হৃদবাংলা
বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ ২০২০
ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব
শ ষ স হ

হৃদবাংলা

বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ ২০২০

স্মারক সঙ্কলন

হৃদবাংলা

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
প্রধান সম্পাদক

পূরবী বসু
সম্পাদক

উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদ

সূচিপত্র

৬০ গল্প ৩২

প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা

সম্পাদকীয়

বাংলাভাষী ভূখন্ডের বাইরে বসবাসরত বাঙালিদের সাহিত্যচর্চার বিষয়ে আলোচনা, বিবিধ রচনার নমুনা প্রদর্শন এবং পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য এবার-ও একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন হতে চলেছে ২০২০-র অক্টোবরের ১০ ও ১১ তারিখে। গত বছর প্রথম বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ শেষে আটলান্টায় ঘোষণা করা হয়েছিল, যে দ্বিতীয় সমাবেশটি হবে কালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগো শহরে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে স্যান ডিয়েগোর পরিবর্তে ইন্টারনেটে সম্পন্ন করতে হচ্ছে এই অধিবেশন, দ্বিতীয় বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ ২০২০।

'হৃদবাংলা' উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশের স্মারক সংকলন। গত বছর প্রথম বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ উপলক্ষে প্রথম সংখ্যা 'হৃদবাংলা' প্রকাশিত হয়। এবার দ্বিতীয় বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশে প্রকাশিত হচ্ছে 'হৃদবাংলা ২০২০' বা 'হৃদবাংলা'র দ্বিতীয় সংখ্যাটি। ছয়টি মহাদেশের আঠারোটি দেশের দেড় শত লেখকের লেখার সম্ভার নিয়ে হাজির হচ্ছে এবারের 'হৃদবাংলা'।কারোর কাছ থেকেই একটির বেশি লেখা নেওয়া হয়নি। এই লেখকদের অনেকেই উপস্থিত থাকবেন এই সমাবেশে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বহু অঙ্গরাজ্য থেকে অভিবাসী বাঙালিরা যোগ দিচ্ছেন সমাবেশে, অনেকেই লিখেছেন হৃদবাংলায়। বাংলা সাহিত্যের সকল প্রকরণই যেমন ছড়া, কবিতা, গল্প, অনুগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আত্মজীবনী, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, ইত্যাকার রচনা উপস্থিত আছে এখানে। এই বিশেষ সংখ্যাটি আশিটি কবিতা, বিয়াল্লিশটি গল্প ও আটাশটি বিবিধ বিষয়ের ওপর গদ্য রচনায় সজ্জিত হয়ে এবং মূল সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে।

এই বছরটি, ২০২০, নানা কারণে খুব তাৎপর্যপূর্ণ আমদের জীবনে। একশত বছর পুর্বে ঘটিত মহামারীর চেয়েও ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী এক বিশ্বমারীর কবলে পড়ে সকল মানুষ আজ স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী। এমন এক ভয়ঙ্কর মানবতার দুর্দিনেও, শ্বেত আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয় কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে মহা তেজে জেগে ওঠে জনতা। প্রচন্ড আন্দোলনে নামে রাস্তায়। সাদা, কালো, হলুদ, বাদামী – সকল রকম মানুষ। স্বভাবতই 'Black Lives Matter' আন্দোলন নতুন করে দানা বাঁধে এবং ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে দাবানলের মতো। দুঃখজনক এই বিষয়ের ওপর বেশ কিছু লেখা, কবিতা ও নিবন্ধ আছে এই সংকলনে। এক অমানবিক ঘটনার মানবিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ। কোভিট= ১৯ বিশ্বমারীতে মৃত মানুষের জন্যে আহাজারিও দেখি আমরা 'হৃদবাংলা'র পৃষ্ঠায় – কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে না করোনা। তাই বলে প্রাণঘাতী করোনার প্রতি ক্ষোভ কম নয় মানুষের। কোভিডের

নিষ্ঠুর আচরণ ক্রমাগত প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আমাদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও অবহেলার-ই ফল--কেউ কেউ লিখেছেন 'হৃদবাংলা'য়।
এই বছর বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম-শতবার্ষিকী। এছাড়া প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষে পদার্পণ করে এ-বছর। দু'টি বিষয়েই লেখা রয়েছে 'হৃদবাংলা'য়। মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুই শত বছরের জন্মবার্ষিকীও এবারেই। সে উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলার নারীদের কল্যাণের জন্যে তাঁর বহুবিধ কর্মের বিবরণ আছে এক রচনায়। মুক্তিযুদ্ধ, রবীন্দ্রনজরুলের ওপরে লেখা, প্রেমবিষয়ক অনুকবিতা, বেশ কয়েকটি ভ্রমণ, আত্মস্মৃতি, রম্যরচনাও আছে। এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী ডঃ আনিসুজ্জামানের প্রয়াণ ঘটে এই বছরেই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে এক নিবন্ধে। আরো অনেক প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে যেমন থাকে এরকম সংকলনে।
'হৃদবাংলা'র পাঠক ও লেখক কারা? পাঠক বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সকল বাংলাভাষী জনগণ- স্বদেশ-বিদেশ যেখানেই তাদের বাসস্থান হোক না কেন। তবে 'হৃদবাংলা'র লেখকরা সকলেই অনাবাসী বাঙালি। হৃদবাংলা কেবল বাংলায় উন্নতমানের সংগৃহীত লেখার একটি সংকলন নয়। সেরকম পরিচ্ছন্ন সাহিত্য পত্রিকার অভাব নেই দুই বাংলায়, বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল উন্নত মানের একটি প্রকাশনাই নয়, আজকের দিনের প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালিদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক লেখার সংগ্রহ। আর তাই আমরা চেষ্টা করেছি অনাবাসী লেখকদের পাঠানো সব ধরনের সকল রচনাই এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে। বলা চলে, এক কথায়, আমরা যতটা সম্ভব গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি বর্জন বা বাতিল না করে। আমরা মনে করি হৃদবাংলা শুধু একটি সাহিত্যপত্র নয়, এটি রইবে কালের দর্পণে একটি সাক্ষ্য -প্রমাণপত্র হয়ে । আজ থেকে ৫০ বছর পরে বাঙালিরা অনুধাবন করতে পারবেন কোন্ চিন্তা নব্য প্রবাসীর মনোজগৎ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, কী কথা বলতে চেয়েছিল তারা তখন।
কিংবদন্তীতে আছে, যুধিষ্ঠির বকরাক্ষসরূপী ধর্মকে বলেছিলেন, 'প্রবাসীর চেয়ে অসুখী কেউ নেই।' আমরা সকলেই সেই বহুশ্রুত প্রবাদটির সঙ্গেও পরিচিত, 'অপ্রবাসী ও অঋণীই জগতের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি।' তা সত্ত্বেও দেশত্যাগ কখনো থামেনি, বিভিন্ন কারণে সব সময়েই জন্মভূমি ছেড়ে কিছু মানুষকে যেতে হয়েছে ভিন্ন কোন দেশে - স্থায়ীভাবেই অনেক সময়। সেখানে নতুন জায়গায় বাসস্থান গড়ে তুলতে হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি চাপা কান্না বুকে বয়ে বেড়িয়েছে তারা। আশ্রিত দেশকে আপন দেশ হিসেবে সর্বতোভাবে গ্রহণ করার ব্যর্থতায়, ফেলে আসা দেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসায়, স্মৃতি-কাতরতায়। এ সব মিলিয়ে যে সার্বিক নস্টালজিয়া তৈরি হয়, তার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে ক্রমাগত দোটানায় ভুগতে থাকে তারা। দেশে ফিরে যাবার প্রচন্ড আকুতিতে, প্রাক্তন জনপদের স্মৃতির অন্বেষণে অনাবাসী লেখকের উন্মুল অবস্থার কথা সর্ববিদিত। কিন্তু ইদানীং নিজ পার্থিব অবস্থা পাল্টানোর জন্যে স্বেচ্ছায় যারা দেশ ছাড়ে, যাদের দেশে ফিরে যাবার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো

হলেও দ্বিতীয় প্রজন্মের সমস্যা ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষে জীবন খুব শান্তিময় প্রায়-ই হয়ে ওঠে না। আগে এই ধরনের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত জনের শারীরিক ও দ্বন্দ্বময় মানসিক বিচ্ছিন্নতা হতো প্রধানত মহামারী, দুর্ভিক্ষ, খরার মত বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, যুদ্ধ অথবা সরকারের বৈরিতার কারণে কিংবা ধর্মীয় বৈষম্যের দন্ড হিসাবে কোন কোন প্রান্তিক গোষ্ঠিকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার কারণে। উপকথায় আছে কখনো অপরাধের শাস্তি হিসাবে লোকালয়হীন গহীন বনে কিংবা সুদূর বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপে পাঠানো হয়েছে একদল মানুষকে। কখনো রেইন ফরেস্টে কয়েক গুণ বেশি জমি পাবার লোভ দেখিয়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার শহরবাসী জনগণের একাংশকে। যেভাবে বা যে কারণেই নিজ চেনা ভূমি ছেড়ে কোন দল, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি অন্য দেশে গিয়ে ঘর বাঁধুক না কেন, তাদের ভেতর স্বভূমির জন্যে কাতরতাসৃষ্ট লেখাই ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলে পরিচিত।

কো্ন লেখা ডায়াস্পোরা, কোন্ লেখা নয়? বিদেশে বসে লিখিত সব লেখা-ই ডায়াস্পোরা সাহিত্যের অন্তর্গত কি? ডায়াস্পোরা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে বেশ কিছুদিন। আর্মেনিয়ান বংশজাত আমেরিকান প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাবিদ Khachig Tölölyan বহু পরিশ্রম করে বের করেন যে ১৯১০-১১-র এন সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও ডায়াস্পোরা শব্দটি নেই। ১৯৫৫ সালের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সংস্করণে শব্দটি রয়েছে এবং তার অর্থ হচ্ছে 'বিচ্ছুরণ' বা 'ছড়িয়ে পড়া'। বলা হয়েছে ডায়াস্পোরা হলো 'ক্রিস্টালাইজড্ এলুমিনাম অক্সাইড'-কে প্রখর তাপে ধরলে তার শরীর থেকে যে ছোট ছোট চূর্ণ ছড়াতে থাকে সেটিই। বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়াটিই ডায়াস্পোরেন (ক্রিয়াপদ), আর ডায়াস্পোরা হলো এক-ই শব্দের (ছড়ানো বা বিচ্ছুরণ) বিশেষ্যপদ। বিচ্ছুরণ বা scattering শব্দটি ডায়াস্পোরার সঙ্গে সম্পর্কিত এই কথা ইদানীং অনেক বাংলা গ্রন্থে বা জার্নালে লেখা থাকলেও ডায়াস্পোরা শব্দটির উদ্ভবে এবং বিচ্ছুরণে এলুমিনাম অক্সাইডের উত্তপ্ত চূর্ণ ছড়ানোর উপমা কেবল এক জায়গাতেই দেখেছি। অন্যরা সকলে ডায়াস্পোরার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়ে ডায়াস্পোরাকে গাছ থেকে বীজের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে উপমাচ্ছলে এক জনপদের মানুষকে দলীয়ভাবে অন্য এক জনপদে গিয়ে আবাস গড়নের প্রক্রিয়াটিকে বোঝান।

ইংরেজি 'ডায়াস্পোরা' শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেওয়া। নিজ দেশ থেকে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে ভিন্ন স্থানে বসতি করতে হয়েছে এমন মানুষদেরই প্রতীকী অর্থে 'ডায়াস্পোরা'-মানুষ বলে অভিহিত করা হয়। ডায়াস্পোরাদের মোটা দাগে দেশহীন মানুষ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। হিব্রু ভাষার বাইবেলকেই বিশ্বের প্রথম ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলা হয়ে থাকে, কারণ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া ইহুদিরা এই গ্রন্থ রচনা করেছিল। সে অর্থে পরদেশে নির্বাসিতদের সাহিত্যকর্মমাত্রই ডায়াস্পোরা সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু অনেকে প্রবাসে বসে এক বিশেষ ধরনের বিষাদময় সাহিত্যকেই ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলেন।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বাংলাদেশের এত বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রবাসী হয়েছেন যে তাঁদের জীবনের, প্রবাস জীবনের প্রেক্ষিত বদলে গেছে। ফলে প্রবাসী লেখকদের সকল সাহিত্যচর্চাকে ডায়াস্পোরা কথাটি দিয়েও পুরোপুরি বোঝানো যায় না। কারণ ডায়াস্পোরা কথাটির মধ্য দিয়ে যে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে এখনকার প্রবাস জীবন সেই বেদনার্ত দিকটিকে বেশ খানিকটা অতিক্রম করে গেছে।

ডায়াস্পোরা শব্দের ব্যবহার বাংলায় বেশিদিনের নয়। বড়জোর তিরিশ বছর। খুব সম্ভবত গত শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে এর শুরু। শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রোথিত হবার কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয়ে যায় মহা দ্বন্দ্ব-- কথা কাটাকাটি। প্রচন্ড বিতর্ক। প্রবাসী বাঙালি লেখকদের মধ্যে কে ডায়াস্পোরা, আর কে নয়। ডায়াস্পোরার যথার্থ বাংলা শব্দ খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রবাসী, পরবাসী, অভিবাসী, অনাবাসী, উন্মূল, দেশহীন, দেশত্যাগী, নির্বাসিত, পরদেশী, দেশান্তরী, অন্যদেশী, দেশহীন, বহিরাগত এরকম বহু শব্দ আবিষ্কার করেছি। এক ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে শৈশবের কিছুকাল কাটিয়ে একদল মানুষ যখন পরবর্তিকালে অন্য ভূমিতে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন, মনে সারাক্ষণ ফেলে আসা ভূমির স্মৃতিচারণ, মনোবেদন, আশ্রিত দেশকে নিজস্ব করে নেবার অক্ষমতা, ফেলে আসা দেশে ফিরে যাবার গভীর আকুতি, সেখানকার গাছ, ফুল, নদী, ফল সকল সময় চোখে ভাসা ইত্যাদি ডায়াস্পোরা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

অনাবাসী বাঙালি বা ডায়াস্পোরা বাঙালি বলতে আমরা কাদের বুঝি? যে ভূখন্ডের মানুষরা বাংলায় কথা বলেন, বাংলা ভাষায় লিখে নিজের ভাব/অনুভব ও চেতনার প্রকাশ ঘটান, যাদের অধিকাংশ-ই বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যাদের শৈশব কেটেছে বাংলার প্রকৃতিতে, কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে তাঁরা রাজনৈতিক বা সামাজিক কি ধর্মীয় বিশ্বাস বজায় রাখতে গিয়ে নির্বাসিত হন স্থানান্তরে অন্য কোন দেশে, অথবা নিজেরাই পার্থিবভাবে লাভবান হবার আশায় কিংবা নিজস্ব আদর্শের সঙ্গে রাজশক্তিধরদের সরাসরি সজ্ঘর্ষে স্বেচ্ছায় অন্য দেশে পাড়ি জমান। কিন্তু স্বেচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, পরবাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক নিরাপত্তা দিলেও মানসিক স্বস্তি ও সন্তুষ্টি কেড়ে নেয়। সারাজীবন অধিকাংশকেই স্মৃতি ও পিছুটান গৃহীত (আশ্রিত) দেশে শিকড় গাড়তে বাধা দেয়।

আঠার, ঊনিশ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙালি যাঁরা সংখ্যায় অতি কম ছিলেন কিন্তু অনাবাসে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, বা সেখানে বাকি জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেমন একেবারে প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর, মাঝে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্, অতুল প্রসাদ সেন, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, তাঁদের রচিত সাহিত্যকে আমরা ডায়াস্পরিক সাহিত্য বলি না, কেন না বিদেশে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে বাঙালি নিয়ে একটি ডায়াস্পোরিক জনগোষ্ঠি তৈরি করেন নি কিংবা তাদের লেখায় বিদেশের জীবন বা সেই দেশের কথা ফুটে বেরোয় নি। তাদের মনপ্রাণ জুড়ে যেমন ছিল স্বদেশ, তাঁদের লেখার বিষয়বস্তুও ছিল নিরেট স্বদেশ-কথা। বিদেশে বসেও

তাঁরা নির্ভেজাল ও একান্ত বাঙালী জীবন নিয়েই কেবল লিখেছেন, বিদেশবাসের জ্বালাযন্ত্রণা, টানাপোড়েন উঠে আসেনি তাঁদের সাহিত্যে। প্রবাসে থাকলেও এঁরা কেউই মানসিকভাবে বাংলাদেশের বাইরে থাকেন নি। বিদেশে বসবাস করেও তাঁরা সৃষ্টি করেননি ডায়াস্পোরা সাহিত্য। বিদেশবাস তাঁদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, শাণিত ও উজ্জ্বল করেছে বটে, কিন্তু তাঁদের মনেপ্রাণে ছিল বাংলার মানুষ। ডায়াস্পোরা শব্দটার দ্যোতনা যতটা মনস্তাত্তিক, ততটা বাহ্যিক বা শারীরিক নয়। কোথায় বাসস্থান, কোথায় তুমি থাক, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন কোথায় তুমি মনে কর তোমার বাড়ি, নিজস্ব বলে কোথায় তুমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর। উত্তরে, বিদেশে বসে রচিত উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাহিত্যকে ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলা যায় না।

ঔপনিবেশিক যুগে যেসব বাঙালি বা ভারতীয়দের দেশ থেকে তুলে নিয়ে শ্রমিক হিসেবে জাহাজে করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল আফ্রিকার কোন কলোনি রাজ্যে, খোদ যুক্তরাজ্যে বা ক্যারিবিয়ান দীপপুঞ্জে যেমন ত্রিনিদাদে, সেসব দেশের কয়েক প্রজন্মের মানুষ ডায়াস্পোরা সাহিত্য রচনা করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ত্রিনিদাদের নাইপল। অন্য ডায়াস্পোরা বাঙালি লেখকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণভাবিনী দাস, ভারতী মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী স্পিভাক, অমিয় চক্রবর্তী-র কথা স্মরণ করা যায়। এছাড়াও আছেন কেতকী কুশারী ডাইসন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, গোলাম মুরশিদ, শহীদ কাদরী, দিলারা হাশেম, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, অমিতাভ ঘোষ, চিত্রা ব্যানার্জি দিবাকারুনি, তসলিমা নাসরিন এবং আরও অনেকে। এর পরের প্রজন্মের যাঁরা বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালি জীবনের অনুপুঙ্ক্ষ জানা সত্বেও বাংলায় সাহিত্যচর্চা করেন না, ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তাঁরা ইংরেজিতেই করেন সাহিত্যরচনা। এদের মধ্যে ঝুম্পা লাহিড়ী, মনিকা আলী, তাহমিমা আনাম, জিয়া হায়দার রহমান-এর নাম করা যায়।

তাই সংক্ষেপে ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা এরকম। জীবিকার তাগিদে, স্বেচ্ছায়, আরো উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় কিংবা শঙ্কিত/বিতাড়িত হয়ে বা অন্য কোনো কারণে নিজ বাসভূমি ছেড়ে অন্য কোন দেশে আশ্রিত হয়ে জীবন কাটালেও ফেলে আসা স্বদেশের স্মৃতি সবসময়েই বুকে জ্বল জ্বল করে এবং সেই স্মৃতিকাতরতা, পিছুটান ও দুই দেশের প্রতি আবেগসৃষ্ট জটিল টানাপড়েনের ওপর লিখিত সাহিত্য-ই ডায়াস্পোরা সাহিত্য।

১. ডায়াস্পোরা সাহিত্যের ভিত্তি বেদনার্ত হৃদয়, স্বদেশের জন্যে মনোকষ্ট, সেখানে ফিরে যাবার বাসনা, স্মৃতিকাতরতা।

২. কখন কখনো একজন বাঙালি লেখক আর একজন অনাবাসী বাঙালি লেখকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, বরং অতি সহজেই সেই অনবাসী বাঙালি লেখককে বাঙালি লেখক বলে মেনে নেওয়া যায়। এটি হয় তখন যখন তাদের লেখার পটভূমি, বিষয়সমূহ, জীবন, প্রকৃতি সব-ই বাংলার বা বাংলাদেশের, যখন সেসব কাহিনী বা অনুভূতিকে নির্মোহচিত্তে গ্রহণ করে সৃষ্টি করতে পারেন তারা সাহিত্য। তারা সাধারণত

বেশি বয়সে, অন্তত প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর দেশ ছেড়ে আসে্ন কিংবা বিদেশে এসে স্থায়ী ঘর বাঁধেন। আর বেশির ভাগ সময়েই তারা দলবদ্ধ হয়ে নয়, একা বা বিচ্ছিন্নভাবে বিদেশে সময় কাটান। ফলে প্রাক্তন দেশের জনগণ দিয়ে এই নতুন দেশে একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে না। প্রবাসের বাঙালি জীবন তেমন আলাদাভাবে তাঁদের সাহিত্যে উঠে আসে না যে তাঁদের সাহিত্যকে প্রবাসী সাহিত্য বলে আলাদাভাবে নির্দেশ করা হবে। তাঁদের লেখার উপকরণে- বিষয়বস্তুতে বিদেশ প্রধান থাকে না। তাদের লিখিত সাহিত্যের পটভূমি বা প্রেক্ষাপট নিখাদ্ বাংলা যা স্বদেশী লেখকদের লেখা থেকে পৃথক করার উপায় নেই। কেননা মানসিকভাবে তারা কখনো বাংলার বাইরে থাকেন নি। বিদেশবাস তাদের চিন্তশক্তির স্ফূরণ ঘটায়, কিন্তু বাংলা ও বাংলার মানুষ-ই তাদের সাহিত্যের উপজীব্য। এই অনাবাসী বাঙালি লেখকদের উদাহরণ, অতুলপ্রসাদ সেন, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্, শামসুদ্দিন আবুল কালাম।
৩. অনেকে দেশ ছেড়ে এসে নতুন দেশের হালচাল, জীবনধারণ, এখানে বেঁচে থাকার, জীবনের মান উন্নয়ন করার সংগ্রাম ও বাস্তবতা এবং নিজেকে ফেলে আসা দেশের একজন সর্বক্ষণ মনে ধারণ না করে যে দেশে আছেন, সে দেশ বা সমাজ নিয়ে, সেখানকার জীবন নিয়ে লেখে্ন। নানা ভাবে দেশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেও অনেকেই নির্বাসিত জীবনের অসারতা, হৃদয়ের তলদেশে গভীর শূন্যতাবোধকে বড় করে তোলেন না। তাঁদের অবলম্বন নতুন ভূখণ্ডে গড়ে ওঠা স্বপ্নের, আর্থিক নিশ্চয়তার, অন্তরে পুষে রাখা একটি স্বচ্ছল, নিরাপদ আকাঙ্ক্ষার জীবন। সে জন্য প্রবাসীর সাহিত্য মানেই নির্বাসিতের বেদনাদীর্ণ ও দেশে ফেরার আকুতিপূর্ণ সাহিত্য নয়। বরং এই সাহিত্য আসলে প্রবাসে গড়ে-ওঠা নতুন জীবনের প্রেক্ষিত অবলম্বনে সৃষ্ট সাহিত্য। এই ভাগে পড়েন আধুনিক যুগের অনেক অনাবাসী-ই। ইংরেজিতে বাংলার মানুষ, প্রকৃতি, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ নিয়ে লেখা এই সাহিত্য। এই লেখকেরা অধিকাংশ-ই দ্বিতীয় প্রজন্মের। বাংলার অনেক বিষয়েই তারা জানে, কিন্তু সেই দেশ বা ভাষা সম্পর্কে একরকম মমতা আছে, কিন্তু পিতামাতার মতো অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা নেই। ঝুম্পা লাহিড়ী, মনিকা আলী, জিয়া হায়দার রহমান, তাহমিমা আনাম তাদের অন্যতম। তারা বেশির ভাগ সময়েই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম। তাদের লেখা ডায়াস্পোরিক হতেও পারে, না-ও পারে। আবার প্রবাসীরা সকলে যে মাতৃভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করেন তা নয়। অন্য ভাষায় অন্য পাঠকদের লক্ষ্য করেও সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরা। আমাদের প্রসঙ্গ বাংলার বাইরে বাংলাভাষার ও বাংলাদেশের সাহিত্য। হ্যাঁ, বাংলাদেশের বেশ কয়জন লেখক এখন ইংরেজি ভাষায় লিখছেন। বাংলাদেশের মানুষ বলে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, বাঙালি জাতির নানা ঘটনাপ্রবাহ, তাদের জীবনযাপনে প্রাসঙ্গিক থাকে; আবার যে দেশে বাস করছেন সে দেশের রাজনীতি অর্থনীতি বা সমাজের চাহিদা সেই সব লেখকদের চৈতন্যে প্রবেশ করে। ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক সময় স্বদেশের ভিন্ন একটা অবয়ব ফুটে ওঠে।

৪. বিশ্বায়নের যুগে, বিশেষ করে ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নততর অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থানগত অবস্থিতি এবং অতি স্বল্প সময়ে ও পরিমিত অর্থে স্বদেশ ঘুরে আসার সুবিধার জন্যে আজ অনেকের কাছে স্বদেশ দূরদেশ একাকার হয়ে গেছে। ফলে যেখানেই বাস করুক না কেন তারা, একটা আন্তর্জাতিকতাবোধ, যা একাধিক সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে, তা তাদের সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক করে তোলে। ডায়াস্পোরা আর থাকে না। ফলে ডায়াস্পোরার এই বর্ণিল রংধনু ছেড়ে আমরা আমাদের সকল বাঙালি অভিবাসীদের জন্যে অনাবাসী এই শব্দ-ই ব্যবহাঁর করব, আর এই অনাবাসী বাঙালির সাহিত্যকর্মের নিদর্শন এই 'হৃদবাংলা'।

পুস্তক রচনা বা লেখা প্রকাশ করা ছাড়াও উত্তর আমেরিকায় বিশেষ করে যুক্তরষ্ট্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয় বহুভাবে। আর আজ তা শুরু হয়নি। এককালে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যম (খুব সম্ভবত পিএল-৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী) হিসাবে আমেরিকার বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়মিত প্রচুর বাংলা বই আসত। বেশ কয়েকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হতো-- যেমন কলাম্বিয়া, শিকাগো, মিজৌরি, ডিউক, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হতো নিয়মিত। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে মার্কিন দেশের কয়েকজন অধ্যাপক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর গবেষণা করে বেশ সুনাম করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এডোয়ার্ড ডিমক, ক্লিন্টন বি সিলি প্রমুখের নাম করা যায়।

আশির দশক থেকেই উত্তর আমেরিকায় স্রোতের মতো বহু বাঙালি এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন-- লটারী ভিসার মাধ্যমে, ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাহামা হয়ে নৌকাযোগে এবং হিউম্যান ব্রাইটস ভঙ্গের শিকার হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে, বেড়াতে এসে জনারণ্যে ভেসে যায় তারা নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি্র আশেপাশের জায়গায়। তখন ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যচর্চার জন্যে গড়ে ওঠে নানা বাংলা সাহিত্যসভা। নিউ ইয়র্ক-এ গড়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র বাংলা সাহিত্য পরিষদ, বনলতা, শিরি, সাহিত্যসংসদ, কবিতাসন্ধ্যা, বিপা, উদীচী, প্রকৃতি, বহুবচন, নজরুল একাডেমি, শুদ্ধস্বর, (কানেক্টিকাট), লেখনী (বস্টন); মন্ট্রিয়লে উঠান থেকে অরণ্যে, প্রভৃতি। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলায় বিভিন্ন খবরের কাগজ প্রকাশিত হতে থাকে প্রধানত নিউ ইয়র্কে---প্রবাসী, দিগন্ত, বাঙালী, ঠিকানা, আজকাল, পরিচয়, জন্মভূমি, নবযুগ, বাংলাকাগজ, ইত্যাদি। প্রকাশিত হয় ম্যাগাযিন শব্দগুচ্ছ, পড়শী, পরবাস, নারী, ঘুংঘুর (টেনেসী), ভিন গোলার্ধ (বস্টন), আস্পেন (ডেনভার), অগ্রবীজ (টেক্সাস), বাংলা জার্নাল (টরন্টো), মুক্তমনা (অনলাইন), সচলায়তন (অনলাইন), অপারবাংলা (অনলাইন), 'আকাশলীনা' (লুইজিয়ানা), গল্পকথা (অনলাইন)। পূর্ব উপকূল বা নিউ ইয়র্ক-এর আশেপাশের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সাহিত্যামোদীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট সাহিত্য সংঘ, বাংলা স্কুল, গান ও বাদ্যযন্ত্রের স্কুল, বাংলা বইয়ের দোকান, বাংলা রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন স্টেশন, অনলাইন খবরের কাগজ, ব্যক্তিগত ব্লগ, প্রভৃতি। ছোটবড় সভাসমিতি থেকে

শুরু করে বাংলাদেশ সোসাইটির এবং ফোবানার বাৎসরিক জাঁকজমকের অনুষ্ঠান, বঙ্গ সম্মেলন ও বঙ্গমেলা (মূলত পশ্চিম বাংলার অভিবাসীদের নিয়ে), ঢালিউড মেলা, হুমায়ূন মেলা, ইন্টারনেটভিত্তিক হাজার রকম টক শো, সংগীতানুষ্ঠান, সভাসমিতি, আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের (ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীদের সমিতি পর্যন্ত গঠিত হতে দেখেছি) নানা অনুষ্ঠান লেগেই আছে। একটি বিরল প্রতিষ্ঠান আটলান্টার সেবা লাইব্রেরী (বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী) একটি নামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শুধু বইয়ের আবাস নয় সেখানে, সেবা ঐ অঞ্চলের বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য সেবা লাইব্রেরী গত বছর প্রথম বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশের স্থানীয় আয়োজক ছিল। সত্যি বলতে গেলে উত্তর আমেরিকার বসবাসকারী বাংলাদেশের জনগণ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকান্ডে অত্যন্ত সক্রিয় ও দৃষ্টিগ্রাহ্য সম্প্রদায়। তাদের জন্যেই আজ সাবওয়েতে, ব্যাঙ্কে নানারকম বিজ্ঞপ্তি ইংরেজি, স্প্যানিশ, চাইনিজের সঙ্গে বাংলাতেও শোভা পায়। সামাজিক নানা কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিদের বহু মসজিদ ও মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে চলেছে ধর্মীয়কর্মাদি। মুক্তধারার উদ্যোগে নিউইয়র্কের বইমেলা ও একুশের প্রথম প্রহর উদযাপন, পুরো উত্তর আমেরিকা জুড়ে নববর্ষ ও একুশে পালন ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম আন্তর্জাতিক দৃষ্টি কেড়েছে। এইসব সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড কেবল বিদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই অঞ্চলের বাঙালী অভিবাসীরা স্বদেশের নানা অনুষ্ঠান ও কর্মশালায় নিয়মিত যোগ দিয়ে থাকেন এবং সেইসব কাজের জন্যে স্বীকৃতিও পেয়ে আসছেন। বলাবাহুল্য, এই সমাবেশে যোগ দিচ্ছেন ও বর্তমান সংখ্যা 'হৃদবাংলা'য় যাঁরা লিখেছেন তাদের মধ্যে ছয় জন বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন, চারজন একুশে পদকপ্রাপ্ত, একজন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত এবং আট জন ওয়ালিউল্লাহ পুরস্কারপ্রাপ্ত রয়েছেন।

হৃদবাংলায় লেখা দিয়ে এবং সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ উপলক্ষে প্রকাশিত অনাবাসী বাঙালির সাহিত্যপত্র এই স্মারক সংখ্যা 'হৃদবাংলা' আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গভীর আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করছি।

পূরবী বসু
সম্পাদক

﴾ কবিতা ﴿

অপরাহ্ণ সুসমিতো

মন গ্রাম

ধর এই একটা কাগজ, তুই আঁকলি তোর স্বপ্ন। আমাকে বললি এই ছবিটার একটা নাম দেয়া দরকার।
কুমিটুমি নামে একটা গ্রাম আছে, তোকে বললাম আয় গ্রামটা দেখি। তুই বললি যেদিন ঝুপঝুপ রোদ নামবে সেদিন গ্রাম দেখব। আবার যেদিন পহেলা বৈশাখ হবে সেদিনও দেখব।
এভাবেই তুই আমি একটা বছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের কর্মসূচি ঠিক করে ফেললাম।

তারা মিয়া নামে আমাদের মন গ্রামে একজন নুলো মানুষ থাকবে, অধোমুখী, কথায় কথায় রাষ্ট্র তাকে নিগ্রহ করবে। তুই আমি তারা মিয়ার সামনে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। কুটুম গোছের একটা পাখি যার লেজ ঝোলা...লাফাবে আমাদের কাগুজে প্ল্যাকার্ডের ওপর।

তুই চোখ মুছে দিবি মানুষের।

বাবার মতো দেখতে একটা লোক বাজারের ব্যাগে করে আনবে অনেকগুলো পেয়ারা...আমি তার সামনে নত হয়ে বলবো, আমাদের গ্রামে পেয়ারার ভাসমান বাজার আছে সবুজ পাতার নীচে।
লোকটা হেসে বলবে, আমার নৌকা বাঁধা ওখানে।
তুই বলবি, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

কুমিটুমি গ্রামের বাড়িগুলোতে উঠান আছে। একটা উঠানে মুরগীর কাজল চোখ বাচ্চাগুলো খুদ খাবে খুঁটে খুঁটে। তুই আজকালকার মানুষের মতো একটাও ছবি তুলবি না। আমাকে বলবি এসো এই বাচ্চাগুলো, এই উঠানটুকু, এই কৃষকের অভাবী মুখ আমরা মুখস্থ করি।

গ্রামের পেছন রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে একটা পুলিশী জিপ চলে যাবে ভয় ছড়িয়ে। খালি গায়ে যে শিশুটা এক বাটি মুড়ি খাবে, খেজুরের গুড় কুটুস করে, তাকে তোর স্বপ্নে নিবি তো?

স্বপ্নে কত স্পেস থাকে! স্বপ্নে কোনো করোনা থাকে না।

গ্রামে নদী না থাকলে কি হয়? একটা বাউলা নদী থাকবে খলবল...বর্ষা নামবে মাতাল। কেউ কেউ ছাতা মাথায় অপেক্ষা করবে। মাথার কেশর দুই ভাগ করা দেখন এই নদীর পাশে জনপদ, দূর থেকে দেখবি যে গ্রাম-ঘ্রাণ নারীরা হাসছে।
জেলে নদীতে জাল ফেলেই বলবে, যেদিকে তাকাই শুধু মাছ আর মাছ...

কমলা নামের যে সুন্দরী থমকিয়া থমকিয়া নাচ করে, তার উঠানের গাছে লাল মরিচ ধরেছে, সবুজ টিয়া পাখি মরিচ খাচ্ছে। টিয়া ঝালে আহা উহু করছে না একফোটা।

তুই অবিকল মিশে যেতে থাকবি দৃশ্যে দৃশ্যে। মাথা ঝুঁকে আমি কাগজটার দিকে তাকিয়েই থাকব সৌর বৎসর ধরে।

আচানক কী ভীষণ শব্দে দুজন চমকে দেখব শহরগুলো চুরচুর জর্দার রঙের মতো মিশে যাচ্ছে তোর মন গ্রামে, এই অবরুদ্ধে।

মন্ট্রিয়ল, কুইবেক, কানাডা

অমল কুমার ব্যানার্জী

আগত দিনের স্রষ্টা

বিশ্বের প্রতি কোণে কোণে আমি গান গাই
আমার অমৃত বাণী বিদ্রোহ মাঝে শান্তির পথ দেখায়
আমি আজও লিখে যায় ভ্রষ্টাচার সমাজের কথা
কেউ রাগে কেউ গালি দেয় কেউ পায় ব্যথা

আমার লেখায় রক্ত ঝরে দেবীর বেদীমূলে
আমি আজ মূক ও বধির রক্ত মাখা ধরনীর কোলে
কালি আর কলমের মাঝে আমি আজও রক্তিম রাগে
সমাজের অন্যায় যতো ব্যক্ত মোর কবিতার মাঝে

আমার সমাধি আজও প্রতিবাদ করে রক্তের অক্ষরে
যতো সব কঙ্কাল জোটবদ্ধ মরণের পরে আধিকার তরে
প্রতিবাদ আজ কবরের নীচ থেকে শ্মশানের ছাইভস্ম মাঝে
মৃত এ সমাজ বেঁচে থেকে পায়নি যে অধিকার
মরণের পরে আধিকার যাচে

মাধবী সন্ধ্যায় আজও সেই কালপুরুষ শত সহস্র অর্বুদ তারকার মাঝে
আজও সেই প্রতিধ্বনি সান্ধ্য অন্ধকারে নূপুরের তালে কে ঐ রমণী?
অদৃশ্য ছায়ার মতো মদিরা রত কে ঐ পাষণ্ড সভাসদ মাঝে
মরণের পরেও ওরা রাজ করে ধরণীর পরে একই ভাবে

শত সহস্র কঙ্কাল সার প্রজা আজও ঘুরে
প্রাসাদের চারিধারে এক মুঠো অন্নের তরে
আমি ঘুরি পাগলের বেশে অন্নহীন প্রজাদের দেশে

অভুক্ত যতো নর-নারী তারই মাঝে আমি যীশু
আমি কৃষ্ণ আমি মোহাম্মদ, বাইবেল কোরান বেদ গ্রন্থসাহেব
আমি ত্রিপিটক, জেন্দাভেস্তা
আমি আগত দিনের স্রষ্টা
খুঁজে পাবে তুমি ইহাদের মাঝে

পুণে, মহারাষ্ট্র, ভারত

আনিস আহমেদ

অন্যরকম অণুজীব

জীবনের খেরো খাতা যতই ভরে প্রতিদিন
ততই শূণ্য হয়ে যায় কবিতার খাতাগুলো
ফ্লয়েডের মতো যখনই নামি পথে আমি
বর্ণবাদের আশংকায় বিবর্ণ হয় বিশ্ব আমার।
ভাইরাসের ভাইয়োলিনে বাজে করুণ সুর প্রতিদিন
এবং জীবনের আয়তন হয়ে যায় ক্রমশই ক্ষীণ ।

জীবন-মরণের এ দড়ি টানাটানির খেলায় দর্শক শুধু আমি
জীবনের জয়ে বাহ বাহ বলি, মরণের টানে নামে অশ্রু শুধু
পাপের ভারে পূণ্যরা কি সব হয়ে যাবে একেবারেই শূণ্য
জীবন মাপেন মুদি দোকানীর বাটখারায় ঈশ্বরও ইদানিং
আশ্চর্যতো এ পৃথিবীতে জন্ম দিলে কেন তবে আদিপিতা
পরজীবি কোন অণুজীবের ভয়ে জীবনটাইতো হয় বৃথা।

জীবাণুর কথা থাক না হয়, রোগের সংক্রমণতো দেখি সর্বত্রই
করুণা করেছে ফ্লয়েডকে করোনা , পুলিশ দেয়নি কোনই ছাড়
বৈষম্যের অণুজীবেরা আজকাল কেবল কালোদেরই মারে ছোবল
সংক্রমিত তারাই অঙ্গ কৃষ্ণ হবার অপরাধে যারা লঘু হয়ে যায় বার বার
রবি-কবি কেন জানি বলেছিলেন কোন একদিন এক কৃষ্ণকলির কথা
কৃষ্ণকলিরা যুগ যুগ ধরে পদপিষ্ট হয়ে যায়, রবিও জানেননি তাদের ব্যথা।

দুটো ব্যাধিরই লক্ষ্য অভিন্ন, জীবনের বিপরীতে, মরণের জয়গান গাওয়া
তবে বর্ণ বোঝে না করোনা কখনই, মানুষের মাঝেই শুধু বর্ণবাদ পাওয়া।

ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

আবু জুবায়ের

ফের দৃষ্টি

আজ সারাদিন জানালার ওপারে তাকিয়ে ছিলাম
ছোট বাগানে কয়েকটি পাখি এসে কিচির মিচির করছিলো
তাদের দিকে দৃষ্টি অস্পষ্ট করে তাকিয়ে ছিলাম
দেখতে পারছিলাম পাখিগুলো খুব গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে
কখন যে দৃষ্টি চোখ থেকে মনের অন্তর্জালে প্রবেশ করেছে বুঝিনি
দৃষ্টি যখন পরিণত হবে বলে মনে হচ্ছিলো, ওরা উড়ে গেলো

ওদের সাথে কোন চুক্তি নেই
নেই কোন নজরদারির আইন
উড়ে গেলো আমার দৃষ্টির শিকল আটকাতে পারেনি
তবুও আকুল হয়ে আকাঙ্ক্ষা করি
ভালবাসায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত হই

পাতাগুলোর যেমন জল প্রয়োজন ওষ্ঠে জিহ্বার রস
শীতল সম্পর্কের পরিবর্তনেরও আশঙ্কা করি সেভাবেই
অপেক্ষায় মিথ্যা অনেক শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি হয়

প্রশস্ত সামনের বারান্দা, তারপর বাগান
এই তো সামান্য দূরে
দুর্বল জিনিসগুলিতে বন্ধুত্বের কড়া রঙ তৈরি হয়
দৃষ্টির বিরতি যখন উজ্জ্বলভাবে প্রয়োগ করে পালিয়ে যাবার জন্য
তখন প্রতিধ্বনি হয়ে কানে আসে
তাড়াতাড়ি চলে যান, বাড়িতে যান
শুধু একজনের সাথে মিলিত হন

এই প্রবণ পৃথিবীর সীমান্ত বলে দেয়
বিলুপ্ত প্রণয় বলে
আবার সেই পাখিদের দিকে তাকাও

প্যারিস, ফ্রান্স

আবুল হাসনাৎ মিল্টন

এতটা দূরত্বে কেন থাকো

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যেখানে আমার হাত পৌছায় না

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
বালিয়াড়ি যেখানে দখল হয়ে যায়

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যেখানে স্পর্শেরা পথ হারায়

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যেখানে ভ্রমর পৌছাবে না কোনদিন

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যেখানে অচেনা লাগে তোমার চিবুক

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যেখানে চুলগুলো পাখি হয়ে উড়ে যায়

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যেখানে কেবল শূন্যতা খেলা করে

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যেখানে না পাওয়ার হাহাকারই একমাত্র সত্য

এতটা দূরত্বে কেন থাকো
যে দূরত্ব আমি অতিক্রম করতে পারি না!

নিউক্যাসল, নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া

আব্দুল্লাহ খোশনবীশ তুহিন

অদৃশ্য অনুভব

রাস্তায় হাঁটার সময়
চকিতে পিছু ফিরে দেখি,
কেউ কি ডাকলো আমায়!

শপিংমল আলো ঝলমল
শুধু কোনের ঐ আলোছায়ায়
কেউ কি দেখছে আমায়!

রাত গভীর হলে বারান্দায়
চাঁদ দেখার উসিলায় একাকী,
হলো কি কেউ সঙ্গী আমার!

উইকএন্ডে-এ স্বপরিবার
ঝিরিঝিরি পাহাড়ি ঝর্ণা,
হাসলো কি কেউ, দেখছে আমায়!

প্রকৃতির কোন মনোরম দৃশ্য
অনুভব করি সেও দেখছে
হাত ধরে পাশে আমার!

জীবনের যা কিছু আনন্দময়
বন্টন করে দিয়ে দিই
শুধু রাখি প্রাপ্য আমার!

দুঃখ কষ্ট বেদনা অতি সংগোপন,
লুকিয়ে রাখি করিনা ভাগ,
তার নয়, সবই আমার!

উনিশ বছর ধরে অনুসরণ,
ছাড়াতে পারিনি পিছু;
নাকি আমিই চাইনি!

ভালো থাকিস, ভালো থাকিস,
ভালো থাকিস
প্রিয় বন্ধু আমার!

রিও ডি জেনেরো, ব্রাজিল

আমীরুল আরহাম

ল্যামপেদোসায় লাশ

বালুতে আঙুল কেটে সখী বেঁধেছিল ঘর
ঘরের দেয়ালে ছলাৎ ছলাৎ স্বপ্নের ঢেউ
বনেতে দাউদাউ আগুণ জ্বেলেছিল কেউ
নীরবে পুড়ছিল সখীর মন মনের ভীতর

দূর থেকে দূরে সমুদ্রে মিলে গেল জাহাজ
আকাশে বাতাসে কাঁদছিল হাজারো গাঙচিল
কৃষ্ণের বাঁশিতে ভরে গেলো মেঘ আকাশ নীল
চোখের ভেতর বিদ্যুৎ মেঘ মন্দির বিপুল সাজ

জমিজমা সব ধনিরে বিক্রি করে প্রাচীন বাস
ঘরের দাসীরে ফেলে ইউরোপে গেলো দাস
সূর্য ডুবলো গভীর সমুদ্রে জাহাজ সাথে নিয়ে

ভোরের পাখির ডানায় উতলা সাগরে বেদনার সুর
রোদের রঙে বাতাসে লেখা ইতিহাস ছুটলো ধেয়ে
ল্যামপেদোসা দ্বীপে ভেসে উঠেছে বাঙালির লাশ

জুরা, ফ্রান্স

আরসালান নিটোল

শেষ বিকেলের ট্রেন

শেষ বিকেলের ট্রেনটা আমি ধরতে পারিনি
হয়তো তেমন করে ধরতেও চাইনি
পড়ন্ত বিকেলের লালিমা যেন
আমার স্নায়ুকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে
আমি বোধহয় শেই ট্রেনটির জন্যই অপেক্ষারত যাতে তুমি ছিলে
যখন তোমায় দেখলাম
আকাশের সোনালী আভা ছাড়িয়ে তুমি উঠে গিয়েছিলে অনেক ওপরে
ঝকঝক শব্দে মাতোয়ারা হয়ে ছিলাম
শুধু তুমি আর আমি
তোমার হাত ছুয়েছি কিন্তু হৃদয় ছুঁইনি
চোখ দেখেছি কাছে যাইনি
তবু মনে হয় তোমার অনেক কাছে ছিলাম
অনেক কিছু বলার ছিল
তোমার নিঃশব্দ শব্দচয়ন
শুধু অনুভব করে গিয়েছি
তখন বুঝেছি পাওয়ার আগে
না পাওয়ার আনন্দ কত গভির
এ আমার এক অদ্ভূত অনুভূতি

আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আল আমিন

নিজস্ব কথা

আমি এক প্রবাসী
প্রবাস নামের যন্ত্রনাকে বুকে দিয়েছি ঠাঁই
মনের কষ্ট লিখিবার জন্য বসেছি আজ তাই
নিজের জীবন বাজি রেখে করে যাই সব কাজ
এরপরেও বস-বেটা দেয় কত ঠাস!
মনকে বুঝাই চলে যাব সব ছেড়ে আপন মাতৃভূমি
কিন্ত! পরিবারের ঋণের চাপে ভুলে যাই সব আবেগ ভরা বাণী
এর মাঝেও চলতে থাকি হাসি-কান্না নিয়ে
মনকে বলি, তাওতো বেঁচে আছি
প্রবাস নামক যন্ত্রনা বুকে নিয়ে

দোহা, কাতার

আলমগীর ফরিদুল হক

কিছু কথা কবিতায়

প্রেম, স্তব্ধতার ক্ষণ

সেদিন তুমি বন্ধুদের নিয়ে কি সুন্দর
আনন্দেই না মেতে ছিলে
সে কি ফিরে যাচ্ছো? দেশে
কি প্রত্যয় ছিল তোমার চোখে
আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছিলে সবার সাথে
আজ সারাটা দিন বাইরে কাজ শেষেও
আর ফিরিনি ঘরে
ফ্রেড্রিক জেমিসনের হালের নুতন বইটা নিয়ে
আর কাবুলি পোলাও খেয়ে রাতে বাড়ী ফিরছি
ঠিক তখনি আবার তোমার কথা মনে পড়ছে
বলেছিলে কিছু হলে ফোন দিও
মনে হলো, ইশরে দেখা যদি হতো
যদি লন্ডনে চলে যেতাম, সে সময়
তাহলে যেন এই একাকীত্বের
জলসন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতাম একটি বার
এই বেলায় কেন যেন ভাত দুপুরের মতন
কি নিরবতা, যোগাযোগের অপ্রতুল
লাগসই প্রযুক্তিগুলোও কেন যেন নিথর
অযুত স্তব্ধতার ক্ষণ গুনতে থাকে

খোলা চোখে

ওরা আসবে গ্রাসিবে সর্বত্র
প্লাবনে ভাসিবে সকল সুকৃতির রূপায়ণ
ধরিতে না পারিলে তাদের অনুষঙ্গ
ভরাডুবি হবে তোমার সৌষ্ঠব

তোমার ঘরের দরজায় কে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসে বার বার তোমার সমস্যার
কথা বলে বলে করে বন্ধুসঙ্গের বেসাতি

খোলা চোখে দেখো কত স্বরূপ ভেঙ্গেছে
কেউ বলে না কথা, আমাদের অনন্তের পানে
চোখ রাখতে দেয় না, কেড়ে নেয়
সকল মানবিক অধিকার, আশা, ভালোবাসা

এই কোন বিগ্রহ রচিত হয়, এই তো নয়
আমাদের জানা শোনা গেল দিনকালের কথা
ফিরে তাকাতে দেয় না, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও না
কার বগলে এই তথ্য, কার ইশারায়

এই পাড়ে নেইকো নৌকো, পরিত্রাণ!
নেহেরুর নন আলাইন্ডম্যান্ট
কবে গেল উবে? প্রয়োজন আজ বড়
নিজের তথ্য সাম্রাজ্য নিজের মত দেখা

ম্যাঞ্চেস্টার, যুক্তরাজ্য

আলেয়া চৌধুরী

আমার জন্ম

আমি কতোবার পৃথিবীতে আসিয়াছি হিসেব রেখেছে কে তার
কতো শত হাজারবার জন্মেছি জলপদ্ম অথবা শামুকের বেশে
পাখি কিংবা প্রজাপতি রূপে ফুল বা বাতাস হয়ে
কতোবার জন্মেছি! কতোবার!
কালো সাদা কুৎসিত সুন্দর নানারূপে
কখনো মানুষ হয়ে কখনো ঘাসফড়িং হয়ে
তোমাদের কাছে আসি
আফ্রিকার হাতীর দাঁতের মতো আমার কদর
আবার প্রয়োজন ফুরালে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে
কে আনে আমার জন্মের ঠিকানা?
আমেনা বেগমের গর্ভে জন্ম নিয়েছি নাকি
বিবিমরিয়ম, ফাতেমা, শকুন্তলা, অথবা মা মেরী
যে কেউ আমার মা হোতে পারতো
আমার জন্ম কখনো বাংলায়
কখনো আফ্রিকার ধূসর মরুতে
আমার জন্ম বসনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে
রক্তাক্ত ফিলিস্তিনে অথবা ভিয়েতনামে
আমার জন্ম দোযখের তপ্ত আগুনে
আমার জন্ম হার্লেমে কালো মানুষের ঘরে ঘরে

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

আসাদ চৌধুরী

বাংলা ছাড় উঠছে আওয়াজ

খোকার হাতে যাদুই চেরাগ
গড়বে সোনার বাংলা
ঘাড়ের শেকল পায়ের বেড়ি
ক্যামনে তোমরা ভাঙলা?

খান্তা সেরা দেখায় দেমাগ
মুজিব তখন জ্বালায় চেরাগ
নদীর জল ওউঠলো ফেঁপে
পাখপাখালি ক্রোধে কেঁপে

ভাঙলো দুয়ার জানলা
বাংলা জুড়ে উঠছে আওয়াজ
শাপলা দোয়েল গাইছে কী আজ
'জয়বাংলা, জয়বাংলা'

টরোন্টো, অন্ট্যারিও, কানাডা

আসিফ ইকবাল

উপলব্ধি কিংবা এপিফ্যানির কাছাকাছি

লিনটন কোয়েসি জনসন, বব মারলি,
উচ্ছল জ্যাজে নিউ ইয়র্ক সয়লাব,
হঠাৎ মনে আসে নাইপলের *অ্যা ব্যান্ড ইন দ্যা রিভার*
উপন্যাসে আলোচ্য ল্যাটিন বচনটি,
মনে হতে থাকে আসলেই কি অকৃত্রিম
এই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী আর ভাষার মিলনমেলা?

রাস্তায় এলোমেলো পদচারণের শুক্রবারটি হঠাৎ করেই
জুম্মাবারের প্রতীক হয়ে হাজির হয়
ডাউন-টাউনের ব্যস্ততম এই অংশটিতে চলে মহাকরণ,
মহান সৃষ্টিকর্তায় দেহ-মন সঁপে ভক্তি-
গদগদ মুসল্লিরা দাঁড়িয়ে পড়েছেন নামাজে,
তবে এই উপস্থাপিত ধর্ম-চেতনা হয়তোবা
বেশ কিছু পথচারীর বিরক্তির কারণও বটে

হাজার বছরের সংঘর্ষ, সংস্কৃতি, সভ্যতা
পারস্য-আফগানীর শৌর্য, কুর্দি সালাহউদ্দিনের সাহসিকতা
তুর্কি সুলতানের সালতামামী, বঙ্গসন্তান কাজী নজরুল ইসলামের হামদ ও নাথ
সব মিলেমিশে একাকার তখন
একেশ্বরবাদের ইতস্তত এই আধুনিক মুহূর্তে
ইসলাম যেন পুরোদস্তুর সেক্যুলার নিউইয়র্ককে শক্ত করে জাপটে ধরে।

ল্যান্সিং, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

আহমেদ শরীফ শুভ

চাষাবাদ

মুক্তো ফলাবে যদি ঠোঁট মেলে নিয়ে যাও বৃষ্টির ফোঁটা

জলেতে জ্বলে উঠো সমুদ্র-ঝিনুক তবে
ধীর পায়ে এসো
ধ্যানে মগ্ন ঋষি হয় বসে আমি মুক্তোর চাষি
বৃষ্টি তোমাকে দেবো
অষ্টপ্রহর কাটে মেঘেদের রসায়ন মনোযোগী পাঠে

মুক্তো ফলাবে এসো রাত জেগে থাকি
আমার খামারে একা জোয়ারের জল মাপে ভিনদেশী চাঁদ

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

ইকবাল হাসান

কিছুই আমার নয়

যা কিছু বলছি আমি তা আমার কথা নয়
পুরোটা অন্যের।
আমার মুখে যা কিছু শুনেছ এতদিন
এ সকল কথা বলা হয়ে গেছে বহুকাল আগে
হয়তো শোনোনি তুমি
এখন আমার মুখে হঠাৎ এসব শুনে মনে হবে
আগে তো শুনিনি
সব কিছু যেন নতুনের মতো মনে হয়!

প্রকৃত প্রস্তাবে-কিছুই নতুন নয়
কিছু বলা আছে প্রাগৈতিহাসিক পুঁথি ও
মিথের বিস্তারে, কিছু আটকে ছিল বিপন্ন বিস্ময়ে

কিছু আটকে ছিল চিত্রকল্প, উপমায়
আমি তাকে অবমুক্ত করেছি।

তোমার সামনে আমি নতশিরে স্বীকার করছি আজ
যা কিছু বলেছি এতদিন কিছুই আমার নয়
সবই অন্যের
শুধু তাদের প্রজ্বলিত মোমবাতি থেকে একফোঁটা আলো ধার করে এনে
নিজের ঘরকে আমি কবরের অন্ধকার গুহা থেকে জীবন্ত করেছি

টরোন্টো, অন্ট্যারিও, কানাডা

ওমর শামস

জ্যোৎস্নাগ্রহণ

চাঁদের থেকে জ্যোৎস্না নয়,
কচি মোরগফুল আর দোপাটির পাতা ঝরছিলো -
বনান্ত, ধানক্ষেত, নদী আর দালানের উপর
সারাটা রবিবার রাত্রি।

চাঁদের থেকে জ্যোৎস্না নয়,
হরিণ পড়ছিলো
শাদা ফুটিফুটি হরিণ শাবকেরা ঝরছিলো -
পৃথিবীর কোন উপত্যকায়
নতুন ঘাসের উদ্যানে।
সারাটা মঙ্গলবার রাত্রি।

চাঁদের থেকে জ্যোৎস্না নয়,
মানুষ পড়ছে -
সারা ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াপথ থেকে জড়ো হওয়া
কালো, সবুজ, শাদা, হলুদ মানুষ -
পৃথিবীর হতভাগ্য দেশগুলোর খরাবন্যা ক্ষুধার্ত প্রান্তরে,
ওরা ঠিক করে দেবে তাই।
ওরা বলেছে ঠিক করে দেবে।

আমি পাত্রের মধ্যে বাংলাদেশকে ধরে রাখি।

হোমডেল, নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

কাজী মঈনুল হক

বৃষ্টির জলে বিম্বিত আকাশ

একটু একটু বৃষ্টির ভেতরে
আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম একা,
দু'পাশে গাছের সারি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল হিন্দি ছবির নায়িকার মতো
আর তির তির করে কাঁপছিল কামার্ত আবেগে।

আমার বেশ লাগছিল,
একা ছিলাম বলেই মনে হচ্ছিল,
'এই পথ যদি না শেষ হয়'......
তবে উত্তম-সুচিত্রার ন্যাকামোর মতো করে নয়।
বৃষ্টিটা ধরে এলে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় রঙধনু
সমুদ্রের শেষে দিগ্বলয়ে।

মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে বলে
আমার কাউকে ফোন করে বলতে ইচ্ছে করে,
দেখো, আমার গতকালের অনিয়ন্ত্রিত মেজাজের জন্য খুবই দুঃখিত......
দুঃখ প্রকাশ করতে গেলে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে,
এমনটি আর ঘটবে না।
গতকাল মেজাজ আমার দখলে ছিল না, তাহলে কোন ভরসায় বলি,
আগামীতে আবেগগুলো আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে......
এমন হাস্যকর অঙ্গীকারের কোনো মানেই হয় না,
এরচেয়ে বেসুরো গলায় গাওয়া যাক কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত।

গাছে গাছে এখন নতুন পল্লব,
মেঘ সরে গিয়ে চিকচিক করছে রোদ্দুর,
সেই রোদ ভেজা সবুজ পাতার ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে পাগলের মতো;
আমি জাপানের একটা পার্কে একবার দু'জন কিশোর-কিশোরীকে

এভাবে চুমু খেতে দেখেছিলাম বহুকাল আগে।

স্মৃতি কেন অপ্রয়োজনীয় সময়কে ধরে রাখে আর
মুছে ফেলে দেয় যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ!
কোনো এক দুপুরের সঙ্গমরত চড়ুইদম্পতির কথা
আমার স্মৃতিতে আজো উজ্জ্বল, অথচ আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব
কিছুতেই আমি আর মনে করতে পারি না অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও!
কিংবা ধরা যাক গত রাত্রের স্বপ্নের কথা.....
যে মেয়েকে আমি ঘষে ঘষে মুছে ফেলতে চেয়েছি চিরকালের মতো
সে কেন উঠে আসে অবচেতনার পথ ধরে!

আমরা যেটাকে শেষ বলে ধরে নিই
সেখান থেকেই হয়ত আরম্ভ হয় নতুন সঙ্গীত,
যে পাহাড়ের পাদদেশে এসে আমরা থেমে গিয়েছিলাম
সেখানেই উড়েছিল একদিন এভারেস্ট বিজয়ের হর্ষিত পতাকা।

এই যে প্রকৃতি আজ রঙের সম্ভার নিয়ে সাজিয়েছে
কাছের পৃথিবী আর দূরের আকাশ
একটু পরেই তা হয়ত ছুঁড়ে ফেলে দেবে দুরন্ত অবহেলায়!
তবু আমার আঙিনায় মরে যাওয়া বেলি গাছকে
শরতের আকাশের মতো অজস্র ফুলের মেঘে ভরে উঠতে দেখে
এই অমিতচারী প্রকৃতিকে আমি একদিন খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম;
তাই ভোরের রোদ্দুর জানলার শিক গলে আমার দু'চোখ ছুঁয়ে দিলে
আমি পাখির মতো সহজ ভঙ্গিতে শিস দিয়ে উঠি নিজের অজান্তে
ভুলে গিয়ে সব রাতের দুঃস্বপ্ন.......

অস্টিন, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

কাজী রহমান

সবুজ উপত্যকা

কবি অথবা খুনি, ঠিক কোথায় শুরু তার?
শুরুটা কোথায়, আধুনিক মানুষ, তোমার?
পথচলা শেষ না হলে, আবার কি হবে শুরু
নতুন সবুজ করিডোর ধরে আরো একবার
শুদ্ধ, অথবা উত্তরাধুনিক মানুষ ছড়াবার?

কেন যে খুঁজিনি অতীত, আমাদের, আমরা
কোথায় থামতে হবে কে বলে দেবে আজ?

সবুজ নতুন উপত্যকা পথে এই মানুষই
হেঁটেছিলো সেদিন, একই আমাদের দিকে,
অতি দূর অতীতে জন্মেছিল যে ভবিষ্যৎ
মহাকালের অস্থিরতায় তা টলে গিয়েছিল
সেই সেদিনে উদ্বাস্তু হলো ওই মানুষেরা
কত কাল এলো গেল, কে খুঁজেছে তারে?

এক অথবা অনেক নাকি হ্রদ ছিল জানি,
ভূমি ছিল জল ছিল আর, ছিল বেঁচে থাকা।
হয়ত বা ঘর ছিল, কুঁড়ে, ছোট ছোট কিছু,
আড় হল গ্রহ অকস্মাৎ, খরা হল যা তা।

তির্যক পশ্চিম অথবা পুবে, উপরে, নিচে
এক সবুজ গলির আমন্ত্রণে পথ হেঁটেছিলো
দল বেঁধে এগিয়েছিল তারা, এই দিকটায়।

নিজেকে মানুষ জেনে বেসেছিলো ভালো,
আগামীর তরে। আমরা, খুঁজিনি তাদের।
অস্তিত্বের যুদ্ধে তাই ছড়িয়ে পড়ার কালে
যুদ্ধ জিতেছিল মানুষ দূর সময়ের জালে।

পুড়ছিল রোদে আমাদের গ্রহ প্রবল খরায়
আর সেই ফাঁকে ধুরন্ধর এনেছিল ঈশ্বর।
ক্ষিধে আর ঈশ্বরের যুদ্ধ বেঁধেছিল তখন।
ক্ষিধেই জিতল বলে মানুষ আজ বর্তমান।

সন্ধ্যাকাশের যতগুলো তারায় ভালোবাসা
জন্ম যাদের শূন্যে অবিরাম, অতঃপর মরণ
সেখানেই ভিটে যার, অনন্ত আশার মেলায়,
সেই বিমূর্ত শূন্যেই কি ওই খোলা জানালা
ভাবনা শুরু অথবা অবাক বিস্ময় খেলাটা?

বেঁচে চলবার পুরোনো যে কথা, মানুষের,
সেখানেই কি উত্তর তার, শুন্যেতে ফেরে?

ব্যাপ্তির কতটুকু দেখা পেলে তা হয়ত সময়?
অজানার বাস কতটুকু উপলব্ধির আঙিনায়?
তবুও মানুষ, স্পর্ধার অন্ধকারেই অ-সামান্য
হয়ে যায়, স্বঘোষণায় এবং অলস অজ্ঞতায়!

তুলনার তরে উপলব্ধির এই যে গন্য সময়
টিক টিক চলে, অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দেয়
আমাদের। সময়কে হারিয়ে চলো ভালোবাসি
এসো দেখা অদেখার অনন্ত আলোক ধারায়।

ফনটানা, ক্যালিফোর্নিয়া

কামরুন জিনিয়া

প্রহরগুলো মোম হয়ে গলে

[সুখেন আর মহুয়া। দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে, যদিও বর্তমানে ওদের অবস্থান পৃথিবীর দুই প্রান্তে। সুখেন ঢাকায় আর মহুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাতে কি? ওদের কথা হয় প্রায় প্রতিদিনই। সে-কথাগুলোতে শুধু প্রগাঢ় ভালোবাসাই নয়, একজন আরেকজনকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই নয়-ওঠে আসে বর্তমানের অস্থির সময়, জটিল পারমনাবিক যুগ ও বৈশ্বিক রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজচিন্তা সহ বর্তমান সময়ের একজন সচেতন আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে নিজেকে ভেঙেচুরে আবার নিজেকে নির্মাণের ইচ্ছাও । সুখেন ও মহুয়া এ সময়ের একবিংশ শতাব্দীর। প্রায়শঃই ওরা একে অন্যের মুখোমুখি না হয়ে, মুখোমুখি হয় নিজের।
ওরা বোঝে, এই জটিল পারমাণবিক যুগে শুধুমাত্র 'আমি' ও 'তুমি'র বিলাপই ভালোবাসা নয়, প্রেম নয়- বর্তমান সময়ে প্রেমহীনতাকেও ওদের কাছে কখনও কখনও এক ধরণের প্রেম বলে মনে হয় ।]

সুখেন:
আর একটি সিগারেট ধরাবো?
নাহ, থাক।

মহুয়া:
জানো, সেই ভোররাত থেকে এখানে বৃষ্টি
ঝরে পড়ছে টুপ্ টাপ্ টুপ্ টাপ্ ...... টাপ্ টুপ্!

সুখেন:
আহা! বৃষ্টি!
আচ্ছা, আচ্ছা যদি এমন হতো....

মহুয়া:
কেমন?কি হতো?

সুখেন:
এমন যদি হতো, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে
হারিয়ে-যাওয়া ডি. সি.-১০ হয়ে

পাঁচ পাঁচ সুখ-বর্ষ পরে লাফিয়ে পড়তে
পারতাম তোমার শহরে বয়ে-যাওয়া
মিসিসিপি নদীর জলের ওপর!

মহুয়া:
গোসল সেরে আমাকে ছুটতে হবে কাজে
ড্রেসটা ইস্ত্রি করা দরকার-শুনছো?

সুখেন:
নাকি, প্রেসিডেন্টকে হত্যার অপচেষ্টার অভিযোগে
ধৃত হয়ে পত্রিকার শিরোনাম হবো?

মহুয়া:
চুপ করো তুমি, চুপ করো
কে যেনো আসছে!

সুখেন:
অথবা অলিম্পাস পর্বতের
দেবতাকূলের শিরোমণি হয়ে
লেডাকে গ্রাস করবো?

মহুয়া:
এই বৃষ্টিতে ট্রাফিক হবে খুব, পৌঁছুতে
নির্ঘাত দেরী হবে আজ শুনছো!
কাজটা হারাই তাই চাচ্ছো বুঝি?

সুখেন:
একটি মেয়েকে ভালোবাসা দরকার
দরকার যাকে বলবো-
'Hold your tongue
and let me love!'

মহুয়া:
ভালোকি থাকা যায় ভালোবেসে?

সুখেন:
সাথে ড্রাকুলাটা থাকলে কিন্তু বেশ হতো!

মহুয়া:
জয় হোক তোমার!

সুখেন:
আমার চোখের সামনে ঝলসে ওঠে
হাজারো সূর্য, লোহিত কণিকাগুলো
আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে!
তারপর... তারপর ...

মহুয়া:
তারপর?
শর্তহীন নীলাকাশ আঙুলের ফাঁক গলে
একসময় ঝরে পড়ে-
টুপ্ টাপ্ টুপ্ টাপ্ এবং টাপ্ টুপ্!

ব্যাটন রুজ, লুইজিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র

কাহ্নপাদ হায়দার

আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড

আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড

এখন এই সময়
যখন ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে
প্রতিটি মুহূর্তকে মিলিয়ে
প্রতিটি মিনিটকে সচল সবাক করে

চলো
ঘড়ির খোলস ফেলে রেখে
কবিতা থেকে মিছিলে চলো

এখন সেই সময়
যখন পৃথিবীর সব ঘড়িতেই সময়ের হিসেব
হিম হয়ে আছে
স্থির
স্তব্ধ হয়ে আছে

গোটা পৃথিবীই থমকে গেছে
থেমে গেছে গাছের শাখার আন্দোলন
পাতাদের সালোক সংশ্লেষণ

এখন শুধুই ঝড় আসার আগের
গাঢ় নিস্তব্ধতা

বাস্তবের গভীরে আছে
আরো এক রূঢ় গহীন
বাস্তব

অতলস্পর্শী সেই বাস্তব
থেকেই জন্ম নেয়
অনন্তকাল ব্যাপী আন্দোলন

যার গভীরে লুকিয়ে আছে
প্রেম...
প্রমিত বিপ্রতীপ সংগ্রামী সত্যিকার

মানুষি ভালোবাসা

সংগ্রাম-সঙ্গমে
প্রেমের অন্তহীন পরিচয়

ভালোবাসা
প্রেমের অমাবস্যা তারার আলোয়
পথ চিনে জ্যোৎস্নার অভিসারে ধায়

মধ্যবিত্তের মুখোশ খুলে ফেলে
নীল আকাশের নীচে এলে
ভালোবাসার দেখা মেলে

আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড
আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড
আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড

বিপর্যস্ত মানুষের
মরণের জন্য
যদি যথেষ্ট

মানুষের মতো
বাঁচার লড়াইয়ের জন্য কি
পর্যাপ্ত নয়?

গহীন
ভালোবাসার শান্ত
 স্বর-সঙ্গতির জন্য?

লক্ষ কোটি মানুষের অনেক অনেক
আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড সময়ের যোগফল

হার্মাদের, প্রবল
জালেমের কবল
থেকে
মানবিক মূল্যবোধের নাজুক লাজুক লতাকে
বলিষ্ঠ সাহসী ভালোবাসার শক্ত শেকড়কে
বাঁচাবেই...

তাই
ম্লান সূর্যমুখীর মতো
 নতুন সূর্যের প্রত্যাশায়
চেয়ে আছি
আমরা সবাই

সূর্য থেকে আলো আসতে...

মাত্র

আট মিনিট উনিশ সেকেন্ড

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

গাজী রশীদ

বৃষ্টির হাসি

আমি ব্যর্থ মানুষ দেখিনি
দেখেছি কালো মেঘের ছায়া
হারতে দেখিনি কাউকে
বুকের ভেতর লম্বা শ্বাস নিতে দেখেছি

অনুর্বর জমিন দেখিনি কখনও
আগাছার নাচন দেখেছি
একটা ঘাস ফড়িং উড়তে দেখেছি
বিষণ্ন শরত বিকেলে

বাতাসের কান্না শুনিনি কখনও...
বৃষ্টির হাসি দেখেছি বহুবার
হৃদয় বীণায় এঁকেছে ছবি...
সেই কালো মেঘের ছায়া
আগাছায় ভরা জমিন
ঘাস ফড়িংয়ের নাচন
আর
পাতাঝরা শরৎ অপরাহ্ন

সকালের হতাশা দেখি নি কখনও...
একফোঁটা শিশির শুকোতে দেখেছি
দেখেছি নীল শাড়ি পরা সাগর মেয়েকে
হারিয়ে যেতে দূরাকাশের সীমানায়

শেষ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি
একা দুটো চোখকে একটি আশার স্বপ্ন বুনতে
অপেক্ষার ফেরিতে

ইরান

গুলশান আরা

করোনার অভিশাপ

পৃথিবী, একি রূপ হেরি আজি তব?
মারণ নেশায় তুমি উন্মাদ হয়ে গেছো, নিয়ে রণ রূপ অভিনব
জীবন-মৃত্যুদ্বারে চারিদিকে হাহাকার, হৃদয় বিদারী চিৎকার
কেন এই নিষ্ঠুর অনাচার?

আজ করোনায় আক্রান্ত পৃথিবী, মানুষ চলেছে বয়ে গুরুভার
ক্ষুদ্র এ ভাইরাসে অসহায় আজ সবে নেই যেন কারো নিস্তার
বন্ধ সিংহদ্বার, শূন্য খেলার মাঠ, শুধু উড়ে চলে কয়েকটা চিল
ধরিত্রী নিশ্চুপ, জনপদ জনহীন, চলে রাজপথে লাশের মিছিল
মানুষে মানুষে ভয়, কেহ যেন কারো নয়, শুধু হয়ে থাকা নির্বাক
মৃত্যুকূপের মাঝে ভয়ে ভয়ে শ্বাস নেয়, কে জানে কখন আসে ডাক
কান্নারোল আজ ঝংকৃত হয়ে ফেরে সমগ্র ধরণীর মাঝে
উপাসনারত ভীত সকল বিশ্ববাসী ক্ষমা মাগো বিধাতার কাছে

আমাদের অর্জন আমাদের বৈভব আমাদের দুর্জেয় শক্তি
আজ সব যেন নিরর্থ, শুধু শুনি হাহাকার নেই কোনো দিকে যেন মুক্তি
পৃথিবীর পরে মোরা করেছি মিথ্যাচার খেলিয়াছি ধ্বংসের খেলা
তাই কি ধরণী আজ সেজেছে রণের সাজ তাই এইপ্রতিশোধ লীলা?

ক্ষমা করো হে বিধাতা ক্ষমা করো আমাদের, ক্ষমো আমাদের অপরাধ
হোক করোনামুক্ত ধরা, দূর হোক দুর্যোগ, কেটে যাক এই কালোরাত
মেঘমল্লার আজ বাজুক সকল দিকে ধুয়ে দিক অপরাধ গ্লানি
ঝংকৃত হোক আজ সকল প্রান্ত থেকে সম্প্রীতি সততার বাণী

হোক সব কলুষতা হোক ক্ষয়
হোক সব মানুষের হোক জয়

কানেটিকাট, যুক্তরাষ্ট্র

জয়ন্ত নাগ

একটি মৃত্যু এবং

(জর্জ ফ্লয়েড-কে)

মৃত্যু তো আসবেই একদিন
কিন্তু কোন কোন মৃত্যু শুধু মৃত্যু নয়, আরও কিছু
ওলটপালট করে দেয় সবকিছু

দীর্ঘদিনের উদাসীনতা, অবজ্ঞা, অবহেলা, অবিচার, দুর্বিনীত আচরণ

হাজার হাজার সাদা-কালো-বাদামি রঙয়ের মানুষের মিছিল
জনতার ঢল পথে পথে এর প্রতিকারে, প্রতিবাদে জানিয়ে দিল
এর কোন বিকল্প আজও মানুষের জানা নেই

অবশেষে জনতার চাপে ক'দিনের মধ্যেই
অভিযুক্ত করা হল হন্তারক পুলিশদের
যা এর আগে কখনও হয়নি,
কিন্তু এবার তা হল ইতিহাসের পথ ধরে
আবারও প্রতিবাদী জনতা জানিয়ে দিল কী করতে পারে ওরা
জানিয়ে দিল দুর্নিবার্য সমবেত প্রতিরোধ এখনও উপযুক্ত অস্ত্র
মানুষের বিবেচনার উপর প্রায়-
হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস আবার ফিরে পেলাম
জানিনা এরপরও শান্তিপ্রিয়,
নির্লিপ্ত ও নিরাপদে থাকা সুধীজনেরা কী বলবেন!

এখন শুধু অপেক্ষা

অপক্ষপাত বিচারের, এতদিনের বিদ্বেষী কালো আইন বদলের সরকার-
রাজনীতিকদের সামনে এখন অনেক বড় পরীক্ষা জনতাকে আবারও কি পথে নামতে

হবে? কালো মানুষের জীবনযাপন কি একটু স্বাভাবিক হবে? পারবে কি তারা নিরাপদে নিঃশ্বাস নিতে? পারবে কি সবাই বুঝতে এখন কালো মানুষের গণ্ডস্থলে মাথার ভিতরে নৃশংস চাপ দিলে শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয়
এরকম অজস্র প্রশ্নের ভিড়

পারবে কি নিজেদের দীর্ঘদিনের সব ভুল শুধরাতে?

কিন্তু উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়
সময় হয়ত তা বলে দেবে
তবুও জর্জ ফ্লয়েডের

আমি আর শ্বাস নিতে পারছি না
মা আমার বড় কষ্ট হচ্ছে
এই অন্তিম আর্তনাদ
অন্তরীক্ষে ভেসে বেড়াবে অনন্তকাল
বারবার তা ফিরে আসবে
মিছিলের শ্লোগান হয়ে
হয়তো তা সংবেদনশীল মানুষের
ঘুম কেড়ে নেবে ক'দিন
হয়তো কিছুদিন তাড়িত করবে
একটা কিছু করার উত্তেজনা শুধু কি এইটুকুই?
শুধু কী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিভাস?
তবুও জীবন কী জীবনের পথ ধরে
এগিয়ে চলবে আগের মতোই
এসবের কোন কিছুই আমাদের জানা নেই
তবুও তোমার নির্দয় মৃত্যু আমাদের কিছু একটা বলে গেল

চেশায়ার, কানেটিকাট, যুক্তরাষ্ট্র

জাকির হোসেন খোকন

দুঃখিত

আপনাদের পরিচ্ছন্ন দেয়ালে
রংতুলি দিয়ে আঁকা চিত্রটি ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য দুঃখিত
নামিয়ে নেব এই এক্ষুনি
চিত্রকর্মটির বিষয় পরবাস
নাম সুখ পাখি
কোন এক প্রবাসী শ্রমিকের প্রেয়সীর রাখা নাম এটি
ডান দিকটায় অবিন্যস্ত বসতবাড়ি শিশুদের আনন্দময় মাঠ পেরিয়ে
সবুজ যে আভা দেখতে পাচ্ছেন
গাঢ় থেকে হালকা হয়ে হলুদের ভেতর অনিচ্ছায় ঢুকে
ছড়িয়ে পড়েছে দিক থেকে দিগন্তে
এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তুলির আদর
ধীরে যা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তামাটে আকাশে মিশেছে
বাম দিকটায় আবির মাখা সন্ধ্যা
থমকে দাঁড়িয়ে আছে নক্ষত্রের দরজায়
অসাধারণ বলে তুমুল শুভেচ্ছা বৃষ্টির ভেতর থেকে
এক বয়োবৃদ্ধ উঠে
ঘনিষ্ঠ হয়ে চিত্রটি দেখে
ভেজা কণ্ঠে বললেন,
পুরো ক্যানভাস জুড়ে আঁকা
অসংখ্য শ্রমিকের ক্লান্ত চোখ অনাদুরে মুখ
তাদের সং সাজা সংসারী আসবাব
স্পর্শাতীত ভালবাসার পরাগ
চুম্বনের মলিন দাগ
রঙ ওঠা স্বপ্নকে ছুঁয়ে কাব্যিক জীবন গল্পের সোহাগ
সব দেখে শুনে ওই পেছন থেকে দু'একজন বলে উঠল-

ওহে সভ্যতার কারিগর
তোমাদের সামনে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকবে
এ দুনিয়া জনম ভর
বিব্রত আমি চিত্রাঙ্কনটি সরিয়ে নিচ্ছি-
আর বারবার বলছি দুঃখিত খুব দুঃখিত

সিঙ্গাপুর

জান্নাতুল ফেরদৌস

বৈষম্য

ক'মাস কেটে গেল বিরামহীন অবসরে
ভারসাম্যহীন ভাবনার নৌকা দোলাচলে চলে
উপচে পড়া চিন্তা কষ্ট দেহ্ করে ভারাক্রান্ত
গভীর রাতে অঘুমের রাজ্যে স্বাদহীন জীবনে
চিন্তা-ভাবনার বিপদসঙ্কুল নদী হয়ে পারাপার
মেঘবাতাসের আন্দোলন, কাকচক্ষু জলের পরিচ্ছন্নতা
ভোরের আলোর শেষ আভা, সূর্য মেঘের প্রহেলিকা
ভেস্তে যায় সব অচেনা ভবিষ্যতের ভাবনায়
কি আছে কি নেই হিসাব রাখা ভার
কোন দিন কাটে মহা যন্ত্রণায়
ঘুম ভাঙ্গে রাতে ডাহুকের ডাকে
জনমানবহীন পথ ঘাট মাঠ
বন্য জন্তুরা টের পেয়ে যায়
ঔদ্ধত্য বাড়ে ওদের ভয় হারিয়ে
যাপিত জীবন ডালির স্বর্গ সুখের নিয়মিত
ব্যস, মায়ের বাড়ীর সুখ, বোনের আদর
নিমিষেই হারায়ে যায় অনুভবের অন্তরালে
মধ্যদিনের রৌদ্রময়ী রঙিন বসন্তের
মৃদু হাওয়া মৃত্যুর সতর্ক বাণী দিয়ে যায়
মুহূর্তে হারায়ে যায়, প্রিয় মুখ, নাড়িছেঁড়া ধন
নিঃসঙ্কোচে শীত শেষে গাছে আসে ফুল পাতারা
চমকিত করে আলোকিত তারার লাবণ্য
বর্ষার কদম পুরনো বেহালার সুর
সঙ্গনিরোধ বলে শূন্য পথ চলে যায় বহুদুর
লিখিত পুঁথিতে কিংবদন্তীরা হবে ইতিহাস
কত ঘটনার সাক্ষী হবে মন খারাপের গল্প

যদি যেতে হয় অবেলায় অচেনায় আমি যাব হয়ত তুমিও
কবে আসবে আত্মার বর্ণালী দিন বইবে শান্তির সুবাতাস
মাখন গলা জ্যোৎস্না ভরিয়ে দেবে নিষ্প্রদীপ প্রান
নতুন পাতায়, গুল্মে ভরে উঠবে মরুভূমি জীবন

পটোমাক, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

জাহানারা খান বীণা

নতুন কবিতা

চাঁদ নিভে গেলে
অন্ধকার ঢেকে রাখে রাত্রি
বাদুড়ের ডানায় অবিরাম খেলা করে
অশরীরী ছায়া

ইদানিং বেহিসাবি অক্ষরগুলো
হঠাৎ থেমে যায় আঙ্গুলের ডগায়
শব্দের বাগানে আগুন
দাউ দাউ জ্বলছে
মসজিদ, মন্দির, উপসনালয়
চতুর কাক খুব সহজেই ঠুকরে দেয়
উপমা চিত্রকল্প আর
অন্তমিলের শোভা

নগর সভ্যতার দুয়ারে কড়া নাড়ে
মেঘনা নদীর সাহসী মাঝি
এই স্বাধীনতার কথা
তুমি বলেছিলে কবি?

ঘুরে দাঁড়ায় রাইফেল কাঁধে
বনে বাদরে ছুটে চলা সেই তরুণ
এই স্বাধীনতা তুমি চেয়ে ছিলে কবি?

মাথার উপর ভন ভন শব্দে
লাঠি ঘুরায় নূরুল দীন
চেয়ে দেখো মাথার উপর
চক্কর মারে বুড়ো শকুনের দল

হুশিয়ার! হুশিয়ার!

অগোছালো অক্ষরগুলো
আঙ্গুলের ফাঁকে নেমে আসে শূন্য পাতায়
শব্দের পরে শব্দ সাজিয়ে তৈরি করে পংক্তিমালা
আহা। এভাবে বুঝি সত্যি লিখা হবে
নতুন কোন কবিতা

বয়ন্টন বিচ, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

জীবন রায়

নষ্ট সময়

নীলকণ্ঠ পাখি বার বার
ফিরে ফিরে আসে
পার্বতী আর আসে না
লজ্জায় অভিমানে
শুনেছি লক্ষ্মী এখন
অনলাইনে বেশ্যার ঠিকাদার

সরস্বতী বিদ্যা কেনাবেচা করে
মার্কিন দেশে
থাকে স্বর্ণকেশীর সাথে
জীবন যাপনে লেসবিয়ান

কার্ত্তিক সমকামী অসুরের সাথে
পেশা রাজনীতি।
সিদ্ধিদাতা গণেশ গাঁজায় সিদ্ধ হয়ে
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে শিবপুর বটমূলে

সিংহ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসো
ফিরে যাও তোমার রাজ্যে
হে মহারাজ প্রজা হওয়া কি
তোমার সাজে?

চালা থেকে নেমে এসো
আমার লক্ষ্মী সোনা লক্ষ্মী পেঁচা
লক্ষ্মী তো এখন উপলক্ষ্মীতে
কিন্তু তুমি আছো
তুমি রবে সগৌরবে

বাঙালীর গোলার খাজে
ময়ূর তুমি পেখম মেলো
শ্রাবণে শ্রাবণে

হংসরাজ তুমি ভাসো
পদ্ম সরোবরে
এবার তুমিই শেখাবে
পরমহংস বিদ্যা
অখণ্ড সরাচরে

মানুষ দেবতা তুমি
ফিরে যাও স্বর্গে
এবার প্রাণী দেবতার বোধন
হবে নষ্ট সময়ে

ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

তপতী রায়

কলকাতার গলি

আবহমানকালের উত্তর কলকাতার গলি
চিরস্থায়ী তার অতি ক্ষীণ কটি
সেথায় সূর্য দেয় না হাতছানি
স্যাঁতস্যাতে গলির গহ্বরে কোনমতে
দুজন মানুষ চলতে পারে
হাত বাড়ালেই পাশের বাড়িকে
ছোঁয়া যায় অনায়াসে
আমি জানি কারণ প্রতিবেশিনীর
কন্যার সাথে প্রেম করতাম আমি
তার নাম ছিল কুহেলি
অলস দুপুরে হতো দৃষ্টি বিনিময়
আর হতো প্রেমপত্রের আমদানি
একদিন হঠাৎ তারা চলে গেল
মফঃস্বল; শুনলাম ওরা
খোলা জায়গায় থাকবে
সেখানকার বাতাস নাকি নির্মল
সেখানে সূর্যের আনাগোনা অনর্গল
আমি যাবো কোথায়, নেই যে ক্ষমতা
জন্ম আমার এই গলিতে, এই গলিই প্রাণ
নতুন প্রতিবেশী, দুই পুত্র, সংসার
আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান

সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

তসলিমা হাসান

অদল বদল

তোমার একটা স্বপ্নময় রাতের বদলে
আমার একটা নির্ঘুম রাত নিবে!
তোমার একটা প্রাণ খোলা হাসির বিনিময়ে
আমার একটা শূন্য হাহাকার!

কিংবা
আমার যাপিত একাকিত্বের সাথে
তোমার একটা আলোঝরা বিকেল!
তোমার একমুহূর্তের ব্যস্ততার বদলে
আমার একটা বিষন্ন দুপুরের বদল করবে তুমি

অথবা
আমাকে একবার ভালোবেসে ডেকে নাও
বিনিময়ে পাবে আমার জীবনের সব পূর্ণতা

অন্ট্যারিও, কানাডা

তাজুল ইমাম

ফেসবুক নয় খোমখাতা

আর কেন তুই মুখ লুকাবি
ওরে আমার টাট্টু ঘোড়া
'খোমখাতা'য় নাম উঠেছে
রটবে সুনাম বিশ্বজোড়া

বন্ধুরা সব জানবে এখন
কখন গেলি ছোট্ট ঘরে
কখন হলি উদ্বেগে-আকুল
রইলি মনটা উদাস করে

স্পর্শ-শূন্য গন্ধ বিহিন
ভার্চুয়াল এই আড্ডা ঘরে
অবিরাম এক আড্ডাবাজি
চলছে দিবা রাত্রি জুড়ে

কিশোর বেলার বন্ধু পাবি
পুরানো প্রেম মারবে উঁকি
হারিয়ে যাওয়া গানের খাতা
আবার বেজে উঠবে নাকি?

ভার্চুয়ালি করবি বাগান
ভার্চুয়ালি চড়ুইভাতি
দেশপ্রেমটাও ভার্চুয়ালি

দেখনা কেমন মাতামাতি

রশিদ খানের শুনবি খেয়াল
জলোতা আজ গাইবে ভজন
সাবিনা আর রুনা ভাবির
সম্মিলিত ক'পাউন্ড ওজন?

জানবি সবই, বুঝবি সবই
রইবি মুখে কুলুপ এঁটে
বেয়াড়া সব ফিচেলগুলো
কি মজা পায় এসব ঘেঁটে?

প্রকাশকের ধার ধারেনা
খোমখাতা লেখক কবি
খাদ্য হোক আর অখাদ্য হোক
পোষ্ট করলেই চলবে সবই

ফাঁকতালে ফের কাটবি ফোঁড়ন
জুটবে শত্রু এবং সাথী
পদ্য লিখেই ছন্দকানা
এই তাজুলের জুটছে খ্যাতি

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

তানিয়া আহমেদ

অনুভূতি

আমি জেনে গেছি
বিষাদী রাত দুচোখের পাতা ছোঁবে
অগোছালো চুলের ভেতর ছুঁয়ে
যেটুকু আদর তোমার
এখানেই শেষ হবে
অধরে অধর ডুবিয়ে
প্রেমের যা আঁকিবুকি এঁকেছো,
গভীর যে কথা লিখেছো
আজই মুছে যাবে।

আমি জেনে গেছি
খড়তাপ রৌদ্রপ্রহর, আঁধারে মিলাবে,
তোমার আলিঙ্গনে বুকের বা পাশে
যে রিনঝিন কাঁকনের শব্দ বারতা
তা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

তোমার আঙ্গুলের সূক্ষ্ম তপ্ততা
সূর্য রশ্মির মতন দেহের আনাচে কানাচে
যে স্বপ্ন ঝড় তুলেছে,
তা দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষ হবে।
কারণ, আমি কেউ না, আমি কিছুনা,
অযাচিত ভাবে যে চাওয়া, যে পাওয়া,
ভুলের ঘরে আনাগোনা করা
অপ্রাপ্তিগুলোর দুঃসাহসের মতন,
সে জানে, শুদ্ধতা তার কপোল ছোঁবেনা,
তবু বারংবার কিছু পাবার আশায়
নিজেকে হারিয়ে ফিরবে।

আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

তাপস গায়েন

অদৃশ্যমান আমি

আমার অনিদ্রা আর নিদ্রার মাঝে
যে অগ্নি হয়েছিল প্রজ্জ্বলিত এবং অবশেষে নির্বাপিত
তার কোন সাক্ষ্য নেই, আর আমার শেষকৃত্যে
সমবেত মানুষের মুখ এখন অদৃশ্যমান
রাতের অন্ধকারে
প্রবহমান বাতাস এখন ভূমির সমান্তরাল
নম্র এক নদীর কিনারে বসে আছি
অদূর শ্মশানের ছাই মুখে এসে লাগে তবু
ভাঙ্গা এক সাঁকো বাঁধছে নদীর দু'কূল
যেভাবে বাতাস বেঁধে রাখে যা কিছু অদৃশ্যমান
আমরা নই পরিযায়ী পাখি
তবু গ্রহ-নক্ষত্রের মতো পরিভ্রমণময়তায়
দৃশ্যমান জগতকে আমরা
নিরন্তর অদৃশ্যমান করে তুলি
চলে যাবার আগে ভাবি কার স্বপ্নে পড়ে আছে
আমার এবড়োথেবড়ো মুখ...

ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

তুষার গায়েন

করোনাসংক্রান্তি

যুদ্ধজারী হল সহসাই অদৃশ্য উৎস হতে
বসুমতী নদীর কিনারে-অভিযোজন স্পন্দিত মানব অঞ্চলে,
দৃষ্টির অতীত অণুজীব বুনোজন্তুর দেহাঙ্গে অধিবাস
মহাজাগতিক ঘুম শেষে জেগে ওঠে রাক্ষুসে ক্ষুধায়
সুনামির বেগে সম্প্রসারিত ভূগোল নির্বিশেষে...
দেহ বিন্যাস পাল্টিয়ে পৌনঃপৌনিক দখল নিতে থাকে
মানব শরীর-প্রাণীকূলে বিজয়ী উপনিবেশিক
আজ জীবিত থেকেও বুঝে নেয় মৃত্যুভয়
ছুরির তলায় যার বাকহীন পশু কাঁপে থর থর!

করোনা, করুণা মিতিতে অনাগ্রহী
অভেদ সংহারী সে নিমিষে নাই করে দেয় মানুষের স্পর্ধিত সঞ্চয়
মাটি থেকে মহাকাশ বিপন্ন করে ছেয়ে বুদ্ধির চাষ,
এবার নিকেশচায়তার ক্ষুদ্র অণুজীব: উষ্ণ হল যে পাপে বসুমতীর পিঠ
মেরু দেশে গলে পড়া গ্লেসিয়ার শিকারে অব্যর্থ শ্বেত ভল্লুক
শিকার না পেয়ে ক্ষুধায় উন্মাদ, ছিঁড়ে খায় আত্মজ সন্তান!

উন্মাদ, উন্মাদ এই কাল!

ছুটেচলা দ্রুত বেগে ভেঙ্গে ফেলে সমস্ত পরিধি
ব্যক্তিগত গতির স্পৃহায় সমষ্টি যানের সম্ভাবনা ধুলায় লুটায়
পৃথিবীর পেট খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে আনাজি বাষ্প সঞ্চয় ফৌত করে দিয়ে
ভাসাল রক্ত গঙ্গায় অনালোকিত মানবাঞ্চল পুঁজির ক্ষুধায়
রক্ত করবী ব্যথায় নীল, বিতাড়িত বন থেকে প্রাণিকূল
হন্তারক মানুষের বিজয়ের গান বুমেরাং হয়ে পিছুটানে
এবার গৃহান্তরীণ হতে ডাকে আমাদের অবেলায়...

আমাদের হাতগুলো আর মিত্র নয় আমাদের কাছে
অনেকনির্মাণ শেষে এবার বিশ্রাম নিতে হবে তাকে
অতন্দ্র প্রহরী হয়ে জেগে থাকা যেন তার ছোঁয়া থেকে
রক্ষা পায় নিজস্ব মুখশ্রী-মুখের গহ্বরে নেমে যাওয়া
শ্বাসনালী, প্রিয় ফুসফুস বাঁচে যেন জীবাণু অস্ত্রের থেকে
জনবিয়োগের নীতি মেনে এ কে অপরের থেকে দূরে থাকা
প্রেমাস্পদ স্পর্শ যোগ্য নয় আর এই করোনার কালে
জীবিত থেকেও মৃত্যু স্বাদ কবে পেয়েছি আমরা এইভাবে
সকলেই একসাথে? শূন্য এ নগরী, এ শূন্যউদ্যান

যদি দেখা হয় আচানক কাঁচা বাজারের পথে
নিতান্ত পেটের জ্বালায় সপ্তাহান্তে একবার,
কাগজ মুখোশে ঢেকে রাখা মুখ হাসি বিনিময়
অন্তরালে থেকে যায় শুধু বিপন্ন চোখের ভাষায় প্রীতি সম্ভাষণ
পরিচিত আমাদের মাঝে কে পড়েছে করোনা থাবায়
কে পায়নি জানাজা মৃত্যুতে তার প্রথা ভেঙ্গে স্বাভাবিকতার
ফুটফুটে শিশুদের রেখে ক্রেনে চড়ে অন্তিম শয়ানে গেল মা
মাটির কবরে! অন্ধকার ঘন হয়ে আসে রুদ্ধশ্বাস ঘরের ভেতর

অচল মুদ্রার চাকা, বেলের কাঁটায় শৈশবে যেভাবে
গালিয়ে দিয়েছে ফোঁড়া, তীব্র ব্যথায় পুঁজের ধারা বের হয়ে যায়
সমাজের দেহে বেড়ে ওঠা পুঁজি বিদ্ধ হলে করোনাকাঁটায়
মানুষ কী ভাববার অবকাশ পাবে
কিভাবে নিরোগ অর্থনীতির সাধনা করা যায়?

যখন আমরা নেই পরিসরে,
এসে গেছে সব প্রাণ প্রকৃতির স্বভাব নিয়মে
ফুটেছে সাগরলতা গোলাপি-বেগুনি ফুলের বৈভব
পর্যটকহীন বালিয়াড়ি জুড়ে মাইলের পর
মাইল, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ সমুদ্র সৈকতে
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ঠেকিয়ে যা রক্ষা করে বেলাভূমি;
বহুকাল দৃষ্টির সীমানা থেকে সরে যাওয়া ডলফিন
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফিরে আসে, সমুদ্র গর্জনে লাফ দিয়ে ওঠে

শূন্যে ভাসে নৃত্যরত দেহশিহরণ, ভেনিসের খালেফের
রাজঁহাসের স্বচ্ছন্দ বিচরণ-পৃথিবীর উপরে ওজনস্তর
সেরে ওঠে দ্রুত ঢেকে দিতে সূর্যের বেগুনি রশ্মির উৎপাত

স্বেচ্ছাচারী জীবনের বিশোধন হবে করুণ মৃত্যুর হাত ধরে
প্রত্যাঘাতে যদি ফিরে আসে প্রজ্ঞার আলোক অন্তর গহনে
সর্বপ্রাণের ব্যথায় যদি মানুষ কাতর হতে পারে, সূর্যস্নানে
রক্তকরবী উচ্ছল হবে ফের এই বসুমতী নদীর কিনারে।

টরোন্টো, অন্ট্যারিও, কানাডা

তুয়া নূর

সব আলো আলো নয়

যেও না তুমি ও পথ দিয়ে হেঁটে
অনেক সময় মন টেনে নিয়ে যায়
মহুয়ার মধুর মতো পাগল নেশায়
ছুটো না ডানা গজানো পোকার মতো
হঠাৎ আলোর আশা রেখা দেখে

সব আলো আলো নয়
সব আলো ভরা ঘর বাতিঘর নয়
কিছু আলো মিছে
কিছু আলো রাতের কুহেলিকা
হাত ধরে যত্ন করে পাহাড়ের উপর এনে
ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবে গভীর খাদে

কিছু আলো ছায়া মরীচিকা
নাচবে চোখে চিকমিক করা
হ্রদের টলমলে জলের ঢেউ হয়ে
তুমি হাঁটবে শুধু হাঁটবে মরুশুষ্ক তৃষ্ণার্ত বুকে
হারাবে তুমি ঘূর্ণাবর্তে

বিবি হাজেরার মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে
ছুটে যাবে রৌদ্র-তপ্ত কাঁচ-বালুতে,
রক্তমাখা পায়ের এক ঢিবি থেকে অন্য ঢিবিতে
এক ফোঁটা পানি পাবে না!
আলোর নেশায় ছুটে যাবে
আলোর আলোর কাছে

এতো আলো নয়, বাঁকে আটকে যাওয়া মরা নদীর

শেওলা পচা গাদে ফুস করে জ্বলে ওঠা
ক্ষণিকের মিথেন গ্যাস
সেই গাদে আটকাবে তোমার পা
ডুববে তোমার শরীর পুরোটা কাদা জলে
তলাবে তুমি কবরের অথৈ অন্ধকারে

লেহাই একরস, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

দিলারা হাফিজ

বিশ বছর পরে বাবা দিবসের গান

আমার যতো মান-অভিমান, হৃদয়বৃত্তি ঘিরে
তরল আয়নায় মুখ রেখে আজ সেদিক তাকাই ফিরে
তোমার সঙ্গে, ভাব-আড়িতে, বাবা নামক পঞ্চদৌঁড়ে
ভাইটি আমার আগে ছিলো আমি ছিলাম অনেক পরে
কে বলেছে দিন-শেষের এক বোকা মেয়ে কেবল যায় হেরে
জন্ম থেকে রাজকুমার এক তুমিই আমার প্রাণে
প্রথম দেখা আকাশ ছিলে, প্রেমিক চন্দ্রযানে
তুমিই ছিলে চমকে দেয়া শ্রবণে তার নতুন সুরকার
তুমি ছিলে অলিখিত মহাদেশ এক নতুন আবিষ্কার
হৃদয়জুড়ে বসত করা তুমিই ছিলে পূর্ণ শশধর
সপ্তডিঙ্গার ভাসানখানা ভাসালো সেই চন্দ্রসওদাগর–
তোমার কোলে, পিঠে-কাঁধে চড়েছি সে কবে
পাতাঝরা সে সন্ধ্যা আজ ফিরেছে গৌরবে
অভিমানী দুহিতা সে, ভেতরে খুব একা
কান্নাগুলো শিশির ভেজা ছবির রঙে আঁকা
কুয়োতলার জলের নিচে সামান্য সে পলি
হাত ফসকে যায় পড়ে যায় সুখের টুকরোগুলি,
জলডুবো সব আনারসের টকমিষ্টি স্বাদ,
ধমক খেয়ে তোমার ভয়ে, হয়েছে বরবাদ
ভয়-পাতানো খেলাঘরে, মেঘের মতো শাদা
স্মৃতির ঘরে জমে আছে–বৃষ্টি-বাদল কাদা
জানো না তো, অপেক্ষাতুর ঈদ-যাপনের কালে
আকূল করা তোমার গায়ের সোঁদাগন্ধ মিলে
মৌ-মাতালে আমি তখন বৈচি ফুলের মালা
ঘুড়ির মতো উড়ে বেড়াই সূর্য-অস্ত বেলা
বুক কাঁপানো কণ্ঠস্বরে কি যেন এক জাদু

চার শরিকের একটি কণ্ঠ, সাধু সাধু সাধু
জুম্মাবারে তোমার হাতেরফুল-বাতাসা যতো
সবার জন্যে সমান ছিলো সাম্যবাদের ব্রত
জ্ঞানের প্রতি অসীমতা, তীব্র ভালোবাসা
আমায় তুমি দেখিয়েছো সেই পথের এক দিশা
তুমিই ছিলে সাত-সমুদ্র তেরো নদীর বাঁক:
জলের মধ্যে ঢেউ গোণা এক গুরুর মতো সবাক
আমিই তো সেই সিন্ধু সারস, স্পর্শে তোমায় পাই
কান্না-হাসির দ্বৈপায়ণে তুমিই পরম ঠাঁই
এখনো আমি ফেরি করি তোমার দেয়া হৃদয়–
চোখের জলে ফুটে আছো পদ্মের মতো বাঙ্ময়

টরোন্টো, অন্ট্যারিও, কানাডা

দিলারা হাশেম

মেলে রাখি প্রতীক্ষায় চোখ

আমার ভেতরে দ্বীপ
পারিজাত পলাশের মেলা
বাউলের একতারা লালনের সুর
সেথা বাজে দুই বেলা

শ্যামল দ্বীপের বনে
টিয়াপাখি ঝাপটায় ডানা
তাল তমালের ছায়া
রাখালীরা করে আনাগোনা

আমার ভেতরে দ্বীপ
বাইরে নোনা জল
আদিগন্ত করে খল খল
আজীবন প্রতীক্ষায় কখন ভীড়বে এসে
নাবিকের সোনার ফসল।

জাহাজের মাস্তুল থাকে দূরে
বহু দূরে দিক চক্রবালে
ভেসে ওঠে দূরে যায়
কখনই ভেড়ে না এ কূলে

মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়।
হা ঈশ্বর। আপনিই সেই।
আপনার দেখা পাব
ভাবিনি কখনই।

ঘর মন জানালার লেখিকা আপনিই।

কি আশ্চর্য। ভেবেছি আপনার কথা
কত কত বার
ডাকিনি এমন করে দেখা পাবো তার

কাউন্টারে রেখে হাত
ভুলে কেনা কাটা
অচেনা পাঠক বলে জানেন না
আপনার ভক্ত আছে কটা।

কাকতালীয় যোগাযোগ
আমি অভিভূত
লোকটি তখন দ্রুত
দিয়ে যায় অভাবিত ফিরিস্তি তার আমলকীর মৌ আমি পড়েছি দুবার
সত্যি চমৎকার।
কি লিখছেন? থাকবেন কদিন?
কিনেছি আপনার বই, অটোগ্রাফ দিন।
একুশের বইমেলা
ফি বছরে তীর্থ আমার

তারি মাঝে এমনটা ঘটে দু একবার
এক এক রকম এসে জড়ো হয়
কে বলে আপনাকে বলতে দ্বিধা হয়
পড়েছি মিউরাল আমি
বিমান যাত্রায়
বইটা দারুণ ভাবে মন টেনে নেয়
বই পড়েই আমি গেছি অজন্তায়
অজন্তা দেখেছি আমি
আপনার দু চোখ
সেই স্মৃতি বাঁধা আছে বুকে।
এই সব তোমাদের নিত্যদিনের
যায় না আসে না কোনো
হলে হের ফের।
প্রকাশনা উৎসব ফুল মালা
সম্বর্ধনা হাততালি ঢের
পেয়ে থাকো প্রেক্ষাগৃহে নাটমঞ্চে

টেলি পর্দায়।
এমতই তোমাদের দিনে কেটে যায়।।

আমার ভেতরে দ্বীপ
নির্বাসিত একা সেই দ্বীপে
নিজের দোসর নিজে কথকতা
পেশ করি আপন সমীপে।

আমি যেন নেভাদার নির্জন মরুভূঁয়ে
ব্যালে নটী সেই
আপন সৃষ্টি সুখে প্রতিরাতে
নৃত্যে যার ক্লান্তি কোনো নেই।

ফাঁকা সেই প্রেক্ষাগৃহে
শূন্য আসন ঢেকে কম্পিত আঁকা
দর্শক নিশ্চল স্থির সেই ছবি সামনে রেখে
মোহন মুদ্রায় লীন
নেভাদার নটী প্রতিরাতে
শূন্য হল কেঁপে ওঠে
নৃত্যময় তার পদপাতে।
যন্ত্রী নেই, বেহালা পিয়ানো নেই
বুকে তবু বাজে বেটোফেন
নেভাদার ব্যালে নটী
আপন সৃষ্টি সুখে মগ্ন থাকেন।

সেমত আমিও আছি
নির্বাসিত দ্বীপে একা একা
কেটে যাবে এমতই
ভাগ্যে এমনই বুঝি হয়েছিল লেখা।

বেথেসডা, ম্যারিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

দেলওয়ার এলাহী

প্রতিশোধ

এখন এখানে রাত নেমে আছে ঘোর
সজারু পেখম উঁচিয়ে বসেছে একা
শেয়ালের দীপ্রজ্বলা চোখে ঘৃণাতুর
আলো হার মেনেছে, জোছনা মাখা
উদার আকাশ সহসা থমকে গিয়ে
মেঘের আড়ালে ঢেকেছে কোমল আলো
বৃক্ষ পাখি নদী সব উচ্চস্বর দিয়ে
বলছে জ্বালো জ্বালো আজ আগুন জ্বালো

কিসের আগুন? প্রশ্ন নেই কারো শুধু
প্রকৃতি-মানুষ বাকহীন চেয়ে থাকা
মাঠ, সবুজ ক্ষেত কৃষকহীন ধু ধু
নুয়ে থাকা ধান আর হবে না তো পাকা!
ঐ মাঠে বিবেকবান চাষ করে ক্রোধ
আগুনের লাভা দিয়ে নেবে প্রতিশোধ

টরোন্টো, অন্টারিও, কানাডা

ধনঞ্জয় সাহা

আমার স্বপ্নের মৃত্যু

আমি ভাবিনি আমার শৈশবের সৌন্দর্য্য
শেষ হবে কোনদিন কিন্তু হয়েছে

এমন নয় যে খারাপ ছিল সরকার
মিলিটারি হত্যা করেছে নিরীহ জনতা
রাজনীতিবীদরা করেছে ধর্মের অপব্যবহার
বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ রুদ্ধ করেছে অর্থনীতি

কারণ আমি দেখেছি বিবর্ণ প্রজাপতির রং
মৌমাছি নিতে পারছিলো না অমৃত ফুল থেকে
নদী বন্ধ করে দিয়েছিলো তার স্রোতে বহমান মোহনীয় গান
আর আমরা প্রিয়জনরা ভুলে গিয়েছিলাম স্বপ্ন দেখতে ভবিষ্যতের*p

শারলট, নর্থ ক্যারোলাইনা, যুক্তরাষ্ট্র

নাজমুন নেসা পিয়ারি

দৃষ্টি আকর্ষণ

তোমার ঐ হেলাফেলা ভাব
নীল রঙের শার্ট
রং-জ্বলা
জিন্স-এর প্যান্ট
আর গলায়
মিহি কাজ করা
সুতোর মাফলার

যদি বলি
এ সবই
দৃষ্টি আকর্ষণের
এক অলস প্রয়াস
তাহলে কেন
আমার উল্লাসে
আঘাত হেনে বলো
ছলা কলা ছেড়ে
কেন্দ্রবিন্দু থেকে
দূরে সরে গিয়ে
লীন হয়ে যাও
সবার মাঝে

জার্মানী

প্রণব মিশ্র

এ কোন পৃথিবী

এ কোন পৃথিবী
কোন ধূলিঝড় উড়িয়াছে আজ?
মৃত্যু দূত আনিয়াছে সঙ্গে তার?
শ্রাবস্তীর পরপারে বাসভূমি ছিল যাহাদের
উপমহাদেশ জুড়ে ছিল যারা সুখী
ছিল সুখী যুক্তরাষ্ট্রে,
সুখী ছিল চীন দেশে,
ছিল সুখী জাপান জাকার্তা জুড়ে
সুখী ছিল ইওরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকায়
জীবনকে ভালোবেসে চলেছিল তাহাদের দিন
কর্মব্যস্ত সে জীবন
সাথে ছিল প্রেম হাসি গান
আজ সে জীবন তাহাদের দিকচিহ্নহীন
স্রোতে যায় ভাসি
গোধূলি নামিছে আজ
একোন গোধূলি
সাথে কোন স্রোত চিহ্ন?
মৃত্যুদূত সাথে নিয়ে ছুটে যায় ওরা
কারা ওরা?
এ স্রোত কিসের স্রোত? এ চিহ্ন কিসের?
অজস্র ভালোলাগা ভালোবাসা কথা হয়ে
রয়ে গেলো
হঠাৎ থামিয়া গেলো
সে কণ্ঠ নীরব
দূর থেকে ভেসে আসে শেষ উক্তি
মিশে গেলো বাতাসের সাথে
কিছুটা বা ধুলোঝড়ে রক্তময় হয়ে

স্রোতের গভীরে নীরব
হাহাকারে আর্তনাদে কাঁদিছে পৃথিবী
এ কোন পৃথিবী
কোন ধূলিঝড় উড়িয়াছে আজি?
বলাকার সাথে আজ কহিতেছে কথা?
সেকোন কথা, কিসের সঙ্গীত?
এই বেদনার বেহাগেরে দিতেছে ধিক্কার
সে কোন বলাকা?
কোন কথা বলিতেছে এই পাখি?

দিকচিহ্ন মুছে যায় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে
মানব ঘিরিয়া ছিলো এই পৃথিবীরে এতদিন
শুধুই ঘিরিয়া ছিলো, ভালোবাসে নাই
অস্থির পৃথিবী তাই......
ঘিরিয়াছে মানবেরে আজ

সাইপ্রেস, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

ফারজানা মুসাব্বির

মুহূর্ত

আমরা বসে ছিলাম পাশাপাশি
একরাশ নিঃশব্দতা বুকে নিয়ে
আলো আর অন্ধকারের চলছিল খেলা
মাঝখানে ঘুরছিলো আফ্রিকা-
আচ্ছা, মরুভুমি কি এমন ঝড় তোলে,
আকাশ অন্ধকার করে?
বেদুইন ঘোড়ার খুরের আঘাতে কি
এমনি স্পন্দিত হয় সাহারার হৃদয়?

আমরা বসে ছিলাম পাশাপাশি
চিঁ ইঁ ইঁ.....
কেঁদে উঠলো কি কোন নিঃসঙ্গ গাঙচিল!
মাঝগাঙে নৌকো থামিয়ে তারা
খুঁজছিলো কোনো দিকহারা মাঝি
দূরে কোথাও বাজছিল শাহানার ধুন
তবে মিঞা কি টোরী আর আহির ভৈরবে-
কেন চলল আলাপ?

আমরা বসে ছিলাম পাশাপাশি
মূক ও বধির...
অগুন্তি জোনাকি উড়ছিল নিঃশব্দে
বয়ে যাচ্ছিল মহানন্দা তার আপন খেয়ালে
নিষ্ঠুর ভাবনাহীন

আমরা বসে ছিলাম...

কথা হলোনা
জীবন বয়েই গেলো

কলাম্বিয়া, ম্যারিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

ফারজাহান রহমান শাওন

স্বপ্নদাগ

সবশেষে যা থেকে যায়
তা হলো "দাগ"..।
গাঢ় দাগ হালকা দাগ
মুছে যেতে যেতে থেকে যাওয়া
রক্ত ঝরিয়ে চিহ্ন রেখে দেয়া
মন ভালো আর মন খারাপ করা
সুখস্মৃতি বয়ে আনা
অশ্রুজল মুছে ফেলা দাগ।
বিকেল আকাশের শেষ প্রান্তে
প্রস্থানরত দিবাকরের রক্তিম দাগ
ভোরআকাশে রাতবিলাসী চাঁদের
অস্পষ্ট মদির দাগ।
শেষ হেমন্তের ন্যাড়া মাঠে
ফসলের দাগ
নক্ষত্রখচিত মেঠোরাতে
জোনাকির আলোদাগ।
সব কিছুর পরেও থেকে যায়
নির্ঘুম চোখে ক্রমশ: হারিয়ে ফেলা
প্রিয় স্বপ্নদাগ..।

মস্কো, আইডাহো, যুক্তরাষ্ট্র

ফারুক ফয়সল

কবিতা আমার ঘর গেরস্থালি

ব্যাঙ্কে আমার জমানো কোনো রেস্ত নেই,
জেনে যাবার পর থেকেই হেনস্থা দু'বেলা।
মধ্যবিত্তের মান বাঁচাতে মিন মিন করি–
আমার কিছু রোদেলা সকাল আছে-
তাল তাল সোনা ছড়ায়,
বিকেলগুলো গোলাপের সুবাস মেখে বসে ঘাসের গালিচায়।
মন ভালো করা রক্তিম আভা ছড়ানো সাঁঝগুলি
আমার আঁধার ঘর আলোকিত করে বসে থাকে।

আলোকিত মানুষ কে আর কবে গৃহ আলো করেছে ?
টাকাওয়ালা টেকো মূল্যবান, ট্যাক খালির ঘর ক'জনের টিকেছে ?

যত যাই বোঝাতে লক্ষ্মী আর সরস্বতী একঘরে থাকেন না,
ওপারের গলায় চুলার আগুন আঁচ, তেড়ে আসে পোড়াতে
ঝলসে যেতে যেতে, শ্বাস বন্ধ হওয়ার আগে বলি কোন মতে
কয়লার দলা সরিয়ে দেখো, কবিতা আমার চমকায় যেন উজ্জ্বল সোনা !

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ফেরদৌস নাহার

হে বল্লম, ইতিহাস জাগা

মানুষের চারদিকে হুহু কুয়াশা, তবু সেই শক্তিশালী
বহমান আঙুলের রেখা ছুঁয়ে বহন করে চলছে একটি পূর্নাঙ্গ জন্ম
প্রতিদিন হেঁটে যাচ্ছ মৃত্যুকে লেপ্টে ধরে নিজেরই ভেতর
সাহস সম্মিলন, অকুতোভয়ের গাঢ় ব্রিজের ওপর
মনুষ্য জীবনের এই উপহার মগজের চিলেকোঠা উড়ায় ঘুড়ি
বোঁবোঁবোঁ-কাট্টা স্মৃতি সম্মোহন। তোমার শরীর জুড়ে
ঘন কাঁটাতার চোখাচোখা দাঁতাল গড়ন
তারপর প্রতিদিন অদৃশ্য রূপকথা কবুল করিয়ে নেয়
আধভাঙা আলো সমাকীর্ণ চৌকশ নামাবলি ক্ষরণ
মানুষের অপঘাত দুনিয়ার অস্ত্রাগারে অস্ত্রোপচার সারে দিনরাত
বিপরীতে উচ্চস্বর, রক্তাক্ত অভিভ্রমণ সকলই তোমার

একটি পূর্নাঙ্গ জন্ম এবং অদৃশ্যমৃত্যুর সাথে মাখামাখি বসবাস
আশরাফুল মাখলুকাত, ডুব দিলে পেয়ে যাও সবুজ পাতার সন্ধান

টরোন্টো, অন্টারিও, কানাডা

বিদিতা চক্রবর্তী

আজ মা এর জন্মদিন
(তোমার জন্য যা কিছু)

এখন মধ্যরাত
আহা শব্দ কোরো না ঝুমুর

জলের তলায় মৎস কন্যেদের গায়ে ফসফরাস জ্বলছে
তাদের ঘুম ভাঙবে এখন

সবুজ ইলের গায়ে লাল আভা
ইটপাতা গলি বেয়ে চলে জলের তলায়

সেখানে স্ট্রিটলাইটের গা বেয়ে
উড়ন্ত কাঠবেড়ালি

তার তলপেটের গোলাপি আলো
চুইয়ে পড়ছে রাস্তাজুড়ে

এইদিনে আমাদের দেখা হয়
প্রতিবার
চ্যাটচ্যাটে লম্ফের আলোটাও
নিভে যাবে এবার

মাঝরাতে আলতা পায়ে
লাল পেড়ে শাড়িতে
মা উঠে আসবেন
শ্যাওলা ধরা সিড়ি বেয়ে এইঘরে

জলের বুকে তুমি
ঢিল ছুড়ো না ঝুমুর
শব্দ কোরো না আর
প্রবালের কাছে

পার্সিপ্যানী, নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

মঈনউদ্দিন মুন্সী

ছায়া রঙ

একটা নরম মনকে আদর দিয়ে লালরং আর পাপড়ি দিয়ে মুড়িয়ে; ফুটে উঠলো গোলাপ পাপড়ির আড়াল মৌমাছি আর প্রজাপতির স্পর্শ না পেয়ে দুঃখী। উড়ে উড়ে মন আকাশ ছোঁয় গোলাপি আদর বুঝতে পারে, প্রেমের ডানায় ভেসে ভেসে সবুজ স্পর্শে সাদা আলতো ঘ্রাণ নীল ছায়াপথ অতিক্রম করে সমগ্র দৃষ্টি জুড়ে আকাশের পরে আকাশ, পাখির ধ্বনিশব্দে ও সুরে কবিতার মতো ধোঁয়াশা।

গোধূলির মতো একটা জীবন দিন ও রাত্রির মধ্যে ত্রস্ত পায়ে পালিয়ে বাঁচে। তুমি দিলে কিছু কোলাহল, মেঘের পরে নীলের আকাশ; তোমার কাছের পথ দীর্ঘ হতে হতে মেঘরাত সন্ধ্যার কাছে মিনতি জানায়, প্রেমময়ী সূর্য আগুন শাড়ী জড়িয়ে ভারে টেনে আনে। সেই অধির সকাল দুপুর বৃষ্টির ফোঁটায় নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্বিনীত প্রেম কি আশা বুকে নিয়ে হেঁটে চলে।

পথে যে বাড়ীর ঠিকানা ছিল তার ছায়া স্থির চোখের তারায় শিমুল রঙের ভিতরে উজ্জ্বল প্রভার বার্তা নিয়ে বাঁওড়ের ধার দিয়ে বাতাসের শনশন সঙ্গীত অথবা রঙের শিল্প মনে ভরে তোলে একরাশ গোলাপের পাপড়ি, মায়ের কথা কুয়াশার মতো পর্দার আড়াল থেকে সূর্যের সামনে দৃশ্যমান হলো ভালোলাগা তারাদের মতো হয় নাচের মুদ্রা।

আকাশে চষা জমিনে জলহীন মেঘ উদাসীন বাতাসের পথ আটকে আত্মদানের মতো অশ্রু টলমল ব্যাথা ঝরতে ঝরতে বদলাতে থাকে। জনপদে কোনও ঝর্ণার উজাড় করা বুকে নদী শ্রাবণের উচ্ছ্বাস ফিরিয়ে দিতে যদি আবার ফলবতী হয়ে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি ঝরায় মনে জাগে মহাশূন্যের আত্মপ্রকাশ। ফসলের মুক্তির যে দায়ভার আকাশের কাছে, মেঘের হৃদয়ে তার আকৃতি পৌছে দেবার শুধু জীবন ফিরে পাবার জন্যই নয় সমর্পণের অন্তর্নিহিত প্রাপ্তির জন্যেও।

ওহায়ো, যুক্তরাষ্ট্র

মনজুর কাদের

বাজা

আজকে আমার 'পেট' হয়েছে
তোমার মাথাই হেঁট হয়েছে
আমার মাথাই আজ হয়েছে উচ্চ
লাজ শরম আর বদনামী সব আজ করেছি তুচ্ছ
আরতো আমার পথ ছিলোনা গভীর খাদে নামার
আজকে তোমার হার হয়েছে জিৎ হয়েছে আমার
তোমরা আমায় 'বাজা' বলো
কেমোন দিলাম সাজা বলো
স্বাক্ষী প্রমাণ আনুক
এই দুনিয়ার তাবৎ মানুষ জানুক
নিত্যদিনই বিচ্ছিরি সব গালমন্দ জোটা
বাজা বলে সকাল বিকাল হাজার রকম খোঁটা
যতোই আমি শপথ করে মাথা কুটে বলছিলাম
গঞ্জনা আর নির্যাতনের ধকল সয়ে চলছিলাম
কিন্তু তোমার পণ ছিলো যে কঠিন
এক বিকেলে তুললে ঘরে সতীন
পুরুষত্বের ভাব গরিমার স্বভাব
তোমার ছিলো সক্ষমতার অভাব
মন্দ অপবাদ দিয়েছো খেয়েছো জাতপাত
ছোট বড়ো সামনে সবার
গায় তুলেছো হাত
যতোই করো ধানাইপানাই যতোই লাগুক তিতে
তোমার নিজের হার হয়েছে আমিই গেছি জিতে
কী প্রয়োজন থামার
এখন আমার ভয় কেটেছে বিশ্ব এখন আমার

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

মনিজা রহমান

বৃষ্টি শেষের অনুভব

কদিন আগে যে তুমুল বৃষ্টি হল
সেই দিনটার কথা মনে আছে?
বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে
নিজেকে মনে হচ্ছিল-
প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম জীব!
যার কোন শুরু নেই শেষ নেই
পুরো বিশ্বচরাচরে যেন আমি একা;
নাটক শেষে প্রসেনিয়ামে দাঁড়িয়ে থাকা শেষ শিল্পী!
গ্রীস্মের দুপুর বেলায় বৃষ্টি থেমে গেলে
চাল ধোয়া একধরনের রঙ দেখা যায় প্রকৃতিতে
দূর কোন প্রাচীরের গায়ে লেগে থাকা জরা
ঘুচে যায় বৃষ্টির পরে
অনিশ্চিত সূর্যালোকে
বৃষ্টির জল জমতে থাকে পাতায় পাতায়
ফুলের মঞ্জরীতে
নীল ঠোঁটের ছোট্ট পাখীটি পাখার পানি ঝেড়ে
শিষ দিয়ে ওঠে
বৃষ্টিস্নান শেষে শুদ্ধ হয় প্রকৃতি
ভেজামাটি থেকে ওঠে বৃষ্টির ঘ্রাণ
যাকে গ্রীকরা পেট্রিচোর বলত অনেক আগে

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ময়নূর রহমান বাবুল

আটপৌরে জীবন

জঙ্গলে লেগেছে আগুন, পুড়ছে আমাজন
ছাই ধোঁয়ার উন্নয়নে একাকার সুন্দরবন
আমাদের ঘর পুড়ছে, বস্তি ও বাড়ি পুড়ছে
শহর, নগর, বন্দর, মন পুড়েও ছাই উড়ছে
বাজারে পুড়ছে পেঁয়াজ, লবন, চাল, ডাল
গুদামে পচে যাচ্ছে সব, শিশুখাদ্যে ভেজাল
আমাদের ডানে সন্ত্রাস, দূর্নীতি লুট হরিলুট
বাঁয়ে ভাঙ্গন, ভেদাভেদ ভিন্নমতের গুমোট
সামনে গভীর অরণ্য, আলোহীন আকাশ
যন্ত্রণায় থেমে গেছে সব প্রাণের উচ্ছ্বাস

আমাদের মেঘগুলো জমে জমে হয়েছে পাথর
স্তূপে স্তূপে শুধুই জমছে এসব মাথার উপর
সব পিছে রেখে কালের পিঠে হাতুড়ি পেটাই
আশার আলোয় বুক বেঁধে সকল ক্ষুধা মিটাই
এইতো আমাদের জীবনচলা আটপৌরে সংসার
অতিষ্ঠ জীবন, তবু চেষ্টা হামাগুড়ি দিয়ে বাঁচার

লন্ডন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাজ্য

মাকসুদা আইরীন মুকুল

বিচার চাই

জেগেছে নবীন, মুক্তির নিশানায়
ডেকেছে তরুণদল
মিলেছে সবাই, স্বাধীন এক চেতনায়
গোটা দেশ অবিচল।

বিচার, বিচার, বিচার,
চাই দেশদ্রোহীর বিচার।

যুক্তিতে এসেছে মুক্তি ভাষার,
সেই বায়ান্নতেই
ভালোবাসা আর সংগ্রামে
পেয়েছি মুক্ত স্বাধীন দেশ -
সুস্থ জীবনে বাঁচার।

পার হয়ে গেছে, এসে চলে গেছে
কত মাস, বছর, দশক
তবুও শুধতে পারিনি ঋণ
ঐ শহিদি আত্মদানের।
গুটি গুটি পায়ে বেড়ে উঠে তারা
আবর্জনার দল
দখল নিয়েছে বহু ত্যাগে অর্জিত
স্বাধীনতার ফসল।
এখন সময় এসেছে রুখে দাঁড়ানোর
উঠেছে জেগে তরুণ
উঠেছে জেগে জনতা
জাতি নেবে আজ বদলা
যুদ্ধ হবে সফল।

বিচার, বিচার, বিচার,
চাই রাজাকারের বিচার।

এল্ক গ্রোভ, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মাসুদ খান

তুমি, তোমার সরাইখানা এবং হারানো মানুষ

একটি দিকের দুয়ার থাকুক খোলা
যেইদিক থেকে হারানো মানুষ আসে
রান্না বাড়ার ঘ্রাণ পেয়ে পথ ভোলা
থামুক তোমার সরাইখানার পাশে

আজও দেশে দেশে কত লোক অভিমানে
ঘর ছেড়ে একা কোথায় যে চলে যায়!
কী যাতনা বিষে... কিংবা কীসের টানে
লোকগুলি আহা ঘরছাড়া হয়ে যায়!

এ মধু দিবসে আকাশে বাতাসে জাগে
ঘর ছাড়বার একটানা প্ররোচনা
হারিয়ে পড়তে নদী মাঠ বায়ু ডাকে
ঘরে ঘরে তাই গোপন উন্মাদনা

জগতের যত সংসারছাড়া লোক
ঘুরে ফিরে শেষে সরাইখানায় স্থিত
এ স্নেহ বর্ষে তুমি কি চাও যে হোক
ঘরছাড়া ফের ঘরেই প্রতিষ্ঠিত?

হারানো মানুষ সেই কতকাল ধরে
স্বজনের ভয়ে দেশ থেকে দেশে ঘোরে
স্বজনেরা তবু নানান বাহানা করে
বৃথাই খুঁজছে কালে ও কালান্তরে!

স্বজন যখন খোঁজে উত্তরাপথে
হারানো তখন দাক্ষিণাত্যে যায়
স্বজন যখন নিরাশা দ্বীপের পথে
হারানো খুঁজছে নতুন এক অধ্যায়

টরোন্টো, অন্টারিও, কানাডা

মাহবুব হাসান সালেহ

কবিতামালায়

লাল গোলাপের পাপড়ি মাঝে
তোমায় চেয়েছিলাম।
দিঘীর জলের শাপলা ফুলে
তোমায় চেয়েছিলাম।

কুয়াশা লাগা শীতের ভোরে
তোমায় চেয়েছিলাম।
বৃষ্টি ভেজা সকাল বেলায়
তোমায় চেয়েছিলাম।

জৈষ্ঠ্য রোদের অলস দুপুরে
তোমায় চেয়েছিলাম।
ফাগুন মাসের মিষ্টি বিকেলে
তোমায় চেয়েছিলাম।

গোধুলী রাঙা সাঁঝের বেলায়
তোমায় চেয়েছিলাম।
গহীন অরণ্যে আঁধার নিশিতে
তোমায় চেয়েছিলাম।

নদীর জলের স্রোতের টানে
তোমায় চেয়েছিলাম।
সাগর বেলাভূমির ধূলোয়
তোমায় চেয়েছিলাম।

বটবৃক্ষের ছায়াতলে
তোমায় চেয়েছিলাম।
দোয়েল পাখির মিষ্টি ডাকে
তোমায় চেয়েছিলাম।

জোছনা মাখা সোনালী আলোয়
তোমায় চেয়েছিলাম।
আকাশ ভরা তারার মেলায়
তোমায় চেয়েছিলাম।

রবি ঠাকুরের গানের সুরে
তোমায় চেয়েছিলাম।
নজরুলের বিদ্রোহী তে
তোমায় চেয়েছিলাম।

জীবনানন্দের বনলতায়
তোমায় চেয়েছিলাম।
আমার লেখা কবিতামালায়
তোমায় চেয়েছিলাম।

রকভিল, ম্যারিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

মুজিব ইরম

জবা কুসুম

আমিও পেয়েছি খুঁজে হারিয়েছি যাকে, ভিন দেশে জবা ফুল নাম ধরে ডাকে। নাম ধরে ডাকে তারা রাঙ্গা জবা ফুল, সেই ডাকে মন কাঁপে ভাসায় দু'কূল। দুধ সাদা জবা ফুল হাসিবাসি মন, আমার কুশল যাচে বলে জনে জন। বলে তারা ভিনবাসি পথহারা লোক, দেখেই বুঝেছি ওরে বুক ভরা দুখ। মরিচ জবার পাশে পাখি দুই বাস, জবা কুসুমের পাশে করেছি নিবাস। সাদা সাদা জবা ফুল চোখ ভরা হাসি, নিরলে আমারে বলে আজো ভালোবাসি। এত দূর এসে দেখি চিরচেনা ফুল, আমারে চিনিতে ফুল করে না তো ভুল।

মুজিব ইরম বলে নিরলে বসিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া জবা শান্ত রাখে হিয়া।

বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য

মুফতি ফারুক'

পরান

তুই আমার পরান হবি?
বুকের পরে গড়ান দিবি?
একটা পরান আমার সবই
একটা গড়ান উদয় রবি

মনের রঙে তুই যে ছবি
তোরে ছাড়া কারেই ভাবি?
আয়না তবে সঙ্গে যাবি
অপার সুখের দেখা পাবি

মন্ট্রিয়ল, কুইবেক, কানাডা

মুসলেমা পারভীন

ছুঁয়ে থাকি শুধু দুঃখটুকু

মার অহংকার ছুঁতে চাইনা আমি
দুঃখটুকু ছুঁয়ে থাকতে চাই
পাশে এসে বসে দেখো
একটু বসে দেখো তুমি
ঠিক ছুঁয়ে থাকবো তোমার দুঃখ!
তোমার নিঃসঙ্গতা?
সে তোমার কাছেই থাক!
ও আমার সাধ্য নেই দূর করার
আমি শুধু ছুঁয়ে বসে থাকব তোমার আঙুল!
বুকের গভীরে পুরানো ক্ষত হারানো প্রেম?
থাকুক অক্ষত!
প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করার
কোন ইচ্ছে আমার নেই
শুধু আলগোছে ছুঁয়ে যাই
তোমার শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুরেখা
পোড়খাওয়া জীবন একাকী পথচলা
অবিরত খুঁড়ে খুঁড়ে মেলে বিন্দু বিন্দু জল!
শুকায় অবগাহনের আগেই–
তার সঙ্গী তো ছিলাম না আমি!
হতে পারিনা এখনও!
শুধু মরুভূমির শুস্কতায়
যে অসীম তৃষ্ণা তোমার
সে তৃষ্ণা মেটাবো আমি দু'হাতের
আজলা জলে

কালামাজু, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

মোস্তফা সারওয়ার

জীবাশ্ম

শিলাপ্রস্তরে তুমি পিষ্ট হয়ে আছো
কোটি কোটি বছর লীন হয়ে গেছে
সময়ের এক ক্ষয়িষ্ণু ক্যারাভ্যানে ...
তবু তুমি পিষ্ট হয়ে আছো
অতি পরিচিত এক জীবাশ্ম।

তোমাকে দেখে এক অর্বাচীন বিজ্ঞানীর
বিকিরণ চোখে ভাসে এক মিশ্র তন্ময়তা
ট্রায়লোবাইট তুমি যখন অপার
সমুদ্রে সাঁতরাতে
তখন তোমার তী2 চোখে
নক্ষত্রের মতো ভাসতো
হয়তো প্রেম, দুঃখ,
অভিমান অথবা জিঘাংসা।

তুমি কি কোনো সাম্রাজ্য গড়েছিলে?
যুদ্ধের রক্তাক্ত সন্ত্রাসে তোমার বাহিনী
পরাভ,ত করেছিল সহস্র ট্রায়লোবাইট
অথবা অন্য কোনো নিরুপায় প্রাণী?

অন্যান্যদের মতো তুমি জীবাশ্ম হয়ে লেপ্টে আছো;
কোটি কোটি বছরের বিধ্বংসী ক্ষয়িষ্ণুতা
এক মোলায়েম মার্কসীয় সমতার আভরণে
ঢেকেছে তোমাকে।

অপরের সাথে তুমি এক হয়ে গেছো
তুমি সম্রাট, সন্ন্যাসী, প্রচারক অথবা সাধারণ প্রেমিক

... এর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই

শুধু শিলা-প্রস্তরে তুমি পিষ্ট হয়ে আছো ...
কোটি কোটি বছর লীন হয়ে গেছে
সময়ের এক অনিরুদ্ধ ক্যারাভ্যানে।

নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র

রওশন হাসান

নৈঃশব্দ্যের অনুবাদ

বিরহ চিঠির ভাঁজ খুলে খুলে কতবার নদীর কাছে রেখেছি অনুনয়
জানাতে ব্যথার আদ্যোপান্ত, দেহান্ত মানুষেরা-
তীব্র শ্বাসযুদ্ধরত জীবনের অন্বেষণে
সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু মায়ের স্পর্শবিচ্ছিন্নতায় কাঁদে
পৃথিবীতে মৃত্যুও কত সহজ হয়। নক্ষত্র খসে পড়ে নির্মম
ভাবনার পুরনো দিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখে; আমি বেঁচে থাকি
শপথবাক্য পাঠ করি আরও একটি সকালের রোদে
উদ্ভিদের অঙ্কুর অপেক্ষায় নিরস্ত্র দৃষ্টি ব্র্যাকেটবন্দী খুঁজি ছয়ফিট ডিসট্যান্স

সেদিনও ছিলো অবাধ ভ্রমনের দিন, দিনপঞ্জির প্রতিশ্রুতি
চোখে চোখে সুখ; উল্লাস-স্রোতে রঙিন অর্কিড মুখ
একদিন মানুষেরা ছিলো একে অপরের বড় কাছাকাছি
শত্রু অথবা মিত্র; তবুও ছিলো কিছু কৃত্রিম সংকল্প
এ সময় সুইসাইডাল; বিষণ্ণতার নাগপাশ,
মলিন ঘরে লালিত ভালোবাসারা জাপটে ধরে শূন্যতাকে;
তোমার হৃদয়ে জারি নেই কোয়ারেন্টাইন
তুমি ভালবাসো; এবং প্রেমময় গানের সঙ্গে সূর্যালোকে বয়ে আনো নিরাময়
শরীরগুচ্ছ বেয়ে ভালোবাসা বাঁধুক বাসা পুষ্প-সংক্রামক

বৃক্ষের পথে পথে তুমুল পিপাসায় জাগৃত সুন্দর
হাঁটে হন্তারকও; ধ্বংসের সুনসান বাতাসে কে দাঁড়িয়ে ওপাশে?
পূব-দখিনের জটিল শতছিন্ন পোশাকে সে কোন ভবিষ্যৎ?
বড় ভয়ংকর এ দূরত্বপ্রবণ নিঃশ্বাস!
সজীব পাতা উপড়ে ফেলে বসন্তবিষুব
কষ্টগুলো স্বৈরাচারী, স্নায়ুতে ঝুলে থাকা সংশয়ের শব

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

রবিশঙ্কর মৈত্রী

পাখি বাউলের প্রার্থনা

যেতে যেতে কোথায় যাচ্ছি জানি না তাও
যেতে যেতে ফিরব কোথায় তাও ভুলেছি
কাকে বলব আমার পথটি বলে দেবে?
কাকে বলব দেখো আমায় চেনো কিনা
জানো আমার মাতৃপিতৃ সাকিনবাড়ি?

যেতে যেতে যাবার ইচ্ছেও মরে গেছে
যেতে যেতে ফিরতে চাওয়াও লঘু এখন
এই বেলাটি রাখবে তোমার আখড়াগ্রামে?
পাখির মতো থাকব আমি গান শোনাব
ভালোবেসে থেকে যাব বাউল ফকির

আমার সকল সাধ্য সাধন ত্যাগ করেছি
চলার পথে যা পেয়েছি তাই নিয়েছি
এখন আমার দেবার পালা, নেবে বলো?
যদি পারো একটু দিও পাখির আধার
আমার ফেরা ভুলে-থাকার সঙ্গ দিও

প্যারিস, ফ্রান্স

রাকীব হাসান

এই মৃতশহরে

পুড়ে পুড়ে নিখাদ হও কোন শব্দ করোনা
মৃতদের শব্দ করতে নেই ফুঁপিয়ে কাঁদো
নিঃশব্দে মৃত নক্ষত্রের মতো নিশ্চুপ
মৃতরা শব্দ করেনা

আগুনের ভেতরে বসন্তের রঙ আছে
পাখিদের পাখায় উড়ে যায় ফাল্গুনের চিতা
আমাদের দখিনা বাতাস
চারকোলে আঁকে মৃতদের পুরনো শহর
ঠিক এইভাবে উদযাপন করো শত শত মৃত্যু

সবাই মিলে মরণের উৎসব কী সুন্দর!
জীবনের আর্কাইভ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য ভ্রূণ
বিকৃত যৌনভঙ্গিতে আজ নাচবে শহর
তারপর একদিন নিথর দেহ নিয়ে
যাদু বাস্তবতার গল্প লিখবেন মহামান্য আদালত

বজ্রপাত শব্দ করে তাই
বরষার জলে কেঁদে নিঃশেষ হয়
এই মৃতশহরে
পুড়ে পুড়ে নিখাদ হও কোন শব্দ করোনা

চলো, গ্লাসভরে ঢোলের শব্দে দুঃখবাদ পান করি
পুবের আকাশ অন্ধকার করে দেই পেসিমিস্টিক পর্দায়
কালোরঙের ভেতরে কোন রঙ আর বেঁচে থাকবে না

মন্ট্রিয়ল, কানাডা

রিপা নূর

লাকী নাম্বার সেভেন

প্রথমতঃ
ছোঁয়ায় যে উঠেছিলো এক লজ্জা, ধোঁয়ার গন্ধে;
লাল লজ্জায় যে ডুবেছিলো অস্ত-লালিমায়, আকাশের নীলে।

দ্বিতীয়তঃ
বসা হয় রাজবাড়িতে, ডুবে মুগ্ধ ও গল্পে অন্ধ;
হাসিখুশি টানটান গল্পে ছোট বড় সব শ্বাসনিঃশ্বাসে।

তৃতীয়তঃ
জোড়াচোখ জোড়াহাতে দেখে আনন্দে শ্বাস বন্ধ!
পানিঝাটা হোটেলের ছিটেফোঁটা পানিতে ভেসে ওঠা লজ্জা;
এবং
কচুর পাতায়, কলার পাতায়, পদ্মপাতায় ফোঁটাজল, চিরসবুজের।
ভেসে ওঠা স্বচ্ছ দেখা প্রেম হয়ে বুকে এক পদ্মপাতায়-
যে জীবন দিয়ে প্রেম আঁকি পদ্মপাতায় এক ফোঁটা জল-
পাশে থেকে হাতে হাতে, প্রতি নিশ্বাসে বিশ্বাসের এক শ্বাস;
বাঁচার তাগিদে বাতাসের দম লাগবেই। সত্যে এক শিহরণ!

তারপর-
বেঁচে গেলে মানুষ হয় পৃথিবীর। পৃথ্বী দেয় শতদল বিবরণ।
লাকী নাম্বার সেভেন তখন এক প্রেসক্রিপশন।

ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো, যুক্তরাষ্ট্র

রুদ্রশংকর

আমরা এখন জ্বরে

তারা তুলল জাতের কথা, আমি বললাম থাক
মাঝ রাস্তায় তাকে দিলাম কবিতা লেখা হাত

কবিতা ওড়ে পাড়ায় পাড়ায়, ফুল ফুটছে ঘরে
আমরা এখন ঘরবন্দী, আমরা এখন জ্বরে

তলায় তলায় তাপ বাড়ছে, গলছে মহব্বত...
আমায় দিও পিছলে যাওয়া তোমার মুসিবত

আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

রেজওয়ান মাসুদ

অতঃপর

ফেব্রুয়ারির এক সুন্দর বিকেলে
সবুজ নীল এর আবেশ ছড়িয়ে
মনোরম স্নিগ্ধতা নিয়ে তুমি এলে
আমি ভেসে গেলাম...

বইমেলার শৈল্পিক বাহারে
চশমার আড়ালে চোখের হাসি ঝরিয়ে
নির্মল চাহনি দিয়ে তুমি বইয়ের পাতা উল্টালে
আমি চেয়ে থাকলাম...

টিএসসি আর লাইব্রেরি পার করে
আবছায়া সন্ধ্যায় রিকশায় বসে
জগতের সকল সুর মিশিয়ে তুমি কবিতা পড়লে
আমি হারিয়ে গেলাম...

নগরীর কোলাহল থেকে দূরে
আধো আলোর মায়াজাল মাখা কফিশপে
হৃদয়ের ঝাঁপি খুলে তুমি সুখ দুঃখের কথা বললে
অতঃপর...

আমি আর উঠতেই চাইলাম না...!

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

লালন নূর

কাদামাটির টেপাপুতুল

যেমন কারো হাতের প্যাঁচে আঙুল থেকে বেরিয়ে আসে কাদা-মানুষ-টেপাপুতুল, পাখিপুতুল। আবার কারো আঙুলগুলো ফুটিয়ে দিন ফুরিয়ে যায়। পুতুল কথা বলতে গিয়ে চোখের খুব গভীর থেকে বেরিয়ে আসে মাটির হাতি, মাটির ঘোড়া; দোকান জুড়ে মাটির ছেলে, মাটির মেয়ে-মাটির মানুষ, পুতুল-মানুষ। আঙুল দিয়ে টিপতে গিয়ে মাটির কাদা মানুষ হল; জোড়া চোখের মুখাবয়ব, নাকটি হলো। মাটির দেহে মাটির মাথা, পা দুটো খুব দাঁড়িয়ে আছে-বোকামানুষ! নিজের ছায়া নিজেই দেখে - রেল সড়কে সমান্তরাল, সমান্তরাল। রাজার দেশে মানুষগুলো শুকনা পাতা দোদুল দুল-পুতুলগুলো মানুষ হলো; পুতুল গড়া মানুষ শুধু পুতুল গাছ, পুতুল গাছ।

পুতুল দিনে কাদা-মাটির ভেতর থেকে ভেসে উঠছি মরা মানুষ, ঊনমানুষ। বাতাস জুড়ে কান্না তুমুল-কার আঙুলে, ফাঁকফোকরে লুকিয়ে হাসো কাদামাটির টেপা পুতুল, টেপা পুতুল।

ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো, যুক্তরাষ্ট্র

লুৎফর রহমান রিটন

নিখোঁজ সংবাদ

এক জীবনে জীবন থেকে
নদীর পাড়ের বটের ঝুরির
দোল হারিয়ে যায়
মায়ের কোল হারিয়ে যায়
নতুন আলু শিংগি মাছের ঝোল হারিয়ে যায়
আহা কোল হারিয়ে যায়
মায়ের কোল হারিয়ে যায়...

সামনে দাঁড়ায় বার্গারচিজ চিকেন
পিজার টপিং সাথে গার্লিকস আর
মিল্ক-সিরিয়াল ম্যাশড্ পটেটো নুডুলস সমাচার
নতুন খাদ্য-সংস্কৃতিতে প্রাণ বসানো দায়
আহা মনটা কেঁদে যায়, স্মৃতি কেবলই হাতড়ায়...

এক জীবনে আরেক জীবন যুক্ত হবার পর
মানুষ হারায় তার চেনা মুখ তার প্রিয় সুখঘর
হারায় স্বদেশ হারায় মাটি নদীর মিঠে জল
দূর প্রবাসে চোখের তারায় জল করে টলমল
আহা জল করে টলমল...

ফেলে আসা জীবন ডাকে স্বদেশ ডাকে আয়
তোর প্রিয় সেই শহর, পাড়া, গাঁয়ের সীমানায়
বর্ষা ডাকে বৃষ্টি ডাকে ব্যাঙ ডাকে আর
বাতাস ডাকে পালতোলা নৌকায়
মাছের পোনা, গঙ্গাফড়িঙ ঢেউ তোলে পাখনায়
খোকা আয়রে ফিরে আয়
খুকি জলদি ফিরে আয়
প্রতীক্ষাতে সন্ধ্যা পিদিম যায়রে নিভে যায়...

অটোয়া, অন্টারিও, কানাডা

শাকিল রিয়াজ

কাঁদিনি, শুধু চোখ মুছলাম

কাঁদিনি, শুধু চোখ মুছলাম।
ভীষণ ব্যথা নিয়ে এসেছি আজ
সম্পর্কের কর্কশ দড়িতে বাঁধা শরীর থেকে
খুলছে যখন একটি একটি প্যাঁচ একেক গিঁট
তখন কিছু নীল দাগ জেগে ওঠে শরীরে
তুমি হাত দিয়ো না এই উপভোগ্য যন্ত্রণায়
শুধু দড়ির এই প্রান্ত ধরে রাখো স্নেহে
আমিই ঘুরে ঘুরে আলগা হয়ে সরে যাবো বহুদূরে

কাঁদিনি, তবু চোখে ভিড়েছে জলপ্রপাত
জল পতনের তোড়ে জেগে ওঠা কুয়াশার চারপাশে
রংধনুর মতো কিছু মানুষ আমোদে মেতেছে
আবছা কিছু মানুষ কিছু হিংসুটে ছায়া কিছু হাসি

কাঁদিনি
তবু টলটলে চোখের ভেতর উঁকি দিয়ে
দেখে ফেললে হৃদয়ের গনগনে বিলাপ ও দাহন
কাঁদিনি। কান্নাকে ভালোবেসে শুধু রেখেছি লুকিয়ে

কাঁদিনি, শুধু চোখ মুছলাম
শুধু হাতের উল্টো পিঠে
স্ফটিকের মতো জমা হয় লবণের নিবিড় জ্বালা
সেখানে চুমু দিতে গিয়ে
তোমার জিহ্বায় লেগে যায়
কাঁদতে না পারা পুরুষের রুদ্ধশ্বাস বেদনার স্বাদ

তোমার জিহ্বার কসম! আমি কাঁদিনি
এতো নোনা জল ডিঙিয়ে
কোনোদিন আমি
ভিড়তে পারিনি কান্নার শানবাঁধা ঘাটে

স্টকহোম, সুইডেন

শাদমা খান

শুধু কি আমার না সবার

তুমি আছো পাশে, সব আছে
ভালোবাসা, সুস্হতা ও স্বাচ্ছন্দ
তবু কেন এ অস্থিরতা
কোন কিছুতেই নেই কোন আনন্দ
কতদিন বাঁচব
আবার কাকে হারাবো
যদি মার সাথে আর না হয় দেখা
মন আমার বিষণ্ণ অশান্ত
বেশি করে বেঁধে রেখেছি চিন্তায়
যদি হঠাৎ অসুস্হ হই
যদি চলে যাই
কি খাবে ওরা
একেবারে বোকা আমি
ভালো করে জানি
দু'একদিন কষ্ট হবে
তারপর সব ঠিক
কিছু থেমে থাকে না কারো জন্য
তবুও কেন যে আমার এত চিন্তা
কিছুতেই যেন মন বসে না
না আসে গল্প, না আসে কবিতা
ভাবী বন্ধু বান্ধবের সাথে আলাপ করি
যার সাথেই কথা বলি
তার এই একই অনুভূতি
ঐ একই বিষন্নতা
কিছুতেই যেন কারো মনে নেই শান্তি
আমি মানুষ ভালোবাসি

আপ্যায়নে আমার আনন্দ
Covid-এ কেউ আমার বাড়িতে আসে না
এ আমি কেন যেন মেনে নিতে পারছি না
কি এক অবস্থা
চলে গেলে, অসুস্থ্য হলে, বিপদে পড়লে
তার পাশে দিয়ে দাঁড়ানো বা তাকে সান্ত্বনা দেওয়া
যেন আজ সব অসম্ভব
একি হলো, অনেক যেন অন্যায় করে ফেলেছি
স্বীকার করছি অনেক অন্যায় করেছি পৃথিবীর সাথে
বুঝতে পারছি, ক্ষমা চাইছি
অনেক করছি অন্যায়
অনেক অন্যায়

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

শামস আল মমীন

পিতা-পুত্র

খোকা,
আয় দেখি, বস
একটু পাশে বস
কোথা যাবি বিকালের এই ঝুরঝুরে হাওয়ায়
কেন সাথী হবি মৌন মেঘের মিছিলে

তার চেয়ে
আরও ক'টা পাতা ঝরা
আরও কিছু-ক্ষণ
চোখে চোখে থাক;
একটা চড়ুই... কী আশায়
পাশে এসে বসে।

খোকা বলে,
যাই...
আমি বলি, বস...
আর একটু বস...
কালো মেঘগুলো সরে গেলে
পথের কুকুর সব চলে গেলে
তারপর না হয়...

ওর চলে যাওয়া দেখি;
দেখতে দেখতে কী যে মায়া গাঢ় হয়
কী যে সুখে ভাসি!

জলের আছাড় খাওয়া নরম মাটির মতো
আমিও ভাঙতে থাকি
আমিও ভাঙতে থাকি খুব
আমার ভেতরে...

শীলা মোস্তাফা

প্রহসনের চিত্রিত আঁধার
'Fifteen minutes of fame'

বিয়ের লাল টুকটুকে শাড়ীতে মেয়েটিকে
সত্যি রাজকন্যার মত লাগছে।

পার সোনা থেকে রূপসজ্জা
ভাসাবি থেকে বিয়ের শাড়ী
জড়োয়া থেকে গহনা
তারপর ফুলের তত্ত্ব
মেহেদির মৌ মৌ গন্ধ
আর হঠাৎ করে পাওয়া একটু অতিরিক্ত
আদরে ভালবাসায়
মেয়েটি সত্যি সত্যি ভাবলো
আমিই তো সেই রাজকন্যা,
যার জন্য রাজকুমারেরা ঘোড়ায় চড়ে আসে!

চারিদিকে আলোয় আলো
রঙের মেলা, হাসি গান
কত আনন্দ তাথৈ তাথৈ,
শুধু তাকে ঘিরে।

আর এই মহার্ঘ সময়ের সকল চিত্র
প্রীত রেজার হাত ধরে রয়ে যাবে স্মৃতির অ্যালবামে
দেয়ালে দেয়ালে, মেঘে মেঘে।

ক্লিক ক্লিক শাটারের মোহময় শব্দ
নতুন বরের চোখে চোখরেখে মেয়ে
খোঁজে উত্তম,

কোমরে হাত সুচিত্রার মোহময় শরীরের বাঁক।
আর চোখে দেখে তার সাথে ছবি তোলার
অপেক্ষমাণ মানুষের উৎসুকসারি।
ঠোঁটের কোণের ঈষৎ হাসিটি
পুরু মেকআপে ঢাকা পড়ে থাকে।

“দৃষ্টি আরো গভীর হবে, হাতটি তার কাঁধে রাখুন”
প্রীত রেজা বলছে মেয়েটির বরকে।
মেয়েটির হঠাৎ মনে পড়ে গেল
হলুদ রং খসে পড়া মধ্যবিত্ত দেয়ালে
মা বাবার বিয়ের একমাত্র ছবিটি, একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন,
মা ঘোমটা দিয়ে জড়সড় বসে আছে বাবার পাশে।
বাবা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, কেতাদুরস্ত বিদেশী কোম্পানির চাকুরে।
পাশে জড়সড় মুখ গুঁজে বসে থাকা তার ম্যাট্রিক পাস মা।

“ভাগ্যিস যুগ পাল্টে গেছে!” ভাবে মেয়ে,
“অমন ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে হয়না”
কি করে হবে, স্বামীর চেয়ে সেই বা কম কিসে!
শিক্ষায় কর্মে, আধুনিকতায় সমানে সমান!
ক্লিক ক্লিক
সুখময় সব স্মৃতি জমা থাকবে
ছবির অ্যালবামে, মেঘে মেঘে, দেয়ালে দেয়ালে।

বর তাকে ছবি তোলার ছলে
আর একটু কাছে টেনে নেয়।
ইউফরিয়ার গন্ধে মহুয়া মাখানো বুঝি,
চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

ক্লিক ক্লিক
সব কিছু সব কিছু জমা থাকবে।
ছবির পরতে পরতে।

বিদায়ের ঘণ্টা বাজে
আলো ঝলমল রাওয়া ক্লাবের সামনে

এসে দাঁড়ায় গোলাপ আর রজনিগন্ধায় সাজানো কালো লিমুযিন।
মায়ের চোখে জল,
বাবার দুটো হাত অপরাধীর মত বুকের কাছে ধরা।

মেয়ে ভাবে এই রজনিগন্ধা আর গোলাপ দিয়েই কি
বাসর সাজানো হয়েছে?
ছবি কিন্তু বেশ আসবে!

মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে,
বাবা মেয়েটির হাত তার বরের হাতে দিয়ে বলে,
"আমার মেয়েটিকে তোমার হাতে তুলে দিলাম"......
মেয়েটি ভাবলেশহীন তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে।
শুধু শুনতে পায় বাবার কণ্ঠ
"তোমার হাতে তুলে দিলাম!"
"তোমার হাতে তুলে দিলাম!"
ক্লিক ক্লিক ছবিতে জমা থাকে দায়িত্ব বদল।
"তোমার হাতে তুলে দিলাম!"

রাতে নতুন বর
আরো একটু স্বামী হয়ে ওঠেন
তার চুল নিয়ে খেলতে খেলতে
আদুরে গলায় বলেন, "তুমি তোমার অফিসে
রেজিগনেশন পাঠিয়ে দাও।
হানিমুন থেকে ফিরে আর জয়েন করতে হবে না"
মেয়েটি রজনিগন্ধা আর গোলাপের গন্ধ খোঁজে।
আজকাল ফুলেও তেমন গন্ধ নেই।
দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়
"তোমার হাতে তুলে দিলাম!"

সে রাতে আর ঘুম হয়না
রাতে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে মেয়েটি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়।
একটি একটি করে গহনা খুলে রাখে।
বাবার দেয়া সিঁতা হার, বাজুবন্ধ, ঝুমকা, নোলক।
লাল টুকটুকে শাড়ীতে কি দারুণ লাগছে তাকে
আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মেয়েটি

এইমুহূর্তটুকু আর একটু থাকুক।
আরও একটু...
প্রহসনের দিনটির চিত্রিত আঁধার।

এলিসো ভিয়েয়ো, ক্যালিফোর্নিয়া

শুক্লা গাঙ্গুলি

হে বসুধা ক্ষমা কর

এবারের বৈশাখ একটু কি অন্যরকম-
আমি দু'হাত বাড়িয়ে যে বৈশাখকে ধরি
আমার হাত যায়না আর
আমার মন সয়না আর
শূণ্যে ঝুলে থাকে আনন্দের বহি:প্রকাশ আজ
মঙ্গলশোভা যাত্রা কাগুজে বাঘ
হরেক রকম ফুলপাখী বিনোদন নতুন জামা-সাজ
রমনা বটমূলে থেমেছে ভোরের গান
হালখাতায় নেই কোনো দোকানদারি
বৈশাখী মেলায় হারিয়েছে পথ পটুয়া
এবারের বৈশাখ একটু কি অন্যরকম
সমস্ত কথোপকথন হতাশ

হে বসুধা আমরা প্রতিজ্ঞা করছি
আর কোনো দিন তোর ভরা নদী মেরে ফেলবোনা
ধর্মের দোহাই আর অত্যাধুনিক
অস্ত্র দিয়ে তোর সন্তানকে মারবোনা
ভালোবাসব ভালোবাসার মত
শুধু একবার ক্ষমা করে দে
বলতে দে কোনো নষ্টামীর পুনরাবৃত্তি হবেনা আর

হে বসুধা
ক্ষমা কর
ক্ষমা কর

ম্যারিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

সামা আকবর

অঙ্গার

এই নিয়ে তৃতীয়বার-
ধূমকেতুর বেগে
তুমি আমার জীবনে এলে আবার চলেও গেলে

আমাদের সংযোগ হয়েছিল
এক দেখাতে চমক লাগায়
অদেখা-অলেখা বন্ধনে
দু-কথাতে আকৃষ্ট হওয়ায়
তারপর আকারে ইঙ্গিতে
ভালবাসা প্রমাণের চেষ্টায়

তারপর যেমনটি হবার কথা- আকাশ ভেঙে পড়ার
বুকের ওপর তুমুল বজ্রাঘাত!
অথচ এই বেদনাকে এড়াবো বলে নিয়েছিলাম যত্ন!
লুকিয়ে ছিলাম নিজেকে নিয়ে একাকিত্বে!
নাকি তা সবই শুধু
একদিন বজ্রের সামনে বুক পেতে দাঁড়াব বলে?

অজানার সাথে এই তুমুল ভালোবাসা আমার
সংঘাতে দ্বন্দ্বে হৃদয় আর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে!
এরা দুজন লড়াইয়ে নামে আমার আত্মার সাথে
তাতেও শেষ নেই, যুদ্ধমঞ্চে যোগ দেয় উন্মত্ত দৈত্য
নাম তার নীতিবোধ, আমি সত্যকে এড়াই যে সত্য
দৃষ্টি শ্রবণ স্বাদ গন্ধ অনুভূতি দিয়ে প্রমাণিত

অপলকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে যার দিকে
তারই চোখ এড়াই
ছুটে যেতে মন চায় যার দিকে
তার উল্টোদিকে ছুটি
প্রাণমন ভরে থাকে যার ভাবনায়
ভুলে থাকার কী আপ্রাণ চেষ্টা!

আত্মার সাথে প্রাণপণ লড়াই

একই অনুভূতি এতটা মধুর
এতটাই বেদনাদায়ক আবার!

কী ভাবে তা হতে পারে? আশ্চর্য হই!

তুমি বললে, এও ভাল!
এর ভেতর থেকেও ভালো কিছু বের হবে
অপেক্ষা করো!
আশ্চর্য হয়েছিলাম
তোমার শক্তি দেখে
আবার কম বিস্মিত হইনি
দূরত্ব চাইতেই তোমার ভেঙে পড়ায়!
সকল রিপু-সংবরণকারী তুমি যেন অসহায় শিশু
বললে, তাহলে কি তুমি আমার সাথে কথা বলবে না?
হায়রে চোরাবালি!

তুমি চিন্তিত হলে আমার ভবিষ্যৎ যেন ধূলায় না মেশে
আমি উদ্বিগ্ন, তোমার পরিপাটি বর্তমানে ফাটল না ধরে!
ছুটলাম দূরে তোমার থেকে, সুযোগ যখন পেলাম
নানা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টায় হলাম ব্যতিব্যস্ত

অন্য কাউকে চেষ্টা করলাম ভাবতে, তোমার জায়গায়
ধোপে টিকল না কেউ, ব্যর্থ আমি ঘুরপাকে ক্লান্ত
ফিরে এলাম, নিজের জীবন থেকে কি কেউ পালিয়ে যেতে পারে?

যেখানেই যাই না কেন, সকল জায়গায়
সকল ভাবনার ঘূর্ণিঝড় সঙ্গে নিয়ে
এই তুমি দৈত্যের মতো হাজির
চোখের গভীর ভেতরে ছবি নিয়ে
মনে কোটি চিন্তার ছাপ নিয়ে
কাঁধে আলিঙ্গনের ছোঁয়া নিয়ে
তুমি দৈত্যের মত হাজির

কী করি? কী করলে প্রাণ থেকে মন
কী করলে মন থেকে শরীরকে
কী করলে শরীর থেকে সব বোধ
বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যায়?

নিঃশ্বাস নাও, কেউ বলে, প্রশ্বাস ফেলো
সামনে রাখো এক পা, তারপর বাড়াও অন্যটা
তাই করি, নিঃশ্বাসের পরে প্রশ্বাস, প্রশ্বাসের পরে নিঃশ্বাস
বাঁ পা'র পরে ডান পা, ডান পা'র পরে বাঁ পা
দিনের বেলায় জীবনের ভাঙা টুকরোগুলো কুড়াই
রাতে দুই হাতে অসহ্য যন্ত্রণার হৃদপিণ্ডটা চেপে ধরি
প্রহর গুণি, বাঁ পা'র পরে ডান পা, প্রশ্বাসের পরে আসে নিঃশ্বাস
দৈত্যরা রাতে দেয় না ঘুমোতে

ছেড়ে দিতে প্রাণটা গেলেও
তবু ছেড়ে তো দিতে হবেই জানি!
কোন সুতো নেই তোমাকে বাঁধার
কোন অধিকার নেই
অধিকার চাইবার

একদিন খুলে দিতে হবে, নিজের আহত হাতেই
শত ছুতোয়-ছলে বাঁধা কাঁচা সুতোর গিট
যা কিনা বেঁধেছে আমাকেই, তোমাকে বাঁধিনি কখনো

হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, ধমনী, শিরা উপশিরা বিক্ষত করে
রক্তক্ষরণে উপচে-পড়া মন দেখা যায় না ভাগ্যিস!

রক্ত জ্বলে আবার পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়
তাই হয়তো শক্তি ডান পা'র পরে ফেলি বাঁ পা
তাই হয়তো শক্তি, বুঝতে দেই না অঙ্গারের কালো
এমনকী তোমাকেও!

ভুল হয়েছে সবার, ভুল থেকে কষ্ট, কষ্ট থেকে অঙ্গার
তোমার ভুলের দীপশিখা অঙ্গারের দহনে আমাকে জোগাবে শক্তি
তোমার দৃষ্টিভ্রমের পরে আগামীতে সাজাবো আমার ছোট্ট পৃথিবী
তোমারই দৃষ্টি ধার করে, থাকবে আমার কল্পনা, আমার গর্ব

পৃথিবীতে কিছু হারায় না, তোমাকে আমি হারাবো না
যে রজনীগন্ধা দেখা দেয়না, কিন্তু ভরে রাখে ঘ্রাণে,
আমার জীবনপাত্রে দাবি করে না জায়গা তার মধুময় নির্যাস
তবুও ভরিয়ে রাখে মিষ্টি সুবাসে, সুরের ঝংকারে
যা হৃদয়ে আমার বাজে বিরামহীন, শুধু আমারি জন্য

তাই বলি, সন্ধ্যা নামার আগে
ছিল এক আমার মধুর কল্পনা,
শেষ যদি তার হয় হোক শেষ
সেই রজনীগন্ধার মধুরতায়
অপেক্ষা যেন না করি
সময়ের ঘর্ষণে ক্ষয় হতে হতে
দুর্লভ মুহূর্তগুলোর স্মৃতি
কুশ্রী হয়ে যাওয়া পর্যন্ত

যে কল্পনা নিয়ে প্রথম দেখেছিলাম
হৃদয়ের যে স্থান অনায়াসে
নিজের অজান্তে অধিকার করেছিলে
অনুভূতির বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তাণ্ডব
এদের একেবারে বিষিয়ে ফেলার আগে
মধুর সব অনুভূতিগুলোর কিছু অংশ
মধুর সব স্মৃতিগুলোর থেকে কিছু স্মৃতি
তুলে রাখলাম এক গোপন চন্দনবাক্সে!

আর অসুস্থ পৃথিবীর এই মহামারীর বিভীষিকাপূর্ণ রাতে যদি হারিয়ে যাই
যদি তুমি নতুন সকালে উঠে আমার ঠিকানা খুঁজে না পাও,
তবে জেনো,
তুমিই ছিলে আমার শেষ প্রেম, পরিপূর্ণ, অন্তিম, অনন্ত!
আর, যদি টিকে যাই কখনো বা যদি দূর থেকেও আমাকে দেখতে পাও
আমার অজান্তেই ঘুরে চলে যেও
আর যদি আমি আগে দেখি আমিও ঘুরব চলে যাব
বারবার যে লড়াই হারতে হয়, সেই লড়াই আর নাই বা লড়লাম

তুমি ভালো থেকো
চিরকাল

ইয়োর্বা লিন্ডা, ক্যালিফোনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

সালেম সুলেরী

ধর্ষণানন্দের বিপরীতে ক্রন্দনাবর্ষণ কাব্য

কী আশ্চর্য মহামারী
লোভের কাতারে একে একে কোমল-কৌমার্য নারী!
ছিঁড়ে গেছে বেহুলা বিশ্বাস
এখন ভেলাতে গেলে একাকী অবলা শোকবধূ
পাশবিক অভিজ্ঞতা নিতো দেহ-জলদস্যুতার

নারী কি শুধুই মোমবাতি
আলো খুঁজতে জ্বালাবে তার সলতে সদৃশ্য রূপ
শিল্পীত আগুন যেন জরায়ু স্বরূপ
সেখানে ডাকাত পড়ে কুটিল কিম্ভূত!

কী মাতাল কুলাঙ্গার কাল
নদীমাতৃক স্বদেশে চাই সতীমাতৃকতার বৃক্ষের ডাল
ক্ষতিমাতৃক মাটিতে ফের একে একে বীরাঙ্গনা উত্তাল!
স্বদেশে প্রণয়ী রেখে বেহিসেবী প্রবাসী নাকাল!
কি দূর্বল পাহারার ঢাল, সুখের আকাল
উন্নাসিকের পতাকা দৌড়
সন্ধ্যাকাল, বন্ধ্যাকাল, মন্দাকাল...

একটি বৃক্ষের থেকে আরেকটি বৃক্ষের দূরত্ব
একেকটি কিশোরীর জন্যে অনিরাপদ অভয়ারণ্য...
অসংখ্য বৃদ্ধের চোখে গ্লুকোমা ব্যারাম
অস্পষ্টতার ভেতরেও কিশোরীর বুক বোঝে
গতরের গতায়াতে অসম বয়েসি সুখ খোঁজে

শরীরমাত্রিক নেশার আগুনে দাউ দাউ সর্বাঙ্গন
শিক্ষালয়, যাত্রালয়, বাস-ট্রেন উড়ান স্টিমার
প্রযুক্তি এগুচ্ছে আর নারীতে বাড়াচ্ছে অভিশাপ
ধর্ষণানন্দের বিপরীতে ক্রন্দনাবর্ষন, তাপ-অনুতাপ

জগতে কমালে কাব্য-কলাধারা-মাথা তোলে পাপ
শুদ্ধতার প্রয়োজনে খোলো দ্রোহের দোকান-ঝাপ
শিল্প-কাব্যই সার্বজনীন, জ্বরে জলপট্টি, জলজ উত্তাপ

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

সুবিমল চক্রবর্তী

অসমাপ্ত যুদ্ধ, অসমাপ্ত কবিতা

যুদ্ধটা কিন্তু জারীই ছিল
জারী ছিল সময় যেখানে শুরু হয়েছিল সেখান থেকেই
জারী ছিল চিন্তায় কথায় লেখায় বক্তৃতায়-
মাঠে ময়দানে যুদ্ধক্ষেত্রে
জারী ছিল তণ্বীনয়নের বহ্নিতে
জারী ছিল তীব্র ঘৃণায়
যে ঘৃণা কালো হাত হয়ে বর্শা ছুঁড়ে দিয়েছিল-
এরেনার ক্রূরতায় হাস্যোজ্জ্বল কল্লোলিত গ্যালারিতে
এই জারী হয়ে থাকা যুদ্ধটা-
জর্জ ফ্লয়েডের শ্বাস নেওয়ার অপারগতায়
রুদ্ধ সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠল

ফ্লয়েড আমাদের চেতনায় চিন্তার নতুন বুনুনি দিয়ে গেল
এই আগুন যেন ছড়িয়ে গেল-
মহাকাল ও মহাপৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে
সেই রুদ্ধ সঙ্গীত আমাদের সকলকে-
বিবেকের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিল
আমাদের বিব্রত করে দিতে চাইল
আমাদের অপ্রস্তুত করে দিল
আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিল অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি
যেন আমাদের নিজেদেরকে পুনরাবিষ্কারের পথে নিয়ে গেল
এই রুদ্ধ সঙ্গীত শুধু কালো নয়, বাদামী পীত সব বর্ণের কথাই বলল
শ্বেতই বা বাদ থাকবে কেন?

পৃথিবী তো শুধু সাদা আর কালোরই নয়
পৃথিবীতে যারা মারে আর যারা মরে সবাইকে নিয়ে

একটা যুদ্ধের ভিতরে কত যুদ্ধই তো লুকিয়ে থাকে
অথবা বলা যায় আবহমানকালের সেই জারী করা
যুদ্ধের ভেতরে জর্জ ফ্লয়েডের যুদ্ধটাই যেন ঢুকে গিয়েছে

অথবা জর্জ ফ্লয়েড সেই স্বস্তিতে বসে থাকা
অসংখ্য যুদ্ধের ঢাকনাটা খুলে দিয়েছে মাত্র
আমেরিকার ইউরোপের চোরা বর্ণবাদ
পৃথিবীর অসংখ্য দেশের অপরাপর নগ্ন ঘৃণা-
খুন ধর্ষণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছে
আমরা দেখেছি, হয়ত দেখিওনি!
চোরা বর্ণবাদ আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
অথবা রাষ্ট্রের সন্ত্রাস থেকে
চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে
আমরা কি পার্থক্য করতে পেরেছি?

পারি বা না পারি, মানতেই হবে
এ আগুন ছড়িয়ে গেছে সবখানে
এ আগুন পুড়িয়ে দিবে সব গরিমা
এ আগুন মুছিয়ে দিবে সব কালিমা
এ আগুন গলিয়ে দিবে মেকি সোনা
এ আগুন গড়িয়ে দেবে সেই প্রতিমা।

ম্যান্সফিল্ড, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

দ্রিঘাংচুর চোঙা

মরা শুকনা পাতায় রাস্তা ভরা
বিরক্তিকর কচরমচর ভিড়ও

বেজায় বড়দিনের বাজার কে যায়
ক্রাচে চইড়ে ক্যান যে এরা বাঁচে
খোদাই জানে সরকারও রাম-ভোদাই

পালে পয়সা দিয়া পঙ্গুপালে
একটা মাতাল টলতে-টলতে ব্যাগটা

পথে ফেলেই পেরিয়ে গেল ওতে
বালও নাইক্কা! নেংটি এই মাতালও
তালে বিড়াল– ব্যাগও ছিঁড়া তালেব

খারাপ কারে কয় দেখবি? খাড়া!
চীনা ধুমসি কুত্তা-হাতে ছিনা

উঁচা কইরে হাঁটতেছে নাক-বোঁচা
সাদা-চামড়া পাইলে যে-সব গাধা
পারে লেংটি খুইলে নাচে; বারেক

বুকে তাকাই তারপরে যাই ঢুকে
রাতে পাবে বাপের আস্কারাতে

সিডনী, নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া

সুলতানা শিরীন সাজি

স্বপ্নের ভিতরে তুমি এবং আমি

যেখানে রাস্তাটা উঁচু হয়ে গেছে অনেক দূর
যেখানে উঠলেই বাড়িগুলোর ছাদ দেখা যেতো রাস্তা থেকে
ছয় মিনিটের সেই পথটুকু শেষ হোক চাইনি কখনো!

কিছু পথ থাকে, যেখানে গেলে চেনা গন্ধর মত তুমি
সেখানেই দেখা হয়েছিল আমাদের
তুমি এই জায়গার নাম দিয়েছিলে শিলং
শেষের কবিতার অমিত আর লাবণ্যর মত সেই হঠাৎ দেখা!

শহরের শেষ মাথায় সমুদ্রটা যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে, সেখানে,
পুরনো এক কফিশপে বসে একটা পুরোদিন শুধু কবিতায় কথোপকথান!
কফি যে কত রকম হতে পারে, সেদিনই শেখা,
স্মোকডবাটার স্কচলাতে খেয়ে তো রীতিমত মুগ্ধ আমি
তুমি বলছিলে কফির ইতিহাস আর
আমি তোমার চোখের ভেতর একটা বোহেমিয়ান ওয়াক্সউইং পাখিকে খুঁজছিলাম
তুমি বলছিলে, একটা শহরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছের কথা
ইতালীর রিওম্যাগিওর সমুদ্রর পাশে বাড়িগুলোকে-
মনে হয় যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি
বলছিলে, আনুশকার সেতার তোমার খুব পছন্দ
পূর্ণিমারাত এলে, জোছনার আলোয় যখন চারিদিকে ডুবে থাকে
তুমি রাতভর সেই জোছনায় ভিজে সেতার শোনো

বলছিলে, আলাস্কাতে থাকবো আমরা সাতষট্টি রাত
সেখানে সে কদিন সূর্য ওঠে না। এ কথা শুনে আমার অন্ধকার-
আর বনলতা সেনকে মনে পড়ে
এবার শীত নামার আগেই
আমি একটা খয়েরী পুলওভার বানাই তোমার জন্য

মেট্রোস্টেশনটার কাছে গেলে তোমার কথা খুব মনে হয়
তুমি বলেছিলে, শুধু ট্রেনে চড়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো আমরা
ডাইরীর এক পাতাতে হিসাব নিকাশও করেছিলে!

আমি বলেছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরকে বিক্রি করে দেবো
আটলান্টিকের তিমিদের কাছে
বদলে তিমিদের পেটের ভেতর যত হীরামানিক থাকে সব নিয়ে আসবো
এরপর, আমরা ট্যুরিস্ট ম্যুভির এঞ্জেলীনা জলি আর জন ডেপের মত
ঘুরে বেড়াবো ভেনিসের পথঘাট
এ কথা শুনে তুমি এত জোরে হেসেছিলে!

একটু পর বলেছিলে, তিমিরা মরে যাচ্ছে সব
পেটের ভেতর পলিথিন আর প্লাস্টিক নিয়ে!
এ কথা শুনে ভীষণ মন খারাপ হতে থাকে আমার!

একটা জীবন-এর ধারাপাতে তুমি আমি মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ি এভাবেই
জীবন তো শুধু ইউটিউবে দেখা বাংলা নাটক না
জীবন নেটফ্লেক্সে দেখা টার্কিশ সিরিয়াল না
জীবন মাঝে মাঝে এমনি
তোমার জন্য
আমার জন্য
হয়তো বা অন্য কারো কারো জন্য

জীবন মানেই চলতে থাকা বায়োস্কোপ!
কখনো সাদাকালো কখনোবা রঙিন!

অটোয়া, অন্ট্যারিও, কানাডা

সৈয়দ আজিজ

খোঁজ

ছোটখাটো সব রূপ আছে এত ছড়িয়ে, আছে জড়িয়ে,
সাগরের ঢেউয়ে, ছোট ঘাসফুলে, পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে।
জীবনটা প্রায় কেটে গেল তবু পড়েনি কখনো নয়নে,
এতকাল শুধু ব্যস্ত ছিলাম অলিক প্রাপ্তি চয়নে।
প্রেয়সীর চোখে আলোর ঝিলিক, কুন্তল লোটে কপোলে,
তাই দেখে দিন কেটে গেছে শুধু, গুনেছি সুদে ও আসলে।
কতটা পেলাম আর কত পাবো, সে হিসেব শুধু কষেছি,
এর বাইরেও জগত রয়েছে সে কথা কী কভু ভেবেছি?

আজ ভাবি তাই, এই অবেলায় তাকাবোনা আর পিছুতে,
সুন্দর আর সত্য রয়েছে জগতের সব কিছুতে।
শুরু হোক খোঁজ, আজ থেকে রোজ, জীবনের খাঁটি অর্থ,
পাবো নিশ্চয়, খুঁজে দেখি তবে আকাশ পাতাল মর্ত্য।

কায়রো, মিশর

স্বপ্না চৌধুরী

মাকে মনে পড়ে

মাকে আমার খুব মনে পড়ে
যখন কাঁচালেবুর গন্ধ পাই
মনে হয় মা দাঁড়িয়ে আছেন
মাথার পাশে বার্লির বাটি হাতে ধরে
খুব মনে পড়ে বার্লি খাব না বলে
প্রতিবাদ করি জ্বর গায়ে
কপালে মার শীতল হাতের স্পর্শ পাই
মাকে আমার আরও মনে পড়ে
দিদির খোঁপায় কামিনী ফুল পরা দেখে
মাকে আমার মনে পড়ে
এই বৈশাখে প্রচণ্ড গরমে
ঘেমে যাওয়া পাখা হাতে

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

হাসান মাসুম

বৈশাখী মেঘ

কি চাও আমার কাছে?
আকাশ, পাহাড় নাকি সমুদ্র?
তোমার চাওয়া আমার কাছে
এক বিন্দু জল ছাড়া
আর কিছু নয়
আমি তো বৈশাখী মেঘ
ঝড় তুলি কেবল
বজ্রপাত ঘনঘন দিই ছুঁড়ে
পৃথিবীর বুকে
ঘরবাড়ি পোড়ে গাছপালা পোড়ে
বন্যা হয় হোক দানবের সুখে

আমি তো সেই বৈশাখী মেঘ
প্রবল জলের তোড়ে ভাসাই
নুহের প্লাবন ধরিত্রীর প্রান্তরে
চাও যদি আদিগন্ত নিলীমা
দিতে পারি তাও
চাও যদি গনগনে অগ্নিপরশ
নাও নিয়ে যাও
সংঘমিত্রা হয়ে সুখের সাগরে
সুনিপুণ সপ্তডিংগা ভাসাও

মাসেরু, লেসোথো

প্রেম বিষয়ক অণুকবিতা

সেজান মাহমুদ

প্রেম+অণুকাব্য =প্রেমাণুকাব্য

১
সুখের অসুখ, ঘুমের আড়ি
স্বপ্ন একা, দু:খ বাড়ি
রাতের মতো, কেউ থাকে না
অপেক্ষা নেই, ভোর ডাকে না

২
বুকের এপাশ, শূন্য খা খা
চুলের ভাঁজে, আদর মাখা
ছুঁই নি তবু, স্পর্শ এমন
নিঃস্ব কেন, হাতছাড়া মন

৩
ছারখার সব, মন জ্বলে যে
জলের কাজল, আঁকবে নিজে
জল কোথাকার, সমুদ্র চোখ
এমন মরণ, সেইখানে হোক!

৪
একদিন তুমি আসবে পাহাড়ে
মেঘবালিকা আমার নেই-
খেয়ালি তোমার বৃষ্টি হয়েই
জড়াবো শরীরে হারিয়ে খেই

৫
তোমার ছন্দে সুর বেঁধে গান

হৃদয় তন্ত্রে তুলেছে কাঁপন;
তোমাকে প্রথম দেখেই ভেবেছি
একসাথে হোক জীবনযাপন!

৬
একটি মানুষ একাধিক হ'য়ে ওঠে
একটি মানুষ ভুলে যায় ভুলচুক
একটি মানুষ ডানা খুঁজে পায় ঠোঁটে
একটি মানুষ অপেক্ষায় উন্মুখ!

৭
একটি মানুষ রূপকথা গানে লিখে
একটি মানুষ প্রেম ছুঁয়ে হয় নি:স্ব
একটি মানুষ তোমাতেই বাঁচা শিখে
একটি মানুষ লিখে যায় গোটা বিশ্ব!

৮
আমিই দিচ্ছি সহজ করে সব;
থাকবে না আর চাওয়ার কলরব
বুকের ক্ষত হোক না যতোই তাজা
মামড়িতে ঢেকেই হবো রাজা

৯
আমি পথের কিনার দিয়ে হাঁটি
বাকিটা পথ তোমার জন্যে, জানা
ভেঙেছি আজ মনের পাখনা দু'টি
তাই দিয়ে হোক তোমার স্বপ্ন-ডানা!

মায়ামী, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

বদিউজ্জামান নাসিম

তোমার জন্যে: গোলাপ নয়, গুটিকবিতা

১
দেখা হ'তো নীলক্ষেতে
কথা হ'তো অল্প ;
এমনি করেই যাত্রা শুরু
সর্বনাশের গল্প!

২
সব পথেই তোমার ধ্বনি
চরনধ্বনি যতো ;
কিছুটা পথ আমায় দিও
পথ হারানোর মতো

৩
চেয়েছি তোমার পরশ কোমল
আঘাত শুধু জোটে ;
আমিতো নিছক মাটিরই মানুষ
মলিন হবো না মোটে !

৪
বিস্মরণে গেছে ভেসে
অনামিকার কায়া ;
তাহারে দেখিনা আর
দেখি তার ছায়া

৫
নদীর নাম প্রেমযমুনা
দুই ধারে দুই শহর ;
সেই নদীতে ভেসে বেড়ায়
বিরহী নৌ-বহর

৬
প্রশ্ন ছিলো তাহার কাছে
গোপন এবং খাস ;
কেমন করে গভীর রাতে
প্রশ্নগুলো ফাঁস !

৭
আমি ছিলেম লেপের তলে
লেপের তলে লেপ্টে ;
তুমি ছিলে দক্ষিনে খুব
আমি ঈষৎ লেফটে

৮
তোমার বাড়ী বারিধারা
আমার বাসা বাসাবো ;
যতোই করো অবহেলা
ভালোবাসায় ভাসাবো

৯
মন্ট্রিয়লে মন টেকে না
মন্টানাতে মন টানে ;
খুলনাতে আর দ্বার খোলে না
মন তবু ধায় তার পানে

বস্টন, ম্যাসাচুসেটাস, যুক্তরাষ্ট্র

কাজী জহিরুল ইসলাম

দেহকাব্য

১
রাধাচূড়া পড়লো এসে কৃষ্ণচূড়ার গায়ে
কৃষ্ণচূড়া রাধার চাপে তাকায় ডানে বাঁয়ে
কাঠগোলাপের চাপা আগুন দিয়েছিল রাধা
সেই আগুনে যাচ্ছে পুড়ে বৃন্দাবনের কাদা

২
আবার কী ঝড় উঠবে নাকি
টের পেল কী বনের পাখি
কাঠগোলাপের নরোম অঙ্গ ঝড়ের ভয়ে কাঁপে
মহাভারত শুদ্ধ হলো কালবোশেখীর পাপে

৩
ফুঁসে ওঠে জল মাটির ফাটলে
বর্ষার অথৈ-আগুন জ্বলে প্রমত্ত আঁধারে
ঘন রাত, পাথর না টলে

৪
ঝড়ের রাতে অন্ধকারে গাছের তলে
কেউ কি হঠাৎ আমায় দেখে থামে?
গাছ আমাকে নিলো টেনে পাতার ওমে
মুখ ঘষি তার নরোম দুটি আমে

৫
ঘাটের কাছে যে গাছের আম চুকা-মিঠা
রিণা খালা সেখান থেকে নড়ে না
আমগুলো কী ডাঁসা ছিল দুলতো শুধু
বোঁটা ছিঁড়ে খুব সহজে পড়ে না

৬
সে আমার ঘাম হয়ে গলে গলে পড়ে
আদরে শুকায় সে জামার ভেতরে

৭
পৃথিবীকে যদি ঢেকে দেয় কালো চাঁদ
আকাশ না পেয়ে মেঘেরা নীরবে কাঁদে
কান্নার রাতে কালো স্রোতে ভিজে তুমি
আমার জন্যে একাকী দাঁড়াবে ছাদে

৮
যদিও গাছেরা পত্র-পুষ্পে ভরা
ডুবে আছে ওরা আঁধারের গিরিখাদে
না যদি তোমাকে দেখি আমি সেই রাতে
আমার দু'চোখ গলে যাবে প্রতিবাদে

৯
মনের বনে আগুন দিয়ে উঠেছি পর্বতে
অরুচি মদ, নেশা হলো শরীরী শরবতে
শরীর শুনে আঁতকে ওঠো, শরীর কি অশ্রাব্য
মন হলো এক জটিল জিনিস খাঁ খাঁ শরীরটাই কাব্য

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

গল্প

অনন্যা দাশ

স্মৃতির আবর্জনা

ডক্টর কুপারের সঙ্গে আমার কাজের সূত্রেই আলাপ। বেশ হাসিখুশি ভদ্রলোক। বয়স প্রায় আশি বিরাশি হবে। এককালে দাপটে রোজগার করেছেন। আমাদের মার্কিন মুলুকের এই হাসপাতালেরই ডাক্তার ছিলেন। তারপর অবসর নেন। ইদানীং আবার কাজে ফিরে এসেছেন।

সেই নিয়েই গল্প করতে করতে বলছিলেন, "আমার স্ত্রী ন্যান্সি মারা যাওয়ার পর থেকে বড্ড একা লাগে। ও যখন হাসপাতালে ছিল দীর্ঘদিন তখন সকাল বিকেল দু'বেলা ওকে দেখতে যেতাম, সময় কুলিয়ে উঠতে পারতাম না আর এখন ও চলে যাওয়ার পর অঢেল সময় হাতে। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিরা সবাই আছে কাছেপিঠেই। এক ছেলে তো পাশের পাড়াতেই থাকে। আরেকজন ঘণ্টাখানেকের দূরত্বে, মেয়েও তাই। কিন্তু ওদের নিজেদের সংসার আছে, চাকরি আছে, ছেলেমেয়ে মানুষ-করা আছে। আমি একা একা বাড়িতে বসে খুব বোর হই। কাঁহাতক আর টিভি দেখে বা বই পড়ে সময় কাটানো যায়? তাই ব্র্যাডের সঙ্গে কথা বললাম। ও আমার ছাত্র ছিল এককালে। ও তো শুনেই বলল, 'চলে এসো! সপ্তায় কয়েকদিন ছাত্র পড়াবে আর দুয়েকদিন রোগী দেখবে, বোর হওয়ার আর সময় পাবে না।' তাই আমি চলে এলাম।"

ব্র্যাড মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডাকসাইটে চেয়ারম্যান ব্র্যাডলি নেলসন। ডক্টর কুপার আবার তারও শিক্ষক ছিলেন! তবে শারীরিকভাবে এখনও বেশ শক্ত সমর্থ রয়েছেন ডক্টর কুপার। মগজের ধারও তীক্ষ্ণই আছে। দিব্যি নিজে নিজেই গাড়ি চালিয়ে কাজে চলে আসেন। মাঝে মাঝে দেখা হলে গল্প করেন। এটা সেটা সুখ দুঃখের গল্প। নাতি নাতনিরা কী খেলাধুলা করছে বা পৃথিবীর রাজনীতি এই সব নিয়ে। মেডিকেল স্টুডেন্টদের পড়ান। তারা ওনাকে খুব পছন্দ করে। আসলে মজার মজার কথা বলে ওদের মাতিয়ে রাখেন উনি। অবশ্য শুধু স্টুডেন্ট না, টাক মাথা হাসিখুশি ডক্টর কুপারকে সবাই ভালোবাসে। উনি হলেন যাকে বলে একেবারে 'থরো জেন্টেলম্যান'। মহিলাদের জন্যে দরজা খুলে দাঁড়ান, এই রকমটা আজকের দিনে খুব একটা দেখা যায় না।

সেদিন দেখা হতে বললেন, "আমি বাড়ি বদল করছি!"

আমি বললাম, "সেকি! কেন?"

উনি হেসে বললেন, "আর বোলো না! একটা ছ'বেডরুমের রাজপ্রাসাদে একা একা থাকি! কোনো দরকার তো নেই অত জায়গার! তাই এটা বিক্রি করে একটা ছোট ফ্ল্যাটে

উঠে যাবো ঠিক করেছি। দেখেও ফেলেছি জায়গাটা। সেখানে সোসাইটির লোকজনই ঘাস কেটে দেবে, বরফ পরিষ্কার করে দেবে। কোনো ঝামেলা নেই। এই বয়সে অত কিছু করতে পারি না আর কাজের জন্যে লোক ডাকলেই কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার চায়!"

আমি শুনে বললাম, "বাহ, বেশ ভালো তো, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন!"

"হ্যাঁ, সে আর বলতে!"

কয়েকদিন পর দেখা হতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ডক্টর কুপার আপনার বাড়ি বদলের পরিকল্পনা কেমন চলছে?"

উনি মাথা নেড়ে বললেন, "উফফ আর পারছি না! বাড়ি বোঝাই স্মৃতি নিয়ে বসে রয়েছি যেন! কী রাখব কী ফেলব কিছুই বুঝতে পারছি না। হিমশিম অবস্থা! জিনিসও খুব বেশি!"

আমি বুদ্ধি দিলাম, "তা ছেলে-মেয়েদের ডেকে কিছু জিনিস দিয়ে দিন না!"

"হ্যাঁ, তাই তো করব ঠিক করেছি। ছোট বাড়িতে তো আর অত কিছু ঢুকবে না। ওদের ডেকেছি। যে যার পছন্দ মত জিনিসগুলো নিয়ে যাক বাপু, বাকি ফেলে দেবো বা চ্যারিটিতে যা নেবে ওদের দিয়ে দেবো। কিছু লোকের কাজে লাগবে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, সেটাই ভালো।"

"ঠিক আছে আবার দেখা হবে!" বলে চকোলেটের এক টুকরো মুখে পুরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে নিজের অফিসে চলে গেলেন। চেয়ারম্যানের শিক্ষক বলে একটা অফিসঘরও দেওয়া হয়েছে ওনাকে।

২

কয়েকদিন বাদে ডক্টর কুপারের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি ওনার অফিসের দরজাটা খোলা কিন্তু ঘরে কোন আলো জ্বলছে না। ঘরটায় জানালা নেই তাই আলো না জ্বালালে কিছুই দেখা যায় না। আমি একটু শঙ্কিত হয়ে কী ব্যাপার তাই চেক করতে গিয়ে দেখি ডক্টর কুপার অন্ধকারের মধ্যে বসে রয়েছেন! আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। বেশ ঘাবড়েই গেলাম আমি। শরীর টরীর খারাপ হয়নি তো আবার!

আমি কাছে গিয়ে বললাম, "ডক্টর কুপার? আপনি ঠিক আছেন তো?"

উনি চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন। আমি আবার ইতস্তত করে বললাম, "অন্ধকারে বসে রয়েছেন যে? কিছু হয়েছে?"

উনি মাথা নেড়ে বললেন, "মনটা ভালো নেই। ভীষণ সমস্যায় পড়েছি!"

"কী হয়েছে? শরীর খারাপ?"

"না, না, ভগবানের কৃপায় শরীর ঠিকই আছে। কিন্তু ওই যে বলছিলাম, জিনিসপত্র নিয়ে সমস্যা! যাক, আলোটা এবার জ্বালিয়ে দিতে পারো।"

আমি সুইচটা অন করে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে বলা যাবে কী?"

"আরে বলছিলাম না যে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিদের ডাকব যার যা জিনিস পছন্দ নিয়ে নিতে, তা গত কাল তারা সব এসেছিল।"

“ও!” আমি আর কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। ঘটনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে না শুনে মন্তব্য করা ঠিক হবে না বুঝতে পারছিলাম।

উনি নিজেই বলতে লাগলেন, “তা তাদের সব দামি দামি জিনিস পছন্দ। কেউ সোফা, কেউ ডাইনিং টেবিল, কেউ ঝাড়লণ্ঠন পছন্দ করে নিল। সে নিচ্ছে নিক। আমি তো দেওয়ার জন্যেই ওদের ডেকেছিলাম। সব হয়ে যেতে আমি ওদের ন্যান্সির কালেকশানগুলো নিয়ে যেতে বললাম। ও, ন্যান্সির কালেকশান সম্বন্ধে তোমাকে আগে বলিনি না? আর বোলো না, মায়ের মন তো! আমাদের তিন ছেলে-মেয়ের জন্ম থেকে বড়ো হয়ে বাড়ি ছাড়া পর্যন্ত সব কিছু জমিয়ে জমিয়ে রেখেছিল সে! জন্মের পরে নেওয়া হাত পায়ের ছাপ, প্রথম আঁচড় কাটা, স্কুলে যে যা আঁকিবুকি করেছে যে যা সার্টিফিকেট পেয়েছে, রেজাল্ট, ক্লাসের ইয়ার বুক সব কিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছিল সে বাক্স করে করে।।”

“ও!” আমি আবার কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠছিল।

“সেই সব বাক্স আমি বেসমেন্ট থেকে ওপরে আনিয়ে রেখেছিলাম। আমি ছেলে-মেয়েদের বললাম ওগুলোও নিয়ে যেতে কিন্তু আমার দুই ছেলে আর কন্যা তিনজনই বলল ওগুলো নেবে না! তুমি ভাবতে পারছ? অতগুলো বাক্সভর্তি জিনিস! অম্লান বদনে বলে দিল না নেবে না! ন্যান্সি সুন্দর করে গুছিয়ে লেবেল করে রেখেছিল সব কিছু। আমি এখন ওগুলো প্রাণে ধরে ফেলতেও পারছি না! কী বিড়ম্বনা! কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না, আচ্ছা ধর্ম সংকটে পড়েছি,” বলে উনি টেবিলে রাখা নিজের স্ত্রীর বাঁধানো ছবিটায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, “ন্যান্সি, ন্যান্সি, কী সমস্যায় ফেললে তুমি আমাকে!”

আমি সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। মাথার মধ্যে ঢেউ উঠছিল। রুনাও তো পাপাইয়ের সব কিছু জমিয়ে জমিয়ে রাখছে সেই তার জন্মের পর থেকে! কত করে বলি পুরনো খেলনাগুলো বা ছোট হয়ে যাওয়া জামাগুলো অন্তত কাউকে দিয়ে দিতে কিন্তু কিছুতেই দেবে না। বলে বৌমাকে দেবো নাতির জন্যে। কিছুতেই ওকে বোঝাতে পারি না যে বৌমা বা নাতি কেউই ওগুলো চাইবে না। পাপাইয়ের বয়স এখন বারো। ও যখন বড়ো হয়ে সংসার করবে তখন ওই রকম পুরনো সেকেলে খেলনা নিয়ে ওর ছেলে মোটেই খেলবে না! কিন্তু রুনা শোনে না। বোঝেও না যে ওই সব সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। পাপাই যেখানে কাজ করবে, যেখানে থাকবে সেখানে ওই সব জিনিসের জন্যে জায়গাই হবে না! পৃথিবী, বাড়ি-ঘর সব কিছুই তো এখন সংকুচিত হচ্ছে, এমনকি হৃদয়ের আবেগগুলোও!

মাথায় একটা ব্যথা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রুনা আর পাপাই কলকাতা গেছে। আমি দু'সপ্তা পরে যাবো। তারপর সবাই একসঙ্গে ফিরে আসব। আমাদের বাড়ির নিচের বেসমেন্টের ঘরে গিয়ে সারি সারি করে রাখা বাক্সগুলোকে দেখলাম। খেলনা, জামা-কাপড়, ছবি আঁকা কাগজ... উফফ আর না পেরে ওপরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

৩

পরের সপ্তায় যখন ডক্টর কুপারের সঙ্গে দেখা হল তখন উনি ওনার পুরনো মূর্তিতে ফিরে এসেছেন। মুখে আবার সেই ঝলমলে হাসি।

আমি ওনাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার? সমস্যার সমাধান হলো?"

একগাল হেসে বললেন, "শুনবে কী করেছি? একেবারে স্ট্রোক অফ দ্যা জিনিয়াস!"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "তাই নাকি? কী করলেন?"

"আমার এক ছাত্রকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার গুণমুগ্ধ আর কি, যা বলব তাই করবে! একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর রাতের আঁধারে ন্যান্সির বাক্সগুলো গাড়িতে তুলে নিয়ে একে একে অ্যান্ড্রিউ, মার্ক আর ক্যারোলাইনের বাড়ির দরজার সামনে নিঃশব্দে সব নামিয়ে দিয়ে এলাম! একটা নোট লিখে দিয়েছিলাম 'তোমাদের জিনিস তোমাদের দিয়ে গেলাম। না চাইলে ফেলে দিতে পারো। আমি প্রাণে ধরে এই সব ফেলে দিতে পারিনি কারণ তোমরা তিনজনই আমার কাছে খুব প্রিয়, আর তোমাদের মা এগুলো জমা করেছিলেন তোমাদের ভালোবেসে'। ব্যাস এখন বলটা ওদের কোর্টে ফেলে দিয়েছি। এবার ওরা যা ভালো বোঝে করবে, আমার আর দুশ্চিন্তা নেই! ন্যান্সির সঙ্গে ওপরে দেখা হলে আমাকে অন্তত বলতে হবে না যে আমি ওর জমানো সব আদরের জিনিস ফেলে দিয়েছি!" বলে হো হো করে হাসলেন ডক্টর কুপার।

সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে আমাদের বাড়ির বেসমেন্টের বাক্সগুলো গাড়িতে তুলে নিলাম আমি। খেলনা আর জামা-কাপড়গুলো বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থাতে দিয়ে দিলাম। কোন দুঃস্থ শিশুরা সেগুলো পেলে খুশি হবে। গরীব এদেশেও আছে। ডাঁই ডাঁই কাগজগুলো কাগজ রিসাইকেলে ঢুকিয়ে দিলাম। আমি চাই না অ্যান্ড্রিউ, মার্ক আর ক্যারোলাইনের মতন পাপাইকে ওই সমস্যায় ফেলতে। রুনা ফিরে এসে যখন দেখবে তখন ওর দুদিন মন খারাপ হবে। তারপর ভুলে যাবে। প্রথমে হয়তো রেগেও যাবে খুব। দেখি ওকে বোঝাতে পারি কিনা যে আজকের এই মাথা গোঁজার জায়গার অভাবের পৃথিবীতে স্মৃতিগুলো উজ্জ্বল হয়ে মনে ধরা থাকলেই ভালো,বাক্সবন্দি রাশি রাশি জিনিসে নয়।

পেনসিলভেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

অমিত নাগ

রাধামোহনপুর

চলতে চলতে বন্যার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে মৃদু স্বরে বললুম চলো রাধামোহনপুর যাই। বন্যা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সজোরে খিলখিলিয়ে হেসে প্রশ্ন করে, "সেটা আবার কোথায়? এই গ্রহতেই তো নাকি?" হাসির আওয়াজে নতুন নিউমার্কেটের ফুটপাথের চলতি লোকজন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে। বন্যার এই সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানায় আমি যেমন লজ্জায় পড়ে যাই, আবার ওর ছেলেমানুষি দেখতে দিব্যি ভালোও লাগে। তবে এই মুহূর্তে রাস্তার মধ্যে অপ্রস্তুতই লাগছে বেশি।

একটু আগেই কর্পোরেশনের অফিসবাড়ির পাশের সোসাইটি সিনেমা হল থেকে সিনেমা দেখে আমরা দুজন বেরিয়েছি। ছবিটা মন্দ ছিলো না। বন্যা হাত ধরতে দিতেও আপত্তি করেনি। ওসব ছুঁতমার্গ ওর নেই। একটা ভালো দিন, ভালো সঙ্গ পেয়ে, ভালো সময় কাটিয়ে, যে কোনো মানুষের মন চনমনে হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু আমার মন ভালো নেই। তাই রাধামোহনপুর যাবার কথা বললাম। মনে মনে ভাবছি আমাদের কথোপকথনটা এবার হয়তো ডাকঘরের সেই অমল আর দইওয়ালার মতো এগোবে। বন্যা বলবে রাধামোহনপুর, যেখানে অনেক অনেক পুরোনো দিনের বড় বড় গাছের নিচ দিয়ে লাল রঙের রাস্তা চলে গেছে। যেখানে শ্যামলী নদীর ঢালে সব গরু চরে বেড়ায়। আমি বলবো হ্যাঁ ঠিক, তুমি কী করে জানলে? কোনো দিন গেছ ওখানে? অথবা শম্ভু মিত্রের মতো কাঁপা কাঁপা গলায় ধীর লয়ে আমি বলবো, "আমাদের সেই গাঁয়ের নামটি খঞ্জনা, আমাদের সেই নদীর নামটি অঞ্জনা, আমার নামতো জানেই গাঁয়ের পাঁচজনে। আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।" অথচ আমার গলা দিয়ে শম্ভু মিত্রের মতো আবেগঘন আওয়াজও যেমন বেরোলো না, তেমন বন্যাও ও সব কাব্যি টাব্যির ধার না মাড়িয়ে সজোরে হেসে উঠলো মাঝ রাস্তায়। বন্যা বাংলার চেয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়তে বেশি স্বচ্ছন্দ্য। হয়তো ডাকঘর পড়েনি।

হাসি থামলে বললো, আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ না। জায়গাটা কোথায়? কী করে যেতে হয়, কী কী দেখার আছে? জায়গাটা ওর আহামরি কিছু লাগবে বলে মনে হয় না। ট্রেনে খড়গপুর থেকে ফেরার পথে ওই নামের একটা স্টেশন দেখেছি- জকপুর, মাদপুর শ্যামচক, বালিচক, হাউর, রাধামোহনপুর। বেশ মনকাড়া একটা নাম। আর স্টেশনটারও একটা জাদু আছে বলতে হয়। সরু নিচু কাঁচা প্ল্যাটফর্ম। বড়ো বড়ো খান কয়েক বট বা পাকুড় জাতীয় গাছের নিচে ছোট্ট একটা টিকিট ঘর। টিকিট ঘরের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে

শুয়ে থাকা দু-একটা নেড়ি কুকুর আর প্ল্যাটফর্ম যেখানে শেষ হয়ে ঢালু হয়ে এসেছে, সেখান থেকে একটা লাল রঙের মোরামের রাস্তা শালুক ফুলে ভরা বড়ো একটা দীঘির পাশ দিয়ে দূরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। মনখারাপ হলে বাড়ি, নন্দন, রবীন্দ্রসদন চত্বর, ভিড়ে ভরা গড়িয়াহাটের মোড়ের সন্ধ্যা, বন্ধুদের সঙ্গে ভরন্ত আড্ডা ছেড়ে হুটহাট করে এ রকম অনেক জায়গার জন্য বেরিয়ে পড়েছি কোনো প্ল্যান না করেই। রাধামোহনপুরও আমার তালিকায় আছে, এ রকম হঠাৎ করে ঘুরে আসার জায়গাগুলোর মধ্যে। "ট্রেনে করে বাপু যেতে পারবো না। কিন্তু দেখি বাবাকে জপিয়ে যদি একদিন গাড়িটা ম্যানেজ করতে পারি," বলে বন্যা। আমি জানি এরপর যথারীতি এক দিন ও বলবে বাবার থেকে গাড়ি ম্যানেজ করা গেলো না। আর তর্কের খাতিরে যদি সেই অসম্ভবও সম্ভব হয় তখন বলবে ওখানে তো কাঁচা রাস্তা। তার মানে রাজ্যের কাদা। ওতে আমার হাই হিল আটকে যাবে। মোট কথা, কিছু কিছু না কিছু কারণে শেষ অবধি ও না যাবার একটা অজুহাত ঠিক জোগাড় করে ফেলবে। যেটা হবার নয় সৌজন্যের খাতিরে সরাসরি সেটাতে না বলতে পারে না সে । এ যাবৎ এমনি হয়ে এসেছে। হঠাৎ অন্য কিছু হবার দুরাশা করা বাতুলতা।

আমাদের মেলামেশার যে কোনো পরিণতি নেই তা আমরা দুজনেই জানি। সাদার্ন এভিনিউয়ে ওদের বাড়ির ড্রয়িংরুমটাই আমাদের চারটে ঘরের সমান। দেখলে মনে হয় দিব্বি ফুটবল খেলা যায় ওখানে। সে ঘরের হালকা ক্রিম রঙের টালিতে গড়া মেঝের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আমাদের ঘরের লাল রঙের সিমেন্টের মেঝের সঙ্গে সেটার কোনও মিল নেই। ড্রয়িংরুমে ঢুকলেই ওদের কুকুর লিসা ছুটে আসে আর মেঝেতে লিসার নখের ধাক্কায় অদ্ভুত আওয়াজ ওঠে। ও নিজেই তার বিবরণ দেয়। আলটাকরায় জিভ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে শোনায়। লিসা ছুটে এলে কেমন টাক টাক করে শব্দ হয়। টাক টাক শব্দটা এমন অদ্ভুত সফিস্টিকেটেড কায়দায় বলে যে মনে হয়, আর সবাই বাংলা ভাষাটা ওর মতো স্টাইল করে বলতে পারলে, ইংরেজি বা ফরাসির চেয়ে খাটো বলে মনে হবে না কোনোদিন। ওদের বাড়িতে রেকর্ডে এলভিস, নীল ডায়মন্ড, ন্যাট কিং কোল বাজে। ওদের রান্নার লোক প্লেটে করে স্যান্ডউইচ নিয়ে আসে যেখানে অন্য বন্ধু বা আত্মীয়দের বাড়িতে সিঙ্গাড়া বা ওমলেট, যাকে তারা মামলেট বলে, তাই খেতে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমি দেখা করতে চাইলেই বেশির ভাগ সময়ই ও দেখা করতে আসে। ওর বাড়িতেও নিয়ে যায় যখন তখন। আপত্তি করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও ও বাড়ির লোক আপত্তি করে না এই মেলামেশায়। যদিও একটা অলিখিত বোঝাপড়া আছে যে, এর বেশি এগোবার কথা যেন না ভাবা হয়। বন্যা যখন ওর নতুন ঘড়িটার দাম বা লন্ডন থেকে ওর মাসি যে দামি মিউজিক্যাল ট্রিংকেট বক্স গিফটটা পাঠিয়েছে সেই গল্প শোনায়, তখন হয়তো অজান্তেই আমাকে ওর ভবিষ্যৎ জীবনের মান সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করে থাকে। আবার এসব সত্ত্বেও আমাদের এই দেখাসাক্ষাৎ, একসাথে হাঁটাচলা যে থমকে যায় এমনটাও নয়।

অনেকক্ষণ কিছু বলছি না দেখে, কী বুঝতে পারে কে জানে। আমাকে চাঙ্গা করার জন্যেই বোধহয় বলে ওঠে, চলো র‍্যালিসে শরবত খাই। এই গরমে দারুণ লাগবে। "দারুণ লাগবে" বলাটা শোনায় মুনমুন সেনের হরলিক্সের বিজ্ঞাপনের মতো। যেন মুনমুন সেন বলছে, আমি কেন খাই, দারুণ লাগে। শরবত খাওয়ার পয়সাও ও-ই দেবে, কোনো আপত্তি শুনবে না। আমার পকেটের অবস্থা ও জানে। আর একবার যখন ওর ইচ্ছে করেছে শরবত খাওয়াতে ও খেতে তখন ওকে থামানোর ক্ষমতা আমার নেই। ও যা করতে ইচ্ছে করে তা করেই অভ্যস্ত।

সন্ধ্যেবেলা চায়ের আড্ডায় সন্দীপনের কাছে রাধামোহনপুর ঘুরে আসার কথাটা পাড়লাম। বন্যার যাবার জন্যে রাজি হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হলে এ জন্মে আর জায়গাটায় যাওয়া হবে না হয়তো। প্রস্তাবটা করতেই ও বললো- "ধুর কী যে বলিস। তোর তো অনেক গার্লফ্রেন্ড, তাদেরকেই বলে দেখ না। আমার সঙ্গে গেলে কি আর মনের মতো সফর হবে?" বললুম, "বাজে বকিস না। তোর সঙ্গে আমি কোথায় না গেছি। সেই বাংরিপোসি, সান্দাকফু, ম্যাকলাস্কীগঞ্জ সব ভুলে মেরে দিয়েছিস বুঝি! আমার অনেক ফ্রেন্ড থাকলেও এবং তারা হ্যাপেনড টু বি গার্ল হলেও, যাকে বলে গার্লফ্রেন্ড তা কিন্তু ঠিক নয়।" তাছাড়া মেয়েদের অমন হুট করে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া সম্ভব নাকি! ওদের অনেক কিছু ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়। সন্দীপন বুঝেছে, আমি ওকে ছাড়ছি না মোটেই। তা ছাড়া ও আমার প্রকৃতই সুহৃদ।

শনিবার ছুটির দিন সকাল বলে ফাঁকা হাওড়া স্টেশনটাকে চেনাই যায় না যেন। কাজের দিনে মানুষের ভিড়ে বোঝার উপায় নেই স্টেশন চত্বরটা এতো বিশাল। চিরন্তন বড় ঘড়ি, যার নিচে ছেলেমেয়েরা যুগে যুগে একে অপরের জন্য দাঁড়িয়ে থেকেছে। সেখানেই সন্দীপনের জন্য অপেক্ষা করছি। ও সব সময়েই লেট এবং আজকেও। পিঠে একটা হালকা ধাক্কায় ঘুরে দেখতেই চমক। বলি, "তুমি এখন এখানে কী করে?" "তুমি তো আমায় ভরসাই করতে পারো না। দেখা করতে বলে, আমার আসতে দেরি হলে বা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে আসতে না পারলে অপেক্ষা করতে করতে আমার ওপর বিশ্বাসটাই তো হারিয়ে ফেলো। তাই ভাবলাম আজকে তোমায় একটু চমকে দিই," বলে বন্যা। আমি বললুম, "তার মানে?" "মানে হলো মশাই, কাল সন্দীপন ফোন করে বলেছিলো তোমরা রাধামোহনপুর যাবার প্ল্যান করছো। আমার কিন্তু বেশ রাগ হয়েছিল প্রথমে, আমাকে বাদ দিয়েই প্ল্যান করছিলে শুনে। তারপর ভাবলুম যাক গে যাক। তুমি তো ভাবো বকবক করি বলে, তুমি যা বলো আমি তা মন দিয়ে শুনিই না। এখন বুঝলে কিছু?" আমি বললুম, "তাহলে শেষ অবধি আমরা রেলে চড়ে রাধামোহনপুর যাচ্ছি বলো! জানো তো পাশাপাশি চলা রেলের দুটো লাইন দূরে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায়।" বন্যা বললো, "সে তো চোখের বা বোঝার ভ্রম। একটা ট্রলিতে বা ইঞ্জিনে চড়ে দিগন্ত অবধি গেলেও দেখবে লাইন দুটো পাশাপাশিই চলছে।"

কথায় কথায় দেরি হয়ে গেছে। খড়গপুর লোকাল ছাড়ার জন্য হর্ন দিচ্ছে। আমি বললুম, "ট্রেন ধরতে হলে ছুটতে হবে কিন্তু।" বন্যা টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। হাই হিল

পরে ছোটা যায় নাকি? বললুম, "জুতো খুলে হাতে নাও।" জুতো হাতে ছুটতে ছুটতে বন্যা যেন একটা ছোট মেয়ে হয়ে গেছে। খিলখিল করে হাসছে ছুটতে ছুটতে। খুব মজা পেয়েছে খালি পায়ে ছুটতে। ওদের বাড়ির সবার মতো ঘরের ভেতরেও ও চটি পরে হাঁটাহাঁটি করে। এ ভাবে খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটার কথা ভাবতেও পারে না সে।

রাধামোহনপুর অনেক দূর। মাঝ রাস্তায় হঠাৎ মত বদলে হয়তো ও উল্টো ট্রেনে ফিরে আসতে চাইবে। ওর বাড়ির লোক হয়তো কালই আমায় ডেকে বলবে আমি যেন ওর সাথে আর মেলামেশা না করি। এখন অতশত ভেবে এই সুন্দর মুহূর্তটা নষ্ট করার মানে হয় না। আপাতত আমার মন ভালো হয়ে গেছে। বন্যার হাত ধরে দৌড়োতে দৌড়োতে বললুম, "দাঁড়ালে চলবে না। ট্রেন মিস্ হয়ে যাবে। ছুটতে থাকো বন্যা, ছুটতে থাকো।" পাশাপাশি সুদূর অসীমে চলে যাওয়া সমান্তরাল দুটো রেলের লাইনের মতো আমরা ছুটতেই থাকলাম।

ফোর্ট কলিন্স, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

অমিতাভ রক্ষিত

বাগান বাড়ি

ধ্যাৎ! আর পারি না! আবার ঘরে ঢুকে পড়েছে কালো বেড়ালটা? তার যন্ত্রনায় মাছ, মাংস, এমনকি দুধ খেয়ে এঁটো গেলাসটা পর্যন্ত বাইরে রাখতে পারি না। ঠিক এসে মুখ দিয়ে যাবে ব্যাটা। এসব একেবারেই সহ্য হয় না আমার। রীতিমত গা ঘিন ঘিন করে। প্রথম প্রথম এই বাগান বাড়িটায় পাকাপাকি বাসা বাঁধার পরে তো সে রোজ আসত। তারপরে বেশ কয়েকবার লাঠির ঘা খাবার পরে আর বেশি আসত না। কিন্তু ইদানীং দেখছি আবার তার আনাগোনা বেড়ে গেছে। রাগের চোটে তেড়ে গেলাম লাঠিটা হাতে নিয়ে। কিন্তু বেশি কিছু করতে হল না। আমার রুদ্র মূর্তির দিকে একবার তাকিয়েই ম্যাঁও বলে বিকট আর্তনাদ করে তিন লাফে বাগানের বেড়া পেরিয়ে সোজা ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে তার দৌড়!

হ্যাঁ, আমার বাগানবাড়িটা একেবারে ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপরেই। বরিশার একটু পরে– কলকাতা থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণে। ঠিক আমার বাড়ি বলাটা হয়ত ভুল হবে। বাগানটা আমার স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে হাতে পেয়েছিলেন প্রায় বছর তিরিশেক আগে। সেদিন থেকে বহুদিন ধরে প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তেই সপরিবারে চলে আসতাম এখানে। কলকাতা জীবনের হৈ হট্টগোল থেকে বেরিয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিতাম। তখনও তো চাকরি ছিল আমার– বেশ চাপের মধ্যে থাকতাম। যতই হোক, হেড অফিসের বড়বাবু, কাজের চাপ তো থাকবেই।

বাগানটা প্রায় চল্লিশ বিঘে জমির ওপর বিস্তৃত। দক্ষিণ দিক ঘেঁষে একটা বেশ বড় পুকুর আছে। অনেক পোনা। মৃগেল আর কাতলা মাছের পোনা ফেলে ফেলে তাতে এখন অনেক মাছ। সারাদিন ধরে ঘাই মারে আর বাঁধানো ঘাটের ওপরে বসে ছিপ ফেললেই টপাটপ বড়শি গেলে। আমি তো পুকুরের মাছই তুলি আর টাটকা খাই। বাগানের উত্তর দিক ঘেঁষে একটা দোতলা পাকা বাড়িও তৈরি করিয়ে নিয়েছি বেশ কিছু বছর আগে; তাতে এয়ার কন্ডিশনার না থাকলেও আর সব বিলাসিতাই আছে। বাগান ভরতি বড় বড় নারকোল, সুপুরি, বিভিন্ন ধরনের লেবু। বেশ কয়েকটা ঝুরিওয়ালা বট। কিছু অশ্বত্থ আর কিছু ছাতিম গাছ। পূর্ব দিকে জঙ্গল কেটে খানিকটা ধানজমি করে নিয়েছি। বর্গাচাষীরা এসে ধান বানায়। আর পশ্চিমে মেন গেট। সেখান দিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে গাড়ি ঢোকবার রাস্তার দুপাশ ধরে নানা ধরনের ফুলের গাছও লাগিয়েছি। সব মরশুমেই চমৎকার ফুল হয় আমার বাগানে!

আমি যে কখনও এই বাগান বাড়িতে এসে পাকাপাকি ভাবে থাকব, তা অবশ্য আগে কোনওদিন ভাবিনি। আলিপুরে আমার নিজের কেনা সাহেবি আমলে তৈরি বনেদি বাংলো। চারিদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল বড় কম্পাউণ্ড, গাড়িবারান্দা, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল কী নেই সেখানে? অবসরপ্রাপ্ত হয়েও দিব্যি ছিলাম। কিন্তু সমস্যা শুরু হল বছর দুই আগে আমার স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে। তিনি থাকতে আমার খাওয়া দাওয়ার বড় আরাম ছিলো। প্রতিদিনই তিন চারজনের এক প্রমীলা বাহিনী নিয়ে তিনি লাল শাক, কচু শাক থেকে শুরু করে লাউয়ের খোসা আর কুমড়োর ফুল ভাজা দিয়ে মশুরের ডাল, পোনা মাছের কালিয়া- কী না করে খাওয়াতেন! কিন্তু তিনি চলে যাবার পরে হেঁসেলে আমার বৌমার রাজত্ব শুরু হল। প্রমীলা রাঁধুনিরা আত্মসমর্পণ করল। বাবুর্চিয়ানার সূচনা হল। শুক্তো, সাদা ভাত আর পুঁটিমাছ ভাজার বদলে প্লেটে দেখা দিতে লাগল ফ্রায়েড রাইস, মুরগির ক্যাচাটোরি, শূকরের চপ। বৌমার কাছে গিয়ে যে এ নিয়ে দুয়েকবার অভিযোগ করিনি তা নয়, কিন্তু সে শুধু আমার গালে একটা চুমু দিয়ে হেসে বলল, 'বাপি, এবারে তুমি একুশ শতকে পৌঁছোও তো! আমি ওসব রান্না করতে জানি না। আর করবোই বা কখন, কোর্টে যা কাজের চাপ!'

ভুল বুঝবেন না, বৌমাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। সে নিজে একজন বড় উকিল। আর রণি তো আমার চোখের মণি- আমার একমাত্র সন্তান। আমার সেই রণি, যে নাকি একসময় বাগানবাড়িতে এসে একটা উচ্চিংড়ে দেখতে পেলেই ভয় পেত। আর পুকরের কাতলা মাছ তার বড়শি ছিঁড়ে পালিয়ে গেলে কেঁদে-কেটে একসা করে দিত। সে হল আজ হাইকোর্টের জজ সাহেব রণজয় সেন। তার দাপটে নাকি হাইকোর্টের বাঘে-গরুতেও একঘাটে জল খায়। কিন্তু এসব নিয়েই তো তারা সারাদিন ব্যস্ত! আমার পুঁইশাক খাওয়া হল কি না, তা নিয়ে চিন্তা করবার, সত্যিই তো, তাদের সময় কোথায়!

শেষ পর্যন্ত একদিন ভেবে দেখলাম, না এভাবে আমার আর চলবে না। তারা তাদের মতন শান্তিতে থাকুক। আমি গিয়ে বাগানবাড়িটায় নিজের মত করে থাকি। আমি রান্না করতে ভালোবাসি। শাক-সবজি যা বাগানে হয় তাই দিয়ে। আর বাকি সব বরিশার বাজার থেকে কিনে এনে আমার একার খুব ভালই চলে যাবে। ছেলে-বৌয়ের সঙ্গে কিন্তু এই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। দেখলাম তাদের বড়ই আপত্তি। রণির খুব ইচ্ছে বাগান বাড়িটাকে সে একটা কর্পোরেট রিট্রিট বানায়। একদিন করেও যদি চড়ুইভাতির জন্য ভাড়া দেওয়া যায়, তবে তো কম করে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দশ হাজার টাকা করে উপার্জন হবে! মন্দ কী? এমনিতে তো খালি-ই পড়ে আছে বাড়িটা! শুনে খুব রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার মত না নিয়ে আমার সম্পত্তিতে তুমি হাত বাড়াবে না।' রণি গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার কোথায়, মায়ের উইল মোতাবেক সম্পত্তিটাতো এখন আমার!' আমিও রেগে বললাম, 'বটে? কিন্তু বাগানের বাড়িটাতো আমার উপার্জনের টাকায় বানানো হয়েছে। সেটা তোমার মা তোমাকে দিয়ে যাবার কে?'

হপ্তাখানেক বাদে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আর কিছু প্রিয় বই সঙ্গে নিয়ে, আমি পাকাপাকিভাবে বাগান বাড়িতে উঠে এলাম। বৌমা অনেক হাতে পায়ে ধরে বলল, 'বাপি, আমাদের ফেলে যেও না। একা একা কী করেই বা থাকবে ওই অজপাড়াগাঁয়ে? তোমার নাতি নাতনি'? আমি হেসে বললাম, 'দেশত্যাগী তো আর হচ্ছি না, উইকেন্ডে ওদের নিয়ে চলে আসবে'! পরের সপ্তাহে রণি এসে অনেক করে ক্ষমা চাইল। তারপরে খুঁজে পেতে নতুন একটা মালী, ঘরদোর পরিষ্কার করবার জন্য এবং রান্নায় সাহায্য করবার জন্য ঠিকে কাজের লোক, আর ফাই ফরমাস খাটবার জন্য দুটো ছোকরাও জোগাড় করে দিয়ে গেল।

সত্যি বলতে কি, তারপর থেকে খুব ভাল আছি আমি। প্রথম প্রথম একটু মানিয়ে নিতে অসুবিধে হত। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে, কাজের লোকেরা সব বাড়ি চলে যাবার পরে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবিস্কার করে ফেললাম যে শহরাঞ্চলের কৃত্রিম আলোর কলুষতা থেকে বাইরে বেরোনোর সৌভাগ্য হলে, রাত্রিটাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। রবীন্দ্রনাথ একদিন ঝিলমের জলে দেখেছিলেন কেমন করে দিনের ভাটার শেষে, রাত্রির জোয়ারের কালো জলে, তারাফুল ভেসে আসে! তুলনায় আমি দেখলাম, কেমন করে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের পুঞ্জীভূত আলো, অগণ্য ছায়াপথের অন্তঃস্থল বেয়ে, চুইয়ে চুইয়ে এসে, আমারই সামান্য পুকুরের জলের ওপরে গলে পড়ছে! মৃদু বাতাসের তোলা ছোট ছোট ঢেউ-এর ওপরে নৃত্যরত সেই আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রমশ যেন দেখি ভৈরবের প্রলয় নাচন। সে নাচনে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। এক এক মুহূর্তে অনবদ্যভাবে একেকটা একক বিন্দুতে গিয়ে লীন হয়ে যাচ্ছে। সেই বিন্দুতে আমি ও আমার অন্তহীন আত্মা, আমার সত্তা ও সত্তাহীনতা, সব কিছু মিশে গিয়ে, অস্তিত্বের সূক্ষ্মতা ও স্থুলতার মধ্যে আর কোনও ব্যবধান থাকছে না

খুব আনন্দের সঙ্গেই দিনগুলো কাটছিলো আমার। কিন্তু কিছুদিন হল কয়েকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার ছোকরা দুটো একদিন বাড়ি গেল কিন্তু তারপর থেকে আর ফিরছে না। কোথায় গিয়ে তাদের খুঁজি! রান্নার মাসিরও দেখি একই অবস্থা। মালীটা তবু আসে, নিজের মনে কাজ করে আর চলে যায়। কিন্তু সে রোজ আসে না। এইসব নিয়ে একটু বিব্রত আছি। রণির সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু এর থেকেও বেশি সমস্যা হল যে, আজকাল কিছু কিছু চ্যাঙড়া ছেলেমেয়েরা, হঠাৎ হঠাৎ বাগানে এসে ঢুকে পড়ছে। এমনিতেই ঠিক ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপরে বাগানটা হবার একটা অসুবিধে আছে। নেশাসক্ত প্রমোদ শিকারিরা অবাধে সুরাপান করে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বাড়ির জানলা দিয়ে তাদের শূন্য বোতল, আধখাওয়া স্যান্ডউইচের মোড়ক, ফলের খোসা, মায় কোনও কোনও দিন তাদের অন্তর্বাস পর্যন্ত, হরির লুটের মতন এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিয়ে যেতে দ্বিধা বোধ করে না। আমার মালীকে তো প্রায় প্রতিদিনই বেড়ার ধার থেকে এ সমস্ত জঞ্জাল তুলে তুলে ময়লা ফেলার ড্রামে উঠিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু বাগানে ঢোকার গেটে সাধারণভাবে কোনরকম তালা দেওয়া না থাকলেও, এতদিন অনাহূত লোকজন আমার বাগানের মধ্যে খুব কমই ঢুকতো। কিন্তু এবারে সেই প্রাইভেসিটাও বুঝি গেল।

এইতো সেদিন শীতের দিন বেশ আরাম করে লেপ মুড়ি দিয়ে, একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছি! কিন্তু সকাল দশটা নাগাদ হঠাৎ একটা বিকট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়ফড় করে উঠে জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখি, একদল লোক দিব্যি দালানের ওপরে এসে বসেছে আর কান ফাটিয়ে তাদের গানের কল চালাচ্ছে। এমন রাগ হয়ে গেল যে কী বলব! চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'এই তোমরা কারা? এটা একটা প্রাইভেট বাড়ি। শিগিগির চলে যাও এখান থেকে।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই! একবার ফিরে পর্যন্ত তাকালো না! উপায় না দেখে ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে ধড়মড় করে নিচে নেমে এলাম। দালানের দরজা খুলে বললাম, 'গান বন্ধ কর শিগগির, এখানে কেন এসেছ? এটা পাবলিক পার্ক নয়।' কিন্তু এত জোরে গান চলছে যে আমার কথা এত কাছ থেকেও তারা শুনতে পাচ্ছে না। তখন ভীষণ রাগ উঠে গেল। হাতের কাছে একটা বাতাবি লেবু পেয়ে সেটাই তাদের বুমবক্সটাকে নিশানা করে ছুঁড়ে মারলাম। ঢপ করে শব্দ হয়ে বুমবক্সটা চুরমার হয়ে গেল। গানও বন্ধ হয়ে গেল। ওরা সবাই মিলে লাফিয়ে উঠে পেছন দিকে তাকালো। আমার তখনও রাগ নামেনি। মুখে যত খারাপ কথা এল, সব একসঙ্গে উগরে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুচারটে লেবু, আপেল যা হাতের কাছে পেলাম তাও ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারলাম। পরে অবশ্য লজ্জা লাগছিল এতটা অভদ্রতা করলাম বলে, কিন্তু উপায় কী ছিল? আর শেষ পর্যন্ত তাতেই কিন্তু কাজ হল। তারা সঙ্গে সঙ্গে তল্পিতল্পা গুটিয়ে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল। তারপরে এ রকম ঘটনা আরও ঘটতে থাকল। কিছুদিন বাদে আমি একটু হাঁটতে বেরিয়েছি, কী কাজে তা মনে নেই। বাড়ি ফিরে দেখি বাগানে দুটো গাড়ি ঢুকেছে আর জনা আষ্টেক মহিলা ও পুরুষ। কিছু কচি-কাঁচা নিয়ে বাগানের মধ্যেখানের গোল জায়গাটা, যেখানে আমি আমার নাতি নাতনিদের জন্য আগুন জ্বালাবার উনুন বানিয়েছি, সেখানে দিব্যি চেয়ার নিয়ে বসে আছে আর আগুন জ্বালিয়ে মুরগির ঠ্যাং সেঁকতে দিয়েছে। আমি জানি এদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে লাভ হবে না। আমার কথায় এসব লোকেরা কেউ পাত্তা দেবে না। তাই সোজা আমার ফুলগাছে জল দেবার লম্বা পাইপটা তুলে মুরগির ঠ্যাং-এর দিকে হনহন করে এগিয়ে গেলাম। বুঝিবা পাইপ হাতে তাদের দিকে আমার দৌড়ে যাওয়ার মূর্তিটা বেশ ভয়াবহ ছিল। যারা আমার দিকে মুখ করে বসেছিল, তারা আঁ আঁ করে লাফিয়ে উঠল। আমি পাইপ চালিয়ে আগুনটা নিবিয়ে দিলাম। তারাও অনেকে জলে ভিজল। তখন অবস্থা সুবিধের নয় বুঝে, জিনিসপত্র ফেলেই সবাই মিলে দৌড় দিয়ে গাড়িতে উঠে চম্পট! সেদিন নিজে নিজেই খুব হেসেছিলাম। পাগলামির ওপর আর কিছু নেই। এই আমার অস্ত্র।

আজ রবিবার। কোর্ট-কাচারি পূজোর ছুটিতে বন্ধ। রণিরা বেশ কিছুদিন আসেনি। তাই আমি জানি যে আজ তারা নিশ্চয়ই আসবে। কাল মালীটা বেরিয়ে যাবার সময় পেছন থেকে বলে দিলাম আজকে আসতে হবে। গেটের কাছটায় অনেক ময়লা জমে আছে, পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু প্রায় এগারোটা বেজে গেল, তার এখনও পাত্তা নেই। অগত্যা আমিই নিজে কাজে লেগে গেলাম। গেটের বাইরেও অনেক জঞ্জাল। সেগুলো তুলে তুলে

ময়লার ড্রামে ফেলছি। হঠাৎ দেখি সেখানে একটা নতুন সাইনবোর্ড লাগানো। দাঁড়িয়ে উঠে দেখি লেখা: "এই বাগান বাড়িটা চড়ুইভাতি অথবা অন্যান্য কাজে ভাড়া দেওয়া হয়। নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন।" নিচে দেখি রণির মোবাইল নম্বরটা লেখা। আর দেখি কেউ রসিকতা করে পাশে কালো স্প্রে পেইন্ট দিয়ে লিখে রেখেছে: "সাবধান, এই বাগানবাড়িতে ভূত আছে।" অন্য সময় হলে এই রসিকতায় বেশ মজা পেতাম। কিন্তু রণির বিশ্বাসঘাতকতা দেখে তখন আমার চোখে জল এসে গেল। তার টাকার এত দরকার যে সে বারণ করা সত্ত্বেও আমাকে না জানিয়ে বাগানটা ভাড়া দিচ্ছে! আজকেই একটা এসপার-ওসপার করে ফেলতে হবে।

গেটটায় চেন লাগিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। চোখে পড়ল যে পাশেই একটা কদাকার প্লাইউডের টুকরো পড়ে আছে। এরকম কাঠ বা প্লাইউড প্রায়ই ঝড়ের সঙ্গে উড়ে এসে পড়ে। আমাদের তুলে ফেলে দিতে হয়। এটার রঙ ও কাদা লাগা দেখে বুঝলাম যে সেটা অনেকদিন ধরেই পড়ে আছে, কেবল আমার চোখে পড়েনি। আর মালীও কিছু করেনি। অগত্যা সেটিকে দুহাত দিয়ে উঠিয়ে ময়লার ড্রামে ফেললাম। দেখি সেটির নিচে চাপা পড়ে ছিল অনেকগুলো পুরোনো খবরের কাগজ। এটাও এখানে থাকার একটা নুইসেন্স। আমি খবরের কাগজ এখন আর পড়ি না। সব খবর পাই টিভি আর ইন্টারনেটে। তাই কাগজওয়ালাকে পই পই করে বলেছি আমাকে কাগজ দিও না, আমি পয়সা দেব না। কিন্তু মফস্বলের কাগজওয়ালাদের সমস্যা আছে। তারা টাকা চায়না আমার কাছ থেকে। তারা চলে শুধু বিজ্ঞাপনে। কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কমে গেলে অ্যাপ্রন উপার্জন কমে যায়। তাই আমি চাই বা না চাই, "বৃহত্তর বরিশা নিউজ" প্রতি দু সপ্তাহ অন্তর অন্তর, নলচে পাকিয়ে আমার বাগানে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। আমিও কিছুদিন পর পর সেগুলো তুলে ময়লার ড্রামে ফেলে দিই। আজকেও তাই করতে যাচ্ছিলাম। বেশিরভাগই রোদ-মাটিতে পড়ে বিবর্ণ হলুদ। হঠাৎ দেখি, একটার নলচের বাইরের দিকে দেখা যাচ্ছে একটা ছবি- লোকটাকে খুব চেনা চেনা দেখাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে দেখি, আরে, এতো আমারই ছবি! আমার ছবি এই কাগজে কিভাবে এলো? ছবির নিচে হেডলাইনে দেখি, "প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মূখ্য অধিকারী ও অধুনা বৃহত্তর বরিশার বাসিন্দা, শ্রী রতন সেন মহাশয় বিগত মে মাসের ২৭ তারিখে সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন"... পরে আরও অনেক কিছু লেখা ছিল...কিন্তু আমি কী করে আর বেশি কিছু পড়ব? তার মানে কি, তার মানে কি...আমি আর ভাবতে পারলাম না।

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

আনিসুজ্জামান

দান বাক্স

মজিদ দান বাক্সের সামনে চুপ করে বসে একাগ্রচিত্তে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে আছে– যেন ভিতর থেকে অদৃশ্য কিছু এসে ওর মণি দুটিকে বাক্সের সঙ্গে চিরতরে আটকে দিয়েছে। ওর বয়স ত্রিশ পার হয় হয়। তেমন লম্বা না হলেও হাঁটার সময় কিংবা বসার সময় ইচ্ছে করেই একটু ঝুঁকে সামান্য নুইয়ে বসে। কার কাছে যেন শুনেছে, এক বিখ্যাত চিত্রকর আদর্শ বাঙালিকে এভাবেই এঁকেছেন। এতে নাকি সংসারের ঘানি টানা মানুষদের মতো দেখায় আঁকা মানুষদের। যদিও সমস্ত সংসারটাই ওর ঘাড়ে আর সে সেটা তেমন অনুভবও করে না, তারপরও একটু ভাব ধরা। প্রচুর খাটে বলে দড়ির মত পাকানো শরীর। কারখানার কাজে বাইরে যেতে হলে ওকে যে খাবার জন্য ৮০ টাকা দেওয়া হয় তা নিয়ে অন্যান্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও মজিদ ঠিকই দিব্যি খাবার খেয়ে দশ টাকা বাঁচিয়ে রেখে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। ওর গোপন কায়দাটা হচ্ছে, প্রথমে এক থাল গরম ভাত সে দুটো পেঁয়াজ আর গোটা পাঁচেক মরিচ ডলে খেয়ে পরের থালে শুধু ডাল দিয়ে মাখিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে সবশেষে পাতে ডাল ঢেলে চুমুক দিয়ে আঁচাতে যায়। তবে বৃহস্পতিবারের কথা আলাদা। ঐদিনটাতে সে বিলাসিতা করে একটা ভাজি বা ভর্তা, সঙ্গে ফার্মের আইড়ের ঝোল নেয়। এরপরও দশ টাকার বদলে মাঝে মাঝে একশ দু'শ বেঁচে যায় এই বারে।

আজ বৃহস্পতিবার। ভ্যাট অফিসের কামাল স্যারের সঙ্গে কাজ শেষ করে খাওয়া সেরে অফিসে ফিরে হিসাব রক্ষকের কাছে সব বুঝিয়ে বের হবার পরপরই সুদূর আমেরিকা থেকে কল আসে। কলটি সেরে সে সোজা মসজিদে।

এখন রাত আটটা। আষাঢ় মাসের শুরু। সাধারণত ওর পরনে থাকে প্যান্ট, পাঞ্জাবি আর উপরে এক পুরাতন কোট। আজও পোশাকে ব্যতিক্রম নেই। ফলে যখন ঢুকেছে তখন ওর সেকেন্ড হ্যান্ড কোটটির গা চুয়ে পড়া পানি মেঝেতে পুকুর বানিয়ে ফেললেও ও তা খেয়াল করে না। এমনকি কোটটা গা থেকে খোলার কথাও মনে আসে না। বসে আছে তো আছেই। দূরে সাদা ধবধবে এক বক ওকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে মাঝে মাঝে।

মজিদ গত পাঁচ বছর ধরে একই মসজিদে আসলেও এ সময়টিতে আসে না। ও আসে অনেক রাত করে, কাজ শেষে, আর বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে সঙ্গম শেষে গোসল করে ঘুমায়। মাঝে মাঝে অজু চলে গেলে আবার পাক হয়ে সঙ্গম করে। কার কাছে যেন শুনেছে এভাবে করাটাই উত্তম–পাক শরীরে, অন্ধকারে, বউয়ের কাপড় আর ছায়া

আলগোছে উপরে তুলে দোয়া পড়ে করতে পারলে মিলনটা সহি হয়। নিচে নিথর হয়ে থাকতে হবে পাক রাব্বুল আলামিনের নেয়ামত ওর দাসীকে। সঙ্গম হচ্ছে ইবাদতের মতো।

ওর সঙ্গে কুলসুমের বিয়ে হয়েছিল বাবা- মায়ের ইচ্ছেতে। পাশের গ্রামের মেয়ে। বিয়ের আগে একবার মাত্র কুলসুমকে দেখেছিল মজিদ। দেখেছিল যখন ওর হবু শ্বশুরকে তার পাওনা বিশ টাকা ফেরত দিতে গিয়েছিল, বাবা হযরত আলি পাঠিয়েছিল বলে। কুলসুম তখন উঠানে। কপালের একপাশে মস্ত এক কালো টিপ। মজিদকে দেখেই কিনা কে জানে মেয়েটা সেখানেই ফিস করে শব্দ করে হিসি করে দেয়। মজিদ এত আশ্চর্য হয়েছিল যে, ওর শুধু তাগা পরা নিম্নাঙ্গের দিক থেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল। কুলসুমের সঙ্গে বিয়ে হবার আটমাস পর যখন সে প্রথম রতি করতে পেরেছিল তখনও সেই দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। এরপর থেকে কুলসুমের পাশে শুলেই মজিদ হিসির সেই শব্দটাই যেন আগে শুনতে পায়।

ওর বাবা হযরত আলি বর্গা খাটে, কামলা দেয়। ওরা সবমিলে ছয় ভাইবোন। হযরত আলিও কিঞ্চিৎ নুইয়ে হাঁটত, নুইয়ে বসত। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। মজিদ দ্বিতীয় সন্তান। বড় বোনের বিয়ে হয়েছে অনেক বছর আগে। মজিদের পরের চারজনের কেউই মক্তব শেষ করে ঢাকায় চাকুরি করে না। গ্রামেই থাকে। একজন তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে হেঁসেল ঠেলে। এক ভাই গ্রামের চেয়ারম্যানের ফাইফরমাশ খাটে। অন্যজন যখন যে ক্ষমতায় থাকে তার দল করে। ওর নাম হালিম। একমাত্র হালিমই টাকা- পয়সার দিক থেকে সচ্ছল। কিন্তু কী কারণে যেন বাবা- মা ওর কাছে থাকতে চায় না। বলে, হারামের পয়সা গলা দিয়ে নামে না।

খুব সম্ভবত বাবা না খেয়ে আজ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। প্রায় বৃহস্পতিবার রাতে আর শুক্রবারে সে বাবার সঙ্গে খায় । কারণ দিনটা পবিত্র। সারাদিন বাবা মা আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাবে। সবই ঠিক ছিল, পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু সব ওলটপালট করে দিল ঐ আমেরিকান ফোন কলটা। আমেরিকা ওর কাছে অন্য এক বিশ্ব, যেখানে ডলার ছাপানো হয়, কষ্ট করে উপার্জন করতে হয় না বাংলাদেশের মতো। ওকে কথাটি বলেছিল কারখানার মালিক। আরও বলেছিল আমেরিকা এটি করতে পারে শুধু তেল ডলারে বিক্রি হয় বলে। শক্তির দাপটে। যেদিন পৃথিবীতে তেলচালিত গাড়ি থাকবে না সেদিন নাকি আমেরিকা আর ডলার ছাপাতে পারবে না। মজিদ বুঝতে পারে না তেলের সঙ্গে ছাপানোর কী সম্পর্ক! কিন্তু মালিক যখন বলেছে তখন সেটা হবে পবিত্র উচ্চারণের মতোই অকাট্য। মজিদ ভেবেছিল, যে মালিক তার মতই ধনী ছিল একদিন আর নিজের চেষ্টায় আমেরিকা গিয়ে কোম্পানির মালিক হয়ে আবার দেশে ফিরে একটি কারখানা দাঁড় করাতে পেরেছে। তার কথা কি বানোয়াট হতে পারে? যদিও মজিদকে যে যা বলে তার প্রায় সবই সে বিশ্বাস করে। জীবনভর উত্তর দিতে দিতে প্রশ্ন তোলার অভ্যাস ওর হয়নি।

ফোনকলটা তেমন কিছু না। প্রায়ই মালিক ওকে এ সময়ে কল করে। কারখানার বিভিন্ন খবরাখবর নেয়। আজও ওরকমই একটা কল হবে বলে ভেবেছিল সে। খুব সকালে মজিদ গিয়েছিল ভ্যাট দিতে। বিশ হাজার টাকা কামাল স্যারের হাতে তুলে দিয়েছে সে। ভ্যাটের ব্যাপারটা মজিদ নিজেই দেখে। বিবেচনা করেই সে এই অংকটা নির্ধারণ করেছে। হিসাবরক্ষকের অফিস থেকে বের হবার সময় কল আসলে মজিদ রিসিভ করতে করতেই লম্বা করে সালাম দেয়।

- কিরে মজিদ, কেমন আছিস?

- ভাল স্যার; আপনি?

- লকডাউনের ঠ্যালায় পাগল হবার অবস্থা। আজ কি করলি?

- স্যার, ভ্যাট দিতে গেছিলাম।

- শালার সব বন্ধ, বিক্রি নাই আবার ভ্যাট। টাকা দেস নাই তো?

- না স্যার, ভ্যাট শূন্য টাকা এসেছে। শুধু কামাল স্যারের হাতে বিশ হাজার দিয়েছি। উনাকে কিছু না দিলে আবার গোসসা করতে পারে।

- তাই বলে এত টাকা? স্যার একটু উত্তেজিত হয়ে বলে। কেন এত দিতে গেলি? আচ্ছা বলত, তুই কি এখেকে টাকা খাস না?

মজিদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। স্যার ওকে অবিশ্বাস করল! কোনোরকমে বলে, না স্যার।

স্যার ওর কথা ঠিকমতো শোনে না। প্রশ্ন করে, তুই তো মিথ্যা বলিস না। সত্যি করে বলতো কোনো টাকাই কি তুই পাসনা?

তখনই ওর মনে পড়ে, জ্বি স্যার, আমাকে চা খেতে এক হাজার টাকা দিয়েছে কামাল স্যার। সে তো সবসময়ই দেয়। বেশি পেলে বেশি দেয়। কম পেলে কম। কিন্তু আমি তো টাকা সরাই না কখনো।

- কিন্তু এটা তো ঘুষ। তুইও ঘুষ খাইলি? ভাবতাম সারা বাংলাদেশে কমপক্ষে অন্তত একজন সৎ মানুষ আছে।

মজিদের দুনিয়া ঘুরতে থাকে। তাই তো! একটু বেশি পাবে বলেই তো প্রথম সে পাঁচ হাজার দিবে বলে ভাবলেও অংকটা আস্তে আস্তে বেড়ে বিশে গিয়ে ঠেকেছে।

মজিদ কলটা কেটে সোজা এখানে।

ইমাম সাহেব আর থাকতে পারেন না। এসে প্রশ্ন করেন- কি রে মজিদ্দা, তর হইলটা কি? তখন থাইক্কা ঝিম মাইরা বইয়া রইছস?

মজিদ সব খুলে বলে।

ইমাম সাহেব শুনে বলেন - হ্যাঁ, গুরুতর পাপ। তবে তুই ভাল মানুষ। আল্লায় তর কথা শুনব। এজন্য দান বাক্সে তর টাকা ফেলতে হইব। যত বেশি দিবি, পাপ তত কাটব। তারপর বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়বি।

মজিদ পকেটের সব টাকা দান বাক্সে দিয়ে দেয়। একবারও ভাবে না, আজ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার, বেতনের সম্পূর্ণ টাকা পকেটেই ছিল, খালি হয়ে গেল। নামাজ পড়ে

মসজিদের দরজা দিয়ে বের হবার সময় ইমাম সাহেবের কথা কানে বাজে–যত বেশি দিবি, তত পাপ কাটব।

মজিদ ঘুরে দাঁড়ায়–আল্লায়ও ঘুষ খায়!

লাফ দিয়ে গিয়ে পলকা দান বাক্স তুলে লাথি দিয়ে ভেঙে সব টাকা নিয়ে নেয়। ধবধবে সাদা বকটি 'করছস কী' বলে দৌড়ে এসে ওকে ধরার চেষ্টা করে।

সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আনোয়ার ইকবাল

কালো টেলিফোন

আব্বার বদলীর চাকরি। আমরা যখন যশোর এলাম, তখন কেবল চারে পা দিয়েছি। সরকারি বরাদ্দে পাওয়া বাড়িটা এককালে কোন এক দেশি মহারাজার বাসস্থান ছিল। বিশাল মাঠের উপর চওড়া চার মহলা প্রাসাদ। সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে চাইলে ডান আর বাম দু'মাথা এক করে দেখার সাধ্যি নেই। বাড়িটির শুধু দোতলাতেই এত এত ঘর যে আম্মা ঠিক করলেন, দিনভর সিঁড়ি বাওয়া-বাওয়ি করার দরকার নেই। আমাদের ঘর সংসার তাই কেবল উপরতলাতে সীমাবদ্ধ থাকল। তাতেও দোতলার পুরোটা ব্যবহার করা যাবেনা। আর একতলার ঘরগুলোর তালা তো খোলাই হলনা।

মাঝে মাঝে শোনা আব্বা ও আম্মার কথা থেকে বুঝতে পারতাম, আমাদের সেই বাড়িটির বয়েস তখন একশ' ছুঁই ছুঁই করছে। বয়েস অংক এসব বোঝার মত জ্ঞান-গম্যি তখনও আমার হয়নি। ওদের এ সমস্ত আলাপের সময় আমি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। মাথার অনেক উপরে সিলিং। সেটাতে সবুজ রঙের ভারী ভারী কাঠের কড়িকাঠ সারি বেঁধে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথায় চলে গেছে। কড়িকাঠগুলোর মাঝের জায়গাগুলো সাদা রঙের। আম্মাকে আব্বা বুঝিয়ে বলতেন, সিমেন্ট জিনিসটা আবিষ্কারের আগে চুন আর কাঁকর মিশিয়ে এককালে কংক্রিটের মত একটা মিশ্রণ বানানো হত। কড়িকাঠের মাঝের ফাঁকা জায়গায় বাঁশের চাটাই গুঁজে দিয়ে তার উপরে সেই মিশ্রণ ঢালাই করে এই ছাদ বানানো হয়েছে। বিষয়টি আমার অপরিপক্ব মনে খুবই নীরস ঠেকলেও, আমি দেখতাম, ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে আব্বা বেশ আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়ছেন। কেন? বুঝতে পারতাম না, শুধু এইটুকু বুঝতাম, এটা সেই রকম একটা বড়দের ব্যাপার। যা পুরোপুরি বুঝতে হলে আমাকেও অনেক বড় হতে হবে। ছাদের অন্য একটি ব্যাপারে আমার অবশ্য যথেষ্ট ঔৎসুক্য ছিল। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চোখ মেলতে প্রায়ই দেখতাম সেই কড়িকাঠগুলো থেকে মাথা নিচে দিয়ে ঝুলছে একগাদা বাদুড়। রাতের অন্ধকারে ওগুলোর লাল ঝুলঝুল চোখ দেখলে আমার গা ছম ছম করত। দিনের বেলা সেটা হতনা।

আমাদের প্রাসাদ বাড়ির সামনে আর পেছনে দুদিকেই টানা বারান্দা। দুটোর চেহারা প্রায় অভিন্ন। বারান্দার খোলা প্রান্তে মোটাসোটা চৌকো খিলানের সারি। পর পর দুটো খিলানের মাঝের ফাঁকা অংশের নিচটুকু রেলিং দিয়ে বন্ধ করা। রেলিংয়ের ওপরটা খোলা। খিলানগুলোর ঘাড় থেকে শুরু হয়ে, ঝালর কাটা একটি দেয়াল ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গিয়েছে। দুপাশের দু'টো খিলান থেকে সেগুলো পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে একসাথে মিলে যেতে সেটা দেখতে হয়েছে অনেকটা উল্টানো বাঁকা চাঁদের মত। সকালে

সামনের বারান্দায় অনেক রোদ আসে। সেই রোদ ঠেকাতে খোলা অংশগুলোয় নলখাগড়ায় বোনা চাটাই পর্দার মত করে ঝুলিয়ে দেয়া। তাদের ফাঁকফোকর দিয়ে আসা রোদ সকাল গড়িয়ে দুপুর আসা পর্যন্ত লাল চকচকে সিমেন্টের মেঝেতে অনবরত আছড়ে পড়তে থাকে। বায়স্কোপের ছবির মত সেখানে আলোছায়ারা নড়েচড়ে বেড়ায়। আমি কখনও সেগুলোর পেছনে দৌড়াই, আবার কখনও মেঝেতে বসে ওদের সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলি। আমরা তখন তিন ভাইবোন। ছোট বোনটির বয়েস এক বছরেরও কম। আমি মাঝে, বড় বোন আট। একমাত্র সে-ই ইস্কুলে যায়। দুপুরে আম্মা ছোট বোনটিকে নিয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নেন । আব্বা অফিসে; এত বড় বাড়িতে আমার সঙ্গী কেউ নেই। রৌদ্র ছায়ার সাথে খেলতে খেলতে যখন আর ভালো লাগেনা তখন চাটাইয়ের পর্দা সরিয়ে বাইরের রাস্তাটি দেখার চেষ্টা করি। চার বছর বয়েসেই জীবনটা বড় একঘেয়ে ঠেকে।

এই বাড়িতে ওঠার সপ্তাদুয়েক পর একটা উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের বাড়িতে ফোন এলো। পুরো যশোর শহরে সেই সময় গোটা পঞ্চাশের বেশি ফোন ছিলনা। সেই দিনটির কথা আজও পরিষ্কার মনে পড়ে। খাকি সার্ট আর খাকি প্যান্ট ধুলোমাখা পায়ে দু'ফিতার নীল স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরা একজন মানুষ; কাঁধে ক্যানভাসের ঝোলা আর হাতে ফোন নামের বস্তুটি ধরে দোতলায় উঠে এলেন। মহিষের মাথার মত দেখতে ফোনটি স্থাপনের জন্যে জায়গা নির্দিষ্ট হল সামনের টানা বারান্দাটিতে। দেয়ালের গায়ে বেশ উঁচুতে বসানো একটা তাক এতদিন ধরে খালি পড়েছিল। তার ঠিক ওপরে ছাদ থেকে দেয়াল বেয়ে নেমে আসা একটি কালো তার এতদিন একাই গড়াগড়ি খেত। মানুষটি সেই তারের সঙ্গে আনা ফোনটিকে জুড়ে দিলেন। তারপর সেটিকে বসিয়ে দিলেন খালি তাকটির ওপর। পায়ের আঙ্গুলে ভর করে উঁচু হয়ে জিনিসটিকে দেখার চেষ্টা করলাম। মহিষের মাথায় যেখানে নাক থাকার কথা সেখানে গোল একটি চাকতি। নিরেট; কোন ফাঁকফোকর নেই। যেখানে শিং থাকার কথা সেখানে আড়াআড়ি বসানো একটি হাতল। হাতলের দু'পাশে সাঁটা দুটো গোলাকৃতি বস্তু। আম্মা বললেন এটার নাম রিসিভার। এটা তুলে এক মাথা কানে লাগিয়ে শুনতে হয় আর অন্যমাথা মুখের কাছে রেখে কথা বলতে হয়। ফোনের উপরে বসানো অবস্থায় রিসিভারটিকে দেখে আমার কাছে মনে হল মহিষের মাথায় ভাঁজ খাওয়া দু'টি কান। আমার নিস্তরঙ্গ একঘেঁয়ে জীবনে এই কালো টেলিফোনটি নূতন বৈচিত্র্য এনে দিল। ব্যাপারটার প্রভাব অল্প বয়সের উপর এত প্রকটভাবে পড়ে ছিল যে, অর্ধশতাব্দী পরে আজও সেই ফোনের নাম্বারটি আমার পরিষ্কার মনে আছে - ১০৫।

শুনলে বিশ্বাস করবেন না। এই টেলিফোন জিনিসটি নানান রকম চমকপ্রদ কাণ্ড করতে পারত। এর মধ্য দিয়ে দেখা যায়না ছোঁয়া যায়না এমন দূরের মানুষের কথা বলা ও শোনা যেত। টেলিফোনটি যে উচ্চতায় রাখা ছিল তাতে আমি নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা ভাল করে দেখতেও পারতাম না। আম্মা রিসিভার কানে লাগিয়ে যখন কথা বলতেন আমি পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। একদিন তো তিনি আমাকে

কোলে তুলে নিয়ে আব্বার সাথে কথাই বলিয়ে দিলেন। আব্বা তখন আমাদের থেকে বহুদূরে। অফিসের কাজে ঢাকায়। আমার মনে হল পুরো ঘটনাটি একটি ম্যাজিক! কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও অনেক বাকী। টেলিফোনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে করতে একদিন খেয়াল করলাম এর ভেতরে কোন এক অত্যাশ্চর্য মানুষ বসে থাকে। তার নাম, ইনকুরী। ইনকুরী নামের এই মহিলাটির ব্যাপার-স্যাপার দেখে বুঝলাম তিনি জানেন না এমন কোন কিছু এই পৃথিবীতে নেই। আম্মা বা আব্বা যখনই অন্য কারো ফোন নাম্বার জানতে চান সে ঠাস করে সেটা বলে দেয়। বাসার ঘড়ি কোন কারণে গণ্ডগোল করলে, আম্মা রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করেন, ক'টা বাজে? ইনকুরী সেটাও একদম ঠিক ঠিক বলে দেয়। একবার ট্রেনে করে আমাদের বাড়িতে নানী বেড়াতে আসবেন। আম্মা ফোন তুলে ইনকুরীকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই ট্রেন কখন আসবে? অদ্ভুতকাণ্ড! ইনকুরী ঠিক ঠিক বলে দিল সময়টা। আমার মনে হতে লাগল, টেলিফোনের ভেতর নিশ্চয় আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের মত কেউ থাকে, যে যেকোন অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারে।

আচমকাই আমার একদিন সেই দৈত্যের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। কিভাবে সেটা বলি। একদিন দুপুরে ছোটবোনটিকে নিয়ে আম্মা গিয়েছেন স্কুল থেকে বুবুকে আনতে। সংগে যাওয়ার জন্যে আমি অনেক অনুনয় বিনয় করেও তার মন গলাতে পারলাম না। নিরাশ হয়ে বাড়ির সামনে থেকে উপরের বারান্দায় ফিরে আসছি। হতাশা আর রাগে পাথরের একটা ছোট টুকরোয় লাথি দিতে দিতে ইটের খোয়া বিছানো পথ ধরে সিঁড়ির দিকে ছুটছিলাম। কেমন করে যেন পা হড়কে রাস্তায় পড়ে গেলাম। হাফপ্যান্ট পরা খোলা হাঁটুর অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়ে সেটা থেকে রক্ত বেরুতে শুরু করল। গোঙাতে গোঙাতে কোন মতে উপরে এলাম। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সেটা করে কী লাভ? বাড়িতে কেউ নেই কাঁদলে শুনবেটা কে? এদিকে যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। কি করি, কি করি? হঠাৎ মনে হল আরে একজন তো আছে - ইনকুরী। বারান্দার একপাশ থেকে টেনে বেতের মোড়াটি নিয়ে এলাম ফোনের তাকের সামনে। ওটার ওপরে ওঠে দাঁড়াতেই হাতের নাগালে চলে এলো টেলিফোন ইনকুরী। ওপাশ থেকে স্নিগ্ধ ঝরঝরে মেয়েলিকণ্ঠ শোনা গেল, "জি, বলুন কি জানতে চান?"

আমি কান্না জড়ানো গলায় বললাম, "পড়ে গিয়ে আমার পা কেটে ফেলেছি।" শেষমেশ কথাটা কাউকে শোনাতে পেরে এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা চোখের পানি ঝরঝর করে আমার গাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

"তোমার মা কোথায়?"

'বুবুকে আনতে স্কুলে গিয়েছে, বাড়িতে কেউ নেই, উ... উ... উ!"

"রক্ত পড়ছে?"

'হ্যাঁ! উ... উ... উ!"

"বাড়িতে ডেটল আর তুলা আছে?"

"আছে, কিন্তু কোথায় জানিনা; উ... উ... উ...!"

“হুম! বাড়িতে গেন্দাফুলের গাছ আছে?”

“আছে; উ... উ... উ!”

“তাহলে যাও, ওটা থেকে পাতা ছিঁড়ে হাতে ডলে নরম করে নাও। তারপর ওগুলো কাটা জায়গায় চেপে ধর। দেখবে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে আর ব্যথাও কমে যাচ্ছে। পারবে না?”

“পারব; উ... উ... উ!”

“আর একটি কথা, কান্না বন্ধ কর। এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একদম কান্নাকাটি না।”

“জি আচ্ছা; উ... উ... উ...!”

ইনকুরীর দেয়া টোটকাটি চমৎকার কাজ দিল। সেই মূহুর্ত থেকেই আমি তার ভক্ত হয়ে পড়লাম। দুপুরে আম্মা ঘুমিয়ে পড়লেই আমি প্রতিদিন ইনকুরী নামের পরিটিকে টেলিফোন করি। টেলিফোনের ভেতরে ওটাতো দৈত্য নয়, এমন মিহি মেয়েলি গলা, এটা নির্ঘাত একটি পরি। আমি একেকদিন তাঁকে একেক প্রশ্ন করি। আব্বা অফিসের কাজে গেলেন বরিশাল। “ইনকুরী, বরিশাল জায়গাটি কোথায়?”

“কেন?”

“আব্বা সেখানে গিয়েছেন।”

“ও! আকাশে কোন দিকটায় সূর্য ওঠে জানো?”

‘হ্যাঁ!”

“সূর্য যেদিকে ওঠে ভোরবেলা সেদিকে মুখ করে যদি হাঁটতে থাক অনেক দূর যাবার পর ডানে মোড় নিতে হবে। তারপর হাটতেই থাকবে, হাটতেই থাকবে, দেখবে এক সময় বরিশালে পৌঁছে গেছ। কিন্তু, খুব সাবধান, যদি দেখ হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের কিনারায় চলে এসেছ বুঝবে বরিশাল পেরিয়ে চলে এসেছ। ঘুরে তখন পেছন দিকে ফিরতে হবে। ঠিক আছে?”

“জি, ঠিক আছে।”

“যাবার সময় মাকে বলে যেও কিন্তু, মা তোমাকে না পেয়ে শেষে চিন্তায় পড়ে যাবে।”

“কেন, মা ফোন তুলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো তুমি বলে দিতে পারবে। তুমি তো সবই জান।”

“তাইতো। আমি সেটা ভুলেই গিয়ে ছিলাম।”

আরও একদিন ইনকুরীকে জিগ্যেস করলাম, “আচ্ছা স্কুল কেমন করে ইংরেজিতে বানান করে?’

“এস-সি-এইচ- ডাবল ও-এল। কেন বলতো?”

“আমি স্কুলে যেতে চাই। আব্বা বলেছে যেদিন ইংরেজিতে স্কুল বানান করতে পারব সেদিন স্কুলে ভর্তি করে দেবে।”

“বাহ, তুমি স্কুলে চলে গেলে আমি কার সাথে কথা বলব?”

"তাইতো! ঠিক আছে তাহলে স্কুলে যাবনা।"

"আরে না, আমি এমনি এমনি বলছি। স্কুলে তোমাকে যেতেই হবে। না হলে বড় হবে কি করে?"

কিছু না কিছু জিগ্যেস করতে আমি রোজই ইনকুরীকে ফোন করতাম। একদিন সে আমাকে পদ্মা নামের একটি নদীর কথা শোনাল। এই টেলিফোনের ভেতরে বসবাস শুরু করার আগে নাকি সে সেখানেই থাকত। পদ্মা, এক বিশাল নদী, একপাড়ে দাঁড়ালে অন্যপাড় দেখা যায়না। তার বুকে বয়ে যায় কতশত স্টিমার, লঞ্চ, বজরা আর খেয়ানৌকা। মাঝে ভেসে ওঠা ধুধু বালুচরে ছুটে বেড়ায় দুরন্ত বালকের দল। আমাকে বলত, বড় হলে একদিন দেখে এসো পদ্মানদী। 'যাব, নিশ্চয় যাব!'

আমাদের মালী বাড়ির পেছন থেকে একবার একটি কাঠবেড়ালি ধরে নিয়ে এল। আমার হাতে সেটা দিয়ে বলল, "এটাকে পালতে চাও বাবু?" আমি জানতে চাইলাম, "খাওয়াব কি?" মালী বলল, "কি জানি, কিছু একটা খাইয়ে দিও।" উত্তরটা পছন্দ হলনা। ইনকুরীকে জিগ্যেস করলাম, 'কাঠবেড়ালি কি খায়?'

"পেয়ারা।"

আমাদের বাড়িতে একটা পোষা ময়না পাখি ছিল। খাঁচার ভেতর বসে দিনভর সে শিষ দিয়ে গান গাইত। বলা নেই, কয়া নেই, একদিন সে মরে গেল। আমার খুব মন খারাপ হল। সারাদিন কিছু খেলাম না, খেললামও না। চুপচাপ বারান্দার এককোণে বসে রইলাম। ইনকুরীকেও সেদিন আর ফোন করতে ইচ্ছে হলনা। পরেরদিন কিছুটা সামলে নেয়ার পর ইনকুরীকে ফোন করলাম। "কি কাল কথা বললে না যে?"

"আমার খুব মন খারাপ ছিল।"

"কেন?"

"আমাদের পোষা ময়নাটা মরে গেছে।"

আমার ছোট্ট মনটাকে এই ময়নার মৃত্যু যে কতটুকু নাড়া দিয়ে গেছে সেটা ইনকুরী বুঝতে পারল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বলল, "বাবু, এই পৃথিবীর বাইরে মন ভরে গান গাওয়ার জন্যে আরও একটি সুন্দর পৃথিবী রয়েছে। তুমি আমি সবাই একদিন সেখানে যাব।"

"সত্যি কবে? ওখানে গেলে তোমাকে দেখতে পাব?"

"হ্যাঁ!" তবে সেখানে যেতে তোমার এখনও অনেক বাকি। তোমার ময়না সেখানে গেছে আর মনের আনন্দে গান গাইছে" কথাটা শুনে আমার মনে হল আমাদের ময়না পাখিটি, ছায়াঘেরা সবুজ একটি বাগানে উড়ে উড়ে গান গাইছে। আমার মন অনেকখানি শান্ত হয়ে এলো।

এভাবে চমৎকার কাটছিল। এরই মাঝে অবশ্য একটি ভয়ংকর ঘটনাও ঘটল। একদিন আমি ইনকুরীর সাথে কথা বলছি। হঠাৎ ঘাড় ফেরাতে দেখি, দরজার পাশে আম্মা দাঁড়িয়ে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আমি ধরা পড়ে এমন চমকে উঠলাম যে, হাতের রিসিভারসহ মোড়া নিয়ে উল্টে একদম পপাত ধরণীতল। আম্মা

ছুটে এসে আমাকে ওঠালেন। "ব্যথা পেয়েছিস?" আমার কানে সে কথা গেলনা। আমি আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। পড়ার সময় রিসিভারটির তার ফোন থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে এসেছে। আমি কানে লাগিয়ে বলতে থাকলাম, "ইনকুরী, ইনকুরী?" ওপাশ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। আমি জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলাম। আম্মা ভাবলেন, টেলিফোন নষ্ট করেছি বলে বকা খাওয়ার ভয়ে কাঁদছি। আমি কাঁদছিলাম আমি ইনকুরী নামের পরিটিকে মেরে ফেলেছি এই ভয়ে। পরদিন টেলিফোন কোম্পানি থেকে লোক এলো; তার জোড়া লাগিয়ে দেয়ার পর আম্মাকে কেয়ার না করে সোজা ইনকুরীকে চাইলাম। তার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তিন বছর পর আমার বয়েস যখন সাত তখন আব্বা বদলী হয়ে ঢাকা চলে এলেন। সেখানে বাসায় অন্যরকমের একটি টেলিফোন। বাদামী রঙের আরও খানিক হালকা পাতলা একটি যন্ত্র। সেটারও পরে গোল ছিদ্রওয়ালা একটা চাকতি। গোটা কয়েক বার সেটাকে এপাশ থেকে ওপাশে ঘোরালে অন্যদিকের সাড়া পাওয়া যায়। ফোন তুলে ইনকুরীকে চাইলাম, কেউ কথা বললো না। তীক্ষ্ণ টানা একটি ধাতব শব্দ আমার কান স্তব্ধ করে দিল।

বয়স বাড়তে আমি ধীরে ধীরে ইনকুরীর রহস্যটি বুঝতে শুরু করলাম। তারপরও আমার ছোটবেলার বন্ধু ইনকুরী যে একজন রক্তমাংসের মানুষ সেটা আমার মন কিছুতেই মানতে চাইত না। তার মায়াময় মিষ্টি কণ্ঠ আমার কানে ফিরে ফিরে ঘুরত সারাটি ক্ষণ। জীবনের প্রতিটি সঙ্কট মুহূর্তে আমি হাতড়ে বেড়াতাম সেই নির্ভরতা যা আমার ছেলেবেলায় ইনকুরী নামের এক বিস্ময়কর পরি অবিরাম যুগিয়ে গেছে।

কুড়িবছর কেটে গেল। অফিসের কাজে খুলনা যাচ্ছি। সেখানে তিন মাসের ট্রেনিং। যশোর এয়ারপোর্টে নেমে অপেক্ষা করছি অফিসের গাড়ির। খুলনা থেকে গাড়ি আসার কথা আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু গাড়ি নেই। হাতের ঘড়ির দিকে একবার আর সামনের রাস্তার দিকে একবার করে তাকাচ্ছি। মনে হল খুলনার অফিসে খোঁজ নেয়া দরকার, কি হল? এয়ারপোর্টের ভেতরে সোনালী ব্যাঙ্কের একটি ছোট শাখা। ওদের বললে কি টেলিফোন করতে দেবে? ম্যানেজারকে বলতেই তিনি টেলিফোন এগিয়ে দিলেন। কিন্তু, খুলনা অফিসের নাম্বার যে জানিনা। ম্যানেজার পরামর্শ দিলেন, ইনকুয়্যারিতে ফোন করে জেনে নিন। আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ইনকুরী... যশোর। যদি...............! রোটারি ডায়ালে জিরো নাম্বারটি শেষ মাথা পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনতেই একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। ওপাশ থেকে ভেসে এলো একটি মিহি পরিষ্কার কণ্ঠ যা আমার সারাজীবনের চেনা। 'কি জানতে চাইছেন?' সাতপাঁচ না ভেবেই বলে বসলাম, "স্কুলশব্দটি ইংরেজিতে কিভাবে বানান করে?" ওপাশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল । তারপর, নরম গলায় প্রশ্ন এলো, "তোমার হাঁটু যে ছড়ে গিয়েছিলো সেটা কি পুরোপুরি ভাল হয়েছে?"

আমি আনন্দে আমার পারিপার্শ্বিক, অবস্থান ভুলে গেলাম, "ইনকুরী তুমি? সত্যি, এটা তুমি? মাইগড! শোন, সুযোগ যখন পেয়েছি, আগেই বলে নেই, আমার জীবনে

তোমার একটা স্থায়ী অবস্থান হয়ে আছে। এটা আমি তোমাকে সেই কবে থেকে বলতে চাইছি। কেমন করে আজকে সুযোগ এসে গেল।”

“আহ! বাবু, তাহলে আমিও বলি, যা সেই বয়েসে তোমাকে বলা যেতনা। আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। একটা বাচ্চার জন্যে আমি সেই সময় পাগল হয়ে ছিলাম। তুমি হয়ত জাননা, তোমার ফোনের জন্যে কি অধীর আগ্রহে আমি প্রত্যেকটি দিন অপেক্ষায় থাকতাম। অদ্ভুত, না?”

অদ্ভুত? হয়ত, অন্য সবার কাছে। কিন্তু, আমার জন্যে এটি অসম্ভব সুখকর একটা স্মৃতি। হড়বড় করে তাঁকে এটা আর অন্য আরও কত কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু সেই চার বছর বয়েসের মত কিছুই গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কথা বলতে গিয়ে বারবার আমার গলা ধরে আসছিল। কোন মতে বললাম, “গত কুড়িটা বছরে এমন একটিও দিন যায়নি যখন আপনার কথা আমি ভাবিনি। অফিসের কাজে খুলনা যাচ্ছি; তিনমাস পর আবার যশোর হয়ে ফিরব। পরের বার এলে কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি?''

“প্লিজ, প্লিজ করো। এখানে ফোন করলেই আমাকে পাবে। তখন বলে দেব কোথায় দেখা হবে। অন্য কেউ ধরলে, বল, মাজেদা বেগমকে চাইছ।''

আমি বললাম, ‘খোদা হাফেজ মাজেদা আন্টি।’ আন্টি ডাকটা নিজের কানেই অদ্ভুত লাগল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেই ছোটবেলার মত তাঁকে ইনকুরী বলেই ডাকি। বললাম, “আজকাল কোথাও আর কাঠবেড়ালি দেখিনা। দেখলে ওদের পেয়ারা খেতে বলতাম।'' ওপাশ থেকে হাসির শব্দ এলো, “বলো, পদ্মানদীটি দেখতে গিয়েছিলে?''

ঠিক তিনমাস পর। খুলনা থেকে ফেরার পথে অফিসের গাড়ি যশোর এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়েছে। হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় নিয়ে এসেছি, ইনকুরীর সাথে দেখা করতে হবে। ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে সোজা এগিয়ে গেলাম সোনালী ব্যাংকের দিকে। এখান থেকে ফোন করে ইনকুরীর ঠিকানা নিয়ে দেখা করতে যাব। ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাকে দেখে চিনলেন। গেলবারে টেলিফোনে আমাদের কথাবার্তা শুনে ভদ্রলোক আমাকে সহজে ছেড়ে দেননি। এক কাপ চা খাইয়ে ইনকুরীর পুরো গল্পটি আদায় করে নিয়ে ছিলেন। বসতে বলে তিনি সহাস্যে টেলিফোনটি এগিয়ে দিলেন। আমি জিরো ঘুরিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। কয়েকমুহূর্ত পর ওপাশ থেকে এক রমণীর কণ্ঠ ভেসে এলো, “কি জানতে চাইছেন বলুন?” আমি বললাম, “আমি কি একটু মাজেদা বেগমের সাথে কথা বলতে পারি?”

“আপনি কে?”

“তার একজন পরিচিত মানুষ!”

“আপনি কি তাহলে শোনেন নি?”

“কি?’

“মাজেদা আপা গতকয়েক বছর ধরে অনিয়মিতভাবে কাজ করছিলেন। শরীরটা অনেক দিন ধরে ভালো যাচ্ছিল না। অবশেষে তিনি আজ এগারো দিন হয় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।''

আমি কি বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ধরা গলায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে কথা শেষ করতে যাব, তিনি বললেন, “কি যেন বললেন আপনার নাম?”

“নাম তো বলিনি; তবে, আপনি জানতে চাইলে বলি, আমার নাম বাবু।''

“মাজেদা আপা আপনার জন্যে একটা ছোট চিঠি রেখে গিয়েছেন।''

“কি লেখা আছে সেটায়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম বটে কিন্তু আমার মন বলছিল, সেটায় কি লেখা আছে তা আমি জানি।

“আমি তো খুলে পড়িনি।“

“দয়া করে একটু পড়ে শোনাবেন?”

“পড়ছি; মাজেদা আপা আপনাকে লিখেছেন- ‘প্রিয় বাবু, তোমার মনে আছে, বলেছিলাম, এইপৃথিবীর বাইরে আরও একটি সুন্দর পৃথিবী রয়েছে। এখানে তো দেখা হলনা। হয়তো সেখানেই দেখা হবে একদিন।'''

(পল ভিলার্ডের “দ্য ব্ল্যাক টেলিফোন” গল্পটির ছায়া অবলম্বনে লেখা।)

স্টার্লিং, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আনোয়ার শাহাদাত

কদমফুলতলীর হাট

সপ্তাহান্তরে হাটে কখনো ঘন বরিষণ দিনগুলোতে আমার বাবা কচু বা কচুশাক বিক্রি করত এক সময়। এ নিয়ে তার একটা বিরাগ ও মনকষ্ট থাকতে পারে বলে ধারণা করি, আবার তা নাও হতে পারে, হয়তো কোন অনুভূতিই ছিলনা সে নিয়ে। হাটে যখন তাকে কেউ এই বলে ডাকত যে ওই 'কচু-ওয়ালা', বাবা তখন বলত, "আরে কচু-ওয়ালা কও ক্যা, চোখে দ্যাখ না এইগুলা যে কচুশাক, কচু না, কচুর শাক"। এর গুঢ়ার্থ বোঝার সামর্থ আমার বয়সের কারণেই কম ছিল, ফলে প্রথমে বুঝতাম না 'কচু-ওয়ালা' কিংবা 'কচুশাকওয়ালা' ডাকলে এমন তফাৎ কী? হাটের দিনের আগের সন্ধ্যায়, আমাদের বাড়ির শ্রাবণের ভরা নিচু ভূমির জলে-ডোবা ভিটা হতে যখন বাবা প্রায় ডুবিয়ে কচুশাক তুলতো, পরেরদিন হাটে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে, তখন তার ওইমত কান্ডে মা বলত "কচুর লগে আবার পাতাগুলা লয় ক্যা, পানিকচুর পাতা কেডা খায়, বোঝা বাড়াইয়া লাভ কী?" বাবা উত্তর করত-"কচুর মুড়ার লগে পাতা লইলে তা আর বেচবার জন্য কচু থাকে না, তা হয় 'কচুশাক'"।

বাবা নিজে বিবেচিত হতো 'বোকার-হদ্দ' যে ধারণা, সেই মতন লোক, মা তুলনায় তার চাইতেও বেশি বোকা; তো মা বোকা বিবেচনা ক্ষমতায়, সেই 'কচু ও কচুশাক'এর তফাৎ অথবা তার বিষদ ব্যাখ্যার বিষয় সম্বন্ধে কী বুঝত কে জানে, যদিও ততদিনে আমি এর তফাৎ বুঝতাম ও জানতাম, এবং সত্য হচ্ছে যে, তখনও আমার সে বিষয়ে বোঝার বা জানবার যে বয়স হয়নি সেটাই তর্ক নতুবা গল্পের খাতিরে এখন ধরে নেয়া ভাল। তবে- কী উদ্দেশ্যে বাবা পানিকচুর মুড়া বেচতে গিয়ে সঙ্গে পাতা নিচ্ছে সে সম্পর্কে ভাবতাম মা'কে কখনো বুঝিয়ে বলব যে- কী হেতু বাবা কচু নিয়ে বাড়তি কাজ করে থাকে 'শাক' ও 'মুড়া' প্রসঙ্গে। যেহেতু আমি বাবার সঙ্গে হাটে যেতাম, সে সুবাদে আমার দেখার সুযোগ হত, বাবা কেমন করে তাকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'কচুশাক-ওয়ালা'ডাক প্রত্যাশা করত, 'কচু-ওয়ালা' শোনার চাইতে। এটা আমি নিজে বুঝলেও মাকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। কারণ ভাল করে কথা বলায় আমার অসুবিধা ছিল। অর্থাৎ, দীর্ঘ কোন বাক্য শেষ করতে গেলে আমার বাক ক্ষমতা রুদ্ধ হয়ে যেত, বিশেষ করে যদি কিছু বুঝিয়ে বলতে চাইতাম। কোনও বাক্য সম্পুর্ন করতে চাইলেই এ সমস্যা হতো। 'হা', 'না', 'জানিনা', 'বলব', 'যাই', 'আসি', এ রকমসব গুটিকয়েক শব্দসহ আরও কিছু শব্দের দক্ষিণ বরিশালের উচ্চারণে বলতে পারতাম। লোকজন বলত "এইডা হইল

যাইয়া অর বাফ-মায়ের অবোধ পোলা, কথা কয় না, কইতে পারেও না"। সেই কথা না বলতে পারা, অবোধ কাল সময়ে যখন হাটে একদিন বাবাকে একজন এসে বলল, "ও 'কচু-মেয়া'", বাবা তর উত্তরে যৎসামান্য থেমে থেকে বলে, "কী হইছে? কী হইছে? মোর নাম নাই? এরপর কচুর পাতাগুলোর দিকে তার হাতখানা ধরে বলে, "এইগুলা কী? এইগুলা কী শাক না? কচুর শাক"। ওই লোক তারপর আরও যোগ দেয়; বলে, "আরে 'কচুর-পো-কচু', ব্যাচো কচু, আবার গলায় হাঁক দিয়া কথা!"

আমি স্বভাবতই পাশে দাঁড়ানো, বাবার দিকে তাকিয়ে থাকি, দেখতে চাই তারপর বাবা কী করে। আমি অনুভব করতে পারি, বাবা যুক্তিহীন মারমুখী লোকটিকে কিছু অন্তত ফিরিয়ে বলতে চায়, তাকে কচুওয়ালা বলবার উত্তরে, কিন্তু সে বলতে সক্ষম হয়না, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নীরব, শুধু তাকিয়েই থাকে, তাকিয়েই ছিল। আমি বাবার ওরকম তাকানো দেখে ভেবে রাখি- মাকে বলব, "মা, বাবা তো দেখি আমার মতনই, কথা বলতে পারে না"। যদিও সে কথাও বলতে পারিনা মা'কে, কেনো না আমার তখনও গুছিয়ে বলার দক্ষতা হয়নি। এমন কী এও ভেবে রেখেছিলাম যে, মাকে বলব- 'মা সে মুহুর্তে বাবার চোখটা দেখতে কেমন যেন লেগেছিল'। সে চোখ প্রকৃতপক্ষে কেমন লেগেছিল বা তার কারণ সে সবের কোন ব্যাখ্যা যথারীতি জানা ছিল না। তারও অনেক বছর পর জেনেছিলাম বাবার অমন নির্ভিক তাকিয়ে থাকাকে 'নির্বাক অসহায় তাকানো' বলা যেতে পারে। যেহেতু তার চোখ দেখতে অত্যন্ত সুন্দর তাই এ উপমাও যুতসই হবে- 'সুন্দর চোখের নির্বাক তাকানো'। অমন ভাবে তাকানোর সকল অর্থ লয়ে হয়ত বাবা বলতে চেয়েছিল 'কচুওয়ালা না ডেকে কচুশাকওয়ালা ডাকতে পার না'? বড়জোর এটুকুই বলতে চাওয়ার ছিল, হয়ত এইটুকুই চাওয়াও। এই যৎসামান্য যৌক্তিক চাওয়ার কারণ সম্ভবত হাটে-ঘাটে তার মর্যাদার অনুমাত্র সন্তুষ্টি খোঁজা, হয়তো বাড়তি খানিকটা সন্মান অর্জনেরও চেষ্টা ছিল!

এসব কিছুর পর এক পর্যায়ে আমি ঢাকায় আসি, এক সাহেবের দপ্তরে চা-নাস্তা দেয়ার কাজে যোগ দেই। পরে জেনেছিলাম সেটা একটা সংবাদপত্রের কার্যালয়। পেশা ভিত্তিক পরিচিতিতে ঠিক 'কাজের-ছেলে' না, সম্পাদকের 'অফিস কক্ষের সহকারী'। এও অবগত হলাম উক্ত দপ্তরের সবাই সাংবাদিক, তারা অতিশয় বড় মানুষজন, অধিকন্ত ভাল মানুষ, তাই আমাকে 'কাজের-ছেলে' বা 'কাজের-লোক' না ডেকে, 'অফিস-সহকারী' সম্বোধনে ডাকত, আসলে ডাকত কী? বলত। একদিন সম্পাদক স্যারের ঘরে দু'জন অতিথি এসেছেন, তাদের জন্য সিঙ্গারা, চা সহ স্যারের কক্ষে গেছি, উপস্থিত অতিথি-দ্বয়ের একজন ছিলেন নারী, পরে জেনেছি বর্ননায় এহেন নারীকে 'অপরূপ সুন্দরী' পরিভাষায় বর্ণনা করা যায়, যার পরনে জিনসের প্যান্ট ও ছেলেদের মতন শার্ট। সেই প্রথম কোন নারীকে এমন পোষাকে আমার দেখা, তিনি সম্পাদক স্যারকে বললেন, "আপনাদের অফিসের কাজের ছেলেটির দেখি অপূর্ব চোখ! দেখি দেখি", তিনি এই বলে হাতের ইঙ্গিতে যেন আমাকে দাঁড়াতে বললেন, যখন আমি টেবিলে চায়ের কাপ, সিঙ্গারার প্লেট রেখে ফিরে যাচ্ছিলাম। সম্পাদক স্যার যখন সে

কথার উত্তরে বলছেন যে, 'হ্যাঁ ও আমাদের অফিস সহকারী', যখন টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বাম হাতে ট্রে-টা ধরে বুকের উপর রেখে ডান হাতের আঙ্গুল চোখের দিকে রেখে বলতে পেরেছিলাম "বাবার মতন", এরপর কেঁদে ফেললাম। প্রকৃত অর্থে বলতে চেয়েছিলাম, "আমার চোখ হচ্ছে বাবার মতন", তা আর বলতে পারলাম না। সে সময় অনেকদিন পর আবারো অনুভব করলাম আমি কার্যত তখনো কথা বলতে পারি না। ভদ্র মহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এরপর ইংরেজিতে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে নাকি 'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি, দুঃখিত' ইত্যাদি। আমি অচিন ভাষার কথার অর্থ না বুঝতে পারলেও যেভাবে তিনি বুকে নিয়েছিলেন তাতে মানুষটির অন্তর উপলব্ধি করায় অসুবিধা হয়নি, কেননা ভাব প্রকাশ করতে না পারার ব্যর্থতার চলাকালে সেভাবে মা ছাড়া অন্য কেউ এমন ভাবে নেয়নি কোনদিন। সম্পাদক স্যার বললেন, "গত মাসে ছেলেটির বাবা মরে গেছে, সে কারণে মনটা নরম আছে। বললাম যা, গ্রামে যা, ঘুরে আয়। ওর ভিন্ন কথা, ওর নাকি মৃত্যু, কবর এমন সব পছন্দ নয়, মা মরেছে নাকি তারও আগে"। আমি শুন্য ট্রে হাতে স্যারের কক্ষ হতে বেরিয়ে আসি তখন। পরে শুনেছি, কে যেন আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল সেই ভদ্র মহিলা হলো আমেরিকা ফেরত উচ্চ শিক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

এরও অনেকপরে দু'একবার ভেবেছি সেই মহিলাকে, জিনস্ পরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেন্সের চশমা পরা, জামার হাতা গুটানো সম্পাদক স্যার, এদের খুঁজব, সে আর হয়না। যেসব জায়গায় আমার অভিজ্ঞতায় একদা সামান্যতমও আদর ভালবাসার ছোঁয়া থাকবে সেসবে কস্মিনকালেও আমার ফিরে যাওয়া হয়না, তা কখনোই না।

সেই- সে-ক্ষণে বাবার কচুর শাক বিষয়ে দেখা অসহায় চোখ, যা কিনা সন্তান হিসাবে আমাকে তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছিল, যেখানে হাটের অতি পরিচিত 'ল্যাংড়া-খোঁড়া-ভিক্ষুক', যাকে সবাই 'মরা' ডাকত, তো 'মরা' আমার উদ্দেশ্যে বলে, "ও ব্যাডা, বেপারীর পো, তোমার বাপরে মানুষেরা ভণ্ড কথা কয়, তুমিও তো দুইডা খামার-গালি দিতে পারো?"। 'মরা-ভিক্ষুক'এর কথা শুনে যেন বাবা ভাষা ফিরে পায়, ভিক্ষুককে বলে, "না মিতা, বেপারির পো, যার ঠিক মতন জবান নাই, হে দেবে আবার গালি। হ্যার যেন মানুষরে কটুকথা কওনের ক্ষেমতা নাই হয়"। বাবা 'মরা'কে 'মিতা' সম্বোধন করত, যেহেতু তাদের দু'জনের অভিন্ন নাম। আমি খোঁড়ার কথা শুনি আর কাদা খোঁচাতে থাকি পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে, একই সময়ে মনে-মনে বাবাকে কষ্ট দেয়া লোকটিকে অবিরাম গালাগাল দিতে থাকি। আমি মনে-মনে যে কারো চাইতে ভাল এবং বেশি গালাগাল দিতে পারতাম। এত ভালভাবেই অনুচ্চারিত গালিগালাজ চালাতে পারতাম যেন আমি মনের গভীরে গালাগালির এক অসীম খনি। গালাগাল-সম্রাট! এ সময়ে বাবা কাছে এসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, 'এরে বাজান, যাবি এখন আউখের মিডা দিয়া রুডি খাইতে'। এর পর বাবা ল্যাংড়া ভিক্ষুকের সঙ্গে বলে, "এই আডার রুটি আর মিডার লোভ দেখাইয়াই তো সঙ্গে আনি, আসতে যাইতে নাওয়ের পানি সেচে, এই সব্জি হাটে

শাকের পাশে একটু লাগলে খাঁড়ায়, কত সাহায্য হয়"। হ্যাঁ, সেটা বাবার একটি ধারণা যে, আমি সামান্য আঁখের মিঠা মিশিয়ে মাঝ-হাটে পচে যাওয়া নাড়ার বাছারী সংলগ্ন ছাপরায় রুটি খাবার লোভে হাটে আসি, নৌকার পানি সেচি, কী ফিরতি কচুশাকের পাঁজা আনতে গেলে আমি বাকী কচুশাক পাহারা দেই। আসলে এসব কোন ব্যাপার না, আমার মনে হত বাবার সঙ্গে থাকাটাই করনীয়, সঙ্গে ছোট্টসব কাজগুলো খারাপ লাগত না।

বাবার কষ্ট হচ্ছিল কী? যখন কিনা তাকে কেহ একব্যাক্তি "কচুর পো কচু" বলে গালি দিল, না কী ল্যাংড়া খয়রাতির কথায় যখন তাকে এ উত্তর দিতে হলও যে, "যে ছেলের জবান নাই, সে দেবে আবার গালি" কেননা একথা বলবার পরই এসে সেদিন আমার পিঠে যেনবা অসহায় হাত রেখে, আদর করে ওই আটার রুটি খাওয়াতে চাইল আখের মিঠা দিয়া। কেননা আমি তো জানি, হতে পারে এ ধারণা তার ছিল, আমি যে বাবার সকল কাজে থাকি তা ওই আঁখের মিঠায় মাখিয়ে হলুদ বর্ণের আটার রুটি খেতে পারবো সেই লোভে। বাবা যে এমতন ভাবত আমাকে নিয়ে এ ধারণাও ভুল হতে পারে।

এভাবে শুনে থেকেছি, আমার দাদা তার বাবার কাছ হতে এই নিচু ভিটা পেয়েছিলেন, যা কচুর ভিটা নামে খ্যাত, কেনোনা এদের ভাইদের মধ্যে আবার তিনিই ছিলেন বোকা, যথারীতি বোকা নিয়মে কচু-ভুমি দাদার ভাগে পড়েছিল। সম নিয়মে অর্থাৎ বোকা, কী সরল-সোজা শর্তের ধারাবাহিকতায় বাবা উপরোক্ত ভূমির উত্তরাধিকার হয়, যেখানে শ্রাবণ ও ভাদ্রে কচু ছাড়া অন্য কোন ফসলাদি বা ফলন হয়না, শুধু পানিকচু, কচুক্ষেত, পানি কচুর ক্ষেত!

এক বছর এত পরিমান কচু তরকারী খেয়েছি যে তা এখনও মনে আছে, অধিকন্তু সে স্মৃতি কোনদিনই ভোলবার নয়। ক্ষেতের উৎপন্ন কচুতে পোষায়নি, বন-কচুও খেতে হয়েছে। সেবার কচুর ফলনও ভাল ছিলনা, উত্তরের উজান হতে পাহাড়ি ঢলের জলে বন্যা নেমেছিল এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল সাগর থেকে আসা নোনা জল, কচুরা মরে গিয়েছিল দীর্ঘদিন বেশি জলে ডুবে থাকতে হলো বলে। আমার বয়স সাত-আট হবে সে সময়ে, যতদূর বুঝি। কেবল মরিচের সঙ্গে নুন সহকারে কচুর সিদ্ধ-রান্না হতো, তরকারী রান্নার উপকরণ সমূহের তেল, হলুদ, মরিচ সহ অন্যান্য কিছু কেনার সামর্থ্য আমাদের সব গ্রাম সমূহে সে আমলে ছিলনা। ভাতের বদলেই সে কচু খেতে হত। ওই না খেয়ে থাকা, কচু খাওয়া ভুখা-কাল, এসবের জন্য দেখি বেবাক দোষ কতিপয় লোক 'দ্যাশ-স্বাধীন-এর উপর দিত। আমার বাবা, সুন্দর চোখের গুরুত্বহীন 'হালিয়া-চাষা' যার পরিচিতি, তাকে দেখি তার উপযোগী সোজা-সরল করে বলে, "ওরে মেয়ারা, কই কী, কই বোলে, দ্যাশ স্বাধীন হইলে পর, এই রহম এট্টু আধটু হইয়া থাকে, হইয়া থাকে মেয়ারা, সব ঠিক হইয়া যাইবে একদিন, অতি শিগগিরই, অতি সত্তর"। তার কথা হয়তো কেউ বিশ্বাস করে না, আমি করি, বাবাকে বিশ্বাস করে স্বপন দেখি- একদিন গরমভাতে, তেল, হলুদ মরিচে রান্না করা অন্যান্য তরকারী- ঝিঙ্গা, রেখা, কাঁকরোলে পুঁই-পাতা

দিয়ে, জোয়ারের জলে তুষের গোলায় বানানো চাড়া ফেলে খালে ধরা কাঁঠালি গোদা চিংড়ি ঝোলে ভাত খাব পেট-পুরে, গরুর দুধে কলা মেখে কী রওয়া পড়া খেজুরের মিঠায় পেট ভরে ভাত খাব, বাবার প্রত্যাশায় যেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, খুব শিগগিরই, অতি সত্তর, সেই স্বাধীনতার ফলন আসছে।

এরপর হয়ত নুনে কচুশাক, কচু'র লতা, কচু-মুড়া ও ভাতের-মাড় না খেয়ে থাকা কমে আসে, কিন্তু আমাদের সব গ্রাম সমূহে অভাব, দারিদ্র তেমন কমে না। আগের মতনই বাবার সাথে ফুলতলীর হাটে গেছি কচুশাক লয়ে। ফুটা নৌকায় কাদার-তালি তেমন কার্যকরি হয়না, অঝোরে পানি ওঠে, আমার সারা পথে কাজ- কখনো নারকেলের আইচায় নৌকার পানি সেচা, বৈঠা অথবা লগি ধরা, এমন করে উজান ঠেলে হাটে যাই। কচুশাক নিয়া সব্জির হাটে গেছি, বাবা প্রথম পাঁজা কচুশাক রেখে আমাকে দাড় করিয়ে দ্বিতীয় পাঁজা আনতে গেছে নৌকায়। তখন খেয়াল করলাম এক লোক তাড়াহুড়ায় হাটের এ মাথা থেকে ও মাথার দিকে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল কিছু একটা বলে, যার অর্থ আমি বুঝি না। তাকে আগেও হাটে দেখেছি, কিন্তু লোকটির দ্রুতগতিতে চলে যাওয়া, তেমন স্বাভাবিক মনে হলও না। ভাবলাম, বাবা দ্বিতীয়বার কচুশাক পাঁজা নিয়ে ফিরে এলে, তাকে বলব লোকটির অস্বাভাবিক হেটে যাওয়া সম্পর্কে, বাবা পরের কিস্তি কচুশাক পাঁজা সমেত ফিরলে আমি লোকটির ঐভাবে স্বাভাবিক নয় পা ফেলে যাওয়া প্রসঙ্গে যা বলতে চেয়েছিলাম তা বলতে পারি না। কেননা আমার পক্ষে অভিমত প্রকাশ কিংবা বুঝিয়ে বলবার দক্ষতা অসম্ভব।

বিকলাঙ্গ খয়রাতি সব্জির হাটেই দক্ষিণের কোনায় হোগলা বিছিয়ে সামনে পাতিয়ে রাখা মাটির শানকিতে কটা পয়সা ছড়িয়ে এক ধরনের আসন পেতে থাকে, গুনগুনিয়ে মোর্শেদি গান গায়, কখনো মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকাবে। শানকি পাতা বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক বাবার মিতা। তড়িৎ গতিতে অমন আধাদৌড়ানো লোকটিকে দেখে বাবার মিতা ভিখেরিও আমার মতনই অবাক ও কৌতুহলী নজর রেখেছিল। অস্বাভাবিক হেটে যাওয়া লোকটির অন্যদের সঙ্গে হওয়া কথাবার্তার ভেতরে হয়তো বাবার মিতা কিছু-একটা আঁচ করতে পেরেছিল। বাবা ফিরে এলে, আমি সে প্রসঙ্গে বলতে না পারলেও হয়ত বলতে চাই, ফলে, বলতে চাওয়া চেষ্টার অংশ অনুসারে আমি দুই দিকে তাকাই, অর্থাৎ বাবার দিকে এবং পূবে, যেদিকে লোকটি হেটে গ্যাছে সেই দিকে। বাবা তার ছেলেকে চেনে নিশ্চয়ই, এবং বুঝতে পারে তার ছেলের কিছু বলার আছে, অথচ বলতে পারছি না। বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক যখন কিনা ভিক্ষা পাত্র মাটির শানকি-মালসা উপুড় করেছে, কী জন্য তা করেছে কে জানে। মনে হচ্ছে সামান্য অস্থির। বাবা তার দৃষ্টি আকর্ষন করা যায় এমন করে বলে, "মিতা, কী ব্যাপারীর পো, উতলা লাগতেয়াচে ক্যান"? এমন ভঙ্গীতে বাবা এ কথাটি বলে, যেন অঙ্গহীন ভিখেরি'র এ প্রসঙ্গে কথা থাকলে সে এখন নিজের দিক হতে বলবে। বাবা বলেছে এ কারণে- যেহেতু সে জানে আমি কিছু-একটা বলতে চাচ্ছি অথচ বলতে পারছি না, সেটাই মিতার সঙ্গে খোঁজ নিয়ে দেখা। ল্যাংড়া খয়রাতি মাথা না তুলে, অন্যদিকে ফিরেই বলে যেতে থাকে, "এহন দেহি, সুস্থে খয়রাত কইর্যাও এই

দ্যাশে খাওন যাইবে না"। সুস্থে ভিক্ষা করেও এদেশে খাওয়া যাবে না ভিখেরীর এমন মন্তব্য শোনবার পর বাবা ধৈর্য ধরে মাটিতে সদ্য নৌকা হতে আনা কচুশাকের পাঁজা পা দিয়ে গোছাতে থাকে পায়ের লেপ্টানো কাদা সহ, আর অপেক্ষা করে তার মিতা ভিখেরি কী বলে তা শুনবার জন্য। বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক এরপর থামে ক'মুহূর্তের জন্য, আবার বলে, "মদন রেজাকার একখানা তাউরাস কইর্যা গেল এই খবর দিয়া যে, শ্যাখ সাইবের গুষ্টি শুদ্ধা খুন কইরা ফেলানো হইছে"। আমি বাবার দিকে তাকিয়ে থাকি, সে এক আর্তনাদের চিৎকার দিয়া ওঠে "কী কইলা, কী...?"। বাবাকে যেভাবে জানি, তাতে এরপর সে আরও কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারবে না। কার্যত বলতে সে আর পারেও না। যেহেতু তারও তেমন ভাবে বলবার ক্ষমতা নেই, ছেলে সেটাই পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। সামনে রাখা কচুশাকের পাঁজার উপর ধড়াস করে বাবা বসে পরে, বামহাত খানা ডান দিকের মাটিতে বিছিয়ে, মাথাটা ঝুঁকিয়ে, ডানহাত খানা বুকের উপর, ঘন শ্বাসে। হতে পারে ক'মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিল সঙ্গে আত্মজ রয়েছে, যে আত্মজ কিনা প্রায় বধির, প্রায় নির্বাক। তারপর বুকের উপরের ডানহাত সরিয়ে, আমার দিকে হাতখানা বাড়িয়ে, আমার সন্ত্রস্ত মুখের প্রতি চেয়ে, সে কিছু যেন বলতে চায় আমাকেই। মনে হয়, অন্তত সে যা বলতে চায় তা বোধহয় এরকমঃ 'আয়রে বাজান, আয় কাছে আয়, মুই ভাল আছি, ডরাইস না'। বাবা যে এমন সব সময়ে হতবাক থাকবে সে আমি আর আমার মা ছাড়া কেউ ভাল বলতে পারবে না, অবশ্য মোদের গ্রামের লোকেরাও সেটা জানে। বাবার নামে নাম তার মিতা ভিখেরি নিজের বিছানো হোগলায় আধা শোয়া অবস্থানের ভঙ্গি বদলায়ে উচ্চারন করে, "ওরে মিতা, বইয়া পরলা কেয়া? সামনে আরও কত কী আছে কেডা জানে, বইয়া পড়লে চলবে"? ঠিক তখনই একই পথে ফের মদন রেজাকার ফিরে আসে, হয়ত শুনতে পায় পঙ্গু ভিখিরির উচ্চারিত ওই বাক্য "বইয়া পরলা ক্যা..."। মদন রেজাকারের হয়ত বুঝতে অসুবিধা হয়না যে বাবা ওই শেখ সাহেব ও তার পরিবারের খুনের খবর শুনে বসে পরেছে। মদন রেজাকার হেটে এই দিকেই আসে, বাবার সাজানো কচুশাকের পাঁজায় লাথি দেয়, থুবড়ে সেই বসে থাকা বাবার কাঁধে দু'হাত দিয়ে নুয়ে ধাক্কা মেরে বলে, "কচুর পো কচু, খাঁড়াও, খাঁড়াও, এই খবরে বইয়া পরছ ক্যা?"। ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ে যাওয়া বাবা দুনিয়া-সেরা সুন্দর নয়নের চাউনিতে মদন রেজাকেরর দিকে চেয়ে থাকে। তখন বাবার মিতা পঙ্গু ভিখেরী তার মতন করে বলে, যাকে কিনা পরোক্ষ প্রতিবাদ হিসাবে নির্নায়ন করা যায়; "আরে মেয়া ক্ষেন্ত দেও, যাও যে কামে যাইতাছিলা, হেই কামে যাও, ও ব্যাডারে ধাক্কাইয়া লাভ কী"। মদন রেজাকার চলে যায়, যাওয়ার আগে অতিরিক্ত একটি লাথি সে দেয় নির্দোষ পড়ে থাকা জড় কচুশাকের পাঁজার উপর। এছাড়া আরও তিনটি ধাক্কা আগের চেয়েও বেশি শক্তিতে সে দেয় চলে যাওয়ার আগে নিথর বসে পড়ে থাকা আমার বাবার উপর।

এরপর বাবাকে বুঝবার চেষ্টা করেছি, তার অবস্থান হলও- "যে দেশে শ্যাখ সাইবের মতন মাইনষেরে খুন করা হয় সেই দেশে কচুশাক বেচে লাভ কী?" এইটুকু, অতি সাধারণ সে বিবৃতি, নয়তো তার বিশ্বাস। অতএব সেদিন, সেখানে, সে হাটে আমাদের

কচুশাক সেখানেই ওয়ারিশহীন পরে থাকে। বাবা আমাকে নিয়ে নৌকায় ফিরে এলো। আমরা জোয়ারের স্রোতে নৌকায় ঢিমে-তালে বৈঠা মেরে বাড়ি ফিরে এলাম। আসার পথে খালের পারের দু'এক ঘাটের মানুষজনদের ভেতর থেকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল 'আজ বাজার দর কী', বাবা ওইসব প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছিল। মায়ের দেয়া কেরোসিন তেল, রান্নার তেলের বোতলগুলো শূন্য এলো, তেল বিহনে। সে রাত সহ অনেক রাত ঘরে বাতি জ্বলল না, তেল বিহীন রান্না হলও যাবতীয় বন-লতা কিংবা বন-সজি। প্রথমবারের জন্য ঘটনা একটি ঘটল আমার অভিজ্ঞতায় যে, হাটে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ- আখের মিঠায় মেখে হলুদ বরন আটার রুটি খাওয়া হলোনা।

এরপর আমাদিগের দৈনিনন্দিন জীবনে হয়ত আরও খানিকটা বেশি উপোষ থাকতে হয় কচুশাক বেচতে না পারার ফলে, ভাতের মাড়, কচু, কচুশাক সেদ্ধ-লবণ, মরিচ বা সামান্য হলুদে জাল দিয়ে। এসত্ত্বেও কোনদিন মনে হয়নি যে বাবার এ ব্যাপারে আক্ষেপ আছে, কী বেদনাভর নিভৃত অভিমান। তেমনি আসে দিন, যায়ও আবার, সময়ের ব্যবধানে আমি ঢাকায় আসি, সে আবশ্য আসতেই হয়, বৃত্তি বা পেশা হিসাবে যে মাধ্যমে শুরু করতে হয়, সে পেশা 'কাজের ছেলে' বর্ননায় চিহ্নিত। সে পেশায় আমার সবচেয়ে উত্তম চাকরি ছিল একটি পত্রিকার সম্পাদকের কার্যালয়ের 'কাজের ছেলে' হিসাবে। সম্ভবত সম্পাদক সাহেব, মানুষের জীবনের যাবতীয় গল্প পছন্দ করতেন, এ ধারণাও হয়, তিনি সম্ভবত ভাবতেন আমিও তার মতনই গল্প পছন্দ করি। কখনো এমন বলেছেন যে, "বুঝলে (তিনি আমাকে অফিসের লোকজনের দেয়া কথিত এক কাব্যিক এবং রাবিন্দ্রিক নাম ধরে ডাকতেন) আমি কাহিনীই বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ্য দোষে সাংবাদিক হয়েছি। দ্যাখ, দ্যাখ বলে তিনি লম্বা দম নেন, তারপর বলেন, তোর বাবা, নিচুভূমির কচু, নুনে-জলে সেদ্ধ, তিনিই কিনা বসে পরে ওই খুনের প্রতিবাদ জানান দেয়; ওই পঙ্গু ভিখারির প্রতিরোধ, আদতে এরাই হলো আমাদের নায়ক, যারা তাদের নিজস্ব ঢঙে এমন এক নিকৃষ্ট-নিষ্ঠুর খুনের প্রতিবাদ করেছে, আমরা নগুরে মধ্যবিত্তরা তা করিনি। আমাদের গ্রামেও সম্পাদক স্যারের ভাষ্য মতনই সে কাহিনীই প্রচলিত রয়েছে যে, কচুশাকওয়ালা আর তার মিতা বন্ধু বিকলাঙ্গ ভিখেরীরাই প্রথম, যারা প্রতিবাদ করেছিলেন শেখ সাহেব ও তার পরিবার হত্যার বিরুদ্ধে। সম্পাদক সাহেব নাকি একসময় ঘুরিয়ে এ বিষয়ে লিখেছিলেন। তিনি একবার তার অফিসে কক্ষে আমাকে ডেকে বললেন, "বস তো দেখি আমার সামনে, নির্ভয়ে"। ততদিনে আমি তাকে চিনেছিলাম, মানে তার সামনে আমার বসতে বাঁধা নেই, সে বুঝতে পেরেছিলাম। বসবার পরে তিনি একটু আবেগ প্রবন হয়ে বললেন, "বুঝলি (তিনি দেয়া নামটা ধরে বেশ আন্তরিক ভাবে ডাকতেন), বুঝলিরে, একদিন তোর বাবা, ওই ল্যাংড়া ভিখেরি এদের অবদানকে বড় করে বিস্তারিত লিখব"। যদিও আমার কোন ধারণা নেই যে, আমার বাবা, বা তার মিতাদের নিয়ে সংবাদপত্রে লিখলে কী ছাপা হলে এমন কিছু হিতকর কিনা। আমি বলি, বস্তুত বলি না, বলতে চাই, অথচ বলতে পারি না, কেঁদে ফেলি, তিনিই বলেন, "কাঁদিস নারে, জানি তুই হয়ত বলতে চাচ্ছিস 'স্যার সেই দিনের

অপেক্ষায় রইলাম'"। আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম, অতঃপর চেয়ার থেকে উঠে সম্পাদক স্যারের কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

এরও বছর তেরো কী চৌদ্দ বছর পরে আমি অভিবাসী লটারি পেয়ে আমেরিকায় আসি। স্বভাবতই আমার কচু-ভিটার দিকে ফিরে যাওয়ার মাত্রা কমে যেতে থাকে। যতবার গেছি ততবার কচুশাক-ফেরিওয়ালার সমাধি প্রান্তে গেছি। তার সুন্দর চোখকে কল্পনা করেছি। সামনে কচুশাক রেখে খদ্দের আশায় পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা, কচুশাকের পাঁজার উপর বসে পরা, ধাক্কা খাওয়া, এসব স্মৃতিতে হয়তো ক'মুহূর্ত বিচরণ করেছি। পুনরায় পুরনো ভিটা পেছনে ফেলে চলে এসেছি। এরপর ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এলে জেনেছি স্থানীয় জনসাধারণ হাটের নামে 'ফুলতলীর হাট'এর আগে'কদম' শব্দ লাগিয়ে নতুন নামকরন করেছে, 'কদমফুলতলীর হাট'। নব এ নাম যুক্ত করার ফলে সেদিন ঘটনার প্রতিবাদ করেছে এমন দু'জনের নামই উল্লেখ করা হলো, যে সদৃশ্য নামের ভিত্তিতে তারা মিতা, এখানে কাহিনী হলও এই দু'জনেরই নাম ছিল 'কদম আলী'। এরপর আমি যখন দু'একবার গ্রামে গেছি তখন কদমফুলতলীর হাটের সেই স্মৃতির খন্দে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছি, হয়তো বা অনিচ্ছাকৃত বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সেই বাছারির দিকে তাকিয়েছি যেখানে মিঠার হাড়ি, হলুদাভ আটার রুটির বেলবার ও ভাজবার ছাপরা ছিল।

এ জাতীয় বিষয়ে জড়িত থাকা পরবর্তিতে হয়ে ওঠে না। অতিদূরের যেন অন্য যেকোন মানুষের মতনই সামান্যই আমি জানি মাত্র। এ নিয়মেই সদ্য জানলাম মদন রেজাকারের বেটা, আওয়ামীলীগের মন্ত্রী হয়ছে। অবশ্যই মন্ত্রী হওয়ার পর নিজ গ্রামের হাটের প্রথম সম্বর্ধনা নেয়ার আগেই ওই হাটের নাম বদলাবার ব্যবস্থা করেছে। নতুন নাম রেখেছেন 'মদিনার হাট'। আমাকে গ্রামের দু'একজনলোক এসে বলেছেন পরোক্ষভাবে (যেহেতু এ ধরনের বিষয়ে অনাগ্রহ রয়েছে এবং সেটাই সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছি, ফলে দূর থেকেই আকার ইঙ্গিতে এ প্রসঙ্গে জানাতে হয়)। ভবিষ্যতে যাতে কোনভাবে আর এ নাম বদলাতে না পারে তাই ফন্দি ফিকিরে মন্ত্রীর বাবার নামে নাম 'মদনের হাট'-এর জায়গায় 'মদিনার হাট' নামকরণ করে বদলানো হয়েছে।

আমার জীবন বোধে এখন আর এসবের ছোঁয়া বা প্রভাব নেই ধারণা করি। তবে বাবার প্রতি, কিংবা কদম আলীদের প্রতি, সে হোক তারা কচুশাকওয়ালা কী পথের ভিখেরি গোত্রভুক্ত, এ গোত্র ও শ্রেণীর মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আবেগ হারাই না। ভাবি সেই নিয়ম, সেই 'মিতা' কদম-আলীদের কথা। যে দেশে তারে অর্থাৎ শ্যাখ সাইবের মতন মানুষরে এমন খুন করা যায়, সে দেশে তো কত কিছুই হতে পারে।

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

আবুসাইদ লিপু

জিহ্বা

‘চুপ করে আছিস কেন?’

‘কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, মা। জিহ্বা কেমন যেন করছে।’ রুশনারের ফর্সা গাল হালকা নীল হয়ে গিয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে।

‘কী হয়েছে জিহ্বায়?’ মা’য়ের কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘ঠিক বুঝতে পারছি না। জিহ্বা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে শক্ত পাথর হয়ে আছে সেটা।’ অনেক কষ্টে কথাগুলো বলে রুশনার।

মা-মেয়ে লিভিংরুমে বসে কথা বলছে। টিভিতে একটা ডকুমেন্টারি চলছে। সাগরতলে অ্যাপার্টমেন্ট বানিয়েছে কী একটা কোম্পানি। সেসবই লোভনীয় করে দেখাচ্ছে। পানির নীচে নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। জলজ উদ্ভিদ আর মাছেদের সৌন্দর্য দেখা। আরও কত কিছু বলছে! ঝড়-বৃষ্টির বালাই নেই। বাতাসের ঝাপটা আসবেনা। মেঘে ঢেকে যাবেনা দৃষ্টিসীমা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রুশনারের এই বাসাটা ছোট। এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট। রুশনারের বাবা মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে। তখন থেকেই মা-মেয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টে এসে উঠেছে। রুশনার ইউনিভার্সিটি প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে এবার। বিষয়- নিউট্রিশন। সময়ের আবর্তে পড়াশুনার বিষয়ও ঘুরপাক খায়। কোনোটা চরম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার কোনোটা যায় আস্তাকুড়ে। এক সময় প্রাকৃতিক খনিজ আহরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ পঠিত বিষয় ছিল। এখন ও সব কেউ ধরেও না। এখন হচ্ছে পুষ্টির যুগ, মহা গুরুত্বপূর্ণ। রুশনার অতি কষ্টে এই বিষয়টাতে ভর্তি হতে পেরেছে। ওর মার মুখে সেকি হাসি তখন! দু’কান ছুঁয়ে যায় সেই হাসি।

অ্যাপার্টমেন্টটা ছোট হলেও বেশ গোছানো কিন্তু! সব ধরনের নাগরিক সেবা আর সুযোগ-সুবিধা আছে। তাছাড়া অনেক উঁচুতে থাকে ওরা। তলা হিসেবে গুনলে ৩৯১। মাটি থেকে প্রায় সাড়ে এগার’শ মিটার উঁচুতে। বিল্ডিংটা কিন্তু আরও উঁচু। কত তলা রুশনারের ঠিক জানা নেই। উপরের দিকটা প্রায় সময়ই মেঘে ঢেকে যায়। অন্ধকার অন্ধকার লাগে। তবে মেঘ সরে গেলে অতি মনোরম দৃশ্য। জানালা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, অপূর্ব। প্রায়ই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে রুশনার। দূরে আরও কতগুলো ভবন তৈরী হচ্ছে। সেগুলো আরও উঁচুতে উঠছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে। মাউন্ট

এভারেস্ট ধরে ফেলবে শীঘ্রই। তখন কী উপরের তলাগুলো বরফে ঢেকে থাকবে? রুশনার আর ভাবতে পারেনা।

'রুশনার, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। দুপুরে যেতে বলেছে ওরা। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে।' মায়ের কথায় ঘুরে তাকায় রুশনার।

'কীসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট?' চোখ কপালে ওর।

'ডাক্তার। এই যে বললি জিহ্বায় কী যেন হয়েছে!'

'সামান্য কিছু একটা হবে হয়তো। আর এ জন্য তুমি ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলেছো?' রুশনার হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলছে।

'রোগকে সামান্য বলতে নেই মা। তোর বাবার কথা মনে নেই। ছোট্ট একটা কাটা দাগের মত হলো। পাত্তাই দিলনা সে। অথচ সেখান থেকেই কত কিছু। পা কাটতে হলো। তাতেও হলোনা। জীবন দিয়ে শেষ হলো সেই অবহেলার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতি কিছুই করতে পারলোনা।' ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রুশনারের মা।

রুশনার কিছু বলেনা। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে শুধু। বাবার কথা মনে হলেই চুপ হয়ে যায় সে। অতি সুখের জীবন ছিল ওদের। বাবা সারাক্ষণই হাসি ঠাট্টা আর মজায় মেতে থাকতেন। স্ফূর্তি তাঁর চারিপাশে। এত রসিকতা তিনি কোথায় পেয়েছেন তিনিই জানেন। সহসাই মনটা কেঁদে ওঠে রুশনারের। জল চলে আসে ডাগর চোখ দু'টিতে। চোখ মুছে বলে, 'ঠিক আছে মা, আমি রেডি হচ্ছি।'

ঝটপট তৈরি হয়ে দরজার পাশের বোতামটা টিপে দেয় রুশনার। দশ সেকেন্ড সময় লাগে মাত্র। চট করে খুলে যায় দরজাটা। সেই সাথে ওদের পুরোনো নীলরঙের মিতসুবিশি মিরেজ গাড়িটাও দাঁড়িয়ে যায় দরজার ঠিক পাশেই। রুশনার এখনও ঠিক জানেনা কোথায় গাড়িগুলো পার্ক করা থাকে। বাইরে থেকে বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢোকার সময় গাড়িটাকে দরজার সামনে রেখে দেয়। এরপর বোতাম টিপে এলিভেটরে উঠে যায়। সাথে সাথে গাড়িটিও কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার বাইরে বের হবার জন্য অ্যাপার্টমেন্টের বোতাম চাপ দিলেই গাড়িটা দরজার সামনে চলে আসে। পার্কিংয়ের এই কাজটি হয় অতি নিখুঁতভাবে। এই পাঁচ বছরে কোনরকম ব্যত্যয় দেখেনি রুশনার।

গটগট করে গাড়িতে ওঠে বসে দু'জনে। গাড়ি আপনাআপনি নামতে শুরু করে। নামছে তো নামছেই, যেন অনন্তকাল। এক সময় ভূতল ছোঁয় গাড়ি। রাস্তায় নেমেই ডাক্তারের চেম্বারের ঠিকানাটা বলে রুশনারের মা। স্বয়ংক্রিয় গাড়ি ঠিকানামত চলতে শুরু করে। কোন ড্রাইভার নেই, তেল-মবিলের বালাই নেই। বৈদ্যুতিক গাড়ি নিজের মনেই চলে। চলতে চলতেই অতিনিরাপদে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায় স্বচ্ছন্দে।

বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে। পৃথিবীতে এত এত মানুষ! এদের আবাস, বেঁচে থাকা, বিজ্ঞানকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে এর জন্য। দ্বাবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে মানুষের সংখ্যা সতেরশো কোটি ছুঁয়েছে। আফ্রিকা আর এশিয়ায় হু হু করে মানুষ বেড়েছে - বানের জলের মত। এরা ছড়িয়েও পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। আনাচে-কানাচে।

পৃথিবীতে দেশ, বিভাজন, অস্ত্র, ক্ষমতা এসবের যুগ শেষ হয়েছে বহু আগেই। এখন যে যেখানে পারে সেখানে চলে যায়। নতুন নতুন শহর হয় মানুষে ভরেও যায়। নগর প্রশাসনের জুতসই একটা নীতিমালা তৈরী হয়েছে শ'খানেক বছর আগে। সেই নিয়ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায় নতুন পুরাতন সকল জায়গায়।

বিজ্ঞানীরা উঁচু উঁচু ভবনের ডিজাইন করছে। আরও উঁচু আরও বেশী মানুষ ধরে এমন। বর্ধিত মানুষের আবাসন বিরাট চিন্তার বিষয়। নতুন নতুন শহর গড়তে যেয়ে ক্ষতি হয়েছে অন্য জায়গায়। কৃষিজমি কমে গেছে। খাদ্যসংকট প্রকট হয় এক সময়। এদিকে প্রযুক্তিতে মানুষের উন্নতি হয় শণৈ শণৈ। রুশনার যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তা সিনথেটিক অ্যাসফল্টের। একশ বছরেও এই রাস্তার কোন ক্ষতি হবেনা, ফাঁটলও ধরবে না। গাড়ি অসম্ভব মসৃণ গতিতে চলে। সিটে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে গরম চা খাওয়া যায়। রুশনারের মায়ের অভ্যেস হলো এক কাপ কফি নিয়ে গাড়িতে উঠা। আজ অবশ্য সে সুযোগ ছিলনা। তাড়াহুড়োয় কফি আনা হয়নি।

'কফির জন্য মনটা আনচান করছে মা।'

'গাড়ি থামাও। নিয়ে নাও কোন জায়গা থেকে।'

'বাইরের কফি ভালো লাগেনা।' মা'য়ের হতাশ গলা শোনা যায়।

'রিপ্রনের কফি কিন্তু খারাপ না। সিনথেটিক হলেও নাকি আসল স্বাদ আছে।'

রুশনারের মা গাড়ির একটা বোতামে চাপ দিয়ে বলে, 'রিপ্রন কফিসপে যাও।'

মুহূর্তে গাড়ি বাঁক নিয়ে চলে যায় একটা মোড়ের কাছে। গাড়ি থেকেই হলোগ্রাম স্ক্রিনে অর্ডার দেয় ওরা। জানালা গলে কফিটা হাতে নেয় রুশনারের মা। একটা চুমুক দিয়ে আবার ডাক্তারের চেম্বারের দিকে যাত্রা। চারিদিকে তাকায় রুশনার। রাস্তার পাশে সারি সারি উঁচু ভবন। পুরো শহরে একই চিত্র। কোন দোকানপাট নেই। থেকে থেকে কিছু রেস্টুরেন্ট আছে অবশ্য। তবে তা লোকে লোকারণ্য না। দু'চারজন মাঝে মধ্যে যায় সেখানে। এত মানুষ শহরে, অথচ রেস্টুরেন্টে কেউ খায়না। এই ব্যবসাটা কী উঠেই যাচ্ছে? এরকম আরও কত ব্যবসা উঠে গেছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয় আরও যাবে।

মানুষ কেনাকাটা করতে এখন আর স্টোরে যায়না। বাসায় বসে হলোগ্রাম স্ক্রিনে প্রয়োজনীয় অর্ডার দিয়ে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে তা বাসায় চলে আসে। কাগুজে অর্থের কোন ব্যাপার-স্যাপার নেই। প্রত্যেকের ক্রেডিট অর্জন করতে হয় কাজ করে করে। সেই ক্রেডিট খরচ করেই কেনাকাটা জীবনযাত্রা চলে। একজনের ক্রেডিট আরেকজনকে ধার দেওয়াও যায়। দুনিয়ার সর্বত্র এই ক্রেডিট। এর বাইরে আর কিছু নেই।

আরেকটি ব্যাপারও ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। দুনিয়া থেকে হাজার হাজার ভাষা উঠে গেছে। জীবনের তাগিদে যার চাহিদা বেশী সেই টিকে গেছে। সকলে সেই ভাষাটাই শিখে নিয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঐ ভাষাই শুধু শিখছে। ভাষার সাথে সাথে বহু অতীত ঐতিহ্য তলিয়ে গেছে ইতিহাসের গহ্বরে। তারপরও মানুষ ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। মানুষ ক্রেডিট অর্জনে ব্যস্ত। ক্রেডিটই জীবন, ক্রেডিটই মরণ। বাকী সব গৌণ শুধু।

'কোন ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছো মা? এতদূর!'

‘হঠাৎ করে ফোন করেছি তো। কাছেরগুলো খালি ছিলনা।’

‘তা তো বুঝলাম। আর কতক্ষণ?’

‘এসে পড়লাম বলে।’

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় রুশনার। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। দিনের আলোয় ভবনের কাচে প্রতিফলিত আলো চিকচিক করছে বৃষ্টি কনার সাথে। কী সুন্দর লাগছে! চোখ ফেরাতে পারে না সে। যদিও রুশনার জানে এই বৃষ্টি সত্যি না। গাড়ির জানালায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে তৈরী হয়েছে এই দৃশ্য। ওরা ডাক্তারের চেম্বারে যাচ্ছে। তাই গাড়ি এরকম একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়ে যাচ্ছে সিনেমার মত। যাতে ওদের মন ভাল থাকে। মনে হবে, সত্যি সত্যিই বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু গাড়ির কাচ নামালে দেখা যাবে খটখটে রোদ্দুর।

কৃত্রিম অনেক কিছুই হচ্ছে আজকাল। প্রসাধন সামগ্রী পুরোটাই কৃত্রিম জিনিস দিয়ে বানানো। প্রাকৃতিক কোন কিছুরই মিশেল আর নেই। পোশাক-আশাকসিনেথেটিক হয়ে গিয়েছে বহু আগেই। প্রাকৃতিক সুতোর তৈরী কোন কিছু নেই। কীভাবে হবে? সুতো নেই, সুতোর গাছও নেই। ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক খনিজ বহু বছর আগেই শূন্য হয়ে গিয়েছে। তাই এখন সব কৃত্রিম জিনিস দিয়ে বানাতে হয়। ভবনের ইট-কাঠ, স্টিল-লোহা সব রাসায়নিক গবেষণাগারে বানানো।

খাদ্যের বিষয়টা আরও চমকপ্রদ। প্রচলিত খাদ্য জিনিসটা উঠে গিয়েছে প্রায়। আয়োজন করে ভাত-মাছ রান্না করে খেতে হয়না আর। জ্ঞানের উৎকর্ষে মানুষ খাদ্য-সংক্রান্ত জটিলতার উচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। তাই এখন প্রত্যেকের যতটুকু খাদ্যপ্রাণ লাগবে শুধু তাই বিক্রি হয় দেদারসে। ১৫ গ্রাম প্রোটিন, ৯০ গ্রাম কার্বহাইড্রেট, ২০ গ্রাম ফ্যাট, ৫ গ্রাম ভিটামিন আর খনিজ- একটা প্যাকেজ আকারে বিক্রি করে অনলাইন স্টোরগুলোতে। সকালে ওঠে সবকিছু এক সাথে করে শরীরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ব্যস তাতেই সারাদিনের খাদ্যগ্রহণের ঝামেলা শেষ। এরপর শুধু ছোট্ট একটা ইনহেলার জাতীয় যন্ত্র থেকে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পাফ করে শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া। শরীর প্রয়োজনমত পানি বানিয়ে নিবে এই অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন থেকে।

অনেকদিন ধরেই মানুষ আর ঘটা করে খেতে বসে না। ফলে অনেক সময় বেঁচে গিয়েছে। বাজার করা, রান্না করা, খাওয়া- এ সব শিকেয় উঠেছে। পুরো কিচেন জিনিসটাই অদৃশ্য। তাই বাড়িতে বর্ধিত জায়গা পাওয়া গেছে অন্য কিছু করার। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন মানুষ খাদ্য সংক্রান্ত জটিলতায় জীবনের একটা বড় অংশ ব্যয় করে। যেটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। তাই বিজ্ঞানের অনেক সাধনার ফল এই কৃত্রিম সহজ খাবার।

আবিস্কারের শুরুর দিকে অবশ্য দু’টো অপশনই ছিল। কেউ কেউ রসনা-বিলাসে আকৃষ্ট হয়ে রান্না করা খাবারই খেত। আস্তে আস্তে সেই প্রবনতা কমতে থাকে। সুস্বাদু রেস্টুরেন্টগুলোতে ভিড় হালকা হতে থাকে ফি-বছর। শুধুমাত্র জিহ্বার পূজোয় এত সময়

আর অর্থ ব্যয় করতে পারে কয়জন? রুশনারদের প্রজন্মে এসে খাদ্যগ্রহণ ব্যবস্থা প্রায় উঠেই গেছে। দু' একজন কালে-ভদ্রে রান্না করে খাবার খায় আয়েশ করে।

ইতোমধ্যে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। এখনকার ডাক্তাররা অল্পবয়েসি হয়। তেইশ/চব্বিশ বছরেই পাশ-টাশ করে গুরুগম্ভীর ডাক্তার। রোগের খুঁটিনাটি সব মুখস্থ ওদের। অবশ্য এই ডাক্তারটি যুবক নন, মাঝবয়সী। মাথার চুল পাকা, খুঁতখুঁতে চেহারা। তবে ভদ্রলোক ধীর-স্থির। রুশনারকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে নানারকম প্রশ্ন করেন তিনি। 'কবে থেকে এমন হলো? আগে কখনও হয়েছে কিনা? কোন কোন জায়গায় ব্যাথা হয়?' এরপর শুরু হয় এটা-ওটা পরীক্ষা। যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ডাক্তারের চেম্বার। তার একটা গলায় লাগায় তো আরেকটা হাতে ছোঁয়ায়। ওদিকে কী যেন একটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেন। রুম ভর্তি নানা রকম স্ক্রিনে বিভিন্ন নাম্বার আর আঁকা-বাঁকা দাগের ছড়াছড়ি। পিপ পিপ করে শব্দ হচ্ছে তার কয়েকটি থেকে। কোনটার বাতি জ্বলছে, কোনটার নিভছে। রুশনার বোকার মত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। ডাক্তারের চেম্বার তার কখনোই ভালো লাগে না।

এক সময় ডাক্তার বলে ওঠে, 'তুমি মুখে খাদ্য খাওনি কতদিন?' ডাক্তারের স্বরকে মনে হয় ক্লান্ত লাগছে।

রুশনার থতমত খেয়ে বলে, 'আমার ঠিক মনে নেই, ডক্টর।'

ডাক্তার ওর মায়ের দিকে তাকায়, 'আপনি বলতে পারবেন?'

রুশনারের মা চিন্তিত মুখে বলে, 'আমার মনে হয় ও কোনদিনই মুখে কিছু খায়নি।'

'আমিও তাই ধারণা করছিলাম। এই রকম রোগী আমরা বেশ পাচ্ছি ইদানিং। গবেষণা হচ্ছে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে।'

'কী গবেষণা ডক্টর? কী হয়েছে আমার মেয়ের?' মায়ের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'আপনি তো জানেন, মানুষ মুখে করেই খাবার খেয়েছে অতীতে। অনেকক্ষণ চিবিয়ে খাদ্য নরম করে গিলে খেত তখন। এতে জিহ্বা এবং আশেপাশের পেশিগুলো সচল থাকত। সেটি এখন আর হচ্ছেনা। মুখে খাবার নিয়ে চিবিয়ে না খাওয়ায় জিহ্বার পেশী আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নাড়াচড়া হয়না বলে এরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।'

'বলেন কী ডক্টর!' রুশনারের মা'র চোখে বিস্ময়।

'জী। আমাদের শরীরের কোন কোন পেশি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেকদিন ব্যবহার না করলে তা কাজের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেতে পারে। আপনার মেয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আরও অনেকেরই হচ্ছে। রুশনার জীবনেও চিবিয়ে কিছু খায়নি। শুধু রুশনার না, এই প্রজন্মের অনেকেরই চিবিয়ে খাবার ব্যাপারটা নেই। শুধুমাত্র কথা বলে পেশি সঞ্চালনের পুরোটা হচ্ছে না।'

'কি বলছেন ডক্টর!'

'তাও কথা বলে, হাসি-ঠাট্টা করে মুখের পেশীর নাড়াচাড়া কিছুটা ছিলো। কিন্তু প্রযুক্তি সেই সুযোগও কমিয়ে দিচ্ছে। মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম প্রচন্ড রকম যন্ত্র-

নির্ভর। স্ক্রিন দেখে, বোতাম টিপে জীবন চলছে ওদের। কথা বলার সুযোগ কই? কেউ কাউকে দেখেনা, কথা বলেনা। শুধু টেক্সট আর টেক্সট।'

'এখন উপায়?'

'আমি কয়েকটা ব্যায়ামের নিয়মকানুন বলে দিচ্ছি। যদিও দেরী হয়ে গিয়েছে অনেক। তারপরও চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। নিয়মিত মুখের আর জিহ্বার পেশির নাড়াচাড়া জাতীয় ব্যায়াম করলে উপকার হতে পারে। আর এর মধ্যে গবেষণায় যদি নতুন কোন মেডিসিন বের হয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে তখন।'

'ঠিক হবে তো, ডক্টর?' কাঁদ-কাঁদ মায়ের কণ্ঠস্বর। 'রুশনার ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই। ওর সাথে কথা না বললে আমি যে মরেই যাব।'

'বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে মানুষের বিলাসের মাত্রাও বেড়েছে। আরও বাড়ছে তরতর করে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা দিচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে।'

'এ তো চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি ডক্টর।'

'ঠিক বলেছেন। তবে ধৈর্য হারাবেন না। কথা বলাটা চালিয়ে যাবেন। আর আমাদের ওপর ভরসা রাখুন। আমরা গবেষণা করছি। শীঘ্রই এসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠব নিশ্চয়। তবে প্রকৃতির উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ এখনও মানুষের অধরা। কী জানি মানুষ কবে সেই সোনার হরিণের নাগাল পাবে!' ডাক্তারের কণ্ঠে অসহায় স্বর।

রুশনার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বড় অসহায় সে মুখ। ঘোর অমানিশার ছায়া মায়ের দু'চোখে। সে চোখ যেন বলছে, 'কী হবে এই উন্নতি দিয়ে? কী হবে এই অতি আধুনিক সভ্যতা দিয়ে। আমার মেয়েই যদি কথা বলতে না পারে, এই উন্নতির আমি থোড়ই কেয়ার করি। আমি চাইনা এই প্রগতি।'

ক্যালগারি, এ্যালবার্টা, কানাডা

আমীনুর রহমান

জলে ভেজা পদ্ম

হোটেল শেরাটন থেকে বেরিয়ে যখন আমি গাড়িতে উঠলাম তখন রাত এগারটা। আজ সেমিনারের শেষ দিন। আমার অস্ট্রেলিয়ান সহকর্মীরা হোটেলেই থাকবে। আমি ফিরে যাওয়ার আগে দুটো দিন বাসাতে থাকবো বলে ভাইয়াকে গাড়ি পাঠাতে বলেছিলাম।

'তসলিম ভাই আপনার অনেক রাত হয়ে গেল, না?' বড় ভাইয়ার ড্রাইভার তসলিম। আগের বার যখন দেশে এসেছিলাম তখনও দেখেছি। বেশ অমায়িক। কথা একটু বেশি বলে এই যা।

'না আপা। রাইত কই দ্যাখলেন। ঢাকায় রাইত এগারটা এহন কিছুই না। মাঝে মাঝে স্যার -ম্যডাম তো রাইত একটা দুইটা পর্যন্ত বাইরে থাকে। হোটেল, দোকানপাট সবই তো খোলা থাকে।'

'অতো রাত পর্যন্ত ভাইয়া ভাবি বাইরে কি করে?'

তসলিম ভাই রিয়ার ভিউ মিররে আমাকে একবার দেখে। তারপর মিন্টু রোডের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলে, 'দোকানপাটে যায়। ক্লাবে যায়।'

'কিসের ক্লাব?'

'তা তো জানি না আপা।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, 'আপা আপনারে একটা কথা জিগাই? আগের বার যহন আইছিলেন তহনও জিগাইতে চাইছিলাম। পারি নাই।'

'বলেন।'

মিন্টু রোড পার করে সাতরাস্তার দিকে মোড় নেয় গাড়ি। তসলিম ভাই একটু দম নিয়ে বলল, 'আচ্ছা আপা অস্ট্রেলিয়ায় কি ড্রাইভারি চাকরি নাই? আমি কিন্তু খুব ভাল গাড়ি চালাই। আপনি তো দ্যাখছেনই ...।'

তসলিম ভাই কথা বলতেই থাকে। একটা দু'টো শব্দ কানে আসে কিন্তু আমার মনোযোগ ছুটে যায়। আমার মাথার ভেতর তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েটি। তার কয়েকটা শব্দ। অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে। সে তো শ্যাওড়ায় নামবে বলে বাসে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস। বন্ধুরা ছিল, টুকরো টুকরো কথা, গাদাগাদি, হাসাহাসি। সবই ছিল। 'সেই আনন্দের রেশ শেষ হওয়ার আগেই কেন আমার জীবন বদলে যাবে? ভুল করে শ্যাওড়ার বদলে কুর্মিটোলায় নামলেই এত বড় একটা ঘটনা ঘটবে? একটা মাত্র ভুল বাস স্টপেজ কেন আমার জীবনে ময়লা কালচে একটা জ্যাকেটের দুর্গন্ধ সেঁটে দেবে

সারা জীবনের জন্যে? কেন আমাকে প্রতিবার মুখে ভাতের লোকমা তুলতে গেলেও সেই দুর্গন্ধ পেতে হবে? যতই শুকনো করে মুছে রাখি, একটা ভেজা অনুভূতি লেগে থাকে আমার তলপেটে? কিছুতেই মুক্তি নেই সেই ভেজা অনুভুতি থেকে।'

মেয়েটার প্রত্যেকটা শব্দ ড্রামের মত এখনও আমার কানে বাজছে। মনে হচ্ছে মাথার কোথাও বড়শিতে গেঁথে গেছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না।

তসলিম ভাইয়ের কথা তখনও শেষ হয়নি।

'জানেন আপা, ঢাকা আর আগের মতন নাই। এখন...।'

মেয়েটা যে সেমিনারে আসবে সেটা নুসরাত আপা আগেই বলেছিলেন। তবে সে যে কথা বলবে এটা আপা আগে বলেননি।

মেয়েটা যখন কথা বলতে উঠছিল তখন আপা পাশ থেকে ফিসফিস করে বললেন, 'আমরাই মেয়েটিকে কাউন্সেলিং করেছি। ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকেই শুরু। এখনো নিয়মিত আসছে। অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে। তবে আরো সময় লাগবে, আরো সেশন লাগবে।'

'আপা, কোন দিক দিয়ে যাব?' তসলিম ভাই জানতে চাইল।

'আপনার যেদিক দিয়ে খুশি। তবে বাসার কাছাকাছি একটা ফার্মেসিতে দাঁড়াবেন। ওষুধ কিনতে হবে।'

তসলিম ভাই ঠিকই বলেছে, ঢাকা আর আগের মত নেই। সাত রাস্তার মোড়ে এত রাতেও লম্বা ট্রাফিক জ্যাম। উত্তরা যেতে সময় লাগবে।

নভেম্বরের শুরু। তবুও গরম কমেনি। রাস্তায় সোডিয়াম বাতি। ধূলোময়, ঘোলাটে আলো। চারদিকে এলোপাথারি গাড়ি, বিচিত্র হর্ন। জ্যামে হর্ন বাজিয়ে কি লাভ? বুঝি না?

আমার আরো বেশি গরম লাগে।

'তসলিম ভাই, এসিটা আরেকটু বাড়িয়ে দেবেন।'

আমি কথা বললাম দেখে তসলিম ভাই জানতে চাইল, 'আচ্ছা আপা দুলাভাই, মা'মনি আইলো না?'

'নাসেরের ছুটি নেই। আর মৌমিতার স্কুল খোলা। আমি তো এসেছি ইউনিভার্সিটির কাজে। মাত্র সাতদিনের জন্য। শুক্রবার ফিরে যাব। পরের বার ওরা আসবে।'

'পরেরবার আপনাদেরকে......তসলিম ভাই কিছু একটা বলছিল কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢোকে না।

মেয়েটা কেন যে মাথায় গেঁথে আছে!

মনোবিদের কাজইতো সবার কথা শোনা, নিজের মাথায় গেঁথে রাখা নয়। আমি তো ঐ মেয়েটির অভিজ্ঞতার চেয়েও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা শুনেছি। বহুবার, বহুভাবে। প্রিয় মানুষ, মায়ের দ্বিতীয় স্বামী, সম্মানের মানুষ; ঘাপটি মেরে থাকে। সুযোগ বুঝে থাবা বসায়। কই সেসব কথা তো মাথায় গেঁথে থাকেনি। অথচ মেয়েটা যখন বলল, তার নাভির নিচে সারাক্ষণ অস্বস্তিকর একটা ভেজা অনুভূতি লেগে থাকে। ঠিক তখনই মনে

হল কেউ যেন হঠাৎ একটা বাঁধের বন্ধ কপাট খুলে দিল। আমিও একটা ভেজাভেজা বিশ্রী অনুভূতি খিল দিয়ে আটকে রেখেছিলাম। মেয়েটা সেই বন্ধ কপাটের খিল খুলে দিল।

আমি ডুবে গিয়েছিলাম চিন্তায়। যেন গভীর পানির তলায় কিছু একটা খুঁজছিলাম।

তসলিম ভাই গাড়ি থামিয়ে বলল, 'আপা বাসার কাছে এইটাই বড় দোকান। আমারে অষুধের নাম কন, আমি আইনা দেই।'

'না তসলিম ভাই, আমিই যাই। আপনি বসেন।'

দোকানটা আমাদের বাসা থেকে দূরে নয়। অবশ্য গত দশ বছরে এ জায়গাটার খোলনলচে বদলে গিয়েছে। আমার কাছে সব অচেনা। ইন্টারমিডিয়েটের পরে যখন দেশ ছাড়ি তখন কিছুই এমন ছিল না।

গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকতেই একজন সেলসম্যান এগিয়ে এল। মাফলার দিয়ে মাথা ঢাকা। গায়ে মোটা সোয়েটার। বলল, 'কী ওষুধ লাগবে আপা।'

'একটা ওষুধ দরকার কিন্তু প্রেসক্রিপশনটা ভুলে আনিনি। জেনেরিক নাম ব্রেক্সপিপরাজল। এখানে কি নামে পাওয়া যায় তাও জানি না। আমি নিজেই ডাক্তার। আপনি কি সাহায্য করতে পারবেন?'

'আপা ঐ নামের কোন ওষুধ আছে কিনা জানি না।'

'তাহলে উপায়?'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খুবই একটা কার্যকর বুদ্ধি পেয়েছে এমনভাবে বলল, 'আপা, ওষুধটা কি জন্য খায়?'

'ওটা ডিপ্রেশনের জন্য।'

'ও আচ্ছা। দাঁড়ান।' লোকটা দোকানের পেছনে গিয়ে ছয়-সাত রকম ওষুধ এনে আমার সামনে কাউন্টারের ওপর রাখল। আমি জেনেরিক নাম মিলিয়ে দেখলাম। পেলাম না।

কাছাকাছি কম্বিনেশনে একটা পাওয়া গেল। সেটা হাতে নিয়ে বললাম, 'আপনি কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া দিতে পারবেন?'

'অন্য কেউ হলে দিতাম না। আমি আপনারে চিনি। সাদী ভাইয়ের বোন। আপনার ছবিও দেখছি পেপারে। শেরাটনে বক্তৃতা দিচ্ছেন।'

'ও।' আমি কথা বাড়ালাম না। 'আচ্ছা এই দিকে কোথাও একটা ছোট ওষুধের দোকান ছিল। একজন বয়স্ক লোক চালাতেন। সেটা আর নেই?'

'উনি আমার নানা। মারা গেছে। এটাই সেই দোকান। ছোটটা ভেঙে পাশের আরেকটা দোকান নিয়ে বড় করছি।'

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি গভীর পানির তলায় সেই অন্ধকার দোকানের শেষ দিকের নির্জন জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি। পাউয়ারফুল একটা চশমা চোখে বুড়ো লোকটা আমাকে ডাকছে, 'ও নাতনি আয়, সি-ভিট নিয়া যা।' লোকটা কোলে বসিয়ে সি-ভিট দিল। বলল, 'চুষে খা।' তারপর আমাকে জাপটে ধরে থাকল। কিছুক্ষণ পরে আমার

প্যান্টের পেছন দিকটা ভিজে চপচপে হয়ে গেল। কী বিশ্রী ঘিনঘিনে সে ভেজা অনুভূতিটা।

'কবে মারা গেছে আপনার নানা?'

'পনের ষোল বছর।'

ওষুধের দাম মিটিয়ে প্রায় দৌড়ে গাড়িতে এসে বসলাম।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, গাড়ির সিটটা ভেজা। আর সেই ভেজাভেজা অনুভূতিটা আবার ফিরে এসেছে।

লোকটা মরে গেছে কিন্তু এই ভেজা অনুভূতিটা তো মরল না।

আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভেজাভেজা অনুভূতিটা আমার পেছন থেকে আস্তে আস্তে কোমর পিঠ বুক কাঁধ হয়ে মাথায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখনই আমার বমি পাবে। কোন রকমে বমিটা আটকে বললাম, 'তসলিম ভাই, বাসায় চলেন।'

গেইনসভিল, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আশীফ এন্তাজ রবি

মতিন স্যারের থার্ড পিরিয়ড

থার্ড পিরিয়ড শুরু হবার ঠিক তিন মিনিট পর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক আব্দুল মতিন পাটোয়ারী ক্লাসে ঢুকলেন। মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল। এ সময় কেউ কেউ বাম হাত দিয়ে তাদের ওড়না ঠিক করে।

মতিন স্যার চেয়ারে বসেন। ক্ল্যাসের দিকে এক পলক তাকান। এবার বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে তাদের ওড়না ঠিক করতে দেখা যায়। মতিন স্যার হাসেন। ছাত্রীদের এই জিনিসটা তার খুব ভাল লাগে। ভাল লাগার আনন্দে তিনি মুখের ভেতর রাখা পানের রস এক ঢোক খেয়ে ফেললেন। চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে যান। ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে একজনের বই নিয়ে (ইসলামিয়াত বই) পাতা উল্টাতে থাকেন। আঙ্গুল মুখে দিয়ে ভিজিয়ে বইয়ের পাতা উল্টান। পানের পিকের লাল রঙ লেগে যায় বইয়ের পাতায়। তার এই ব্যাপারটিও বেশ ভাল লাগে। তিনি আবারও হাসেন।

এবার তিনি তার সবচেয়ে ভাল লাগার কাজটি করলেন। বললেন, মেয়েরা তোমাগো যাদের অসুবিধা আছে তারা কইলাম বই টাচ কইরো না। খুব গুনাহের কাজ হইব। আইজ যারা যারা বই ধরতে পারবানা তারা খাড়াও তো...

ক্লাসে ছয়টি মেয়ে দাঁড়ায়। খুব ধীরে ধীরে। মতিন স্যার আবারও হাসলেন। গতকাল ছিল পাঁচজন। আজকে ছয়জন ছাত্রী। তার মানে আরও একজনের শরীর আইজ খারাপ হইছে...।

মতিন স্যার ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকা ছয়টি মেয়ের দিকে তাকান। তাকিয়ে থাকেন। তার ভীষণ ভাল লাগে। সারা শরীর কেমন শিরশির করে। ছয়টি মেয়ের মধ্যে পাঁচজন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। তাদের লজ্জা দেখে মতিন স্যারের শরীরে চারশ চল্লিশ ভোল্টের কারেন্ট পাস করে। প্রতিদিন প্রতিক্লাসে তিনি এভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তার ভীষণ ভাল লাগে। তিনি তাকান লজ্জায় মাথা নত করেনি এমন একমাত্র ছাত্রীটার দিকে। বেশ প্রতিবাদী চেহারায় সে দাঁড়িয়ে। মতিন স্যারের পুরুষাঙ্গ এবার টন টন করে ওঠে।

তিনি পড়াতে থাকেন। ওজু ভাঙ্গার কারণ, গোসলের ফরয সমূহ ...পড়াতে তার ভীষণ ভাল লাগে। তার ভাল লাগে ছাত্রীদের পড়া ধরতে। পড়া না পারলে তাদের হাতে বেত মারতে। ক্লাসে এইটের মেয়েদের গায়ে হাত তোলা নিষেধ। তাদের কেবল বেত মারা যায়। অন্য কোথাও নয়। কেবল হাতে। হাতে বেত মারতেও তার ভীষণ ভাল লাগে। এই বেত মারার মধ্যেও কত নকশা।

আজ যেমন মিথিলা বেগম পড়া পারেনি। তিনি মিথিলা বেগমকে হাত বাড়িয়ে দিতে বলেন। কোন ক্ষমা নাই। ধর্ম পড়াই পারনা-তাহলে আর পড়াশুনা কইরা কি লাভ? ঘরে বইসা কর কি? শয়তানের বড় বাক্স দেখ?

মতিন স্যারের ছাত্রীরা জানে শয়তানের বড় বাক্স মানে কি? শয়তানের বড় বাক্স হল টেলিভিশন। আর ক্যাসেট প্লেয়ার হল শয়তানের ছোট বাক্স।

শয়তানের বড় কিংবা ছোট বাক্স কোনটাই মিথিলা বেগমের পড়া না পারার কারণ নয়। মতিন স্যার জিজ্ঞেস করেছেন গোসলের কয় ফরয ও কি কি? মিথিলা সেটা জানে। কিন্তু স্যারকে বলতে ভীষণ বাঁধো বাঁধো লাগে। এজন্য সে বলে না। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় ঠিকই লিখতে পারবে। সে হাত বাড়িয়ে দেয়। মতিন স্যার বেত তুলে মারার ভঙ্গি করেন। ভয়ে মিথিলা ছিটকে উঠে হাত সরিয়ে নেয়। এ সময় তার চৌদ্দ বছরের স্তন জোড়া কেঁপে ওঠে। মতিন স্যার হাসেন। তার আবারও ভাল লাগে। আরও এক ঢোক পানের রস বেকায়দায় তার গলার ভেতর ঢুকে যায়। তিনি আবারও বিদ্যুতায়িত হন। বিশেষ করে তার মধ্যমাঙ্গ টন টন করে ওঠে। তিনি বলেন, থাক বস। আইজকার মত মাপ কইরা দিলাম। এর পর থিকা পড়া শিখা আসবা।

মিথিলা হাত টেনে নিয়ে ওড়নার প্রান্ত আঁকড়ে ধরে। মতিন স্যার আড় চোখে সেই হাত দেখেন। আহা বড় কোমল সেই হাত। এট হাতে বেত মারা যায় না। এই কোমল হাত যদি তার ওই জায়গায় রাখা যেত এরকম একটা আকস্মিক চিন্তায় মতিন স্যারের শরীরে আবারও পল্লী বিদ্যুতের কারেন্ট বয়ে যায়। তার আবারও ভাল লাগে।

গোসলের ফরয সমূহ আরেক ছাত্রী কিন্তু ঠিক ঠিক বলতে পারে। ...লজ্জা স্থান ধৌত করা। মতিন স্যারের শুনতে বেশ ভালই লাগে। তিনি আরও একবার আকস্মিক কল্পনায় দেখতে পান তার ছাত্রীরা গোসলের ফরয ঠিক ঠিক পালন করছে। লজ্জাস্থান ধৌত করছে। পর পর দুই ঢোক পানের রস মতিন স্যারের পেটে চলে যায়। তার মুখের ভেতরটা হঠাৎ শুকিয়ে আসে এবং আবারও ভিজতে শুরু করে।

মতিন স্যারের পড়া ধরা শেষ হয়। গলা পরিস্কার করে তিনি বলেন, মাইয়ারা বই খোল। ছাত্রীরা বই খোলে। কেবল ছয়জন ছাত্রী বোকার মত বসে থাকে। মতিন স্যার তাদের দিকে একবার তাকিয়ে পড়াতে শুরু করেন। কত কিছুই পড়ান তিনি। ধর্মের কথা। সোয়াবের কথা। গুনাহর কথা। সেখান থেকে তিনি চলে যান বেহেস্তে। যারা সোয়াবের কাজ করেছে-তারা যাবে সেখানে। বেহেস্তর যাবতীয় ফ্যাসিলিটিজের কথাও তিনি বলেন সবিস্তারে, সেখানে গিয়া তোমার মনে হইবো তুমি ফল খাইবা, অমনি ফল তোমার মুখের সামনে আইসা ঝুলব। মতিন স্যারের চোখ চকচক করে ওঠে। যেন

বেহেশতের ফল তিনি চোখের সামনে দেখতে পারছেন। তার নাকের সামনে ঝুলছে সেই ফল।

এরপর চলে আসেন হুর পরীদের কথায়। আহা কী তাদের চেহারা। কী তাদের রূপ যৌবন। মতিন স্যারের পাজামা, তার নিচে ঢিলে ঢালা আন্ডারওয়ারের তলে তার পুরুষাঙ্গ সচল হয়ে ওঠে। যেন হুর তার সামনে উপস্থিত। সারা ক্লাস ভরে গেছে হুর পরীতে।

এ সময় মতিন স্যারের মনে হয়, বেহেশতে গিয়ে হুর পরীদের তিনি যদি এরকম ধর্ম ক্লাসটা নিতে পারতেন। আহা, গোসলের ফরয বিষয়গুলো তাহলে খুব ভাল করে বোঝাতেন! এটা ভাবতেই তার শরীরে শিহরণ জাগে। মনে হয় গোটা একটা পাওয়ার প্লান্টের বিদ্যুৎ তার শরীর বয়ে যাচ্ছে।

চট করে তিনি প্রসঙ্গ বদলার। চলে আসেন নারী অধিকার বিষয়ে ...পুরুষ গো এক ওয়াক্তও নামাজ বাদ নাই কিন্তু মা বোন গো মাসিকের সময় নামাজ একদম মাফ। এ পর্যন্ত বলে তিনি ছাত্রীদের (বিশেষ করে ঐ ছয়টি ছাত্রীর) দিকে তাকান। তাদের চোখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন খোঁজেন। নাহ তেমন কোন আলামত তিনি তাদের চোখে দেখেন না। এমন কি ঐ বই না খোলা ছয়টা নেমকহারাম মেয়েদের চোখেও না। মতিন স্যারের মেজাজ খারাপ হয়ে আসার আগেই ঘন্টা পড়ে যায়। এবার ছাত্রীদের চোখে সত্যিকারের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। এমন কি ঐ ছয়জন ছাত্রীর চোখেও।

হার্নডন, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

কুলদা রায়

পরীপর্ব

পরীমানবের কথা অমৃত সমান।
কুলদা রায় ভনে শুনে পূণ্যবান।।

বাল্যকালে পরীদের দেখেছ। সামনের রিজিয়া আপুদের বাসায়। ফরিদা আপুর বাসায়। আমেনা আপুদের বাসায়। তারা তিন বোন। আরেকটি বোন হয়েছিল। হামাগুড়ি দিত। জানালা দিয়ে আলোর রেখা দেখলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। এই আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিত। বলত, আ আ আ। সবাই বলত রিজিয়াদের এই বোনটি সত্যি সত্যি পরীর মত ছিল। তাকে পরে একদিন তালতলায় পাওয়া গিয়েছিল। সায়েম কবিরাজ বলেছিল– এটা পরীদের কাজ। এই ছোটো শিশুটিকে পরীরা ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছে। ফেলে রেখে গিয়েছে আমাদের পুকুরপাড়ের তালগাছটির নিচে। ওই তালগাছটির নিচে তখনো ছায়ার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে সে। চোখের উপরে জোড়া ভুরু। তার নাম ফাহমিদা।

ফাহমিদা আমাদের বাসায় আসত গুটি গুটি পায়ে। ছোটো ছোটো পায়ে এসে পুকুর থেকে স্নান করে যেত। স্নান সেরে যাওয়ার পরে উঠোনে ওর পায়ের চিহ্ন পড়ে থাকত। লাল আলতার মত সেই সব গুটিগুটি পায়ের চিহ্ন। আমার ঠাকুরদা সেই পায়ের চিহ্ন রক্ষা করত গভীর স্নেহে আর মমতায়। বলত, এ মেয়ে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবী। রিজিয়া আপা, ফরিদা আপা, আমেনা আপা শুনে খিলখিল করে হাসত। বলত, ও দাদাজান, ফাহমিদা লক্ষ্মী হইবে ক্যামনে। ও হইল পরী। সাকিন কোহেকাফ। কোহেকাফের মুছাম্মাৎ ফাহমিদা পরী।

পরে ঠাকুরদাই বলেছিলেন, জানিস, শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবীর পা মাটিতে পড়ে না। মাটি থেকে একটু সামান্য উপর দিয়ে যায়। যায় হেঁটে নয়–উড়ে উড়ে।

ফাহমিদা লম্বা ঘাগরা পরত। ঘাগরাটি তার পা ছাড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ত। খালাম্মা তার মেয়েদের এ রকম লম্বা ঘাগরা বানিয়ে দিতেন নিজ হাতে। হাতে সেলাই করে। পরে একটি মেশিন কিনেছিলেন। ঘরঘর শব্দ হত তার। শব্দ শুনলে বোঝা যেত– মাহমুদারা বড় হয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন ঘাগরা চাই তাদের।

ফলে তার পা দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। আমরা কখনো পা দুটি দেখতেই পাইনি। ঠাকুরদাই সে সময়ে আমাদের দুখী হতে দেখে বলেছিলেন, মেয়েদের পা দেখতে নেই। দেখতে পেলে প্রভাব চলে যায়।

বাল্যকালে এই একটি বাসায়ই পরীরা আসত। কখনো সকালে। কখনো দুপুরে। অথবা সন্ধেবেলা–রাত্রেও। এই পরীটি ফাহমিদা। সে আমাকে দাদা বলে ডাকত।

একদিন ওদের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। সারা ঘর খুব ভালো করে দেখিয়েছিল। বলেছিল, পরী বলতে কিছুই নাই দাদা। যদি পরী বলে কেউ থাকে তাইলে আমার আপারা হইল সেই পরী। বুঝতি পারতিছ?

আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি সেই সময় আপারা বাসায় ছিল না। নিচে খালাম্মা নামাজ পড়ছেন। একটা ঘুঘু পাখি ডাকছে। হাওয়ায় কী একটা সড়সড় শব্দ হচ্ছে। দিনের আলো হালকা হয়ে এসেছে।

এ সময় জানালা দিয়ে আমাদের তিন আপা–রিজিয়া আপা, ফরিদা আর আমেনা আপা জানালা দিয়ে সোজা উড়ে এলো বাইরে থেকে। উড়ে বেড়ালো ঘরের মধ্যে। চোখ বুজে। আমাকে দেখতে পায়নি। ফাহমিদাকেও নয়। ফরিদা আপা একটু ছাদ ছুঁয়ে গেল। একটি টিকটিকি বাঁদিকের দেওয়ালে স্থির হয়ে ছিল–রিজিয়া আপা তার লেজটা একটু নাড়িয়ে দিল। আর আমেনা আপা ডানদিকের দেওয়ালে খসখস করে লিখল–মনে রেখো, ভুলো না আমায়। ফাহমিদা আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল, ওই দ্যাখো দাদা, ওই দ্যাখো ওদের পিঠে পাখা।

চেয়ে দেখি–তিন আপা ততক্ষণে তাদের পিঠ থেকে জোড়া জোড়া পাখা খুলে ফেলেছে। ভাঁজ করে রাখছে। জলে ভেজা। টপটপ করে জল পড়ছে।

আরো একটু গভীর করে দেখতে পাই–তাদের চোখ থেকেই এই জল ঝরছে। তাদের একমাত্র ভাই, আমার সামান্য বড়। আমাদের বাছেত ভাই পরী হতে চেয়েছিল। পরী হতে গিয়েছিল মডেল স্কুলের মাঠে। মাঠ থেকে ওড়া যায় না। তখন স্কুল ঘরের চালে উঠতে গিয়েছিল। কোনো সিঁড়ি না থাকায় চালে উঠতে পারেনি। তখন পুকুর পাড়ের সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছের একটির ডাল বেয়ে উঠে পড়েছিল। সেখান থেকে দুদিকে দুহাত পাখির মত সোজা করে উড়াল দিয়েছিল। আকাশের দিকে। বাছেত, আমার বন্ধু উড়তে পারতে পারেনি। কৃষ্ণচূড়া গাছের উপর থেকে থেকে সোজা পড়ে গিয়েছিল নিচে। পুকুরের জলে। জলের নিচে। গভীরে। মাছেদের কাছে।

সেদিন আমাদের সামনে আমাদের তিন আপা–রিজিয়া, ফরিদা আর আমেনা খবরটি পেয়ে ঠিক উড়ে যাওয়ার মত করে ছুটে গিয়েছিল মডেল স্কুলের পুকুরের দিকে। তখন ভরা বর্ষা। জল থৈ থৈ করছে। আর মাঝখানে পদ্ম ফুটেছে। পদ্মের গায়ে ফড়িং উড়ছে। হালকা হাওয়ায় জল নড়ছে। এর মধ্যে কোথাও বাছেত ভাই নেই। তিন বোনে সেই পুকুরপাড়ে বসে হাহাকার করে বাছেত ভাইয়ের নাম ধরে ডেকে ডেকে ফিরল। সেই আর্তনাদে জলের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠল। একটি হাওয়াও ছুটে এলো দক্ষিণ থেকে। আর কারা কারা মিছিল নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল–তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। এবং আরো কয়েকটি লোক রাতে ইঁদুর ধরতে পারেনি বলে হায় হায় করছিল আর মাঝে কপাল চাপড়াচ্ছিল, এর মধ্যে কে যেন বলছিল, আজি রজনীতে দীপালী অপেরায় অভিনীত হইবে 'একটি পয়সা দাও'। মূল ভূমিকায় অভিনয় করিবেন–নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস। আর কিছু ডানাকাটা পরী।

এই পরী শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে জলের নিচ থেকে বাছেত ভাই উঠে এলো। একটা বড়সড় মাছের মত। মাথাটি উপর দিকে। দুহাত দুদিকে তখনো ছড়ানো। ঠিক এই ভাবেই গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে গিয়েছিল সে। পড়তে পড়তে বলেছিল—আমি উড়ছি।

পুকুরপাড়ে তখন আমাদের পাড়ার দুখী দিদির মা কাপড় কাচতে বসেছিলেন। একটি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির উপর ধপাস ধপাস করে কাপড় আছড়ে ফেলছিলেন। সেই ধপাস ধপাস শব্দের কারণে হতে পারে, তার বয়সজনিত কারণে হতে পারে, অথবা সত্যিকারের একটি বিভ্রমও হতে পারে, তিনি শুনেছিলেন—আমি পুড়ছি।

তার প্রথম মেয়েটি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। আগুন দেখে সবাই গিয়ে দেখল, দুখী দিদির মায়ের ঘরটিতে আগুন লেগেছে। ভেতরে দেখা যাচ্ছে—দুখী দিদি আগুন দেখে আউ আউ করছে। একটু ঝুঁকি নিলেই তাকে তুলে আনা যায়। বাঁচানো যায়। কে একটা ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে বলে উদ্যোগও নিচ্ছিল। তার মামাবাবু একটু ধমকে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, পাগল হইলি নাকি তুই। আগুন নিয়া খেলা করতি যাইতিছিস।

এই কথার পরে দুখী দিদি আগুনেই পুড়ে গিয়েছিল। পুড়তে পুড়তে অবাক হয়ে সবার দিকে চেয়েছিল। মুখে কোনো কথা ছিল না। না কোনো ব্যথা। না কোনো বেদনা। না কোনো হাহাকার।

এরপর থেকে দুখী দিদির মা মাঝে মাঝেই শুনতে পান—পুড়ছি। কে যেন থেকে থেকে বলে ওঠে পুড়ছি গো মা। এই রকম কাউকে তিনি পুড়তে দেখেননি। দেখার কোনো স্মৃতি তার নেই। সায়েম কবিরাজ বলেছিল, ভুল শুনতিছিস রে দুখীর মা। কেউ পোড়ার কথা না। বাঁচার কথা কয়। কয়, বাঁচাও।

ফলে এই দুখী দিদির মা পুকুরের দিক থেকে পুড়ছি শব্দটা সত্যি সত্যি শুনেছেন কিনা সন্দেহে পড়েন। মনে হয়—ভুল শুনেছেন। ভুলই তিনি শোনেন। এ রকম ভুল শুনতেই তিনি চান। এই মনে করে এক ধরনের সান্ত্বনাও তিনি পান। আর কাপড় কাঁচতে তার ইচ্ছে করে না। দুখী দিদির মা পুকুরপাড়ে থেকে চলে যান। একটা সজিনা গাছের নিচে চুপ করে বসে থাকেন। কাউকে বলেন না যে পুড়ছি বলে একটা শব্দ তিনি শুনেছেন। বললে হয়তো তারা উপহাস করতে পারে। তখন তার ঘুম পায়। ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে গেলে তার কোনো কথাই আর মনে থাকে না। শুধু মনে পড়ে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িটি পুকুর পাড়ে রেখে এসেছেন। পিঁড়িটা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বলছে—মাগো, পুড়ছি। এই পিঁড়িটা আনতে যাবে বলে ছুটে এসে দেখতে পান—পুকুর থেকে তিনটি পরী ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। তারা নিয়ে যাচ্ছে একটি বড়সড় মাছ। ঠিক মাছ নয়। মাছের মত। মানুষের মত। পরীর মত আরেকটি মানুষ। মানুষ নয়। পরীমানব।

তিন বোনের পর চতুর্থ বোন মাহমুদা। সে-ই শুধু তাদের সঙ্গে ওড়েনি। আমাকে পরে মাহমুদা বলেছিল, বাছেত ভাইয়েরও ডানা ছিল। সেদিন তাড়াহুড়া করে যাওয়ার সময় ডানাটি নিতে ভুলে গিয়েছিল। কোনো কোনো ভুলের ক্ষমা নেই।

২

পরী হওয়ার ঘটনার বহুদিন পরে, যখন রিজিয়া আপার বিয়ে হয়ে গেছে, বিয়ে হয়ে গেছে ফরিদা আপার। আমাদের আমেনা আপাও শ্বশুরবাড়িতে চলে গেছে। এমন কি মাহমুদাকেও আমরা পৌঁছে দিয়ে এসেছি মাদারীপুরে মীর্জাদের ঘরে। খালাম্মাও ততদিনে বেশ বুড়ি হয়ে গেছেন। এতো বুড়ি যে তার নাতিপুতিরাও বাবা-মা হয়ে গেছে।

সেই সময়ই আমাদের খুব ভালো খালাম্মা একদিন ডেকে বলেছিলেন, বাবারে, আমার বাছেতের সত্যি সত্যি কিন্তু কোনো ডানা ছিল না। ডানা ছিল মাহমুদার। মাহমুদার ডানা নিয়েই বাছেত মাঝে মাঝে উড়ত। উড়ত কিনা ঠিক বলতে পারছি না। এখন সব কথা মনেও করতে পারি না। রিজিয়া অথবা ফরিদা–এমনকি আমেনাই হয়তো বলেছিল, মাঝে মাঝে বাছেত উড়ত। ওর স্মরণ শক্তি এতো প্রখর ছিল যে কখনো কোনো কিছু ভুলে যেত না। তবে একটা জিনিস জানত না। জানত না যে, ডানাটি শুধু কায়া নয়– মানুষ, গাছপালা অথবা পক্ষীর মত কায়ার পাশে ছায়াও ছিল। রোদ উঠলেই ছায়াটি টের পাওয়া যেত। অল্প আলো বা অন্ধকারে ছায়া দেখা যায় না। কায়ার পাশে এমন করে ঘুমিয়ে থাকে যে তাকে দেখাই যায় না। উড়তে উড়তে সেদিন হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছিল–আজ ডানাটির বদলে ডানার ছায়াটি নিয়ে এসেছে। ততক্ষণে ফেরার উপায় ছিল না। কৃষ্ণচূড়া গাছটির আগা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সে। আর উপায় নেই। খালাম্মা হাহাকার করে বলেছিলেন, ছায়া দিয়ে ওড়া যায় না। প্রকৃত ডানা লাগে।

পরে আমি আবিষ্কার করি আমাদের বাড়িতে বেলগাছটার নিচে একটি গুপ্ত সিন্দুক আছে। ঠাকুরদা সিন্দুকটি মাঝে মাঝে খুলে দেখতেন। আমার বাবাও খুলে দেখতেন। আমিও একবার খুলে দেখতে গিয়ে দেখি–সেই দুটো ডানা সিন্দুকের মধ্যে গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে। তখন ঠিক শীতও নয়–গ্রীষ্মও নয়। বর্ষা চলে গেছে। আকাশটা নীল। মেঘগুলো সাদা। থেকে থেকে হাওয়া আসে গাছের পাতা থেকে। বেশ সবুজ হাওয়া। সেই হাওয়া বেলপাতার উপর থেকে সোজা সেঁধিয়ে যায় মাটির নিচে। সিন্দুকের মধ্যে। এই হাওয়ার ছোঁয়ায় ডানাজোড়া চোখ মেলেছে। হেসে উঠেছে। সেগুলোর গায়ে রোদের গন্ধ লেগে আছে। বেশ পুরনো বলে কটু গন্ধ বটে। তারপর রোদ নেমে গেলে ডানাজোড়া পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার মা সেটা শুনে বলেছিল, এই ডানাজোড়া মায়ের বাপের বাড়িতেও ছিল। তবে বেলগাছের তলায় নয়। একটি ডালিমগাছের নিচে। কেউ কেউ জানে। কেউ কেউ জানে না।

এই জানাটাই পরীকথা। না জানাটাও পরীকথা।

মাঝে মাঝে এ রকম পরীকথা শোনা যাবে। শোনা যাবে মায়ের মামাবাড়ীতেও ডানা ছিল। তারও পিসিবাড়িতে ডানাজোড়া ঘরের বেড়ার এক ফাঁকে গোঁজা ছিল। এইসব। এ আর কিছু নয়।

(কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রকে নিবেদিত)

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

খায়রুল আনাম

প্রথম চুমু

সেই ১৯৭৩-৭৪ সালের কথা। আমরা প্রথম আমেরিকা এসেছি। না না, মিনেসোটা, ডাকোটা ফাকোটায় নয়। এই নিউ ইয়র্কেই। এত স্টেট থাকতে ধুম করে এখানে পড়ে মরতে এলাম কেন? কারণ বাবার দুই ক্লাসমেট তখন কুইন্সের ফ্লাশিং-এ থাকতেন। ম্যানহাটানের অফিসে যেতে দীর্ঘ সময় লাগে দেখে ওনারা জ্যাকসন হাইটস-এলমহার্স্ট, এইসব এলাকায় অ্যাপার্টমেন্ট দেখে বেড়াচ্ছিলেন। ওনাদের লিজ শেষ হতে আরো ছ'মাস দেরি ছিল। ইতোমধ্যে আমরা আসছি শুনে এলমহার্স্টেই ওনাদের পছন্দ করা একটা বিল্ডিংয়ের ছ'তলায় আমাদের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করে দেন। কোন ঝঞ্ঝাট ছাড়া একটা থাকার জায়গা যোগাড় হয়ে গেল দেখে বাবা সমেত আমরা মহাখুশি। দুই কাকাবাবুর পরিবার ছাড়া আর কোন দেশি লোকজন দেখতে না পেয়ে প্রথম দিকে খুব হাঁসফাঁস লাগত। পরে ওঁদের চেনা আরও কয়েকটা ভারতীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়ে কিছুটা স্বস্তি লাগে। তবে আজকের বাঙ্গালী-ঠাসা কুইন্সের তুলনায় তা ছিল নস্যি।

একদিন ঘটল এক মজার ঘটনা। সোফায় বসে আছি। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের মেন দরজায় কেউ যেন টোকা দিচ্ছে মনে হলো। উঠে দরজা খুলে দেখি চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা বাটি হাতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "পুরি"। বাটিটা ধরতেই সে সিঁড়ির দিকে মারল দৌড়। সিঁড়িতে ওর ছোট পায়ের সঙ্গে যেন আরো একটা ভারি পায়ের শব্দ হলো। বুঝলাম, ছেলেটি একা আসেনি। সঙ্গে গার্জিয়ান টাইপের কেউ গার্ড হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কে মানুষটা? ওর মা না বাপ? এসে আলাপ করলে কি কোন ক্ষতি ছিল?

দু'দিন পর আবার দরজায় টোকা। দেখা গেল পুরি হাতে সেই একই ছেলেটি। আমার হাতে দিয়ে পালাবার আগেই বাচ্চাটাকে ধরে ফেলে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলাম, "এই ছেলে, তোমার নাম কি?"

"মাই নেম ইজ নরেন্দ্র"।

"বাপ রে! নরেন্দ্র। নরেন্দ্র হোয়াট?"

"নরেন্দ্র দেশাই?"

"তোমাকে কে সঙ্গে নিয়ে এসেছে?"

"মাই আংকেল"।

"আংকেল? নট ড্যাড, নট মম?"

"নো, জাস্ট আংকেল"।

"কি নাম তার?"

"পারেশ।"

“পরেশ?”

“নো, পারেশ”।

“আচ্ছা, পারেশই সই। তো সে সামনে না এসে ওভাবে পালিয়ে যায় কেন?”

“তোমাকে ভয় পায়”।

“আমাকে? আমাকে ভয় পায়? আরে, আমি কোন ভয় পাবার মতো মানুষ নাকি? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। পরেশ, এই পরেশ। এদিকে এসো, সামনে এসো। এসো বলছি”।

পরেশ কাঁচুমাচু হয়ে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। অথচ দেখে মনে হলো, আমার চেয়ে সে অন্তত চার-পাঁচ বছরের বড় হবে। এই ছেলে আমাকে ভয় পাচ্ছে? আশ্চর্য!

জিজ্ঞেস করি, “তোমরা এই বিল্ডিংয়ে থাকো?”

“হ্যাঁ”।

“ক’তলায়?”

“চার তলায়”।

“কতদিন ধরে আছ?”

“এই নিয়ে দু’বছরে পড়েছে”।

“পড়াশুনা কর? উহুঁ, শুধু মাথা নাড়লে হবে না। কোন কলেজে পড়? কোন ইয়ারে? কি বিষয়ে? চুপ করে আছো কেন? বাড়িতে আর কে কে আছে? নরেন্দ্র তোমার কে হয়?”

“এক সাথে এত প্রশ্ন? পরেরগুলোর উত্তর আগে দিই? আমার নাম পরেশ। আমার দাদা নরেশ একজন ফার্মাসিস্ট। এখনো লাইসেন্সের ব্যবস্থা করতে পারছে না। তাই আপাতত অড জব করে। ভাইপো নরেন্দ্রের ছোট এক বোন আছে, নাম নায়না। বৌদি খুব ভালো মানুষ। দেশে এখনো মন পড়ে আছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ছ’তলায় ইন্ডিয়ান একটা নতুন ভাড়াটিয়া এসেছে। তাই বন্ধুত্ব করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে আছেন। কিন্তু সেই মানুষটা বন্ধু হতে চায় কিনা বুঝে ওঠার জন্য অগ্রিম ছেলেকে দিয়ে পুরি আর তরকারি পাঠিয়েছেন। আর বৌদি আমাকে সঙ্গে পাঠিয়েছেন নরেন্দ্রর ব্যাক আপ হিসেবে। আর আগের প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর হলো, এখন ব্রুকলিন পলিটেকনিক-এ মেকানিকাল ফাইনাল ইয়ার চলছে”।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ওরা দুজন উধাও হয়ে গেল। এর পর এলিভেটর দিয়ে ওঠানামার সময় মাঝে মাঝে পরেশের সঙ্গে দেখা ও চোখাচোখি হয়েছে। কিন্তু চোখ নামিয়ে নিয়েছি। কোন কথা হয়নি, এমনকি সৌজন্যের হাসি বিনিময়ও না। একদিন আমাদের ছ’তলা থেকে ফাঁকা এলিভেটরে উঠে নিচের দিকে নামার পথে দেখি চারতলায় ওটা থামল আর সঙ্গে সঙ্গে পরেশ উঠে পড়ল। আর কেউ ছিল না। দু’তলাটা পার হতেই হঠাৎ সে কাছে এসে আমার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল। অতর্কিতে এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়ে আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাছাড়া একতলায় যদি লিফটটা থামে আর কেউ উঠে দেখে ফেলে তাহলে তো কেলেঙ্কারি। অনুভব করলাম, মনে হয় একই দুশ্চিন্তায় পরেশের ঠোঁট ও হাতদুটো অনেকটা শিথিল

হয়েছে। কিন্তু আমার ব্যাড লাক। একতলায় লিফটটা থামলোই না দেখে সে আবার আগের মতো শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর গ্রাউন্ড লেভেলে এসে থামতেই, ছেড়ে দিয়ে এক দৌড়ে সে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। এরপর অনেকদিন আর দেখা হয় নি। পরেশ কি লজ্জায় আমাকে এড়িয়ে চলছিল?

চার মাস পরে অকস্মাৎ আবার একদিন এলিভেটরে তার সঙ্গে দেখা। আমি রেগে ঝাল ঝাড়তে গিয়ে বললাম, "তোমাকে দেখে অনেক ভালো ভেবেছিলাম। কিন্তু অমন জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে, তা চিন্তাও করিনি।"

ভান করল কিনা জানি না। যেন অবাক হয়েছে এমন ভাব করে ও বলল, "আশ্চর্য, কি খারাপ ব্যবহার করেছি?"

"তুমি বিনা পারমিশানে আমাকে ওভাবে চুমু খেলে কেন? আমি কি তোমার প্রেমিকা? আর তারপর এলিভেটর থামতেই দৌড়ে একদম পগার পার?"

"বারে, তুমি আমার ছোট বোনের মতো না? মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক মায়া লেগেছিল। তাই স্নেহের বশে আদর করে একটু চুমু দিয়েছিলাম।"

"ফাজলামি কর? স্নেহের চুমু হলে তো গালে দিতে। ঠোঁটে দেবার মতলবটা কি? ওটা যে অসভ্যতা, তা বোঝার বয়স আমার হয় নি ভেবেছ? তাছাড়া আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে এত বড় ধামড়ি মেয়েকে কোন যুবক ওভাবে স্নেহ দেখায়?"

"কি বলছ তুমি? জানো, বিশেষজ্ঞদের মতে, কয়েক মিলিয়ন ইয়ার্স আগে, এই সিস্টেমটা স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শুরু হয়েছিল। তখন মায়েরা খাবারগুলো চিবিয়ে নরম করে ঠোঁট দিয়ে তাদের বাচ্চাদের ঠোঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত আর সেগুলো খেয়ে বাচ্চারা বাঁচতো, বড় হয়ে উঠত। টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ববিদ এবং চুম্বনবিশারদ, ভন ব্রায়ান্ট-এর মতে, প্রায় ৩৫০০ বছর আগে সংস্কৃতে লেখা বেদ-এর মধ্যে নাকি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে চুম্বনের সূত্র পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে এক ধরণের চুম্বন প্রচলিত ছিল। তাতে নাকি তারা একে অপরের সঙ্গে নাক ঘষাঘষি করত। এভাবেই ঘষতে ঘষতে একসময় নাক হড়কে, একজনের ঠোঁট অন্যের ঠোঁটে গিয়ে পড়ে। তখন তারা আবিষ্কার করে যে, ঠোঁট কিছু নরম, কিছু গরম, বেশ স্পর্শকাতর এবং খুবই আরামদায়ক, শরীরের একটি অঙ্গ। এর পর প্রাচীন মিশরের কবিতার মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেমন,

"And when her lips are pressed to mine
I am made drunk and need not wine
When we kiss, and her warm lips half open,
I fly cloud-high without beer!"

এসব শুনে আমি রাগ করব কি? ছোঁড়ার জ্ঞানের বহর দেখে আমি তো একেবারে থ! তবু মনে মনে বলি, ব্যাটা ঘাঘু, পাক্কা শয়তান, এক নম্বরের মতলববাজ। জেনে শুনে অন্যায় করে এখন সাফাই গাইতে বসেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ রাগটা ধরে রাখতে পারি না। একটু পরেই তা কেমন পড়ে যায়। সত্যি কথাটা হলো, ওটা ছিল আমার জীবনের প্রথম

চুম্বন। মনে হয়েছিল যেন সারা শরীর দিয়ে এক হাজার ভোল্টের এক ঝাঁকুনি বয়ে গেল। আমিও যে সেই অভূতপূর্ব, এক অদ্ভুত শিহরণ, পরম আনন্দে বুঁদ হয়ে উপভোগ করছিলাম বলে তাকে কোন বাধা দিতে পারিনি, সেকথা কি করে অস্বীকার করব? সেই থেকে আমি তো ওকে মনে মনে সদাসর্বদা একদিকে গাল দিয়ে যাচ্ছি আর অন্যদিকে কামনা করে আসছি কখন আবার দেখা হবে। ঐ চারটে মাস যে কি করে কেটেছে, তা একমাত্র আমিই জানি।

যাকগে, টু মেক ইট শর্ট, ঐ দুষ্টুমিভরা চুমুটা আমার জীবনে শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ হয়ে আসে। আমরা বিয়ে করি। এখন ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে, লেখাপড়ায় ভালো করে, সবাই অন্যান্য স্টেটে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা আর কোথাও যাইনি। বুড়োবুড়ি রিটায়ার করে নিউইয়র্কের এই কুইন্সেই একটা বাড়ীতে থাকি। আমি নার্সিং থেকে রিটায়ার করলেও আমাদের এখানকার এলমহার্স্ট হাসপাতালে সপ্তাহে ২ দিন পার্ট টাইম কাজ করতাম। এরপর হারামি করোনা ভাইরাস যখন এলো, তখন হাসপাতালে ফুলটাইম ডিউটির ডাক পড়ল। বাধ্যতামূলক দূরত্ব রাখার জন্য নিজেদের বাড়িতেও আমরা এক বিছানায় আর শুতে পারি না। আলাদা রুমের বদলে, বেসমেন্টে ৬ থেকে ৮ ফুট দূরত্ব রেখে আমাদের আলাদা আলাদা বিছানা সাজানো হলো। রোজ দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে দিনে অন্তত দু'বার চুমু খাওয়া আমাদের এতদিনের অভ্যাস। সেটা না হোক, অন্তত একে অপরকে দেখতে পাব এটাই আশা। মনের মধ্যে অনেক কষ্ট হলেও এই সাময়িক বিচ্ছেদ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আমাদের একভাবে চলে যাচ্ছিল।

একদিন সকালে কাজে যাবার আগে শরীরটা একটু দুর্বল লাগল। শুনে পরেশ অস্থির হয়ে এসে কপালে হাত দিয়ে বলল, "তোমার তো কোন টেম্পারেচার নেই। তেমন ভাল ঘুম হয়নি মনে হয়। যা খাটাখাটুনি যাচ্ছে! আজকে এসে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। একটা ভালো ঘুম দিলে একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে"। এই বলে সে আগের মতো গভীর আবেগভরে আমার ঠোঁটে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, "যাও, চিন্তার কিছু নেই। সাবধানে থেকো আর প্রোটেকটিভ গিয়ার, ম্যাস্ক ও গ্লাভসগুলো ঠিকমতো পরে নিও"।

হাসপাতালে ঘন্টা দু'য়েক কাজ করার পর শরীরের দুর্বলতা আরো বেড়ে গেল। অন্য নার্সরা দু'বার টেস্ট করে দেখল, আমার টেম্পারেচার বাড়ছে। কিন্তু আমার কোন শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল না। শুনে ডাক্তাররা করোনা আক্রান্ত হয়েছে সন্দেহ করে আমাকে আর ছাড়েনি। ওখানেই ভর্তি হতে হলো। তিন সপ্তাহ পরে যখন বাড়ি ফিরে এলাম, দেখি কেউ কোথাও নেই। বাড়িটা একদম ফাঁকা। বুঝলাম, আমি পুরো সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আত্মীয়, বন্ধুরা, কেউ আমাকে আমার এই চরম সর্বনাশের খবরটা দিতে চায়নি।

শিকাগো, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র

চৈতালী দে

জীবনদাতা

১

সকাল থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে। বছর চল্লিশ বয়সের মকবুল রিকশা নিয়ে বেরিয়েছে। হঠাৎ দেখলো একটি বছর চৌদ্দ-পনেরোর মেয়ে ওর সামনে রাস্তায় বৃষ্টির মধ্যে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় খেয়াল করলো একটা স্কুলের ব্যাগ সে বুকে চেপে ধরে রেখেছে। যেন বৃষ্টির জল থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ঠিক তখনি মেয়েটি ক্ষীণ গলায় ওকে বললো, "কাকু ভাড়া যাবেন? রেল স্টেশন"? মকবুল দাঁড়িয়ে পড়লো। মেয়েটি রিকশায় বসলে মকবুল তাকে রিকশার সামনের ঝোলানো প্লাষ্টিক দিয়ে ঢেকে দিলো। শুনতে পেলো মেয়েটি মোবাইল ফোনে কারো সাথে কথা বলছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কথাবার্তা বাদানুবাদের আকার নিলো এবং বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়েও তার কান্নার আওয়াজ মকবুলের কান এড়ালো না। যেন বারবার কাউকে কিছু বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। হঠাৎ শুনলো, "আমার আর বেঁচে থেকে কী লাভ! আমি এই জীবন শেষ করে দেব। তুমি ভালো থেকো।" মুহূর্তে মকবুল বুঝতে পারলো তার সওয়ারি কেন রেল স্টেশন যেতে চাইছে। স্টেশনের মোড় পর্যন্ত পৌঁছে মকবুল হঠাৎ রিকশার মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলো। মেয়েটি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো। "একি? আপনি কোথায় যাচ্ছেন? শিগগির রিকশা থামান। নয়তো আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকবো।" মুষুলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বলে রাস্তায় লোক প্রায় নেই। আর এতো জোরে রিকশা ছুটছে বলে মেয়েটি লাফিয়ে নামার সাহসও পাচ্ছে না।

প্রাণপণে রিকশা টেনে মকবুল স্টেশনের কাছেই বড়ো দরগার সামনে পৌঁছে রিকশা থামালো। মেয়েটি লাফিয়ে নামলো রিকশা থেকে। মকবুলও সজাগ ছিল। একে পালাতে দিলে চলবে না। হয়তো এখান থেকে পালিয়ে কিছু একটা অঘটন ঘটাবে। স্টেশন খুব একটা দূরে নয়। ও মেয়েটির হাত চেপে ধরলো। দেখলো ভয়ে পুরো পাংশুটে চেহারা হয়ে গেছে তার। ওকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মকবুল বললো, "কিসের ভয় তোমার? তুমি না মরতি চাইছিলা? তাইলে? মরতি যখন ভয় নাই তাইলে অহন কিসের ভয়?" মেয়েটি একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মকবুলের কড়া ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গেছে কিছুটা। "মা, আমার একখান ছেলে আছিলো। বাঁইচা থাকলে সে আজ তোমার বয়সি হইতো। তারে তো বাঁচাতি পারি নাই। কিন্তু তোমারি তো মরতি দিতে পারি না"। মেয়েটির কী মনে হলো কে জানে, সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। "আমি জানি না মা তুমি কারে মানো। আল্লাহ না ভগবান। কিন্তু এটুকু জানি তাঁর দরবারে সবাই সমান। তোমার কী দুঃখ আছে তাঁরে খুলি বলো। উপরওয়ালা আমাদের সবারে একটা

জান দিছেন। সেটারে তো এতো সহজে নষ্ট করা যায় না। একবার কি ভাবছো তুমি মরলে তোমার মা-বাবার কী অবস্থা হইব? তোমার শোকে যদি তাদের কিছু হয়? তখন? মা, ওপরওয়ালা যখন কাউরে পৃথিবীতে পাঠায় তখন তার জন্য কিছু কিছু কাজ স্থির কইরে পাঠায়। তোমার কাজ শেষ না কইরে তো তুমি মরতি পারবা না। তোমার এইটুকুন বয়স। সারা জীবন পইড়ে আছে। বাড়ি যাও। ঠান্ডা মাথায় জীবনটারে নিয়া নতুন কইরা ভাবো। বড়ো হইয়া মানুষের মতো মানুষ হইয়া পরের সেবা করো। দেখবা জীবনটা কত সুন্দর।" বৃষ্টির জল আর মেয়েটির চোখের জল এক হয়ে অঝোর ধারায় ঝরতে লাগলো। তবে সে কী বুঝলো কে জানে, ধীরে ধীরে আবার মকবুলের রিকশায় চড়ে বসলো। বাড়ির ঠিকানা জানালো। মকবুল তাকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে কিছুক্ষন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু বাড়ি থেকে আর কাউকে বেরোতে দেখলো না। এরপর মকবুল সেই বাড়ির আশপাশে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু মেয়েটির সাথে আর দেখা হয়নি বা কিছু অস্বাভাবিকতাও নজরে আসেনি তার।

২

কদিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই সাথে বড্ড জ্বর মকবুলের। মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছে সে। পাশের বাড়ি থেকে ওর বৌ সাবিনা ক'টা বড়ি চেয়ে এনে খাইয়ে দিয়েছে তাকে। কিন্তু শুধু বড়িতে কী আর হয়! পেটে যে কাল থেকে কিছু পড়েনি। ধীরে ধীরে উঠে বসলো মকবুল। সাবিনাকে আশেপাশে দেখতে পেলোনা। বৌটার কাশিটাও যেন বাড়ছে অনেকটা। একবার একটু হাতে বেশি পয়সা এলেই ও বৌকে বড়ো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। বৌকে বড্ড ভালোবাসে যে ও! আর বউটাও বড্ড ভালো। বিয়ে হয়ে আসা অবধি কোনো চাহিদা দেখায়নি সে। এই নাই-এর সংসারেও সে সন্তুষ্ট। এই সব ভাবতে ভাবতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো মকবুল। বাইরে বেরিয়ে গায়ের সমস্ত জোর একখানে করে লজঝড়ে রিকশাটা টেনে বের করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো সে। মাথাটা অসম্ভব ঘোরাচ্ছে তার। প্যাডেলে পা প্রায় চলছে না। তবু তাকে আজ যে করেই হোক কিছু রোজগার করতেই হবে।

রিকশাটা নিয়ে পাড়ার মোড়ের দিকে রওনা দিলো মকবুল। বর্ষাকালে গঞ্জের রাস্তার হাল এমনিতেই বেশ খারাপ থাকে। বড়ো বড়ো গর্ত রাস্তা জুড়ে। সেগুলো কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এখানেও কোনো ব্যতিক্রম নেই। রাস্তার দুই ধারে পাথরের স্তূপের সারি। কাজ যদিও আপাতত বন্ধ বৃষ্টির জন্য। টানা বৃষ্টিতে রাস্তার ধারের স্তূপ থেকে পাথর গড়িয়ে রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। চলাফেরার পক্ষে বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে চেনা রাস্তাটা। এখন সকাল দশটা। স্কুল, কলেজ, অফিসের সময়। এই সময় ভাড়া জুটতে অসুবিধে হবে না। নয়তো আজকাল টোটোর সাথে পাল্লা দিয়ে রিকশা চালিয়ে রোজগার করা বেশ কষ্টকর। ধীরে ধীরে রিকশা টেনে মোড়ের দিকে এগিয়ে চললো মকবুল। সামনে থেকে একটা ছোট লরি আসছে। সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলো সে। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেলো তার। চোখে অন্ধকার

দেখলো সে। রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরের ওপর রিকশার চাকাটা গিয়ে পড়লো। টাল সামলাতে না পেরে রিকশাসহ মকবুল গিয়ে পড়লো রাস্তার ওপর। লরির ড্রাইভার অনেক চেষ্টা করলো ব্রেক চেপে লরিটাকে দাঁড় করানোর। লরিটা রিকশাসহ মকবুলকে হিঁচড়ে নিয়ে চললো। চারদিকে সবাই চিৎকার করে উঠলো। তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুললো মকবুল। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। চার পাঁচ জন পুরুষ, মহিলা ওকে ঘিরে রয়েছে। সেই ভিড়ে মনে হলো সাবিনাও রয়েছে। ঘোলাটে চোখে বোঝার চেষ্টা করছে মকবুল ও এখন কোথায়। একটু উঠে বসতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হাত পা বড্ড অসাড়। সাথে সাথে কেউ একজন বলে উঠলো, "না না একদম ওঠার চেষ্টা করবেন না। শুয়ে থাকুন। প্রচুর রক্ত গেছে। তবে চিন্তার কিছু নেই, আপনি এখন বিপদমুক্ত।" মকবুল ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকালো। ও হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। এখন দৃষ্টিটা মনে হচ্ছে আগের চেয়ে অনেকটা পরিষ্কার। হাঁ, ওই তো সাবিনা এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাবিনা এগিয়ে এসে ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মুখে মলিন আঁচলটা চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

কেউ একজন মনে হয় ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলো ওর জ্ঞান ফেরার পর। ডাক্তার এলেন মকবুলকে দেখতে। অল্প বয়সি একটি মেয়ে। মেয়েই বলা ভালো মনে হয়। বয়স বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। সাদা ডাক্তারী কোট আর গলায় স্টেথো ঝোলানো। মুখে মিষ্টি হাসি। এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, "এখন কেমন লাগছে?" মাথা ডানদিকে হেলিয়ে মকবুল বোঝালো ভালো। "আপনি চিন্তা করবেন না। পাঁজরের একটা হাঁড় ভেঙেছে। আর মাথায় কয়েকটা সেলাই পড়েছে। তবে এখন আর কোনো বিপদ নেই। ক'টা দিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে। ধন্যবাদ দিতে হবে লরির ড্রাইভারটিকে। সে জোরে ব্রেক না চাপলে হয়তো বিপদ আরো বাড়তো।"

সাবিনা হঠাৎ ডাক্তারের হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো। "ডাক্তার সাহেব আমি যে আপনারে কী বইলে ধন্যবাদ দিমু জানি না। আপনি না থাকলি আজ কি যে হইতো।" মকবুল অবাক হয়ে ওকে দেখছে। একটু লজ্জাও পেলো বৌটার কাণ্ড দেখে। বৌটা চিরকালই একটু বেশি আবেগে ভেসে যায়। নয়তো এইভাবে ডাক্তারের হাত ধরে সবার সামনে হাউমাউ করে কেউ কাঁদে! "কাইল থিকা আমার স্বামীটারে নিয়া যমে-মানুষে কী টানাটানি গেলো! আপনি না থাকলি কি যে হইতো আমি ভাবতিও পারি না। বোতল বোতল রক্ত জোগাড় কইরা অপারেশন করা। তারপর সারা রাত আপনি এই খাটের পাশে বৈসে থাকলেন। চিকিৎসার জন্য এক পয়সাও নিলেন না। আপনি ফেরেশতা, মানুষ না। নাইলে অহনকার দিনে অচিন মাইনষের লাইগ্যা কেউ অত করে না।" মকবুল অবাক হয়ে সাবিনার কথা শুনছে। সত্যি তো ইনি তো ডাক্তার নন, স্বয়ং আল্লাহর দূত। নয়তো এই স্বার্থপর পৃথিবীতে কেউ কি কারো জন্য এতটা করে! ডাক্তার সাবিনার হাত দুটি ধরলেন। কিন্তু তার দৃষ্টি মকবুলের দিকে। "আপনি মনে হয় আমাকে চিনতে পারেননি। আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি। আজ থেকে ১০ বছর আগের

কথা। সেদিনও ঠিক এরকম অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি আপনার রিকশায় উঠে রেল স্টেশনে নিয়ে যেতে বলেছিলাম। স্টেশনের বাইরে রিকশা থামিয়ে আপনি আমাকে কিছু কথা বলেছিলেন। তারপর আমার জীবনটার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। অল্প বয়সের ছেলেমানুষিতে আমি আমার জীবনটা শেষ করে দিতে চাইছিলাম। সেদিন আপনার সাথে দেখা না হলে হয়তো আমার ডাক্তার হওয়া হতো না। আমার বেঁচে থাকাটাই হয়তো হতো না। আপনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন।" সাবিনা অবাক হয়ে দেখছে তার সামনে দাঁড়ানো দুটি অসমবয়সী, অসম সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা মানুষকে, দুজনের চোখেই জলের ধারা।

আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

জায়েদ ফরিদ

যে বনে আগুন লাগে না

১

চারদিকে গজারির বন। খুব ভোরে ডোবার জলে ডুব দিতে নেমেছে দামা চিরান। বনের ভেতর শুকনো পাতার উপর দিয়ে খড়খড় শব্দ ভেসে আসছে তার কানে। হয়তো সাতসকালে গিরগিটি বের হয়েছে খাবারের সন্ধানে। কিন্তু শব্দটা ডোবার কাছে এলে ভুল ভাংলো দামার। গিরগিটি নয়, এনজিওর সাহেব রিচার্ড মর্গান, ছড়ি হাতে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। খুবলে ধরা কাপড়ের অনুশাসন উপেক্ষা করে তড়িঘড়ি পাড়ে উঠে পড়ল দামা। কিন্তু পাড়ে উঠে লজ্জা হল তার, না উঠলেই তো ভাল ছিল। মর্গান সাহেব তাকে দেখেও দেখল না, নির্বিকারভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হেঁটে চলে গেল।

এই বিধবা গারো মেয়েটি তার অফিসেই কাজ করে। সারা এনজিও অফিস ঝাঁট দিয়ে ঝকঝকে তকতকে রাখে। সাহেবের কফিও বানিয়ে দেয়। সাহেব বাংলা শিখে নিয়েছে, শুধু ট-বর্গ আর ত-বর্গ এখনও ভালমত রপ্ত হয়নি। দামাও ভাল বাংলা শিখেছে মিশনারি স্কুলে পড়ে, কিন্তু গারোদের আচিক ভাষা ও সংস্কৃতির উপর রয়েছে তার নাড়ির টান। অফিসের কাছেই দামা চিরানের বাড়ি। ভাইয়ের সাথে সংসার। ভাইটা দারোয়ানের কাজ করে দূরে আরেক অফিসে, মাঝে মাঝে বাড়ি এসে থাকে।

ক'দিন হল অফিসে বসেই খবর পেয়েছে মর্গান সাহেব, ইদানীং দামা চিরানের বাড়ির ফটফটে উঠানে সে নাকি কোত্থেকে এক মরা গাছ এনে লাগিয়েছে। এই নিয়ে তাকে পাগল ঠাউরেছে অফিসের কিছু লোক যারা গারো নয়। অনেক কসরৎ করে বেশ কয়েকজন গারো মিলে বয়ে এনেছে মোটাসোটা সেই গাছ। বিষয়টা বিস্তারিত জানার ইচ্ছা হল সাহেবের। মনে মনে ভাবল, হয়ত মধুপুর এলাকার গারো সংস্কৃতির কোনো ব্যাপার হবে।

সকালে কফির পেয়ালা হাতে সাহেবের রুমে ঢুকল দামা। সাহেব উৎফুল্লভাবেই হাসলো, 'এই যে ডামা, টুমার কথাই ভাবছিলাম। জঙ্গলে টুমি আর আমিই মনে হয় খুব সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠি। টুমি কাজ শেষ করে গোসল করটে নামো আর আমি টখন ওয়াকিং করি।'

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে অধোমুখে বলে উঠল দামা, 'স্যার, ঘুম থেকে ওঠে আরো অনেক বনের প্রাণী আর পাখপাখালিরা।'

এই উপলব্ধিতে সাহেব খুব অবাক হল, তাই তো, শুধু মানুষ তো নয়, যাবতীয় গাছপালা প্রাণীদের নিয়েই তো বনের জীবন। এবার সাহেব জিজ্ঞাসা করল, 'শুনলাম টুমি একটা মরা গাছ লাগাইছ, অফিসের স্টাফরা বলছে।'

- 'জ্বি স্যার সত্যি কথা, মরা গাছ লাগিয়েছি।'

-- 'সবাই টাজা গাছ লাগায়, আর টুমি লাগালে মরা গাছ। বিষয়টা খুব স্ট্রেঞ্জ লাগছে আমার, সিওরলি এর পিছনে টুমার যুক্তি আছে।'

- 'স্যার কিছু মনে করবেন না, আমার বিশ্বাস, সব কিছুর ভিতরেই প্রাণ আছে, মরা গাছপালা, এমনকি পাথরের ভিতরও প্রাণ আছে। পৃথিবীতে মরা আর বাতিল বলে কিছু নেই স্যার।'

-- 'ও আই সি, ইউ আর এন এনিমিস্ট। কিন্টু এখন আমাকে বল, মরা গাছ রেখে কী লাভ হবে টুমার?'

- 'স্যার, কিছু পাখি আছে যারা মরা গাছে বাসা করে, যেমন কাঠবিড়ালী, কাঠঠোকরা। আবার কাঠঠোকরা গর্ত করলে সেই গর্তে বাস করে শালিক, ফিঙে, সুঁইচোরা নানান জাতের পাখি। বনে যদি মরা গাছ না থাকে এসব পাখিরা কোথায় যাবে স্যার। মরা গাছ কেটে খড়ি বানায় মানুষ, আমি তাই মরা গাছ এনে বাড়িতে লাগিয়েছি।'

-- 'ও মাই গড, আমি জানটাম না টুমি বাই নেচার একজন কনজারভেশনিস্ট, আমি টুমাকে রেসপেক্ট করি ডামা।'

২

ভোর বেলা যথারীতি মর্গান সাহেব হাঁটতে বের হয়েছে বনের পথে। দামাদের বাড়ির পাশে ডোবার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। আজ তো সে ডুব দিতে নামেনি, কী হল মেয়েটার, এনিথিং রঙ! মর্গান ডোবা ঘুরে দামার বাড়ির উঠানে চলে আসে। উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে আছে আলোচিত মরা গাছ, যার নিচটা পরিপাটি করে লেপা। উপরের ডালে, ডোবার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে মাছরাঙা। গাছের কাণ্ডের চারদিক দিয়ে পোকার সন্ধানে ঘুরছে কাঠঠোকরা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু পাখি গাছটাকে খাদ্য আর নিবাসের জন্য নির্বাচন করে ফেলেছে। গাছটা অদ্ভুত লাগে সাহেবের। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে, মৃত হলেও জীবিত প্রাণের জন্য কিভাবে জায়গা করে দিচ্ছে এই গাছটা। দামার বাড়ির উঠান এ মুহূর্তে তার কাছে যেন এক গবেষণাগার হয়ে উঠল।

উঠানের অন্য প্রান্তে দুটো মাটির চুলো। সেদিকেই হেঁটে যায় মর্গান। দূর থেকে সাহেবকে দেখতে পেয়ে ভীষণ আশ্চর্য হয় দামা, যেন তার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে শস্য-দেবতা সালজং। ছাই ফেলা কুলোটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মর্গানের সামনে ঝুঁকে পড়ে সে, 'হ্যালো স্যার, গুড মর্নিং।' মর্গান হাত বাড়িয়ে দেয়, 'জানি টুমি কাজ করছিলে ডামা, টুমার হ্যান্ডস্ ডার্টি, কিন্টু নো প্রবলেম, আমার সাথে হ্যান্ডশেক কর।' অগত্যা হাত বাড়িয়ে দেয় দামা, অজ্ঞাতসারেই তার মুখ থেকে বের হয়, 'নাআ নিথুয়া'

মর্গান বলে, 'ইট সাউন্ডস্ সুইট, কিন্টু আমি টুমার আচিক ভাষা বুঝি না ডামা।'

- 'স্যরি স্যার, এর মানে তুমি সুন্দর মানুষ, ছাই-কালো হাতে হ্যান্ডশেক করলে যে,

তাই বলেছি।'
- 'থ্যাঙ্ক ইউ ডামা, তুমি কিন্টু দেখতে খুব মডার্ন।'
- 'আমি আদিবাসী, নিম্নস্তরের মলিন জাতের মানুষ, আধুনিক হলাম কিভাবে স্যার?'
- 'নিজেকে কখনও এমন করে ভাবটে হয় না ডামা। দেখো, একটা সময় সকল মানুষ ফরেস্টে বাস করটো। তার শরীরে টখন অনেক পশম ছিল। যখন শহরে এসে গেল, তারা আধুনিক হল, টখন পশম ঝরে গেল। গারোডের শরীরে পশম নাই, মডার্ন বডি, কালারটাও সুন্দর... হা হা।'
- 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'
মর্গান সাহেব তালগাছ কেটে বাঁধাই করা ডোবার ঘাটে হাত ধুতে নামে। এক রাশ মাছ খলবল করে ওঠে তার আঙুলের পাশে। দামা বলে, 'এ সময়ে আমি মাছদের খাবার দিই স্যার, এজন্য এমন করছে।'

মর্গান বনের পথে কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে ভাবে, এই মেয়েটা তো তার সাথেই কাজ করতে পারে, এসিস্ট্যান্ট হিসাবে। অফিস ঝাঁট দেয়ার জন্য বুদ্ধি কম, বিবেকহীন অন্য লোক রয়েছে। বনাঞ্চলের উপকারী পাখিদের জন্য প্রতি একরে গোটা দুই মরা গাছ থাকা চাই। এসব গাছ যাতে বিক্রির জন্য কেটে নিয়ে না যায় ইল্‌লিগাল লোকজন, সেসব দেখার জন্য আর বিভিন্ন রকম পরিসংখ্যান তৈরির কাজে মেয়েটাকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তাকে ফরেস্ট ইকোলজি সম্পর্কে নিজেই কিছু ধারণা দিতে চায় সে। সামান্য গাইড্যান্স পেলে অনেক দায়িত্বশীল কাজ করতে পারবে দামা। যে মানুষটা সব কিছুর ভিতরে প্রাণের অস্তিত্ব দেখে, সেই প্রাণকে পূজা করে এবং যত্ন নেয় এমন হৃদয়বান মানুষই তার কাজের জন্য দরকার।

৩

অফিসে দামা চিরানের পদোন্নতির নোটিশ দেয়া হল। মরগান সাহেবের বড় রুমের এক কোণে টেবিল চেয়ার ফেলে জায়গা করা হল তার। উপজাতীয় মেয়েটিকে এই সুবিধা দেয়াতে অফিসের কিছু কর্মচারী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, এত অফিসার থাকতে গতরখাটা দিনমজুর এই গারো মেয়েটাকেই পছন্দ হল সাহেবের! কেন পছন্দ হল, সেই রহস্যটা জানা খুব দরকার তাদের, অফিসের কোনো জরুরি কাজের মতই। মর্গানের জ্ঞান নাই, থাকলে কি আর এমন কাজ করে! একজন তো চায়ের টেবিলে স্লোগানই দিয়ে বসল, 'রিচার্ড মর্গান, নাই কোনো হুঁশ-জ্ঞান।'

অফিসের কর্মচারীরা আস্তে আস্তে দামা চিরানকে ম্যাডাম বলতে শুরু করে। অফিস ডেকোরাম নয়, মর্গান সাহেব এতে খুশি হবেন, এটাই মুখ্য কারণ। কিন্তু নিচু লেভেলের দুজন অফিসার প্রাক্তন এই ঝাড়ুদারনীর কথা মান্য করতে কষ্ট বোধ করে। যখন ঝাড়ুদারনী ছিল তখন দামার সাথে বেশ বন্ধুভাব ছিল ছোট কেরানীর, এখন সে তাকে এড়িয়ে চলে, পাত্তা দেয় না। উপরে উপরে ভদ্র ব্যবহার করলেও ভেতরে তাদের জ্বলুনি কমে না। দামা চিরানকে চিরে ফেলতে ইচ্ছা হয় তাদের।

একদিন দুজন গিয়ে দামা চিরানের সঙ্গে দেখা করে। মিনতি করে বলে, "দামা ম্যাডাম, তোমরা গারোরা তো অনেক অনুষ্ঠান করো। সেসব অনুষ্ঠানে সবাই নাচগান করে, 'চু' পান করে, কত রকম আনন্দ করে। আমরা তো নাচগান করতে জানি না, জীবনে আনন্দ বলে কিছু নাই আমাদের কপালে। কখনও 'চু' খাওয়ার একটু সুযোগও হয়নি। একবার এক ঢোক খেতে পারলে খুব কৃতজ্ঞ থাকতাম তোমার কাছে।'

দামা কষ্ট অনুভব করে, 'এসো একদিন, তোমাদের চু খেতে দেব, সঙ্গে কয়েকরকম গারো খাবারও, কাঁকড়া, শামুক, কুঁচে মাছ যাই পাওয়া যায়। শুধু সপ্তাখানেক আগে আমাকে জানাতে হবে। লোকদুটোর চার চোখ জ্বলজ্বল করে, 'যা দেবে তাই খাব ম্যাডাম, দেবতার প্রসাদ মনে করে খাব, আমাদের কোনো রকম ঘিন্নে পিত্তি নেই।'

দামা তার ভাইকে দিয়ে এটা সেটা যোগাড় করে, সন্ধ্যায় রান্না শেষ করে অপেক্ষা করে অফিসের মেহমানদের জন্য। মেহমানরা একটু দেরি করেই আসে। ঘরের মেঝেতে আসন পেতে দিয়ে কাঁকড়ার ডিশ এগিয়ে দেয় সামনে। মাটির পাত্রে ঢেলে দেয় খানিকটা চু। দুজন প্রথমে একটু চেখে নেয় চু, তারপর কাঁকড়ার ঠ্যাং ভেঙে মচমচ করে চিবুতে থাকে, যেন হাড়গোড় চিবিয়ে খাচ্ছে মানুষরূপী কোনো প্রাণী। চু খেতে খেতে মাতাল হয়ে যায় তারা। দামা তাদের বেশি খেতে নিষেধ করে, ভয় হয় তার, শেষমেষ বিপদসংকুল বনের পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি যেতে পারলে হয়। কিন্তু তারা নিষেধ শোনে না, উল্টোপাল্টা শুরু করে, সেদ্ধ শামুক ভেঙে চু-র মধ্যে ছেড়ে দেয়। শামুকের খোল হাতে নিয়ে বলে, 'মেয়েদের বুকেও কিন্ত শামুক থাকে দামা ম্যাডাম।' দামা তাদের সাবধান করে দেয়, নোংরা কথা না বলার জন্য। কিন্তু তারা আরো বেড়ে যায়, 'তুমিই তো আমাদের চু খাইয়ে টাল করছ, এখন যাই কিছু করি আমরা, দায়ী কিন্তু তুমি। এখন তুমারে খুলতেও পারি, পুকুরেও ডুবাতে পারি, যে পুকুরপাড়ে রোজ রোজ মরার মর্গানের সাথে দেখা হয় তুমার।'

দামা প্রতিবাদ করে, 'আমি মর্গান সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তার মত মানুষ জগতে বিরল, একটিও বাজে কথা তাকে নিয়ে বলবে না তোমরা।'

'না বাজে কথা বলব না, কিন্তু নেশা ধরিয়ে তুমিই আমাদের উদ্বুদ্ধ করছ, সেটা তো ঠিক।'

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় লোকগুলো, এগিয়ে যায় দামার দিকে। দামা এক দৌড়ে ঘরের কোণ থেকে দুহাতে দুটো শলাকা নিয়ে আসে। শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে বলে 'এই কাঁটা নিশ্চয়ই চেন তোমরা। না চিনলে বলি, এগুলো বিষাক্ত সজারুর কাঁটা। আর এক পা এগুলেই কাঁটা ঢুকে যাবে পেটের ভিতর। ভুলে যেও না, গারো মেয়ে আত্মরক্ষা করতে জানে।'

দামার হাতে সজারুর কাঁটা দেখে দুই পা পিছিয়ে যায় তারা। নেশা ছুটে যায় তাদের। ঘর থেকে বের হয়ে গজারি বনের ভেতর দিয়ে পড়িমরি দৌড়াতে থাকে।

৪

অফিসে মর্গান সাহেবকে বিষয়টা জানায় না দামা। কয়েকদিন পর সে রাতের নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে দামার আচরণ স্বাভাবিক হয়ে আসে। সাহেব যত্ন করে তাকে বন্যপ্রাণী ও গাছপালা নিয়ে তালিম দিতে থাকে, অফিস শেষ হওয়ার পরেও। বিকেল বেলা অফিসের শেষে মাঝে মাঝে দামার বাড়িতে যায় মর্গান। কাঠের টুল পেতে দেয় দামা। মর্গান অভিভূত হয়ে মরা গাছটি চেয়ে চেয়ে দেখে, কিভাবে তার গায়ে নানারকম পাখি এসে বাসা করছে, যেন নতুন করে জীবিত হয়ে উঠছে গাছটি।

এক দিন মরা গাছ থেকে হঠাৎ শালিখের ছানা নিচে পড়ে যায়। ছানা হাতে নিয়ে দামা পক্ষীশাবককে বাসায় ফিরিয়ে দিতে চায় কিন্তু অল্পের জন্য নাগাল পায় না। মর্গান বলে, ‘ইউ মে রাইড অন মাই শোল্ডার।’ দামা লজ্জা পায়। মর্গান বলে, কাল টুমাকে একটি মই বানিয়ে দেয়া যাবে, কিন্তু আজকের ‘বার্ডিকে তো বাসায় টুলতে হবে।’

বাসায় বাচ্চা তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দুজন। দামা তাকে সামান্য কিছু খেতে দেয়। মর্গান পছন্দ করে গারোদের খাবার খায়, প্রায় মসলাবিহীন, ইউরোপীয় খাবারের মতই। দামা সাহেবকে বলে ‘আগামি মাসে আমাদের ওয়ানগাল্লা, শস্য ঘরে তোলার জন্য দেবতাদের নিয়ে অনুষ্ঠান। তুমি পছন্দ করলে ওখানে আসতে পারো। আমার সাথে নাচতেও পারো। তোমাকে সবাই খুব সমীহ করে, খুশি হবে গারোরা।’

- ‘তাহলে তো আমার জন্য টুমাকে নাচের মহড়া ডিতে হবে।’

এবার আর তেমন লজ্জা পায় না দামা। মর্গান বলে, ‘টুমার নামটা খুব সুন্দর, ট্রাইবাল ইন্সট্রুমেন্টের নাম। এত লম্বা ন্যাচারাল রিদমের যন্ত্র খুব কম দেখা যায়। শব্দটাও সুন্ডর, লাইক ইংলিশ, ড্রিম-সিং ড্রিম-সিং। দামা বলে, -‘বাহ্ কি সুন্দর, এমন করে তো ভেবে দেখিনি কখনও, স্বপ্ন দেখা আর গান করা।’

-- ‘হ্যাঁ ডামা, তুমাকে নিয়ে অনেক ড্রিম করি আমি, মাঝে মাঝে ভাবি, টুমাকে দেশে নিয়ে যাই, প্রকৃত কনজারভেশনের এডুকেশনটা পাও টুমি।’

- ‘আর কিছু না?’

-- 'হ্যাঁ, আরো কিছু তো আছেই ডামা, কিন্টু আমাদের দায়িত্বটা বড় করে ডেখতে হবে। কাজকে বড় করে ডেখলে, অন্য সব কিছু বড় মনে হয়, নিজের উপর রেসপেক্ট আসে। যে কোনো মানুষের জন্য ‘সেলফ এস্টিম খুব ডরকার ডামা।’

৫

অফিসের ছোট কেরাণী তার হিতৈষীকে বলে, আপনি তো দেখলেন ওয়ানগাল্লার অনুষ্ঠানে কেমন পাল্লা দিয়ে নাচল দু’জন। এখন বাড়ির উঠানে সন্ধ্যেবেলা দামাকে পিঠে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মর্গান সাহেব। দুনিয়ার ভিটেমাটিহীন মানুষের চেয়ে বড় হল শালিখের বাচ্চা! অথচ আমরা এখনও থাকার জন্যে কোয়ার্টার পাই না। এর একটা বিহিত করা দরকার।

শীতের সকালে মর্গান সাহেব ওয়াকিংয়ে বেরিয়েছে। দু'কদম যেতে না যেতেই তার নাকে এল ধোঁয়ার গন্ধ। এত সকালে তো আর দাবানল লাগেনি তাহলে কোনো গারো আগুন জ্বালালো নাকি। আগুন জ্বালানো তো নিষেধ। মর্গান ধোঁয়াকে লক্ষ্য করে দ্রুত হাঁটতে থাকে। দামার বাড়ির উঠানের মরা গাছটি জ্বলছে। দামা সেটা পাগলের মত নেভানোর চেষ্টা করছে। নেভাতে গিয়ে তার পোষাকে আগুন লেগে যাচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

মর্গান তার জ্যাকেট খুলে দামাকে জড়িয়ে ধরে আগুন নেভায়, 'আই এম হেয়ার ডামা, ডোন্ট ওয়ারি ডিয়ার।' দুজন পুকুর থেকে বালতি ভরে জল এনে গাছের আগুন নেভায়। গরমে বেরিয়ে পড়া পক্ষীশাবক পড়ে গেছে মাটিতে। দামা ডুকরে কেঁদে ওঠে। মর্গান বলে, 'গাছটা আগে ঠাণ্ডা হোক দামা, তারপর পাখির বাচ্চা টুলে ডেবো আমরা।'

- 'তুমি আমাকে অন্য বনে নিয়ে যাও মর্গান, যে বনে কখনও আগুন লাগে না।'

সৌদি আরব

তামজিদা খান পিউ

পরি

সে ছাদের কার্নিশে বসে বহুবার অমাবস্যা রাতে খোলা আকাশের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। পূর্ণিমা রাতেও এবং যেকোনো সাধারণ রাতেও। মাঝে মাঝে সূর্যাস্তও দেখেছে কার্নিশে বসে। একি দৃষ্টিতে যখন তারাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, কখনো কখনো তার মনে হয়েছে আকাশে বিশাল একটা জলের ঘূর্ণি আছে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকালে চোখে জালা করে আর মাথা ভোঁ ভোঁ করে, কেমন যেন একটা ঢিমা ঢিমা অনুভূতি। অনেকদিন পর আজকে তার এমন লাগছে। মাথায় ভোঁ ভোঁ কিন্তু স্বপ্ন তার কোহকাফ নগরে যাবার। ঠিক এই মুহূর্তে তার চোখ বাঁধা, সে খালি পায়ে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে মঞ্চের দিকে। শ্যাওলা ধরা কাঠের মঞ্চ। পায়ের নিচে নিশ্চয়ই অতল সমুদ্র অথবা মহাকাশ। তার শেষ ইচ্ছা ছিল হালকা ঠাণ্ডা-গরম ভাতের সাথে আগুন গরম মুচমুচে নরম ইলিশ আর তেলে টালা লাল মরিচ দিয়ে ভাত খাবার, লাল সূর্য রঙ্গা টিপ, কমলা সূর্যাস্ত রঙের শাড়ি আর দুঃখের যেই সবচেয়ে গাঁড় নীল তার চেয়েও গাঁড় নীলের চুড়ি পরবার। তার সব ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছ। এখন শুধু অপেক্ষা কখন সেই সময় আসবে যখন তার গলায় পরান হবে বিজয়ের মালা, আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলা হবে তার কণ্ঠনালী, শ্বাসরোধ করা হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সে পরি হয়ে উড়ে যায় আকাশে। রিন রিনে শব্দে মঞ্চের মাঝখানে এগিয়ে যায় সে।।

মানুষদের মাঝে যখন সে থেকেছে মোটামুটি খারাপ থাকেনি। ভালো-মন্দের মধ্যেই কেটেছে দিন। ছোট একটা চার ফুট বাই ছ'ফুট ঘরে দম বন্ধ হয়নি তার। রাতের বেলায় টেরাজোর মেঝেতে শীতল পাটি বিছিয়ে ঘুলঘুলির দিকে তাকিয়ে থেকেছে অবিরাম। সারাদিন যমের খাটুনি খেটে রাতে নিজের ছোট্ট ঘরে রাজ্যের চিন্তা নিয়ে শুয়ে থেকেছে। ফুলতোলা ঘুলঘুলির বাইরে ঠিক অল্প দুরে প্রায়ই একটা পরির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পেত সে। মাঝে মাঝে খিলখিল হাসি, হা করে তাকিয়ে থেকেছে ঘুলঘুলির দিকে যদি কোনদিন সে পরি কে দেখতে পায়? একদিন এরকম ক্লান্ত ভাবে সে তাকিয়ে দ্যাখে ঘুলঘুলির অপারে দাড়িয়ে ডানা ঝাপ্টাচ্ছে সেই পরি। পলক ফেলতেই মনে হল যেন ছোট ঘরের ভেতরে লাল ডানা বিছিয়ে বসে আছে। খিলখিল করে হেসে বলল "আমার দিকে তো প্রতিদিন তাকিয়ে থাকিস, কি দেখিস এত? আমার মত উড়তে চাস? ডানা ঝাপটাতে চাস? এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে যেতে চাস? তবে আকাশের বন্ধু হতে হবে।

নির্ভয়ে যদি তাকাতে পারিস আকাশের দিকে হয়তো একদিন আকাশ তোকে নিজের করে নেবে।" তারপর থেকেই ছাদের কার্নিশে সে নিয়ম করে বসেছে প্রতিদিন। একদিন ও বাদ দেয়নি আকাশ কে আপন করার প্রয়াস। আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে তার পিঠে কেমন একটা ব্যাথার ভাব। সেটা তার মনের ভুল হতে পারে। কানণ প্রায়ই প্রতিদিনই তার পীঠে পরে প্রচণ্ড জোরাল বেত জামা ভেদ করে একেবারে পিঠের চামড়া কেটে ফেলে। বেতটিকে মাঝেমধ্যে সযত্নে সরিষার তেল মাখিয়ে রোদে শুঁকোতে দেন বড়বাবু। প্রতিদিনই কোন না কোন অজুহাত আর উত্তম মধ্যম, কোনদিন তরকারীর লবণ বেশি, কোনদিন বিছানার চাদর কোঁচকান। এক রাতে পরি কে সে বলে তার ব্যাথার কথা, পিঠের দুদিকে যে চামড়ার ফাটল ধরেছে তার কথা। পরি তাকে হাসতে হাসতে বলে "আরে পাগলি এই ব্যাথা তুই যত নিতে পারবি তত শক্ত পাখা বের হবে তোর পিঠের ভেতর থেকে। আমাদেরই একজন এরকম কঠিন ব্যাথায় মরার পথে গিয়েছিল, আর আজ তার কুচকুচে কালো ডানা ঝাপ্টালে উত্তর কোণে ঝড় ওঠে। তোরও একদিন তাই হবে দেখিস, তবে আকাশের দিকে তাকাতে ভুলবি না।"

ছোটবেলায় মা এর বুকে মাথা গুঁজে উঠানে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত আর মা শোনাত চাদের বুড়ির চরকা কাটার গল্প। মাঝে মাঝে অনেক খিদে পেলে মাকে জিজ্ঞেস করত, "মা খাবলা দিয়ে চাঁদকে ছিরে খাই? মা চাঁদ কি পনিরের মত খেতে?" পনির কোন দিন সে খায়নি কিন্তু পনিরের গল্প শুনেছে রতনদার কাছে। মা তাকে বলেছে বড় হলে বড়বাবু দের বাড়িতে যত ইচ্ছে পনির খেতে পাবে সে। তার বড় হতে প্রচণ্ড ইচ্ছা করে। একদিন একটা লাল ফ্রক পরে হাতে লাঠি নিয়ে পুকুর পারে ডুমুর নিয়ে খেলা করছিল, অমনি কোথা থেকে সেলিম চাচা এসে তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল আমার সোনা মামনি আজ তোকে চকলেট খাওয়াব আবার কাউকে বলিস না যেন। তুই আমার ছোট সোনালি পরি। রোজ ঠিক এই সময় পুকুর পাড়ে আসবি। আমি তোকে শেখাব কেমন করে উড়তে হয়। কিন্তু আবার কাউকে বলিস না যেন। এরকম প্রায়ই যেত সে সেলিম চাচার কাছে। চাচা বলত তোর মতন এমন আলো করা মেয়ে এই গ্রামে আর একটি নেই আর অল্প দিন পরেই তোর সোনালি ডানা গজাবে আর তুই উড়তে শিখে যাবি। কিন্তু ছোট্ট পরির ডানা গজাল না, একদিন দৌড়ে পালাল ডুমুর লাঠি সব ফেলে। কাউকে আজ অবধি বলেনি সেইসব দিনের কথা।

আর একটু বড় হবার পর সে যখন পুরনো জমিদার বাড়ির বাঁধানো ঘাঁটে বসেছিল অমাবস্যা রাতে, পুব পাড়ার বেয়াড়া ছেলে বিদ্যুত "পরি আইসে" বলে চিৎকার করে পুরো গ্রাম এক করেছিল। পুরো গ্রামে রটে গেল অপরূপা এক পরি নাকি পুকুর পাড়ে বসেছিল আর তার শরীর থেকে নাকি বের হচ্ছিল আগুনের হলকা। এই ঘটনার তিন মাস পর্যন্ত সে তার বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি। খুব ইচ্ছে করছিল ছাদ ফুঁড়ে উড়ে যাবার। কিন্তু সারা শরীর জ্বলছিল পুঁজে। পুরনো চামড়া পচে ভেতরে তৈরি হচ্ছিলো নতুন চামড়া। সেদিন পুকুর পাড়ে যে জসিম তার সোনা বরণ গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিল কাউকে বলেনি। মা শুধু বলেছিল "সব দোষ তোর, রাতের বেলা পুকুর পাড়ে গেছিলি

কি কামে গো"? তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল আগুন রঙ্গা পাখা এবার পিঠ ফুঁরে বেরুবে কিন্তু এখনো কিছু সময় বাকি।

এই ঘটনার কিছু বছর বাদেই মা তাকে বললেন সময় হয়েছে বড়বাবুদের বাড়িতে যাবি। ভাল-মন্দ খাবি আর একটুখানি কাজ করে দিবি। এমনিতেও সে বাড়ির সব কাজ করে, রান্নাবান্না, ঝাড়ামোছা টুকিটাকি ইত্যাদি। এবার বুঝি সে প্রতিদিন পনির খাবে, সাদা ধবধবে পনির, ভেতরে বাষ্প মাখানো খোপ। বড়বাবু জাঁদরেল, কোন কথা বলেন না, বাড়িতেও বিশেষ থাকেন না। চার ফুট বাই ছ'ফুট ঘরটি সে গুছিয়ে নেয়। ঘরে আসবাব বলতে একটি পানির মটকা, একটা শীতল পাটি, পরিদের ছবিওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার তাতে একেক মাসের একেক পরি, আর সেই ফুলতোলা ভেন্টিলেটর। সে ঘরেই সে রাত কাটায় লাল পরির কথা ভেবে।

একরাতে বাইরে প্রচণ্ড ঝড় এলো। ভেন্টিলেটর থেকে পানি ছিটকে তার পাটির ওপর পড়ছিল। বড়বাবু তাকে ডেকে বললেন আজ তোর জন্য পনির এনেছি বগুড়া থেকে, পরিদের ছবি দেখবি আর পনির খাবি। তাহলে হয়ত তুইও একদিন পরি হতে পারবি। সেই ঝড়ের রাতে সে অনেকক্ষণ ছিল বড়বাবুর সাথে। সেই ক্লান্ত রাতেই ভেন্টিলেটর এর ফাঁক গলে লাল পরিটা তার ঘরে এসেছিল। সারারাত গল্প করেছিল তার সাথে। বলেছিল ডানা গজালে সে তাকে কোহকাফ নগরে বেড়াতে নিয়ে যাবে। এজন্য কষ্টও করতে হবে প্রচুর, সব ব্যাথা গিলে সহ্য করে যেতে হবে। এরপর বড়বাবু তাকে এটা সেটা দিয়েছে, এটা ওটা বলেছে, কোনটায় সে কেঁদেছে ফুঁপিয়ে, কোনটায় সে কেঁদেছে চিৎকার করে। আজ অবধি কাউকে বলেনি সে কথা। তার বাসনা কোহকাফ নগরী যাবার। যত কষ্ট সে নিতে পারবে ততটা শক্ত সোনালি ডানা হবে তার।

কিন্তু একদিন সে আর পারে না, দাউ দাউ করে তার শরীরে জলে ওঠে জসিমের লাগানো সে আগুন, যে আগুনে পুড়ে বড়বাবু ছাই হয়ে যায় সেই মুহূর্তেই। বড়বাবুর পোড়া ছাই গুলো সে সারা শরীরে মেখে নেয়, বুঝতে পাড়ে আগুনের তাপে তার পীঠের ভেতরের চামড়া ফেটে সোনালি ডানা গজিয়ে গেছে। সে জানালা ভেঙ্গে উড়ে যায় আকাশে, অনেক্ষন এদিক সেদিক উড়ে ফিরে আসে ছাঁদের কার্নিশে। শ্রান্তভাবে কার্নিসে বসে আকাশের দিয়ে তাকায়। এতদিন এখানেই বসে সূর্য, তারা, আকাশ কত কী দেখেছে। আজ সেই আকাশ তাকে আপন করে নিয়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথাটা ঝিম ধরে আসে, ভোতা একটা ঢিমা ঢিমা অনুভূতি টের পায় সে। তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে একসময়।

চোখ খুলে সে দেখে তার ঘরের আকার বড় হয়েছে। লোহার খাঁচায় তাকে আটকে রেখেছে খাকি পোশাকের লোকেরা। লালপরি একসময় এই খাকী পোশাকের পরিধরাদের কথা তাকে বলেছিল। বলেছিল পরিধরার সামনে ভাল করে ডানা লুকিয়ে রাখবার কথা নতুবা ওরা ডানা কেটে চড়া দামে বিক্রি করে দেবে।

একদিন সূর্যোদয়ের পরে অনেক লোকের সামনে সে একটা কাঠের খাঁচার ওপর নিঃশব্দে দাড়িয়ে থাকে সারাদিন ধরে। নানা লোক নানা কথা বলে যায়, তাকে জিজ্ঞেস করে এটা

সেটা, সে নিঃশব্দে শুনে যায় আর ভাল করে লুকিয়ে রাখে তার সোনালি ডানা। দু'মাস পর সে জানতে পারে তার গলায় নাকি পরানো হবে বিজয় মালা। শেষ ইচ্ছা থাকলে এখুনি বলা হোক। সে বলে আধা গরম ভাতের কথা, ঝাল মরিচ আর মুচমুচে ইলিশের কথা, আগুন রঙ্গা শাড়ি, দুঃখনীল চুড়ির কথা।

তার সব ইচ্ছা পূরণ হয়, সূর্যাস্তের সময় হতেই তার চোখ বাঁধা হয়, সে রিনরিনে শব্দে এগিয়ে যায় স্যাঁতস্যাঁতে মঞ্চের মাঝখানে। পশ্চিমের অস্তমিত সূর্যের লাল রশ্মি তার শরীরে লাগতেই পিঠ ফুঁড়ে আবার বেড়িয়ে আসে গগন জোড়া বিশাল সোনালি ডানা। শোঁ শোঁ শব্দে ডানা ঝাপ্টায় সে কয়েকবার। বন্ধ চোখের ভেতর সে দেখতে পায় আশ্চর্য সুন্দর কোহকাফ নগরি।

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

তামান্না ইসলাম

চাওয়া পাওয়া

এসির মধ্যে বসেও কুলকুল করে ঘামছে আভা। বেনারসির ব্লাউজ ভিজে গেছে। লাল ওড়নায় ঢাকা উঁচু খোপার তলায় চুলের গোড়াও ভিজে গেছে। খোপার চারপাশে জড়ানো বেলির মালাগুলোকে পাহাড়ের মত ভারী লাগছে। ইচ্ছে করছে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে। শাড়ি, গয়নার স্তূপে নিজেকে একটা ক্লাউন মনে হচ্ছে। সার্কাসের ক্লাউন, যে বিচিত্র সব রঙ মেখে অজানা মানুষের মন ভোলায়। সেও তো বসে আছে হাসান সাহেব নামের অপরিচিত এই মানুষটির মন ভোলাতে। এর চেয়ে বেশি কিছু কী? ভীষণ ক্লান্ত বোধ করে আভা। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসে।

সেদিনও তার গলা শুকিয়ে আসছিল। নিজেকে সারাটা জীবন নীরস, কাঠখোট্টা মেয়ে বলেই জানতো আভা। তাকে দিয়ে আর যাই হোক প্রেম হবেনা। কখনো যে কাউকে ভালো লাগেনি তা না, কিন্তু একেবারেই পাত্তা দেয়নি সেই সব হঠাৎ হাওয়াকে। সে কিছুটা স্বাধীনচেতা, দুর্দান্ত, ডানপিটে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিয়ে বিরোধী নয়। বাবা, মায়ের পছন্দের উপরে তার আস্থা আছে, তাদের পছন্দেই বিয়ে হবে, এমনটিই কথা ছিল। মাস্টার্সের শুরু থেকেই ছেলে দেখা শুরু হয়েছে। কিছুতেই বাবা, মায়ের পছন্দ মত ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই বোনের মধ্যে আভা বড়। পিঠাপিঠি শুভা। তাই সময়েরও একটা সীমা আছে অলিখিত।

প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছিলেন বড় মামা। ছেলে সরকারি চাকরি করে, ছেলের বাবা স্থানীয় কলেজের শিক্ষক। ওদের পরিবারের মন মানসিকতা বেশ আধুনিকই বলতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে মেয়ে দেখতে আসেন নি তারা। আভা আর সুজন দেখা করেছিল একটা কফিশপে। সুজনের কী কারণে যেন দেরি হচ্ছিল, আভা পৌঁছে ছিল আগে। কফির অর্ডার দিয়ে তৃষ্ণার্ত আভা চেয়ে নিয়েছিল একগ্লাস বরফ শীতল পানি। সে কি নার্ভাস ছিল? সেই ডানপিটে মেয়েটা সেদিন নিজেকে একটা শামুকের মতো গুটিয়ে ফেলেছিল কেন যেন। নিশ্চয়ই সে নার্ভাস ছিল। না হলে এমন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল কেন? এক নিঃশ্বাসে প্রায় একগ্লাস পানি শেষ করে যখন ঠোঁট মুছছিল তখনই এসে ঢুকেছিল সুজন। আধুনিক কফিশপের দরজা ঠেলে ঢুকেছিল খুব সাধারণ চেহারার ছেলেটি। পোশাকও খুব সাধারণ। সেই অতিসাধারণ ছেলেটির সাথে চোখাচোখি হতেই কেন যেন ভালো লেগেছিল। হয়তো মুহূর্তের জন্য আভা ভুলে গিয়েছিল যে এটা আসলে পাত্রপাত্রী দেখার প্রথম ধাপ। আভাকে দেখে মিষ্টি করে হেসে হাত নাড়ল সুজন, যেন বহুদিনের পুরনো বন্ধু। হঠাৎ সব মনে পড়তেই লজ্জায় চোখ নামিয়েছিল আভা, সেই সাথে বুকের

মধ্যে ড্রাম বাজতে শুরু করলো। এইসব পরিস্থিতিতে কি বলতে হয় তার জানা নেই। বুকের ভেতরে এতো জোরে শব্দ হচ্ছে সুজন না শুনে ফেলে।

'কেমন আছো আভা? অনেকক্ষণ আগে এসেছ? সরি ...' বলতে বলতেই চেয়ার টেনে বসলো সুজন আর সাথে সাথেই হাতের ধাক্কায় গ্লাস উল্টে অবশিষ্ট পানিটুকু যেয়ে পড়ল আভার হাল্কা বেগুনী কামিজে। এক নিমেষে নিভে গেলো যেন স্মার্ট ছেলেটা। উঠে দাঁড়িয়ে ওয়েইটারকে ডাকবে নাকি নিজেই ন্যাপকিন এগিয়ে দেবে ঠিক কূলকিনারা পাচ্ছিলো না। 'আমি ঠিক আছি, আপনি অস্থির হবেন না।' ওকে আশ্বস্ত করতে নিজেই সহজ হয়ে গেলো আভা। তারপরে কোথা দিয়ে যেন ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেলো। দেখা গেলো, সুজনও আভার মতো খেলা পাগল। ক্রিকেট খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে যেতেই হবে। মাশরাফি আর সাকিব দুজনেরই প্রিয়। হিন্দি ছবি পছন্দ নয়, ওদের পছন্দ ইংলিশ মুভি, তবে দুজনের দুরকম, একজনের ভালোলাগে সায়েন্স ফিকশন, আরেকজনের রোম্যান্টিক। দুজনেই গান পাগল, কবিতার ভক্ত ততটা নয়। পাত্রপাত্রী দেখাদেখি পর্বটা কেমন করে যেন একটা নতুন বন্ধুত্বের সূচনা করলো, দারুণ এক বন্ধুত্ব।

'আভা সামনের সপ্তাহে খেলার টিকেট কেটেছি। তোমার ক্লাস নাইতো?'

'গোল্লায় যাক ক্লাস, এই খেলা বাদ দেওয়া যায়? তুমি না বললে বন্ধুদেরকে জোর করতাম।'

একই সাথে গর্ব আর আনন্দে সুজনের বুকটা ভরে যায়।

ভিড়ের মাঝেও ওকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে কখন যেন নিজের অজান্তেই আভার হাতটি তুলে নিয়েছে সুজন নিজের শক্ত মুঠিতে। একটু চমকে উঠে ওর দিকে তাকায় আভা। চারিদিকে মানুষ, ঠেলাঠেলি এর মাঝেই দু'জোড়া চোখ বন্দি হয়ে থাকে পরস্পরে কিছুক্ষণ। চোখে চোখে কথা হয়। আভা কিন্তু হাতটি সরিয়ে নেয়না।

গভীর রাতে আভার মেসেজ আসে 'এই গানটা শুনে দেখো।' ... 'দারুণ না?'

ওদের দিন কাটছে পাখির ডানায় ভর করে। কখনো বসুন্ধরায় নতুন মুভি দেখে, কখনো টিএসসিতে চা খেয়ে। কখনো গলির মোড়ে ফুচকা খেয়ে। মাঝে মাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করে আভা 'সুজন আমার আসলে কে?' সবসময় উত্তর পায় 'সবচেয়ে ভালোবন্ধু।' ওর মাথায় কখনোই 'হবু বর' উত্তরটা আসে না।

ওদের মেলামেশাটাকে দু'পক্ষের বাবা মা-ই খুব ভালো ভাবে নিয়েছে। হাজার হোক, ওনারা নিজেরাই ছেলে মেয়ে ঠিক করেছেন এন্‌গেজমেন্টও হয়ে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা আভার মাস্টার্স পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার।

বিয়ে নিয়ে আভার মাঝে কোন মেয়েলি ফ্যান্টাসি নেই। তবে সুজন মাঝে মাঝে খোঁচায়।

'আভা আমার কিন্তু গায়ে হলুদ ভালোলাগে না, তুমি চাইলে তোমারটা করতে পারো।'

'তোমার কী বিয়েও ভালোলাগে না সুজন? সেটাও আমি একা করি?'

'বিয়ে ভালোলাগে, তবে তার চেয়ে বেশি ভালোলাগে হানিমুন।' বলেই একটা অর্থপূর্ণ হাসি দেয়। ওকে কপট রাগ দেখায় আভা।

'সুজন হানিমুনে হাওড়ে যাবে? সুনাম গঞ্জের হাওড়ে?' শুনেছি ভরা বর্ষায় নাকি হাওড়ের রূপ হয় সমুদ্রের মতো।'

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সুজন। ওর এই পাগলামিগুলোর জন্যই ওকে বেশি ভালোলাগে ওর।

দেখতে দেখতে আভার পরীক্ষার সময় এসে গেলো, ওদের আজকাল দেখাশোনা বেশ কম হচ্ছে। সুজনও অফিসের কাজ গোছাচ্ছে। এতদিন বেশ ফাঁকি মারা হয়েছে। তাছাড়া সামনে বিয়ের জন্য ছুটি নিতে হবে।

পরীক্ষা ফেরত এক বিকেলে বাসায় এসে মায়ের থমথমে মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারছিলনা আভা। 'বাবার সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি মা? নাকি বুয়া আবার ছুটি চেয়েছে?' মা যখন এর উত্তরে ঝাঁঝিয়ে উঠলো না, তখনই গোলমালটা টের পেল সে। কিছু একটা সিরিয়াস।

'শোভা মার কী হয়েছে বলতো? তুই কিছু জানিস?' উত্তরে শোভা কেমন অসহায় মুখ করে তাকিয়ে থাকে। বেশি জোরে চেপে ধরতেই কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় 'সুজন ভাইয়ের মা ফোন করেছিল বিয়ের আলাপ করতে। মাকে নাকি বলেছে বিশলাখ টাকা যৌতুক দিতে হবে। ওনারা ঢাকার কাছে একটা জমি কিনবেন।' মাকে বলেছে, এটা তো আপনার মেয়ের ভালোর জন্যই, ওদেরও একটা মাথাগোজার ঠিকানা হবে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আভা। 'এটা কিছুতেই হতে পারেনা। সুজন নিশ্চয়ই জানেনা। সুজনকে না জানিয়ে ওরা এটা করেছে।'

লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে আভার। তারপরও সুজনের মুখটা মনে করে শক্তি পায়। কাউকে কিছু না বলে অনেকটা বাসা থেকে পালিয়ে আসে। সোজা সুজনের অফিসে। ওর উত্তরটা জানা খুব জরুরি।

আভাকে অফিসে দেখে খুব অবাক হয় সুজন। ওতো সচরাচর আসেনা এখানে। তাও আবার না জানিয়ে। তবে মুখ দেখে আন্দাজ করে কিছু একটা হয়েছে। কথা না বাড়িয়ে নিচে এসে একটা রিকশা নেয় ওরা।

'কি ব্যাপার আভা, কিছু হয়েছে, কোন সমস্যা?'

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনা আভা। ভুলে যায় রিকশাওয়ালার অস্তিত্ব। রাগে, অপমানে, কান্নায় একসাথে ফেটে পড়ে সে 'তোমাদের বাড়ি থেকে নাকি বিশ লাখ টাকা যৌতুক চেয়েছে? তুমি জানো সে কথা? '

সুজন বেশ কিছুক্ষণ সে কথার কোন উত্তর দেয়না। আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে বলতে থাকে, 'আব্বার ছোটবেলার বন্ধু মহিউদ্দিন চাচা ওমানে থাকে। অনেক টাকা। ওনার মেয়ের জন্য আমাকে তার খুব পছন্দ। আব্বাকে খুব চাপ দিচ্ছে, মেয়ের নামে ফ্ল্যাট আছে ঢাকায় দুটো। তুমি তো জানো আমাদের নিজেদের কোন বাড়িতো দূরের কথা জমিও নেই। মায়ের খুব সখ একটা নিজের বাড়ির। আমাকে পড়ালেখা শেখাতে গিয়ে আর রানুর বিয়ে দিয়ে তাঁরা একেবারে নিঃস্ব। আব্বা তো এবছর রিটায়ার্ড করবেন, এরপরে আমার একার এই সামান্য আয়ে আমরা নিজের চলবো নাকি ওনাদের চালাব?'

'তার মানে তোমার সম্মতি আছে? হ্যাঁ বা না উত্তর দাও।'

এরপরের মিনিট দুয়েক আভার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ দুটো মিনিট। বুক ধুকধুক করছে আর প্রতিটা সেকেন্ডে সে আশা করছে সুজন বলবে তার সম্মতি নেই। না, সুজন কিছু বলেনি।

রিকশাওয়ালাকে থামতে বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেনি আভা। রাতের আঁধারে হারিয়ে গিয়েছিল। সুজনের অজস্র আকুতিকে উপেক্ষা করে একবারও পিছু ফিরে তাকায়নি। নিজেকে তার একটি পণ্য মনে হচ্ছিল। যার একটা বাজার দর আছে।

বিয়েটা ভেঙ্গে দিয়েছিল আভা, কোন দ্বিধা ছিলনা তার। শুধু বুকটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। সে যে না জেনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ভালবেসে ফেলেছিল একজনকে কাঠখোট্টা নীরস মেয়েটি।

সেই থেকে বাবা, মাও আর ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি বহুদিন।

'মেয়েটার জীবনটাকে না বুঝে নিজেরাই ধ্বংস করে দিলাম?' বাবার দীর্ঘশ্বাসে সান্ত্বনা পায়না মা। মনে মনে ভাবে 'যৌতুকটা দিয়ে দিলেই কী ভালো হত আভাকে লুকিয়ে?' কিন্তু বাবা আর মেয়েকে কিছু ব্যাপারে তিনি ভীষণ ভয় পান।

বিয়ের কথাতো দূরে থাক, আভাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাই কঠিন হয়ে গেছে। মেয়েটা আর আগের মত প্রাণ খুলে হাসেনা। রাত জেগে বাবার সাথে খেলা দেখেনা, শোভার সাথে মুভি দেখে শোরগোল করেনা। সে যেন থেকেও নেই। ছায়ার মত এক জীবন কাটাচ্ছে।

রিটায়ার করার পর বাবাও যেন কেমন হয়ে গেছে। পুরো বাড়িটাকে মনে হয় এক ভুতের বাড়ি।

পাশের বাড়ির চাচি যেদিন মাকে এসে হাসান সাহেবের কথা বলল, আড়াল থেকে সবই শুনেছে আভা।

'ছেলের বয়স একটু বেশি, অল্প বয়সে বিদেশে চলে গেছে। পড়ালেখাটা খুব বেশি আগাতে পারেনি।'

'তাই বলে ইন্টারমিডিয়েট পাস ছেলে?' মার গলায় কষ্টের ছোঁয়া।

'বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া মেয়ে আপা, তিরিশের কাছাকাছি বয়স। এরচেয়ে ভালো ছেলে আর কই পাবেন আপা?'

এ কথায় মা মনে হয় ফাটা বেলুনের মত চুপসে যায়।

'ওদেরকে সব জানিয়েছেন আপা?'

'হ্যাঁ, এনগেজমেন্টের কথাটা আর অতো বলিনি। বলেছি এক জায়গায় কথা বেশ এগিয়েছিল।'

চাচি চলে যাওয়ার পর মায়ের ঘরে এসে দাড়ায় আভা। 'মা আমি বিয়ে করবো না, কখনই না।' ওর বরফ শীতল কণ্ঠে চমকে ওঠে মা। আভা আর দাঁড়ায় না সেখানে।

সেই রাতেই বাবার স্ট্রোক হয়। আইসিইউতে দু'দিন পরে জ্ঞান ফিরে এলে শুধু আভাকে খুঁজেন তিনি। 'মা তোর যা ইচ্ছা তুই তাই কর। আমরা তোকে জোর করবো

না।' আভার কেন যেন মনে হয় বাবা চলে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে তার এই প্রিয়মুখটিতে সে একচিলতে হাসিও দেখেনি। সেই মুখটি বিষাদ ঘিরেই থাকবে আমৃত্যু তাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া এক দুর্ঘটনার জন্য।

দুই রাত ঘুমায়নি আভা। বাবাকে যেদিন কেবিনে দেওয়া হয় সেদিনই সে তার সিদ্ধান্ত জানায় সে হাসান সাহেবকেই বিয়ে করবে। তাঁর সম্পর্কে তার কিছুই জানার দরকার নেই। তার শুধু একটাই শর্ত, সে দেখাদেখি করতে পারবে না। ছবি দেখে বিয়ে হবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই।

তাড়া ছিল হাসান সাহেবেরও। রেস্টুরেন্ট থেকে মাত্র সপ্তাহ তিনেকের ছুটি পেয়েছে। এর মধ্যে চলে গেছে দশদিন।

ঠিক ছয়দিনের মাথায় ওদের বিয়ে হয়ে গেলো। কেউ কাউকে না দেখে, কোন কথা না বলে।

বেলি ফুলের তীব্র গন্ধে, এসির শোঁ শোঁ শব্দে যখন আভার মাথাটা ভার ভার লাগছে ঠিক তখনই দরজাটা খুলল, লোকটি ঘরে ঢুকল।

মাথা নিচু করে বসে আছে আভা। না, লজ্জায়না, অনেকটা অনীহা থেকে আর কথা বলাটা অ্যাভয়েড করার জন্য।

ওকে এক ঝলক দেখে কী বুঝল সে কে জানে। শেরওয়ানিটা খুলে ফেললো। কান্না পাচ্ছে আভার 'একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়ের সামনে...।' টেবিলে রাখা টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল 'তুমি পাকশাক কেমন জানো? নিজের হাতের রান্না খাইতে খাইতে পেটে চর পইরা গেসে, কামের জায়গায়ও রান্দ আবার বাড়িতেও রান্দ, আমার আবার গ্যাসটিকের সমস্যা, তেল মশলা খাইতে পারিনা।'

সে কথার উত্তর না দিয়ে আভা খালি বলে 'আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, এক গ্লাস পানি খাব।'

হাসান তার অবহেলাটুকু ধরতে পারলো বলে মনে হলনা। তবে পানি এনে দিল যত্ন করে, সেই সাথে দুটো বিস্কিট।

পানিটুকু শেষ করে আভা যখন বলল তার খুব ক্লান্ত লাগছে, হাসান কী বুঝল কে জানে। ওকে ঘুমাতে বলে নিজে পাশের ডিভানে শুয়ে পড়লো। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নাক ডাকতে শুরু করলো। এই প্রথম লোকটিকে ভালো করে দেখল আভা। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। নাক ডাকার তালে তালে ছোট্ট ভুঁড়িটি ওঠা নামা করছে। চেহারায় কিছুটা ভালোমানুষির ছাপ। নিজের মনের রাশ টানলো আভা। না সে আর বেশি কিছু বুঝতে চায়না। না হোক বন্ধু, অন্তত আজ রাতের জন্য হাসানকে তার একজন নিরাপদ মানুষ মনে হচ্ছে। এটুকুতেই সে সন্তুষ্ট। চাওয়া পাওয়ার হিসেব আর মিলাবে না সে কোনদিন।

সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

তোরসা ঘোষাল

যাত্রা

১

কলকাতা, ভারত, ১৯৯৯

আআআআআ, বলো, নাভির থেকে উচ্চারণ করো। তোমার গলা কাঁপছে কেন? একদম শেষ সারির দর্শক যেন বিনোদিনী দাসির সব কথা শুনতে পায়। তারা যাত্রা পালা দেখতে পয়সা ঢালেনি? চীৎকার করো না

ঠাম্মা - আমার দাদীমা - বিনোদীনি দাসীকে কখনোই সাক্ষাৎ করেননি, অথবা "নটি বিনোদিনী" চরিত্রে- মূলত যেটি বিনোদীনি দাসীর জীবনের মঞ্চরূপ- যাত্রা-পালায় অভিনয় করেননি। তারপরও বিনোদীনি দাসী ঠাম্মার ঝুলিতে সঞ্চিত এক উদাহারণ। বিশেষত যখন আমাকে তিনি গানের তালিম দেন। এবং সেই সময়েই যদি ছোট টিয়া পাখীটি তীক্ষ্ণ শিষ দেয়, দাদী আমার উপর আরেকটি কাজের ভার চাপিয়ে দেন। যখন পাখিটা তার ছোট ছোলার দানিটা উল্টে ফেলে। ঠাম্মা বলে উঠেন, "এই, বলতো, পাখিটার চেঁচানোর উৎস কোনটি? বুক, পেট, নাকি নাড়িভুঁড়ি?" গলার ক্ষমতা নিয়ে দাদীর প্রশ্ন থেকেই যায়।

আমি হালকা গরম পানির কাপটা সিঙ্কে রেখে ঠাম্মার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। ভুলই উত্তর করি কিন্তু তারপর গড়গড় করা বাকি রেখে ঠাম্মার শব্দ প্রক্ষেপণ আর উচ্চারণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা শোনা শুরু করি যদি কিনা কখনোও কোন নাটকে যুগান্তকারী কোন চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে যাই। অনেক সময় বাবা আমাদের এই যজ্ঞে ব্যাঘাত ঘটান একটা ঘটনার বিবরণী শুনিয়ে- যখন তিনি আবিষ্কার করেছিলন এক অভিনয়-শিল্পীর পা-গুলো ছাড়িয়ে দিয়ে আমাদের বাড়ির পিছনে মূত্রত্যাগ করার ঘটনা, যিনি কিনা আবার যাত্রায় রামায়ন মঞ্চোস্থ হলে সীতা চরিত্রে অভিনয় করতেন।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি বাবার একমাত্র স্মৃতি যাত্রার- গণমানুষের কাছে এই শিল্প মাধ্যমটি এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। ছোটবেলায় তিনি ঠাম্মার, যিনি ছিলেন তার সৎমা, কর্মযজ্ঞের সঙ্গী হয়ে গ্রামে গ্রামে যেতেন। যাত্রা কোম্পানির সূচীর সাথে বাবা খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। ঠাম্মার সৃতিচারণ করে আমাদের জানিয়ে দেন। যাত্রা পালায় কর্মরত ঠাম্মার অভিনয় বাবাই বেশি দেখেছেন। যদিও বয়সে তিনি ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে সবচাইতে ছোট যখন দাদা ঠাম্মাকে বিয়ে করেন। ঠাম্মা বিয়ের এক বছরের মধ্যে যাত্রা-পালা ছেড়েছিলেন। বিনোদীনিও কি ঘর-সংসার করার

জন্য মঞ্চ ছেড়ে দেননি? যখন স্কুলের ইংরেজি শিক্ষকের সামনে বাৎসরিক নাটকের অডিশন দিচ্ছিলাম তখন ঠাম্মার অভিনয় জীবনের গৌরবময় দিনগুলো মনে করার চেষ্টা করি। চিত্রপটে ঠাম্মাকে আমার গল্পের মধ্যমণি বানিয়ে ড্রামা অডিশন ক্লাস থেকে শুরু করে ছুটির ঘণ্টা অবধি তার নাম জপতাম। তাতে ঠাম্মার পেশাগত জীবন শুরু হতো অপ্সরা ওপেরায় নাচিয়ে হিসেবে, যখন তিনি দর্শকদের নাচ দেখাতেন বেহুলা যাত্রা-পালার বিরতির সময়গুলোতে। কিন্তু মধ্যমণি তখনো ছিলেন জ্যোতি রানী, মনসা দেবীর আরাধনায় রচিত বেহুলা নাটকের মধ্যমণি।

যখন টিফিন বক্স খুলছিলাম, তখন উপলব্ধি করলাম ঠাম্মা কিভাবে অভিনয় শুরু করলেন তা স্পষ্ট করে জানিনা। ঠাম্মার পালার পরিচালক সুখেনদা মনে করতেন, মঞ্চে নারী চরিত্রের চিত্রায়ণ নারীরা করতে পারে না। তাতে বাস্তব আর অভিনয় জগতের মাঝে যে দেয়াল আছে তার অস্তিত্ব থাকে না। তাই জ্যোতিরানীর মতো পুরুষেরা নারীর চরিত্রে অভিনয় করতেন। কিন্তু সুখেনদা মত পরিবর্তন করলেন কেন? ঠাম্মার কাছ থেকে আমার বিস্তারিত জানতে হবে কিন্তু আমি আমার শ্রোতাদের পুরো গল্পের জন্য অপেক্ষা করাতে পারিনা। এটা তো আর বাংলা মেগাসিরিয়াল না যে ১৩০০ টি পর্বেই দর্শকের আগ্রহ থাকবে। মা বলেন যে ওইসব উপস্থাপনা যাত্রার মতোই উচ্চকণ্ঠ। ঠাম্মা বলে উঠেন যাত্রা মহাজীবন, কেবল থিয়েটার নয়, জীবনের যাত্রাও বটে। আমি তখন স্টার ওয়ার্ল্ডে ফ্রেন্ডস দেখায় ব্যস্ত।

সেই বছর সুখেনদার যাত্রা কোম্পানি আর অপ্সরা ওপেরা দক্ষিনপাড়া দিয়ে ভ্রমন করছিল, এইভাবেই আমি আমার কাহিনী শুরু করছি। তাদের প্রথম পরিবেশনা ছিল এই পুরাতন জমিদার বাড়ির জীর্ণ স্থাপনায়। মধ্যাহ্নভোজে খুব করে আগ্রহী। যাত্রা আর নাচের দল দুটো ধুলোমাখা পথ ধরে তাদের গন্তব্যে যাচ্ছিলো। বড়ো ইলিশ মাছের টুকরা বাসমতী চালের সমেত তারা কলাপাতার প্লেটে করে তারা খেত- জ্যোতি রানী সর্ষের ঝাঁজ খুব করে উদযাপন করছিল যখন তার চুল হালকা বাতাসে দোল খাচ্ছিল। কে জানতো সর্ষে-ইলিশ তার বিকেলের অভিনয়ে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে?

গলায় কাঁটা নিয়ে বেহুলা নিশ্চয়ই মনসাদেবীর কাছে স্বামী লখিন্দরের জীবন ভিক্ষা চাইতে পারতো না। কিন্তু বেহুলা পার্টটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর যাত্রাটির ঘোষণা বেশ ঘটা করে আগেই দেয়া হয়েছিল। কি আর করা? ঠাম্মা এগিয়ে এলেন। জ্যোতিরানীকে ঠাম্মা হাজারবার রিহার্সালে দেখেছিলেন, কিভাবে সে উষ্মা প্রকাশ করে অথবা হাত ফুটায় অথবা ভূরু কুঁচকায়। সে সুখেনদাকে তাই বলেছিল। কিন্তু জ্যোতি রানীকে ছাড়া তো বেহুলা-লখিন্ধরের পালা হতে পারেনা। যখন মানুষ দূর দূরান্ত থেকে কেবল তার চৌকস অভিনয়ই দেখতে আসতো না, তার সুললিত কণ্ঠের পালা গানও শুনতে আসতো। সবচাইতে বড় কথা হলো, যাত্রাপালার আয়োজক পরিবারটি কি কোন নারীকে তাদের প্রাঙ্গনে অভিনয় করতে দেবে? আমাদের দর্শকেরা আবেগময়, সুখেনদা বলছিলেন। কিন্তু জ্যোতি রানী সাজসজ্জার কালে রক্তবমি করলো- এইভাবেই ঠাম্মার মঞ্চে হাতে-খড়ি হল, ইলিশ মাছের কৃপায়।

পরদিন আমি জানলাম আমাকে পরীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে স্কুলের বড়দিন উপলক্ষে হওয়া নাটকে। আমার মাত্র দুটো সলিলকি বলার পার্ট দেওয়া হলেও, আমি অভিনয় করতে চাইলাম। ইংরেজি শিক্ষিকা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঠাম্মা ইস্কুলের ছাত্র ছাত্রিদের উদ্দেশ্যে বাংলার ফোক থিয়েটার নিয়ে বক্তৃতা দিতে পারবেন কিনা। আমি রাজি হয়ে গেলাম ঠাম্মার পক্ষ থেকে আর মাকে গিয়ে খবরটি দিলাম।

মা রাগান্বিত হয়ে ঠাম্মার যাত্রা পালার টুকিটাকি অভিনয়ের কথা বলে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন শুনলো আমি শিক্ষিকা আর ক্লাসমেটদের ঠাম্মা সম্পর্কে বলেছি তখন বললো আমি হটকারী হয়ে ঠাম্মাকে নিয়ে বড়াই করে ফেলেছি। মা বলে উঠলো ঠাম্মা কি পারবেন ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র ছাত্রীদের সামনে যাত্রা নিয়ে বয়ান দিতে? আমিই বা কীভাবে ঠাম্মার অভিনয়ের বিষয় উপস্থাপন করলাম আমি কি তার যাত্রা দেখিছি। শেষোক্ত অভিযোগটি মিথ্যা বটে।

আমি যাত্রা-অভিনয়ে ব্যাতিব্যস্ত ঠাম্মাকে যে শাড়ীতে দেখেছিলাম আমার গল্পের চোখ দিয়ে সেটি বনবিবি পরেছিল সেই যাত্রার সময়, যেটি আমাদের সামনে পরিবেশিত হয়েছিল আমরা যখন সুন্দরবনের বাঘের রিসার্ভে গেলাম। প্রতি শীতে আমার পরিবার আর আমি বাবার বন্ধু আর তাদের পরিবারের সাথে বেড়াতে যেতাম শহরের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পেতে। আমরা দামি হোটেলে থাকি যেগুলোর আশেপাশে গিঞ্জি বস্তি থাকে। দিনে আমরা বাজারে আর খামারে ঘুরে বেড়াই। রাতে বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেলে বাবা-মায়েরা স্কচ নিয়ে বসে পড়েন সুখ দুঃখের আলাপ সারতে। ঠাম্মা ওই একবারই আমাদের সাথে গিয়েছিলেন।

যেই রিসোর্টে আমরা থাকি সেগুলো বিকেল বেলার দিকে স্থানীয় পালার সমাবেশ ঘটায়। সাধারণত আদিবাসী নাচিয়েদের হাজির করা হয়, যারা কোমর দুলায় বাদ্যের তালে। সেইবার বনবিরির পালা হল। ঠাম্মা অবশ্য তা দেখতে রাজি হননি। আমি আশা করেছিলাম উনি আমাকে অভিনয় আর প্রোডাকশন সম্পর্কে কিছু বলবেন কিন্তু দিনের বেলায় বেড়িয়ে উনি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ঘুমোতে যাবার আগে আমার হাতে ১০০ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল ১০ বছরের অভিনেতা যে কিনা দুখি চরিত্রে অভিনয় করছিল তাকে দিয়ে দিতে- সেই গরীব ছেলেটা যে কিনা দক্ষিণ রায়ের লালসার বলি হয়েছিল। যখন পালা শেষ হল বাবা আমার হাতে নতুন নোট গুঁজে দিলেন পুরনো ঘামে নেয়ে থাকা নোটটি ছোঁ মেরে নিয়ে। আমাকে কিছু দশ টাকার নোটও দিলেন অন্য অভিনেতাদের দেওয়ার জন্য।

২

নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২০১৪

আজও চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই ঠাম্মা ছোট নৌকায় বসে নদী পার হচ্ছে। এখনও বনবিবির সাজে সে মনসা দেবীর সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, যার পায়ে সে লুটিয়ে পড়বে।

দেবতারা তাকে নাচতে বলবে - উনি কোনভাবে অপ্সরার থিয়েটার কোম্পানির গতানুগতিক নাচ করবেন।

আমি আবার ঠাম্মা-নির্ভর হলাম ফ্রেশম্যান বছরে যখন আমার নাট্যদলে যোগদানের আয়োজন চলছিল। প্রথম অডিশনের দরখাস্ত চেয়েছিল আমরা মঞ্চের সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে লিখি। আমি আমার হাই স্কুলের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ভাবিনি অডিশনে সফল হতে। বরং ঠাম্মার কথা বলেছিলাম, বোঝাতে চেয়েছিলাম যে বাংলা ইনডিজেনাস থিয়েটারের সাথে আমার নাড়ীর টান আছে। আমি থিয়াটার নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেছি আমার মা-বাবাকে অবাক করে, যারা আমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিল নিউরোসায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে।

গতকাল বিকেলে আমার সিনিয়র বর্ষের শেষ পরিবেশনা ছিল। আমরা আমার করা নয়টি বিনোদিনীর ক্রিয়েটিভ ট্র্যান্সলেশন আগে অনেকবার মঞ্চস্থ করেছি। তাই আমাকে হঠাৎ ব্যাকস্টেজে ব্যস্ত হয়ে পায়চারী করতে দেখে নাটকের ডিরেকটর ডোরি বলে উঠলো "অভিনয় তোমার রক্তে। টেক ইট ইজি।" আমার মনে হল ও আমার বায়োনোট এখনো ভোলেনি। "আমি ষ্টেজ ফ্রাইটে ভুগছিনা" আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম। মা নাটক শুরু হবার এক ঘণ্টা আগে আমাকে উৎসাহ আর আশীর্বাদ জানাতে ফোন করেছিল। বলছিল ঘুমোতে যাবার আগে ঠাম্মা আমাদের আঠারো বছর বয়সী টিয়া পাখিটার গলা টিপে হত্যা করেছে।।

(ইংরেজি থেকে ভাষান্তর: আসিফ ইকবাল)

তোরসা ঘোষাল: সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
আসিফ ইকবাল: ল্যান্সিং, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

দীপেন ভট্টাচার্য

রান বয় রান

১

কালো ঘুড়িটা হঠাৎ করেই কাত হয়ে পাক খেল। যেন চাঁদা মাছ হাঙর দেখে দিশেহারা হয়ে কোথায় পালাবে বুঝতে পারছে না। পালানোরই কথা কারণ অমলের লাল কয়রা ঘুড়ির সুতো কালো ঘুড়িটার সুতোকে পেঁচিয়ে ফেলেছে। অমল তার সুতোর ওপর বিশ্বাস রাখে। ঐ কালো ঘুড়িটা তারই হবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। নাটাইয়ে টান দেয় অমল, কিন্তু আকাশের খেলার মাঠে পৃথিবীর বিশ্বাস সব সময় চলে না। কালো ঘুড়ি আর একটা ঘূর্ণি দিয়ে উঠে গেল অনেক ওপরে, সাথে নিয়ে গেল অমলের লাল ঘুড়িটা। কালো ঘুড়ি অমলের লাল ঘুড়ির সুতো কেটে দিয়েছে। লাল ঘুড়ি উড়ে যেতে থাকে। ঘুড়িটা অমল মাসখানেক আগে চার আনা দিয়ে বাংলাবাজার থেকে কিনেছিল। তার বন্ধু দুলাল তাকে ঘৃতকমলে মাঞ্জা দেওয়া, কাচের গুঁড়ো লাগানো সুতো দিয়েছিল। সেই সুতো কোনো কাজেই লাগল না। কিন্তু সুতোর চেয়ে বড় কথা ঐ ঘুড়িটা অমলের হৃদয়ের অংশ ছিল। ঘরে জায়গা নেই, তবু রাত্রিবেলা মাথার পেছনে ঘুড়িটা না রেখে ঘুমালে তার চলে না। মা বকাবকি করেন, কিন্তু অমলের রাতে ঘুম হয় না ঘুড়ি দূরে রাখলে। ঘুড়ি মাথার কাছে রাখলে স্বপ্ন দেখে অমল। সে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুড়ি উড়াচ্ছে। আর অন্য যেসব ঘুড়ি তার ঘুড়ির সমান উচ্চতায় উঠতে চাইছে তাদের সে অনায়াসে কেটে দিচ্ছে। সেইসব কাটা ঘুড়ি ভেসে যাচ্ছে দিগন্তে লাল মেঘের পেছনে যেখানে সূর্য ডুবছে।

কিন্তু আজ তারই কাটা ঘুড়ি উড়ে যায় রাজার দেউড়ি পেরিয়ে, কারকুন বাড়ি লেন পেরিয়ে, পানি টোলা রোড পেরিয়ে, কোতোয়ালি পেরিয়ে, নবরায় লেন পেরিয়ে নদীর দিকে। তার স্বপ্নের আধার ভেসে যায়। কপালের ওপর ডান হাতটা তুলে চোখকে সূর্যের আলো থেকে বাঁচিয়ে অমল দেখতে চায় ঘুড়িটা কোনদিকে যাচ্ছে। দক্ষিণে পুরনো শহরের কালো শ্যাওলা জমা ছাদগুলোর ওপর জং-ধরা জলের ট্যাংকগুলোর ওপর দিয়ে সোজা দক্ষিণে। চৈত্রের নিদাঘ আকাশে এক নির্মোহ উদাসীনতায় গা এলিয়ে অমলের লাল ঘুড়ি চলে যেতে থাকে। তার ঘুড়ির নির্বিকার বিশ্বাসঘাতকতায় অমলের চোখে জল আসে। দু-গাল বেয়ে টসটস করে জল পড়ে। কিন্তু ক্ষণিকের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠে তেতলার ছাদ থেকে এক অন্ধকার সরু সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে অমল নিচে নেমে আসে। নামতে নামতে একটা ভাঙা সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

বাড়ি থেকে বের হতে হতে মা'র গলা শোনে সে, "এই দুপুরে কোথায় যাচ্ছিস?" কিন্তু অমলের তখন থেমে উত্তর দেবার সময় নেই।

রাস্তায় নেমে ওপরে তাকিয়ে ঘুড়িটা দেখতে পায় না অমল। ছোট গলিটার ওপরে এক চিলতে মেঘহীন আকাশ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে। দুপুর তিনটে। রাস্তায় লোক কম। দোকানের ঝাঁপি বন্ধ। গলি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে অমল একটা খোলা জায়গায়। জগন্নাথ কলেজ, উল্টোদিকে বাহাদুর শাহ্‌ পার্ক যার নাম পুরোনো সময়ে ছিল ভিক্টোরিয়া পার্ক। এখানেও রাস্তা বেশ ফাঁকা। একটু হেঁটেই ঘুড়িটার দেখা পায় অমল। পাটুয়াটুলির আকাশে তার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল সেই লাল চতুষ্কোণ। তাকে দেখে পশ্চিমদিকে মোড় নেয় ঘুড়ি। ইসলামপুর রোডের ওপর দিয়ে ওড়ে কিন্তু দুদিকে দুলতে দুলতে নিচেও নামে। অমল রাস্তার ডানদিক ঘেঁষে দৌড়ে ইসলামপুর রোডে ঢোকে। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। কিন্তু সেই কাজের দিনেও ইসলামপুর রোড ফাঁকা ছিল। ঘুড়িটা প্রায় হঠাৎ করেই রাস্তার ডানদিকে কয়েকটা বাড়ির পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অমল প্রথমে বুঝে পায় না কীভাবে সে ঐ বাড়িগুলির পেছনে যাবে। একটু এগিয়ে দেখে রাস্তার ডানদিকে কবিরাজ লেন বেরিয়ে গেছে। কিছু পরেই হাতের ডানদিকে আর একটা ছোট গলি পড়ল। অমলের মনে হল এই গলিটার আশেপাশেই ঘুড়িটা নেমে আসতে পারে।

গলিটার মধ্যে সূর্যের আলো ঢোকার ব্যবস্থা ছিল না। কয়েক ফুট চওড়া। দু'জন মাত্র মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে। গলিটার শেষে প্রায় শ'দুয়েক ফুট দূরে সূর্যালোক চোখে পড়ে। সুরঙ্গর শেষে যেমন আলো দেখা যায়। দুদিকে কিছু জায়গায় উঁচু পাঁচিল। কিছু জায়গায় কোনো কোনো বাড়ির দরজা। কোনো জায়গায় আবর্জনা ফেলা। একপাশে খোলা ড্রেন। সেই নির্জন গলিতে ভয়ে ভয়ে অমল পা ফেলে হাঁটে। কিন্তু একটু পরেই দেখে তার লাল ঘুড়িটা ঠিক গলির মাঝখানে পড়ে আছে। বিশ্বাস করতে পারে না সে নিজের ভাগ্যকে। তার বন্ধু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। দৌড়ে গিয়ে মাটি থেকে দু'হাতে যত্ন করে ঘুড়িটা তোলে অমল। দাঁড়ায়, খুঁটিয়ে দেখে কোনো জায়গায় কাগজ ছিঁড়েছে কিনা।

দূরে গলির অপর প্রান্তে গোলযোগ শোনে অমল। ভাল করে সেই দিকটা দেখতে পায় না। মনে হয় একটা ছায়া দৌড়ে আসছে। তারপর বোঝে একজন মানুষ তার দিকে দৌড়াচ্ছে। সূর্যের আলোটা পেছনে থাকায় তাকে একটা কালো ছায়া মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই লোকটির পেছনে আরো কয়েকজন ছিল। কয়েক সেকেন্ড লাগল। অমল বুঝল সামনের লোকটিকে ধরার জন্য পেছনের মানুষ ক'টি তাড়া করছে। অমল খুব ভয় পেল কিন্তু ওরা যে বেগে দৌড়াচ্ছে তাতে সে তাদের আগে গলির এই প্রান্তে, যে প্রান্ত দিয়ে সে ঢুকেছিল সেখানে পৌঁছুতে পারবে না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রায় দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে অমল।

সামনের মানুষটা অমলের থেকে দশ ফুট মত দূরে এলে অমলের উপস্থিতি বুঝতে পারে। তার হাতে ধরা একটা জিনিস থেকে রঙিন আলো এসে পড়ে অমলের মুখে। বেশ বয়স্ক মানুষ। অমল ভাবে চল্লিশ বছর তো হবেই। পঞ্চাশও হতে পারে। ষাট হলেও আশ্চর্য হত না সে। অমলের মত বয়সের কিশোরদের বড় মানুষের বয়স সম্পর্কে ধারণা নেই। অমল দু'হাত দিয়ে ঘুড়িটা যেভাবে আগলে রেখেছিল সেটা দেখে সেই বয়স্ক মানুষটা যেন তার দৌড়ের খেই হারিয়ে ফেলল। অমলের মনে হল সে যেন মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। তারপর একটা অদ্ভুত কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠল, "রান, বয়, রান।" তার কপালের একটা প্রান্ত রক্তাক্ত। তার উদভ্রান্ত চোখ দেখে মনে হল সে যেন আরো কী বলতে চেয়েছিল কিন্তু পেছনের লোকগুলো ততক্ষণে খুব কাছে চলে এসেছে। শুধুমাত্র তখনই অমল বুঝল তাড়া করছে যে মানুষগুলো তারা বয়স্ক নয়। চার-পাঁচটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে। কিন্তু ওরা যেন অমলকে দেখতেই পেল না। তাড়া-খাওয়া মানুষটা আর ঐ ছেলেগুলো গলির এই প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে গেল।

সেই রাতে মেঝেতে পিঁড়ির ওপর বসে ভাতের সাথে কই মাছ খেতে খেতে অমল বলল, "মা, আমাকে আজ একটা লোক বলল, 'রান, বয়, রান।' ইংরেজিতে আমাকে দৌড়াতে বলল। কিন্তু আমাকে দেখে ইংরেজি বলল কেন, মা?"

২

সেই বৃহস্পতিবারের পর আরো ২৩১৩টি বৃহস্পতি এল, গেল। ১৬১৯১টি দিন পার হল, ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা প্রায় ১৪০ কোটি সেকেন্ড গুণল। বর্ষা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। গ্রীষ্মের দাবাদহ কমেছে অল্প। দুপুর দুটোর সময় পৌঢ় অমল জগন্নাথ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বহু বছর পরে দেশে ফিরেছে সে। জগন্নাথ কলেজ এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। নতুন দালান উঠেছে। পুরোনো জায়গা অচেনা হয়ে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে তার চোখে পড়ল বাহাদুর শাহ পার্কের পাশে ফুটপাথের ওপর একটা জটলা। প্রবাসী অমলের সব ব্যাপারেই কৌতূহল। রিক্সার স্রোত বাঁচিয়ে সে রাস্তা পার হয়। মানুষজনের ভিড় ঠেলে যায় জটলার ভেতর। মাটিতে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা পাখি। চারজন পনেরো-ষোল বছরের কিশোর সেই পাখিকে ঘিরে রেখেছে। পাখিটার রক্তোপল ডানা, সাদা ঘাড় ও মাথা এবং বাঁকা ঠোঁট দেখে মুহূর্তেই চিনে নিল অমল শঙ্খচিল। ঢাকার আকাশে শঙ্খচিলের দেখা সহজে পাওয়া যায় না। পাখিটার দুটো পা কালো সুতোয় বাঁধা। একটু সময় লাগল বুঝতে অমলের। তারপর বুঝল ঘুড়ির সুতো আকাশের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে মুক্ত পাখিকে পঙ্কিল পৃথিবীতে। ক্লান্ত হয়েছিল পাখিটা তবু মাঝেমাঝে ডানা ঝাপটাচ্ছিল। অমল ভাবল ছেলেগুলো পাখিটা মুক্ত করতে চাইছে। খুলতে চাইছে পায়ের সুতোর বেড়ি। কিন্তু তার ভুল ভাঙতে দেরি হল না। একটা ছেলে ছোট একটা ঢিল তুলে পাখিটার দিকে ছুড়ল। ঢিলটা পাখিটার পাখায় লাগল। পাখিটা শিশুর মত ডেকে উঠল। শঙ্খচিলের ডাক শিশুর কান্নার মত। অমলের হৃদয় দুমড়ে

মুচড়ে গেল সেই শব্দে। চিৎকার করে ওঠে অমল। "কী করছ তোমরা! পাখিটাকে মেরে ফেলবে তো?"

অমল ভাবে তার সাথে সায় দেবে উপস্থিত জনতা। কিন্তু নিশ্চুপ থাকে জনতা। চারটা ছেলে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়। তাদের পেছন থেকে হঠাৎ করে পঞ্চম ছেলের আবির্ভাব হল। এতক্ষণ কোথায় ছিল এই ছেলেটা? পঞ্চমের পরিধানে জিন্সের প্যান্ট। ইংরেজিতে লেখা গেঞ্জি। তার দৃষ্টির ক্রুরতা গ্রীষ্মের উষ্ণতা ফিরিয়ে নিয়ে আসে। "কেরে, এইডা কই থিকা আইল?" ছেলেটি চেঁচিয়ে ওঠে, এই অনুষ্ঠানের সে-ই সর্দার। অমল পিছু হটে। পাঁচটি ছেলে তার দিকে এগিয়ে আসে। হঠাৎ একটা ঢিল এসে অমলের কপালে লাগে। ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে অমল। কপালে হাত দিয়ে দেখে রক্ত পড়ছে। কপালে হাত ওঠাতে ওঠাতেই তার চোখে পড়ে সর্দার ছেলেটি পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করছে। পালাতে হবে, পালাতে হবে, ক্ষণিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠে অমল।

ভিড় ঠেলে ফুটপাথ থেকে রাস্তার ওপর নামে অমল। মাথার পেছনে ছোট একটা ঢিল আঘাত করে। এবার ক্ষণিকের জন্য চোখে অন্ধকার নামে। কিন্তু বাঁচতে হলে তাকে দৌড়াতে হবে। রাস্তার চলমান রিক্সাগুলির ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে দেহ গলিয়ে অন্যপারে পৌঁছায় সে। তারপর দৌড়ায় পাটুয়াটুলির দিকে। কিন্তু ছেলে ক'টি তার পেছন ছাড়ে না। এই বয়সেও অমল দৌড়াতে পারে ভালই। যে দেশে থাকে সেখানে সপ্তাহান্তে দূর পাল্লার দৌড়ে সে অংশগ্রহণ করে। ডান হাতে মোবাইল ফোনটা আঁকড়ে ধরে দৌড়ায় অমল।

দৌড়ায় অমল ইসলামপুর রোড দিয়ে। রিক্সার পাশ কাটিয়ে। রাস্তার লোক হাঁ করে দেখে। গহনার দোকান, কল-কবজা ফিটিংসের দোকান, কাপড়ের দোকান সবই খোলা, কিন্তু সেখানে থেমে সাহায্য চাওয়া যাবে না বরং তাকে ছিনতাইকারী ভেবে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে। পেছনে ছেলেগুলো "ধর ধর" বলে চিৎকার করছে। এই শহরে কে কাকে সাহায্য করে? অমল ভাবে সে দৌড়াচ্ছে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক নীল হ্রদের প্রান্তে। হ্রদের স্বচ্ছ জলের নিচে পাথর দেখা যায়। তার পাশ দিয়ে মাছ চলে যায়। অমল অনুভব করে পাহাড়ে ঝাউয়ের আন্দোলন। তার গতি বাড়ে, রিক্সা, ঠেলা আর মানুষের ভিড় কাটিয়ে সে উড়ে যায় শঙ্খচিল পাখির মত। পিছনের ছেলেগুলি পিছু ছাড়ে না। কিন্তু তারা অমলের দৌড়ের গতিবেগ দেখে আশ্চর্য হয়। বুড়ো লোকটাকে তারা ধরতে পারছে না দেখে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। তাদের ক্রুদ্ধ গালাগালি অমলের কানে পৌঁছায়।

একটা ছোট রাস্তা পড়ে হাতের ডানে। এইসব গলি এককালে কত পরিচিত ছিল, আজ স্মৃতি হাতড়ে তাদের নাম মনে করতে হয়। অমল সেটাতে ঢোকে। তারপর আর একটা গলি ধরে, খুব সরু ছিল সেই গলিটা। অন্ধকার নির্জন গলি, খুব দূরে সুড়ঙ্গের শেষে সূর্যের আলো দেখা যায়। গলিটার মাঝামাঝি এলে তার চোখে পড়ে একটা ছোট ছেলে একটা লাল ঘুড়ি নিয়ে দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে। অমলের ডান হাতে ধরা মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের রঙিন আলো গিয়ে পড়ে ছেলেটার মুখটার ওপর। ছেলেটিকে চিনল সে। অমল এক মুহূর্ত সময় নেয়। সেই মুহূর্তটা তার মনে অসীম সময় ধরে বিস্তৃত

হতে থাকে। ঐ ছেলেটিকে অমলের অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু সে অনুভব করে ছুরি হাতে পেছনে সর্দার ছেলেটি খুব কাছে এসে পড়েছে। ১৬১৯১টি দিন এক সেকেন্ডের মাঝে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু অতগুলো দিনও নয়। অমলের দরকার ছিল শুধু একটি দিনের কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করা। শুধু একটি সতর্কবাণী। কিন্তু তার মুখ দিয়ে মাত্র তিনটি কথা বের হয়, "রান, বয়, রান"।

পেছনের পদশব্দগুলো যেন অমলের কানে বিস্ফোরিত হতে থাকে। এখানে দাঁড়ানো চলবে না একেবারেই, নইলে এই গলিতে তার মৃত্যু অনিবার্য। ঘুড়ি-ধরে থাকা ছেলেটিকে সেখানে রেখেই গলির অপর প্রান্তে বের হয়ে আসে অমল। যতক্ষণে সে আবার ইসলামপুর রোডে পৌঁছায় ততক্ষণে সেই ছেলেগুলো ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে। তবু দৌড় থামায় না। অমল ফিরে আসে বাহাদুর শাহ পার্কে। কপাল দিয়ে ঘাম চোখে পড়ায় চোখ জ্বলছে। ঘামে জবজব করছে জামা। পথচারীরা তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়।

কিন্তু পার্কের পাশের ফুটপাথে সেই জটলা আর ছিল না। ছিল না সেই শঙ্খচিল পাখিটাও। পাখিটাকে কি কেউ সাহায্য করেছে? উড়ে গেছে কি পাখি নীল আকাশে? খোঁজ করে অমল। চারদিকে তাকায়। ওপরে তাকায়। দেখে পার্কের বেড়ার ওপর বসে আছে একটা কাক। সেই কাকটার দুটো পায়েই ঘুড়ির কালো সুতো জড়ানো। যেমন জড়ানো ছিল সেই শঙ্খচিলের। কাকটা অমলকে দেখে মাথা কাত করে একদিকে। যেন চিনতে পেরেছে। তারপর দু-বার কা-কা করে উড়ে যায় পার্কের ভেতরের বড় ছাউনিটার ওপর দিয়ে পূর্ব দিকে। তার দুটো পা থেকে ঝুলতে থাকে কালো সুতো।

দু-দিন পরে ঢাকা থেকে বিমানে চড়ে উড়ে যায় অমল পশ্চিমে। বিমানের জানালার কাচে মাথা ঠেকিয়ে শহরটাকে দেখতে চায় শেষ বারের মতন। জানালায় তার নিশ্বাস ঘনীভূত হয়। বিমান কাত হয়ে ঘুড়ির মতন। শহরও কাত হয়ে যায়। আপেক্ষিকতা সূত্র বলে বেশি গতিতে ভ্রমণ করলে সময়ের মন্দন হয়। ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা যায়। কিন্তু অতীতে ফেরা যায় না। বালক অমল ভবিষ্যতে ভ্রমণ করেছিল। শুনেছিল সাবধানবাণী "রান, বয়, রান"। কিন্তু সেই বাণীর পুরো অর্থ সে তখন বোঝেনি। শুধুমাত্র আজ, ১৬১৯১ দিন পরে, পৌঢ় অমল বুঝতে পারল সে কী বলতে চেয়েছিল নিজেকে। কিন্তু সেই অতীতে ফিরে যাবার তার কোন ক্ষমতা নেই। অসংখ্য সম্ভাব্যতার বিচারে সময়ের দরজা খোলার সামান্য সম্ভাবনা হয়তো থেকে যায়। কিন্তু একবারের বেশি দু'বার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা কম।

১৬১৯০ দিন আগে, শুক্রবারের খুব ভোরে সূর্য তখনো ওঠেনি। তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ভিনদেশি সৈন্যরা। ১৯৭১র মার্চের এক ভয়াল রাত ছিল সেটা। অমলকে তার বাবা-মা বাড়ির পাঁচিল দিয়ে উঠিয়ে পেছনের গলিতে নামিয়ে দিতে পেরেছিলেন। মা আর বাবাকে সেই শেষবারের মত দেখে অমল। অনেক বছর পরে শুনেছিল জগন্নাথ কলেজের মাঠে পুরোনো বহু হাড় আর করোটি পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র আজ, এত বছর পরে অমল বুঝল "রান, বয়, রান" কথাটা তাদের বাড়ির সবার জন্যই প্রযোজ্য ছিল। অমল ভাবে কী বললে সেই সতর্কবাণীটা তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে

দেওয়া যেত। অমল ভাবে কিন্তু অথৈ আকাশে কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। বহু নিচে সবুজ আয়তাকার খেতগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে থাকে। মেঘের ওপরে বিমান উঠে যাবার আগে শেষবারের মত শঙ্খচিল পাখিটা খোঁজে অমল। শঙ্খচিলটা কীভাবে কাক হল। ভাবে সে। ভাবে তার দৌড়ানো এখন শেষ হয়নি। ভাবে সেই লাল ঘুড়িটার কথা যেটা সেই কবে বাড়িটার সাথে পুড়ে গিয়েছিল।

মোরেনো ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

নাহার তৃণা

তিমির তরঙ্গ

১

ঠিক সাড়ে ছ'টায় সকালের হাঁটাহাঁটি সেরে বাড়ি ফিরেন ফরিদ সাহেব। রুটিনের খুব একটা হেরফের হয়নি আজ পর্যন্ত। বাড়ি ফিরে, মৃদু উষ্ণ পানিতে একটা গোটা লেবুর রস, আর সামান্য মধু মেশানো পানি পান করেন। এক্ষেত্রে, স্ত্রী আয়েশা বেগমেরও সময়ের খুব একটা এদিক-ওদিক হয়না। ফরিদ সাহেব চেয়ার টেনে টেবিলে বসা মাত্র লেবু পানি নিয়ে হাজির হন আয়েশা বেগম। সকালের হাঁটাহাঁটিতে বলে বলেও, ফরিদ সাহেব স্ত্রীকে সঙ্গী করতে পারেননি। আয়েশা বেগমের সেই এক কথা, না বাবা তোমার মতো হনহন করে অতটা পথ হাঁটা আমার পোষাবে না। চেষ্টা যে করেননি তা নয়। উৎসাহ নিয়ে একদিন স্বামীর সঙ্গী হয়ে সুবিধা করতে পারেননি। তাঁর সকালের হাঁটাহাঁটির পর্ব তাই বাদ।

বিকেলের হালকা চা-নাস্তা সেরে, দু'জনে টুকটুক করে আশেপাশের এলাকায় খানিক হেঁটে আসেন। ফিরতে ফিরতে মাগরিব হয়ে যায়। নামাজ পড়ে, পড়াশোনা লেখালেখির কাজ থাকলে, সেগুলো নিয়ে বসেন ফরিদ সাহেব। বেশির ভাগ দিনেই আয়েশা বেগম নারী কেন্দ্রের খাতাপত্র নিয়ে বসেন। এখন মূলত তিনি কেন্দ্রের হিসাব নিকাশ, বিভিন্ন প্রকল্পের বাজেট, নতুন প্রস্তাবনা উত্থাপন এবং সেসব যাচাইয়ের কাজগুলোর তত্ত্বাবধানে আছেন। ঘরে বসে সেগুলোর অধিকাংশ করে নেয়া যায়। আগের মতো ছুটোছুটির কাজগুলোতে শরীর তেমন সায় দেয় না। নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে দু'তিনজন কে তৈরি করে নিয়েছেন। তারাই প্রয়োজন মতো সেগুলো দেখে। নিয়ম করে প্রতিদিনই আয়েশা বেগম কেন্দ্রের ফাইলপত্র নিয়ে আসেন। স্বামী নিজের কাজে ডুবে গেলে তিনিও নিজের কাজগুলো সারেন, কখনও টিভি দেখেন, নইলে বই পড়েন পছন্দ মতো। টিভির নেশা তাঁর তেমন একটা নেই। মনিরার জন্য টিভি খুলতেই হয়। বাড়ির যাবতীয় কাজ হাসিমুখে করতে মনিরার জুড়ি নেই। কিন্তু সন্ধ্যার পর টিভি না চললেই তার মুখ ভার। আর কোনো আব্দার নেই, কিন্তু রোজ টিভি দেখা চাই। কোন চ্যানেলে কী অনুষ্ঠান, সব মনিরার মুখস্থ।

ফরিদ সাহেব মাঝে মধ্যে টিভিতে খবর দেখেন। আজকাল খবর শোনার চেয়ে দেখার ব্যাপারই তো বেশি। যে যার মতো দেখনদারীতে ব্যস্ত। দুনিয়া জুড়ে শুধু হানাহানি, ভাংচুর, খুন-জখম আর ধর্ষণের সচিত্র প্রতিবেদন। সেসব দেখেন আর বিরক্তিতে

গজগজ করেন। বই-খাতা থেকে চোখ তুলে আয়েশা বেগম কখনও কখনও স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। স্বামীর মন অন্য দিকে ঘোরানোর জন্য হয়ত জানতে চান, "আচ্ছা অমলেন্দু চক্রবর্তীর বইটা পড়েছো?" ফরিদ সাহেব হয়ত তখন, সিরিয়া বিষয়ে রাশিয়া আর ইরানের পদক্ষেপের জবাবে ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার খবরটা নিয়ে রীতি মতো বিরক্ত। এরকম একটা সময়ে, হঠাৎ অমলেন্দু চক্রবর্তীর নাম ওঠায় বেশ ভ্যাবাচাকায় পড়ে যান। ঠাহর করে উঠতে পারেন না, সিরিয়া সম্পর্কিত বিষয়ে অমলেন্দু চক্রবর্তীর ভূমিকা ঠিক কী! বিষয়টা স্পষ্ট করতে স্ত্রীকে পালটা প্রশ্ন করেন, "অমলেন্দু চক্রবর্তী সিরিয়া বিষয়ে কি লিখেছেন? না, পড়িনি তো তেমন কিছু।" হঠাৎ মেজাজ হারানো বাচ্চা ছেলেকে শান্ত করার ভঙ্গিতে মুখে হাসি টেনে আয়েশা বেগম জবাব দেন- "না, না, আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা বলছিনা। সেদিন, তোমার ছাত্র বকুল, যে বইটা দিয়ে গেলো, "আকালের সন্ধানে", অমলেন্দু চক্রবর্তীর লেখা। তুমি খুব উৎসাহ দেখালে পড়বে বলে?"

মুহূর্তকাল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে, ফরিদ সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন। "তুমি পারোও বটে আশা। কীসের সাথে যে কী মিশিয়ে ফেলো, বুঝে কার সাধ্যি!" স্বামীর অগোচরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন আয়েশা বেগম। এই বয়সে, হুট হাট উত্তেজনা ভালো নয়। গত বছরে ছোটোখাটো একটা এ্যাটাক হয়ে গেছে। তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব হয়, স্বামীকে উত্তেজনা বা হঠাৎ মেজাজ খারাপ হওয়া থেকে আলগোছে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। ভোরে স্বামীর হাঁটাহাঁটিতে সঙ্গ দিতে না পারাটা তাঁর জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশের ফ্ল্যাটের ডাক্তার ভাই হন্টন সঙ্গী হওয়াতে এখন স্বস্তিতে থাকেন।

ফরিদ সাহেব সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন বছর খানেক হলো। তাই বলে, সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে এখনও পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেননি। একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস নিয়ে থাকেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ প্রজেক্টেও সাধ্য মতো সময় দিতে হয়। যদিও ফরিদ সাহেবকে অনুরোধের ঢেঁকি গেলানো একটু কষ্টসাধ্যই, তবুও এমন কিছু প্রিয়ভাজন আছেন, যাঁদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের অনুরোধে ফরমায়েশি লেখার পাশাপাশি, নিজ উৎসাহে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কলামও লিখে থাকেন। স্ত্রী আয়েশা বেগমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, নারী শিক্ষা কেন্দ্রটিতেও মাঝে মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে নানান বয়সীদের শিক্ষার পাশাপাশি, অর্থনৈতিকভাবে নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফরিদ সাহেব বরাবরই স্ত্রীকে এসব বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। সৌরভ ক্লাস সিক্সে ইংরেজিতে ফেল করায়, ছেলেকে সময় দেয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল আয়েশা বেগমের। পাশাপাশি নিজ উদ্যোগেই কিছু একটা করবেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে কলেজের চাকরিটা হুট করে ছেড়ে দেন। ছেলের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে গিয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়া বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমমনস্ক কিছু মানুষ নিয়ে নারী কেন্দ্রটি গড়ে তোলার জন্য নিজের শ্রম, সময়, মেধা, এবং অবশ্যই সাধ্য মতো অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেবার সিদ্ধান্তে, বাধা দেয়া উচিত ভাবেননি ফরিদ

সাহেব। স্ত্রীর কাছে শুধু জানতে চেয়েছিলেন, তিনি যা করছেন স্বপ্রণোদিত হয়েই করছেন কিনা? স্ত্রীর হ্যাঁ বাচক উত্তরে তিনি যেন স্বস্তিই পেয়েছিলেন। ফরিদ সাহেব মনে করেন, একটা সমাজের প্রকৃত 'হিরো' হলেন নারীশক্তি। অথচ তাঁদের সবার গল্প সমাজ কান পেতে শুনতে নারাজ। এসব গল্প তখনই বেরিয়ে আসবার শক্তি পায়, যখন একটা সমাজে তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হয়। উইমেন্স ইকোনমিক ইমপাওয়ারমেন্ট, এডুকেশনাল ফাউণ্ডেশন, ইত্যাদি কর্মযজ্ঞে স্ত্রীর উৎসাহে ফরিদ সাহেবের আনন্দ হয়। আশাবাদী হতে কার না ভালো লাগে। ফরিদ সাহেব চিরকালই ভীষণ আশাবাদী মানুষ। আয়েশা বেগম মাঝে মধ্যে কেন্দ্র নিয়ে হতাশ হয়ে পড়লে, ফরিদ সাহেব তাঁকে আশার কথা শোনান। এই দম্পতি, একে অন্যের কাজেকর্মে সহৃদয় উৎসাহ যোগান। একটা দীর্ঘ সময় পাশাপাশি থেকে, কেবল নিজেদের নেবার পাল্লা ভারী না করে, সাধ্য মতো সমাজকেও কিছু ফিরিয়ে দেবার আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দুজনে।

২

আয়েশা বেগম-ফরিদ সাহেব দম্পতির এক মাত্র সন্তান সৌরভ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে গিয়ে, ওখানেই পাকাপাকি ভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে এখন নামকরা কোম্পানীর চাকুরে। ছেলের সিদ্ধান্তে তাঁরা বাধা হননি। জীবনটা যার, সিদ্ধান্তটা তার নিজের হলে পরবর্তীতে কোনো পক্ষকে দোষী করার থাকে না। সিদ্ধান্ত গ্রহনে, আবেগের চেয়ে বিবেক-বাস্তবসম্মত বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে ফরিদ সাহেব অধিক পক্ষপাতী। ছেলের সিদ্ধান্ত, ছেলের ভবিষ্যতের নিশ্চিত নিরাপত্তা দিতে সমর্থ্য, সন্দেহ নেই। কাজেই, এ নিয়ে তাঁদের দু'জনের কেউ প্রকাশ্য হাহুতাশ করেননি। আয়েশা বেগমের মায়ের মন, খোলাভাবে ছেলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পারলেও চুপচাপ থেকেছেন, উচ্চবাচ্যে যাননি। ছেলের কথা বলতে গিয়ে, মাঝে মধ্যে, আয়েশা বেগমের বুক চিরে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস জানান দিয়ে যায়, বিষয়টা ঘিরে একটা হিমবাহ কষ্ট তাঁর বুকের খাঁজে মাথা লুকিয়ে আছে।

মাস ছয়েক আগেই তাঁরা দু'জনে ছেলের কাছ থেকে ঘুরে এসেছেন। সৌরভ মা বাবাকে নিয়ে আমেরিকার বেশ কিছু রাজ্য ঘুরে দেখিয়েছে। বিদেশ বিভূঁইয়ের পরিবেশ ফরিদ সাহেব বা আয়েশা বেগমের অপরিচিত নয় মোটেও। স্বামীর পেশাগত কাজের সঙ্গী হিসেবে, জীবনের বেশ ক'টা বছর আয়েশা বেগমকে দেশ ছেড়ে বিদেশে কাটাতে হয়েছিল। অক্সফোর্ড অন্তর্ভুক্ত প্রেস্টিজিয়াস কলেজ হার্টফোর্ড থেকে ফরিদ সাহেব তাঁর পিএইচডি ডিগ্রী নিয়েছিলেন। ডিগ্রী লাভের পরপরই, দেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তারপর বেশ কয়েকবার তাঁকে বিদেশগামী প্লেনে চড়ে বসতে হয়েছে, কর্মসূত্রে। স্ত্রী মাঝে মধ্যে সেসব যাত্রার সঙ্গী হয়েছেন বৈকি। তবে ছেলের ছুতোয় এভাবে বিদেশ ভ্রমণের অনুভূতির আনন্দ একেবারেই অন্যরকম। যে কয়েকদিন তাঁরা ছেলের কাছে ছিলেন, সৌরভ সাধ্য মতো সেবাযত্ন করেছে মা বাবার। কাজ থেকে ফিরে, বা কাজে গিয়েও ফোনে তাঁদের সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিয়েছে।

সৌরভের নতুন কেনা বাড়িতে টুকটাক সাজানোর কাজ করে তৃপ্তির পাশাপাশি ছেলের জন্য একটা বউয়ের খুব অভাববোধ করেছেন আয়েশা বেগম। সেকথা ছেলেকে বলা মাত্রই, সৌরভ হেসে মাকে জানিয়েছে,
-আই নিউ দিস ম্যাটার উড কাম আউট ফ্রম ইউ মা।
-হোয়াটস্ রং উইদ দ্যাট বাবা? মায়ের ফিরতি প্রশ্নে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ত্বরিত উত্তর দিয়েছে,
-নাথিং রং। আই উইল লেট ইউ নো হোয়েন দ্য টাইম কামস, ওকে মা?
এরপর আর তো কিছু বলার থাকে না। আয়েশা বেগমের ভেতরের কৌতুহলী মন এটা জেনে নিশ্চিত হতে চায়, ছেলের পছন্দের কেউ আছে কিনা, নইলে তারাই ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ করবেন। মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে হয় না সে কথা। সৌরভ মাকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় জানিয়ে দেয়,
-ইয়েস, মা, দেয়ার ইজ সামওয়ান স্পেশাল। আই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ উইদ.....'

"এক কাপ চা বা কফি পাওয়া যাবে, নাকি মা ছেলের গপ্পোবাজিই চালবে..." ফরিদ সাহেবের কথার তোড়ে সৌরভকে থেমে যেতে হয়। ছেলের পছন্দের কেউ আছে, এই তথ্যটা পাওয়ার আনন্দে ছটফটে পায়ে স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। সেদিন চায়ের সাথে, ফরিদ সাহেব দু'খানা রসগোল্লা খাওয়ার অনুমতিও পেয়ে যান। তাঁর আতিশয্যের হেতুটিও যথা সময়ে স্বামীর কানে তুলে দিতে ভোলেন না আয়েশা বেগম।

৩

ছেলের পছন্দের মানুষটিকে সামনা সামনি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কাজের কারণে তাকে অন্য কোথাও যেতে হয় বলে, তাকে স্বচক্ষে দেখতে না পাওয়ার আফসোস নিয়ে দেশে ফিরতে হয় আয়েশা বেগমকে। ফরিদ সাহেবের অত কৌতুহল নেই। দেশে ফেরার পর যখনই ছেলে ফোন করেছে, কথা শুরু হতে না হতেই, আয়েশা বেগম মেয়েটার সাথে হয় কথা বলার আগ্রহ দেখিয়েছেন। নাহয় ছবি পাঠানোর অনবরত তাগাদা দিয়ে গেছেন। খুব কাছের আত্মীয় স্বজনদের ইতিমধ্যে সৌরভের পছন্দের একজন আছে, সে কথা জানানো হয়ে গেছে। শীঘ্রই হয়ত ছেলের বিয়ে দেবেন। নিজের গহনার বাক্স খুলে প্রায় কোনটা কোনটা ছেলের বউকে দেয়া যায় বাছাই করেন। আয়েশা বেগমের পাশে বসে মনিরাও মহোৎসাহে নিজের রায় দিতে ভোলে না।

-আম্মা আজকালকার মাইয়া, এত ভারী গয়না যদি পছন্দ না হয়? দুই-একটা হালকা পাতলা গয়না বানায়ে রাখেন। নাইলে বেড়াছেড়া লাগতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার ভাবীসাবের পছন্দ কেমন, সেইটা জানা গেলে ভালো হইত, ঠিক কিনা?

মনিরার কথাটা ফেলে দেবার মতো না। কাজেই, আলোচনা খাওয়ার টেবিলে গড়ায়। স্বামীকে জানানো হয়, বউয়ের জন্য একসেট নতুন গহনা বানাতে চান তিনি। ফরিদ সাহেব এসব বিষয়ে কখনই মাথা ঘামান না। আজও সেটার প্রয়োজন নেই ভেবে, খাওয়াতে মনোযোগ দেন। অধৈর্য্য আয়েশা বেগম ছেলেমানুষি আগ্রহে, স্বামীর উদ্দেশ্যে

দ্বিতীয় বার কথাটা বলেন। ডাইনিং টেবিলের ঠিক মাথার উপরে থাকা আলোটা খুব কম মনে হয় ফরিদ সাহেবের। মাছের কাঁটা বাছতে সমস্যা হচ্ছে তাঁর।

সামান্য বিরক্ত চোখে, মাথার উপর শ্যাণ্ডেলিয়ারে দিকে তাকিয়ে দেখেন বেশ কয়েকটা বাল্ব জ্বলছে না। একটু গলা তুলে মনিরাকে ডাকেন। টিভিতে চোখ আটকে থাকলেও কান খোলাই রাখে সে। ডাক শোনা মাত্র এসে উপস্থিত হয় মনিরা। ইশারায় ফিউজ বাতি দেখাতেই, মনিরা জানিয়ে দেয়, ড্রাইভার ভাইকে বাল্বের কথা সে গতকালই বলেছে। "আজকে তো সারাদিনই আপনেরে নিয়া বাইরে বাইরে, তাই লাগানো হয়নাই। কাল ঠিক লাগানো হবে, আব্বা।" এবার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলেন, "আশা, তোমার এসব ব্যাপার তো আমি বুঝিনা। তোমার মন চাইলে একটা কেন, দুটো সেট বানাতে দাও সমস্যা নেই। কিন্তু ছেলের বিয়ে নিয়ে যে এত মাতামাতি করছো, সে তো সোজাসুজি বলছেই না কবে, কখন, সেই মহার্ঘক্ষণটি আসবে। জানিয়েছে কী ইতিমধ্যে সে কথা?"

আয়েশা বেগম এবার খানিক লজ্জিতই হলেন। মনের ভুলে স্বামীর প্লেটে পেটির মাছ না দিয়ে, কাঁটাময় গাদা দিয়েছেন। তার উপর বাতির এই হাল, আর তিনি গহনা নিয়ে ব্যস্ত। কাজটা ঠিক হয়নি। খানিক অপরাধের সাথে স্নেহের মিশেলে বলেন, থাক, ও টুকরোটা খেও না। পেটির টুকরোটা খাও বরং। রাতের মেন্যুতে মাছ রাখতে মনিরাকে বারণ করি এত, কে শোনে কার কথা!

খাওয়া দাওয়া সেরে ফ্যামিলি স্পেসে এসে গা এলিয়ে খানিক বসেন দু'জনে। ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত, এ সময় নানা বিষয়ে তাঁদের কথা হয়। কখনও পুরনো এ্যালবাম খুলে ছবি দেখাদেখি চলে। ফরিদ সাহেব সোফায় বসে, খাওয়ার টেবিলের প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করেন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে, সৌরভ কিছু জানিয়েছে, কবে বিয়ের সময় পাবে বা সেরকম কিছু? সত্যিই তো, আগেভাগে ব্যবস্থা না নিয়ে রাখলে শেষ সময় ছুটোছুটি পড়ে যাবে। তুমি ঠিক লাইনেই এগোচ্ছো আশা। শাড়ি গহনা যা যা লাগে আগেভাগেই ব্যবস্থা নিয়ে রাখো।

স্বামীর কথায় সামান্য হেসেই আয়েশা বেগমের মুখটা কেমন হয়ে যায়। ছেলে তো আজকাল আমার মোবাইলে ফোন করা ছেড়ে দিয়েছে, খেয়াল করেছো তুমি? সে এখন তোমাকে ফোন করে। আরে বাবা, তোর ভালোর জন্যই তো বিয়ের তাড়া দেয়া। একা থাকা তো অনেক হলো। আর পছন্দ যখন করাই আছে, দেশে এসে বিয়েটা করে নিতে সমস্যা কোথায় বলো দেখি!

ফরিদ সাহেব স্ত্রী আয়েশার শিথিল হয়ে আসা চামড়ায় মোড়া হাতখানা নিজের হাতে টেনে নেন পরম স্নেহে। ইদানিং ছেলে তাঁর মোবাইলেই ফোন করে, বিষয়টা তিনিও খেয়াল করেছেন। কিন্তু তা নিয়ে আশার বুকের ভেতর কষ্ট জমা হচ্ছে সেটা বোঝেননি। মুখ ফুটে সেভাবে নিজের অভিযোগ কবেই জানান দিয়েছে সে! তাঁর সবটা জুড়ে আছে স্বামী-সন্তান। তাদের ভালো মন্দ নিয়েই তাঁর যত ভাবনা। বিয়ের এতদিন পরও ফরিদ সাহেবের পক্ষে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। সামনে বসে থাকা এই অনিন্দ্য সুন্দর মুখটাতে

তিনি কখনও জটিলতা-কুটিলতার জটাজল দেখেছেন। স্ত্রীকে তিনি ভালোবাসেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আশার মতো অতটা তিনি বাসতে পারেননি। এই মুহূর্তে স্ত্রীর বুকে ছেলের ফোন করা বিষয়ে যে কষ্ট গেঁথে আছে, সেটা তুলে নেবার ইচ্ছেতেই যেন তিনি স্ত্রীর হাতখানা বুকের কাছে চেপে ধরেন। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকেন পরম মমতায়। সে দৃষ্টিতে থির হয়ে থাকে গির্জার মোমবাতির পবিত্রতা।

৪

রুটিন মতো হেঁটে এসে, চেয়ার টেনে বসবার মুখে পকেটের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। সৌরভ এ সময়ে সাধারণত ফোন করে। মা বাবা দু'জনকেই এক সাথে পাওয়া যায়। গত দু'সপ্তাহ ছেলের ফোন না পেয়ে ফরিদ সাহেব-আয়েশা বেগম উদ্বিগ্ন ছিলেন খানিক। ছেলের ফোন আসায় দারুণ তৃপ্তি নিয়ে ফরিদ সাহেব ফোনটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেন। হাসিমুখে, স্বামীকেই কথা শুরুর ইঙ্গিত করেন আয়েশা বেগম। ফরিদ সাহেব হ্যালো বলতেই, ওপাশ থেকে ভীষণ তাড়াহুড়ো গলায় সৌরভ জানায়, ওঁরা এতদিন যেটা চাচ্ছিলেন, সে ব্যাপারটা গতকালই ঘটে গেছে তার জীবনে। অনেক ভেবে চিন্তেই সে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে। বাবা মা নিশ্চয়ই খুশি হবেন তার এ সিদ্ধান্তে। মায়ের সাথে পরে কথা বলে নেবে। এখনই তারা হাওয়াই রওনা দিচ্ছে হানিমুনের উদ্দেশ্যে.........

দু'জন মানুষের অবাক মুখের সামনে কট্ করে ফোনটা কেটে গেলো। ফরিদ সাহেব তাঁর রুটিন মতো লেবু পানির গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন। আয়েশা বেগম, কর্তব্য করণীয় কী হতে পারে তার খেই হারিয়ে বোকার মতো জানতে চাইলেন, আজ নাস্তায় পরোটা দিতে বলি?

... সপ্তাহ খানেক পর, ছেলের কাছ থেকে আসা ইমেইল খুলতেই, ফরিদ সাহেবের ছোটোখাটো এ্যাটাকের মতো অনুভূতি হলো। মুহূর্তকালের জন্য নিবিড় অন্ধকারের একটা তরঙ্গ তাকে ভাসিয়ে নিতে চাইলো বুঝি। 'টু মা এণ্ড বাবা' লেখা একবাক্যের ছোট্ট ইমেইলটার সাথে বেশ কিছু ছবি এ্যাটাচ করা। নিষ্পলক অথচ সন্ধানী চোখে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেও, ছেলের পাশে একটা মেয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেন ফরিদ সাহেব। ভীষণ হাসিখুশি একজন, সব ছবিতে সৌরভের গলা বা কাঁধ ছুঁয়ে আছে। কোথাও বা সে সৌরভের গালে চুমুও খাচ্ছে... কিন্তু সে তো সৌরভের মতোই আরেকজন পুরুষ! বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, তাঁদের সন্তান সৌরভ, সমপ্রেমী। প্রচণ্ড ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, সারা জীবন নিজেকে মুক্তমনা ভেবে আসা ফরিদ সাহেব, এমন সত্যির মুখোমুখি হয়ে ভীষণ অসহায় বোধ করলেন। এরকম দমবন্ধ পরিস্থিতিতে জীবনেও পড়েননি তিনি। তাঁদের একমাত্র সন্তানের এই নিদারুণ চমকানোর মতো সত্যিটা, স্ত্রীকেই বা কীভাবে দেয়া সম্ভব, সে কথা ভেবে বাতাসে অক্সিজেনের ভীষণ অভাববোধ করেন ফরিদ সাহেব।

শিকাগো, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র

নাহার মনিকা

মৌষলপর্ব

“পাঞ্চালরাজার স্বয়ংবর সভা থেইকা দ্রৌপদিরে জয় কইরা যুধিষ্ঠির-অর্জুনরা যখন কুন্তীর কাছে আইল, ব্যাবাকটি তো বনবাসে আছিল, তো আইসা কইলো- ‘মা ভিক্ষা কইরা আনছি’।

কুন্তী আছিল কুটিরের ভিতরে, কইলো- ‘বাবারা তোমরা একলগে ভোগ করো’। তারপর বাইরে আইসা যখন দেখলো যে এই কান্ড, তখন কুন্তী কয়- ‘হায় হায় এইটা কি করলাম! এখন কি হইবো!’

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ভাইগো চউক্ষে দ্রৌপদীর লাইগা লোভ দেইখা ডরাইছে, শেষে না নিজেগো মইধ্যে খুনাখুনি লাইগা যায়। ডরের ঠেলায়- মায় যা কইছে তা-ই আসল ধর্ম। এই কথার প্যাঁচ চালাইয়া পাঁচ ভাইয়ে মিল্লা দ্রৌপদীরে বিয়া কইরা ফালাইছে।”

গ্রামের উঁচু পাকুড় গাছটার গোড়ায় গাঁজায় টান দিয়ে সনাতন মন্ডলের কাছ থেকে শোনা গল্প রাজশেখর বসুর অনুবাদে মেলানোর চেষ্টা করে ছেলেটা। মণি ঠেলে বেরুনো কৈশোরের বিস্ময়বোধক চোখ পলিগ্যামি, মনোগ্যামির জ্ঞানার্জন করে কোটরে ফিরেছে। সব ছাপিয়ে ‘শরীর শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?’ বাক্যটা উল্টে ‘মন মন, তোমার শরীর নাই মেয়ে?’ বাক্যটা ছোট পোনামাছের কায়দায় পুচ্ছ নাচিয়ে সাঁতরায়।

‘মহাভারতীয় আদি পর্বে কেউ একটা মিসটেক করলে অভিশাপ জুটতো। অভিশাপ তাকে চিন্তাকুল করতো। তারপর যজ্ঞ, তপস্যা, নইলে সেবা করে-ফাইন,কাফফারা দিয়ে মিলতো শাপমুক্তি। তারপর সেই অভিশাপের প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধ, ক্ষমা। তারপর আবার কারুর অনিন্দ্য সুন্দরী ভার্য্যা দেখে স্খলনের বদলে অভিশাপ। ধ্যান ভঙ্গের অপরাধে শাপ। তারপর শাপমুক্তি, যুদ্ধ, শাস্তি, ক্ষমা-ক্ষমতা, প্রেম-কাম-মায়া-সংবরণ, পুত্র উৎপাদন, জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম একের পর এক দাবার গুটির মত নীরব চাল দিতে থাকলে বইটা নামিয়ে রেখে বালিশে মাথা হেলান দিতে হয়’। মেয়েটাকে এভাবে গল্পটা বলবে ভাবতে ভাবতে সোজা হয়ে বসে ছেলেটা। কোন অভিশাপে তার নিজের স্বর্গচ্যুতি!

'সেখানে মৃত্যুর কথা শুনলে মনে হবে মৃত্যু তেমন যন্ত্রনাদায়ক কিছু না। তুমি একটা পাকুড় ফলের মত টুডুক করে ঝড়ে পড়বে। রক্ত গড়াবে কিন্তু কোন বেদনা তৈরী হবে না'।

পাকুড় ফলের নাম উল্লেখে ছেলেটার চোখে সনাতন মন্ডলের মলিন-জটাধারী-গেঁজেল চেহারা ফ্ল্যাশ ব্যাকে ঝলসে ওঠে।

-'তুমি কাহিনীর সবটা জানো?'- গোলপনা মুখের ইনোসেন্ট চেহারা শ্যামলা মেয়েটা তখন নিশ্চিত এই প্রশ্নটা করবে।

নাহ, সবটা কি আর কেউ জানে? না জানার ব্যর্থতা তার ভেতরে ঈর্ষা জন্ম দেয়। কোন অর্বাচীন জানে এই জগতে সবটা? বেতাল এ ভাবনার সঙ্গে সন্ধ্যাটা খামোখাই তখন প্রবলপ্রতাপান্বিত মনখারাপ করা হয়ে আসে। অথচ তার ইচ্ছে করে সন্ধ্যাগুলো সেই রকমের হোক। আছে না, একরকম? যখন চারদিক ধবল ধোঁয়াটে রং ধরে। বাড়ির উঠোনগুলো ঝিকমিক করতে থাকে, নেমে আসা অন্ধকার তাকে জাপটে ধরবে এই উত্তেজনায়, থির থির কাঁপে! সবার ইচ্ছে করে তড়িঘড়ি ঘর থেকে বের হতে, ঠিক ভোরবেলার মত উচ্ছ্বাস নিয়ে! তেমন সন্ধ্যা তবু ডাকাডাকি ছাড়াই আসে, কিন্তু দেখা যায় না। বিশাল তিতির পাখির মতো পাখা বিছিয়ে ঘরগুলোর ওপর বসে, আস্তে আস্তে ক্লান্ত পাখা গুটোয়, ফের চলে যায়। তার ছায়ার নিচে আনন্দের মত একটা গোপন দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে। যেমন আছে গোপন দুঃখের মত আনন্দেরও একটা একান্ত জগৎ। হঠাৎ হঠাৎ সেই সুখে, অথবা দুঃখে নিজের সঙ্গে কথা বলে ওঠা, বিপুল অন্ধকারের মধ্যে আলোয় আন্দোলিত কোন আয়নায় নিজের মুখ দেখার মত। মেয়েটার জন্য তবু শুধু দৃশ্যের ভেতরে গল্প, আর গল্পের ভেতরে দৃশ্য তৈরী করতে মন চায়। কিন্তু থেকে থেকে সনাতন মন্ডল তার ভান্ডার নিয়ে হাজির হয়। নারী আর পুরুষের সম্পর্কের বাইরে তার ভান্ডারে গল্প আছে কই?

ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বয়স, গভীর চোখের অল্প রোগা ছেলেটা এই পর্যন্ত কতবার কতভাবেই না জীবন দেখেছে। দেখেছে মেয়েটাও। তার বয়স আরেকটু নিচে। কিন্তু তাতে কি জীবনের তেজকটাল-মরাকটাল ভেবেচিন্তে আসে! তবু তাদের ভ্রম হয়, গোলক ধাঁধার মত বিভ্রম হয়। হরেক মেনু আর ভেন্যুতে দেখেও মেলাতে পারে না, এক নাকি একের অধিক। ফ্যানের বাতাস গরম হয়ে জাপটে ধরে গা গতর। কথা বলতে আসা, কথার নিরন্তর স্রোতে ভাসতে আসা। পরস্পরের চোখে চোখ। প্রশ্নবোধক, বিস্ময়চিহ্ন আঁকা। কোথায় বসে থাকে তারা দু'জন! অপরিসর এমন রেষ্টুরেন্টে আয়না লাগানোর আইডিয়া এখনো চৌকশ। ওরা দু'জন নিজেকে দেখে, নিজের বাইরেরটাকেও। শুধু ভেতর দেখা যায় না, কেউ কি কখনো নিজের অভ্যন্তরের প্রত্যঙ্গ দেখতে পায়? নিজের অন্ত্র, হৃদযন্ত্র ইত্যাদি। অথচ কত একান্ত, নিজস্ব, আর হৃদয় শব্দটা কতই না হৃদয়গ্রাহী। ডাক দিয়ে যায় কোন আকালে...

-তাহলে বেরিয়ে এসো।

- উপস্থিত না থাকলে বেরিয়ে আসার প্রশ্ন আসছে কেন?

- ভেতরে থাকলে অনুপস্থিতির কথা উঠছে কেন?

- কারণ ওই যে সন্ধ্যাবেলায় বনের কুটিরে এটা ঘটেছিল।

কি ঘটেছিল?

অভ্যন্তর থেকে বৃহদান্ত্র, পিত্তথলির সঙ্গে হৃদয়ও বের হয়ে এসেছিল!

কখন?

যখন রাজা দুষ্মন্ত রূপযৌবনবতী কন্যাকে বললো, -ঊর্ধ্বরেতা তপস্বীর কি করে এমন রূপবতী কন্যা হয়!

এরকম প্রেম, মোহ, বিবাহ আর সন্দেহবীজ থেকে শকুন্তলার পুত্র সর্বদমন জন্ম নিয়ে ফেলে। কিন্তু কি হলো- রাজা দুষ্মন্ত তার ভোগ ভুলে প্রেম অস্বীকার করলো।

কেন?

বৈধের স্বীকৃতি আদায়ে মিথ্যা ভাষণ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। তখন প্রেম শুধু প্রেম না, পুরুষের প্রেম। সেখানে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। সুখদন্তিনী চারুহাসিনীর শুধু অভিমান আর অপেক্ষা প্রয়োজন ছিল। অপেক্ষার অর্থ তাহলে সব সময় কেবল অনুৎপাদনশীল থাকা নয়!

মেয়েটাও তাহলে গল্প জানে! জানবে না কেন?

একদিন বাস থেকে নেমে পঞ্চাশ কদমও যেতে পারে নি, স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেল। কালো সালোয়ার পরনে ওর। হাইট আর আত্মবিশ্বাস মোচড় দেয়া ভেজা গামছার মত হয়ে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো- ফুটপাতি স্যান্ডেল আর কিনবে না। এইচ এস সি'র পরে বান্ধবী পারুলের বুদ্ধিতে ঢাকার শপিং মলে চাকরি নেয়া ঠিক আছে, তেজকুনি পাড়ায় শেয়ারের ফ্ল্যাটে বিছানার ভাড়াও ঠিক আছে। কিন্তু বড় শপিং মলে কাজ করে ফুটপাতের দোকানে যাওয়া বোকামি। কিন্তু তার নিজের আবার বুদ্ধি আছে নাকি? এ যাবত যা কিছু বুঝ সবই তো পারুলের, নইলে পারুলের বোনের, নয়তো ওর ভাবীর আর ওর ভাবীর বুদ্ধি তো আসে স্বামীর ঘট থেকে। তার মাজা গায়ের রং, কটা চোখ আর বড় কপালী চেহারা নিয়ে সে কি ওদেরকে ছাড়া চলতে ফিরতে পারবে? সাড়ে তিন বৎসরে এই প্রথম সে ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। এতদিন তার সাধ আর ইচ্ছা সাহস হয়ে বের হতে পারেনি। আজই তার স্যান্ডেল ছিঁড়তে হবে? অনেকদিন পরে বাড়ি ফেরার শিহরণ কেমন উধাও হয়ে গেল। বুড়া বাপ, রুগ্ন মা গুচ্ছের ভাইবোন সবার কথা মাথা থেকে উড়ে গিয়ে তার পায়ের পাতায় স্থির হয়ে থাকলো। উপুড় হয়ে পাদুকা মেরামতিতে হাত লাগাতে গিয়ে সে সোজা হয়ে পড়ে। তার দিকে স্থির চেয়ে আছে পাশের সিটের বাসযাত্রী। ছাত্র, নাকি সেলসম্যান বোঝার সাধ্য কি? প্ল্যানমত ঘুমিয়ে পড়ার বেখেয়ালে সে নিজেই তার কাঁধে মাথা ফেলে দিয়েছিল। ভুলবশতঃ নিদ্রাবিভোর হয়ে সে কি তবে শাপগ্রস্ত হয়ে গেল? বাসযাত্রী কি তার অপেক্ষায় বসে আছে?

•

এদিকে ছেলেটার তখন আরো গল্প বাকি।

কথা তাহলে অপেক্ষা নিয়ে হোক। দৃশ্যগুলোকে রেষ্টুরেন্ট কিংবা সেখান থেকে একটা ওয়েটিং রুম নিয়ে যাওয়া যায়। কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরের রেল ষ্টেশনের চেয়ে মেডিকেল ক্লিনিকের ওয়েটিং রুম বরং মানানসই। অবিচ্ছিন্ন চেয়ারের ধৈর্য্য দিয়ে ঘিরে থাকা উঁচু ছাদ প্রতিটা ইটের ফাঁকে অপেক্ষার মন্ত্র বুনে দেয়। এইসব সিলিং দেখলে মনে হয় মহাশূণ্য অহেতুক, জরুরী নয়। আর মানুষ সবসময় কোন না কোন কারণে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে যাওয়া বেঁচে থাকার এক মহার্ঘ ইন্ধন। পাশাপাশি বসে থাকা আন্তঃমহানগর ট্রেনের পথ চাওয়া, আর রক্তক্ষরণসহ অস্ত্রোপচারকারী ডাক্তারের জন্য দীর্ণ অপেক্ষা! অন্তঃসত্তা স্ত্রীর মাথার কাছে অস্থির দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটা। প্রসব বেদনার তীব্র চিৎকার তাকে অবশ করে দিয়ে যায়।

স্ত্রীর ডিভোর্সের আবেদন প্রসেসিং এর সঙ্গে সঙ্গে তার গর্ভও পরিণত হয়েছে।

সনাতন মন্ডল আবারো কথা ভুস ভুস করে তার বায়বীয় উপস্থিতি ছড়িয়ে দেয়- ‘কত কারণে মানুষ বাচ্চা সংসার ফালায়া যায়। কুন্তী তো নিজে যে কর্ণের কুমারী মা হইছিল সেই কথা না কইয়াই স্বয়ংবর হইছিল। আবার দেবযানীর কথা যদি ধর, শর্মিষ্ঠারে পাকে চক্রে দাসী বানাইলে কি হইবো, সে তো ঠিকই দেবযানীর স্বামীরে ভুলাইয়া গোপনে তিন পোলা পয়দা কইরা ফালাইছে। কইছে- ‘মহারাজ, মাইয়া মাইনষের মন ভুলাইতে, বিয়া করতে, ফতুর হওয়ার সম্ভাবনায় আর জান বাঁচাইতে মিছা কথা কওন জায়েজ আছে’।

উপবনে বেড়ানোর কেচ্ছা শুনতে শুনতে মেয়েটার একথালা ফল খেতে ইচ্ছে করে, যেন কুসুমিত বনে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করতে ফলই একমাত্র ভরসা আর সে নিজে তাপসবেশধারিনী রাজকন্যা, ইচ্ছে করলে বর দিতে পারে কিংবা শাপ দিয়ে সম্মুখের মানুষটাকে শ্বেতী রোগী ইঁদুর বানিয়ে দিতে পারে।

নধর আপেল সরু দাঁতে সাবাড় হলে একটা ডালিম তার হাতে উঠে আসে। টেবল নাইফের এক চাড়িতে লাল হীরকের বিন্দু বিন্দু দ্যুতি ছড়িয়ে যায় শাদা প্লেটের ওপর। গোলাপি নখের মধ্যে ততোধিক গোলাপী প্রতিফলন দিনের প্রাপ্তির কথা শোনায়। তবু সারাক্ষণ কিসের প্রতীক্ষা করে মন, দেহ! চেয়ারের সাথে সেঁটে বসে আপেল ভক্ষণকালে এইসব বিতন্ডার কোন সুরাহা মেলে না।

ছেলেটা তখন বরং অন্য কোন জায়গার কথা ভাবে। আসলে তো মানুষের জন্য স্থানই নিয়ামক, স্থিতিস্থাপক। ধরা যাক, এই শহরে মেয়েটা না থাকলে, কাকে দেখতো সে? সেই কোন এক বিদেশী কবির কবিতা ধার করে তাকেও তো কদ্যপি বলতে হয়েছে- তুমি যখন ন্যুয়র্কে থাকো, ন্যুয়র্কে তোমাকেই দেখি...তুমি যখন ন্যুয়র্কে থাকো না- ন্যুয়র্কে কাউকে দেখি না। এর্নেস্তো কার্দেনাল গেরিলার ইউনিফর্ম ছেড়ে কবির জামা গায়ে হাজির হন। মেয়েটাকে নিয়ে তখন ছেলেটাকে স্বাভাবিকভাবেই অন্য কোথাও সরে আবার অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার ভেন্যু কারুর ব্যাক্তিগত সম্পত্তি। স্থাবর। টেরা কোটার নকশা করা বিশাল দরজা, কাঠের। দরজাগুলি দু'চারটা সাগর পার হয়ে এসেছিল, ছেলেটা এই বাড়িতে বসবাসের অভিজ্ঞতায় জানে। সেদিন ছিল দরজার

ওপারে গরর গরর ডাক। শাদা খয়েরী প্রিন্টেড গ্রে হাউন্ড, গলায় তার সাগর পার হবার অনভিজ্ঞতা। দরজার ওপারে অভিজাত গরগররের সন্নিকটে মৃদু, ভারী নিঃশ্বাস পরিচিত, কেননা সে তার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমিয়েছে। ছেলেটার বুকের ভেতর বাতাস ভারী লাগে, দরজার পাল্লাটার মত। খুলতে দেরী হয়, পেছন দিকের পুদিনার ঝাড় মথিত করা হাওয়া বুকের ভেতর ঘোঁট পাকাতে থাকে। দরজা খুলবে জানা কথা, খুলে গেলে এক বাক্স খুচরো তিসিদানার মত স্মৃতি পাঁজাকোলা করে পিছনে সরিয়ে বর্তমান সামনে এসে দাঁড়াবে তাও জানা কথা। মুখোমুখি বসে থাকার জন্য এত দূর থেকে আসা! মাঝখানের কতগুলো সময়ের দূরত্ব, অসমাপ্ত, কিছু তথ্য সাজিয়ে সময় মাপার চেষ্টা।

নিজেকে দু'শো বছরের বৃদ্ধ মনে হয় ছেলেটার। মনে হয় মাথার ওপরে ছাদ ছাড়িয়েও আরো বড় সীমানা থাকা উচিত। খুব বড় একটা ঘর, এত বড় যা সাধারণত দেখা যায় না। এর সিলিং উচ্চতার কাছে মানুষের ক্ষুদ্রতা প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে দূর তারার মত ফ্যান ঘোরে ফৎ ফৎ। চারপাশ দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে গিয়ে মৃদু হয়। দেয়ালের পেইন্টিংয়ে মা হাতি আর তার শিশু মন্থর গতিতে ঘুরপাক খায়। কেন কে জানে! উলটোদিকে টেরাকোটার স্থাপনা, খাজুরাহো, কুমারের ঢং উপচে পড়া স্তনবতী বোবা মূর্তি, অনন্তের স্তব্ধতা ধরে স্থির হয়ে থাকে। ছেলেটার নিজেকে কেবলি বৃদ্ধ মনে হয়, তার বয়স বেড়ে যায়-দু'শো, চারশো, হাজারখানেক বৎসর।

একহাতে সদ্যোজাত কন্যা আর অন্য হাতে বিচ্ছেদের পাঠ নিয়ে সে বাড়ির সামনে এসে হাত বাড়িয়ে রিক্সা ডেকেছিল। পাঁচ বছর পরে আবার মেয়েকে দেখাতে সে বাড়িতেই ফিরে আসতে হলো- অস্থায়ী, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাড়ি ছেড়ে বাঁধে উঠে আসার মত এক অনুভূতি নিয়ে। মুঠোভর্তি কাজুবাদামের সাথে বিয়ারের লম্বা গ্লাস জমে উঠলে ছেলেটার মনে পড়ে- একান্নের বিবর ছেড়ে তার প্রাক্তন চলে গিয়েছিল। সে নিজে তখন ঠিকানা হারানো বেড়াল। যেন দশ মাস বস্তাবন্দি। যেন জলের তল থেকে উঠে আসা লোম শুকানো হাড্ডিসার। আবার খুঁজে পেল তার ঠিকানা। শিশু কন্যাকে রেখে তাকে ঢাকা-মফস্বল করতে হয়েছে কত শতবার। নামি দৈনিকের জন্য সংবাদ সংগ্রহের আড়ম্বর তাকে ভেতরে ভেতরে মারলেও বাইরে বাঁচিয়ে রেখেছে। হাইওয়ের সাঁই সাঁই গাড়ি যাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে কত লক্ষবার সে একটা মেয়ে শিশু কেঁদে ওঠার শব্দ পেয়েছে। অগত্যা সে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফেরে। মেয়ে কাঁদলে কাজ করা যায় নাকি? কে বলবে যে জন্মের সময় তিন কেজি ওজনের বাচ্চাটা এখন রীতিমত স্বাস্থ্য নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে! কোলে করে সিঁড়ি ভাঙতে হাঁপ ধরে যায়। ছেড়ে দিলে মেয়ে খলবলিয়ে হৃষ্টপুষ্ট হাত পা ছুড়ে ছিটকে পড়তে চায়। ছোট ছোট হাত তার গালে ঘাড়ে দাপাদাপি করে। দাপাদাপিতে কোনারক, খাজুরাহো আর শ্রাবস্তির কারুকাজ ফুড়ুৎ করে উড়ে উড়ে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার করা নিউজ ডেডলাইন না মানায় হতাশ, বিরক্ত আর ক্যান্সেল হয়ে যায়।

ছেলেটা বিষণ্ণ বসে থাকে। সমুদ্রে ভাসার আক্ষেপ দিয়ে মেয়ে আগলাচ্ছে সে। তার ফেরার জায়গা এখনো সুনির্দিষ্ট না, তবু সে ফিরতে চায়, বাড়িতে, রেলষ্টেশনে, শোবার ঘরে। তখন সে এস্রাজ বাজানো শিখে নেবে।

গল্পের এ পর্যায়ে মেয়েটা ততক্ষণে আপেল শেষ করে ফেলেছে। তারও এস্রাজ বাজাতে ইচ্ছে করে, ঘেমে ওঠা হাত ফতুয়ার কানায় মুছে নেয়। অথচ সে এস্রাজ বাজাতে জানে না। সে কেবল দু'একবার মন বাজাতে শিখেছিল। যে কারণে সাজেদীনকে দেখে তার মন খারাপ হয়। সাজেদীন পারুলের ভাবীর ছোটভাই, আর তখন তো সে এই আজকের সে ছিল না!

-'সাজেদীনরে দেইখা তাইলে তোমার মন খারাপ হইল?'

এই প্রশ্নে তার খারাপ মনেরও মেজাজ খিঁচড়ে যাবে, খুব স্বাভাবিক। সন্ধ্যার ছায়ার ভেতর ভাপ ওঠা গরমে একটু দম নেয়ার ইচ্ছে করবে তাও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সারাদিন বন্ধ না হওয়া ফ্যানের বাতাসের ক্লান্তি তার পানপাতা মুখে বসতে চাইলেও সাজেদীনকে নিয়ে বলা বাক্যটা তার সকল ইন্দ্রিয় আবারো সন্তর্পণে সজাগ করে ফেলে। এমন ক্যাজুয়াল একটা কথা অথচ শুনলে মনে হবে যেন সাজেদীনের সাথে তার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়। মোবাইলে একে অন্যের ফোন নাম্বার সেইভ করে রেখেছে আর মাঝে মধ্যে কোন ছুটির দুপুর তাদেরকে ঘায়েল করে রাখে।

এটা কোন কথা বলার ধরন? মেয়েটা সুতরাং নিজের হৃদপিণ্ডের দ্রুত ধুকপুক সামলায়। চোরা চোখে সাজেদীনের ওপরে খবর সংগ্রহকারীকে দেখে, সোফার কোণায় উপুড় হয়ে জুতার ফিতা খুলছে। সুঠাম শরীর খালি করে পাশে তার ঘামে ভেজা রং জ্বলা শার্ট। সোজা হয়ে বসতে না বসতে কারেন্ট চলে গেলে সে আরেকপ্রস্ত আশ্চর্য আর স্বস্তিবোধ করে ভেতরে ভেতরে। এ সময় কথা চালাচালি করতে অন্ধকার, নৈঃশব্দ ভালো। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী থেকে তার চাকরি বদল শপিং মলে। সারাদিন এসির গুঞ্জনের মধ্যে কাষ্টমারকে শাড়ি, ড্রেসের ভাঁজ খুলে দেখাতে দেখাতে ভিড়ভাট্টা এককাট্টা হয়ে তাকে একটা একরৈখিক শোরগোলের মধ্যে পুরে রাখে। মাঝখানে আধঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেকে শপিং মলের বাইরে তীব্র রোদে তার বুকের কাছটা অনুভূতি শূণ্য হয়ে যায়। তবু সে কতদিন শুধু সাজেদীনকে খুঁজেছে।

একটা তীব্র আলিঙ্গনের জন্য হাহাকার করতে করতে ভেবে ফেলেছে- এইবার সাজেদীনকে বলবে- 'মা হতে চাই'।

তারপর সাজেদীন মরুক বাঁচুক আর ফিরে না আসুক, কিছুই যাবে আসবে না।

-'সাজেদীনরে দেইখা তাইলে তোমার মন খারাপ হইল!' দ্বিতীয়বার এই কথার পাশাপাশি আবছা আলো আঁধারীতে মশার গুনগুন বেড়ে গেলে পা টান টান করে সেন্টার টেবিলে উঠিয়ে চায়ের কাপ নেয় মেয়েটা।

-'এত দিন পরে যখন দেখলা শুকায়া গেছে, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার, মাথায় চুল নাই, কেমন হ্যাগার্ড অবস্থা!'

মেয়েটা তখন শকুন্তলা, মনে মনে সর্বদমনকে নিয়ে রাজপুরী ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ কম্পমান- "মহারাজ তোমার স্মরণ থাকলে প্রাকৃত জনের ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই"!

এটা কেমন প্রশ্ন? মন খারাপ হতো কিনা এখন সে তর্কে কী ফল? সে কি সাজেদীনকে দেখেছে? প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা- সে কি দেখতে চায়? এই যে কতগুলো বৎসর, কখনো কখনো প্রতিদিনই তো তার সাজেদীনের কথা মনে পড়েছে। একা একা, অনেকের সঙ্গে থেকেও। মেয়েটার সাবলেটের বাসায় বাড়িওলির দুই ছেলে পাশের ঘরে মারামারি করে। তার রেশ ভেজানো দরজা দিয়ে কার্টুন ছবির তীব্রতা নিয়ে থেকে থেকে হানা দিয়ে যায়।

গরমের কামড় তাচ্ছিল্য করে তারা উঠি উঠি করেও ওঠে না। ঘামে ভেজা শার্ট পাশে সরিয়ে, কল্পিত সুবর্ণ মালা, রত্নালংকার, বস্ত্রাদি পাশে সরিয়ে, ভালোবাসাসহ সাজেদীনকে ঠেলে সরিয়ে তারা রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। স্তনবৃন্তে দাঁত আর আঙ্গুলের আমূল আক্রোশ গেঁথে গেলে চেয়ারটা ক্যাচ ক্যাচ শব্দ তোলে। মেয়েটা দাঁত কামড়ে মনে মনে এবারও একটি সন্তান প্রার্থনা করে। সে তখন একটা হরিণ শাবক, আদুরে নিটোল প্রজাপতি, হাত আঁকড়ে, পা জাপটিয়ে ছেলেটিকেও মৃগরূপ ধারণ করতে বলে। সে মুহূর্তে ছেলেটার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। নৈমিত্তিকের ডাকে সাড়া দেবে না করতে করতেও সে কাছে আসার শক্তির কাছে হার মানে। তাকে 'হ্যালো' বলতে হয়।

•

সনাতন মন্ডল ছাই কাদা মেখে পাকুড় ফলের মত গড়াগড়ি যায় আর হাসে,

-'প্রপঞ্চের একটা বাঘ আছে, বুঝছ? সেই বাঘের একটা খাঁচাও আছে, তয় সেই বাঘ খাঁচায় ভরলে দেহা যায় না। খালি খাঁচা, কিন্তু বাঘটা আছে, থাইকা থাইকা বাইরে আইসা ঘেডি মটকায়! পান্ডবেরা যখন মহাপ্রস্থানের পথে যাইতেছিল, হিমালয় পার হইয়া যাইতে যাইতে সবার পয়লা দ্রৌপদী যোগভ্রষ্ট হইয়া পইড়া গেল। তো ভীম গিয়া যুধিষ্ঠিররে জিগাইল- ওতো আমাগো লগে কোন অন্যথা করে নাই, ও পইড়া গেল ক্যান? যুধিষ্ঠির কইল- আমরা তো পাঁচ ভাই-ই পাঞ্চালীর স্বামী আছিলাম, কিন্তু মনে মনে হে সবসময় অর্জুনেরে বেশি পাত্তা দিছে। এইডার একটা শাস্তি আছে না?' -সনাতন মণ্ডল ছাইমাখা পাকুড় ফল ভূপতিত, আবার কখনো উড্ডীন গাছের মগডালে। এদিকে ছেলেটা- মেয়েটা তখনো শরবিদ্ধ, মৈথুনরত মৃগদম্পতির মত সহসাই বধ হয়ে যায়।

মন্ট্রিয়ল, কুইবেক, কানাডা

পপি চৌধুরী

দম্ভ

হঠাৎ করেই মাত্র সাতদিনের কথাবার্তায় বিয়ে হয়ে গেল রুমানার। সব কিছু কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে তার কাছে। সবাই বলছে, এমন সুশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত বর পাওয়া নাকি অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।

ভাগ্যেরই তো ব্যাপার! তা না হলে তাদেরই বা ভাগ্যটা এমন হবে কেন? মনে মনে ভাবে রুমানা। পরের দয়ার ওপর বেঁচে আছে তারা। সে, তার মা, আর ছোট ভাই রূপম।

রুমানার বুক ফেটে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস, সেই সাথে চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরোনো দিনের স্মৃতি। বাবা বেঁচে থাকতে কত সুখ-শান্তি আর স্বচ্ছলতা ছিল তাদের! হঠাৎ একদিন রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন বাবা। তাদের দু'ভাই বোনকে নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখেন মা। প্রথমদিকে আত্মীয়-স্বজন নিয়মিত খোঁজ খবর নিলেও দিনে দিনে তাদের উৎসাহে ভাটা পড়তে থাকে। এরপর শুরু হয় মায়ের গহনা বিক্রি করার পালা, একসময় তাও শেষ হয়ে যায়। মায়ের দুরবস্থা দেখে নানা এসে তাদের সকলকে নিয়ে যান গ্রামের বাড়ি।

সংসারে নতুন করে তিনটি মানুষের আগমনে খুশি হতে পারলেন না মামীরা। মুখে তেমন কিছু না বললেও তাদের আচরণে স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগলো তাদের অসন্তুষ্টির বিষয়টি। মা, মামীদেরকে খুশি করতে ভোর থেকে গভীররাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতেন। তবে এত কষ্টের মধ্যেও কোনভাবেই মা তাদের লেখাপড়া বন্ধ হতে দেননি মা। মাঝে মাঝে অবশ্য লেখাপড়া ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছে রুমানার। কারণ বই আছে তো খাতা নেই, খাতা আছে তো কলম নেই। সারাক্ষণ এত নেই নেই কার ভালোলাগে! তারপরও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লেখাপড়াটা চালিয়ে গিয়েছে। আর ডিগ্রী পরীক্ষাটা শেষ হতে না হতেই মা উঠে পড়ে লাগলেন মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য।

ভালোপাত্র পাওয়া কী যেই সেই কথা! একে তো মেয়ের বাবা নেই, তায় আবার পরের বাড়ি আশ্রিত। যোগ্যতা বলতে মেয়ের আছে তো কেবল রূপ। এমন মেয়ের জন্য পাত্রের অভাব না হলেও সুযোগ্য পাত্র পাওয়া মুশকিল। উপযুক্ত পাত্রে মেয়ের বিয়ে দেয়ার চিন্তায় তার মা যখন দিশেহারা ঠিক তখনই এই পাত্রপক্ষের আগমন। পাত্রের মা এসে রুমানাকে দেখে দুইভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন পরিয়ে দিয়ে জানালেন, মেয়ে তার পছন্দ হয়েছে। তাদের আপত্তি না থাকলে তিনি পাকা কথা দিয়ে যেতে পারেন।

এ কথা শুনে রুমানার অভিভাবকরা বলেছেন, “আপনি একা মেয়ে পছন্দ করলে তো হবেনা, ছেলেরও তো একটা মতামত আছে।”

“আমার ছেলে আপনাদের মেয়েকে অনেক আগেই দেখেছে। ছেলের জন্যেই তো আমার আসা। ছেলের একটাই কথা, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে এই মেয়েকেই করবে।”

কথাটা শুনে রুমানার মা আঁচলে চোখ মোছেন। মেয়ের সৌভাগ্য দেখে গর্বে তার বুকটা ভরে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ মত দিয়ে ফেলেন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে।

বাসর ঘরে বসে তন্ময় হয়ে এসব কথা ভাবতে থাকে রুমানা। হঠাৎ খুট করে দরজা বন্ধ করার শব্দে সম্বিত ফিরে আসে তার। দরজার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে, কেউ একজন ভিতরে প্রবেশ করেছে। মাঘ মাসের শীতের মধ্যেও ঘামতে শুরু করে রুমানা।

“তুমি তো খুব কথা বলতে পারো, আজ এমন চুপ করে আছো কেন রুম্পি?” বিছানার ওপর বসতে বসতে বলে রুমানার বর।

বরের মুখে রুম্পি নামটি শুনে চমকে ওঠে রুমানা। এ নাম তো তার জানার কথা নয়! এ নাম জানে মাত্র একজন। সে শিখা, রুমানার ছেলেবেলার বান্ধবী। কিন্তু শিখা তো কানাডার সিটিজেনশিপ নিয়ে আজ চার বছর হতে চলল স্বামীর সাথে বিদেশে আছে। তাছাড়া তার বেশি কথা বলার অভ্যাসের কথাটাই বা মানুষটা জানলো কিভাবে? কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে রুমানার।

“কি, কথা বলবে না?”

রুমানাকে নীরব দেখে পুনরায় বলে রুমানার বর।

“আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা আছে দেখছি।” বিব্রত কণ্ঠে বলে রুমানা।

“অ-নে-ক কিছু। এই যেমন, তুমি নন্দন কাননের অপর্ণাচরণ স্কুলের ছাত্রী ছিলে। শিখা নামে তোমার একজন প্রাণের বন্ধু ছিল। যে তোমায় রুম্পি বলে ডাকতো...”

“কে আপনি...!”

চমকে উঠে মুখের ওড়না সরিয়ে জানতে চায় রুমানা।

“আমি বাদল। শিখার বড় ফুফুর ছেলে। যাকে তুমি ‘বানর’ উপাধি দিয়েছিলে” হাসতে হাসতে বলে রুমানার বর।

বিস্ময়ে, লজ্জায় হতবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রুমানা। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটি নির্মম স্মৃতি। শিখা আর সে একই স্কুলে পড়তো। স্কুলের পাশেই শিখাদের বাসা হওয়ায় টিফিনে প্রায়ই শিখার সাথে ওদের বাসায় যেত রুমানা। শিখা বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। দীর্ঘদিন যাতায়াতের ফলে ওদের বাসার সবার সাথে পরিচয় ছিল তার। হঠাৎ শিখাদের বাসায় ঢ্যাঙা লম্বা মত, শ্যামলারঙের একটি ছেলেকে দেখতে পায় রুমানা। শিখা জানায়, ছেলেটির নাম বাদল। তার বড় ফুফুর ছেলে। কিছুদিন পূর্বে ওর বাবা মারা গেছে। তাই শিখার বাবা ওকে চাঁদপুর থেকে এখানে নিয়ে এসেছে। ও এখন থেকে শিখাদের বাসায় থেকেই লেখাপড়া করবে।

এ ঘটনার কিছুদিন পর স্কুল টাইমে বাদলকে প্রায়ই বাসার ছাদে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেতো। তারপর একদিন শিখার মাধ্যমে বাদল রুমানাকে তার ভালোলাগার কথা জানিয়ে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিটা পড়ে রেগে যায় রুমানা। রাগের কারণও আছে। একে তো সে দেখতে খুবই সুন্দরী, তার ওপর বড়লোকের মেয়ে। তাছাড়া বাদলকে প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি তার। শিখাদের বাসায় গেলে কারণে-অকারণে তার সামনে দিয়ে অযথা বাদলের ঘোরাঘুরি দেখে বিরক্ত হয়ে শিখাদের বাসায় যাওয়া এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিল রুমানা। সেই ছেলে কিনা তাকে প্রেমপত্র পাঠিয়েছে! ছেলেটার কি সাহস! ভাবতে ভাবতে রাগে অন্ধ হয়ে একটা দুঃসাহসের কাজ করে বসে রুমানা। কঠিন ভাষায় চিঠির একটি উত্তর লেখে। সেই চিঠিতে বাদলকে 'বানর' বলে সম্বোধন করে এবং জানায়, জীবন গেলেও কোনদিন সে একটি বানরকে ভালোবাসতে পারবে না। এরপর চিঠিটা খামে ভরে মুখ আটকে বাদলকে দেয়ার জন্য শিখার হাতে দেয় সে। কিছু না বুঝে শিখা খুশি মনে খামটা পৌঁছে দেয় বাদলের হাতে।

এরপর দু'দিন স্কুলে আসেনি শিখা। তৃতীয় দিন স্কুলে এসে জানায়, "বাসার সবার মন খুব খারাপ। বাদল ভাই কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। এ দু'দিন তাকে অনেক খোঁজা হয়েছে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে।"

সেসময় রুমানা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। এ ঘটনার কয়েক মাস পরেই বার্ষিক পরীক্ষা শেষে তার বাবা বদলী হয়ে ঢাকায় চলে আসেন। এরপর মাঝে মাঝে ফোনে শিখার সাথে কথা হলেও বাদলের প্রসঙ্গ আর ওঠেনি।

"কথা বলবে না রুম্পি?"

রুমানাকে নীরব দেখে পুনরায় জানতে চায় বাদল।

"শেষ পর্যন্ত এভাবে প্রতিশোধ নিলে?"

"প্রতিশোধ বলছো কেন? বলো, ভালোবেসে জয় করে নিয়েছি।"

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ফরহাদ হোসেন

ছেলেটা

প্রায় ছয় মাস হলো আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

আমি এখনও জানিনা আমাদের সংসার কেন ভেঙ্গে গেল। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির প্রবেশ ঘটে নি। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে আমাদের সম্পর্ক দিনকে দিন জটিল হয়ে যাচ্ছিল। যদিও আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। আমি অবশ্য কোনো অভিযোগের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারিনি। শুধু ভেবেছি, জোর করে আর যাই হোক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায় না। তারচেয়ে বরং আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো।

যদিও সে এখন আর আমার স্ত্রী নয়, কিন্তু আমার তাকে সাবেক ভাবতে ভাল লাগে না। আমরা দুজনে এখনও সিঙ্গেল, নতুন করে বিয়েও করিনি–কোনো সম্পর্কেও জড়াইনি। তাই প্রাক্তন কিংবা বর্তমান বিষয়টা এখনও আমাদের সম্বোধন বা পরিচয়ের মধ্যে আসেনি।

আমাদের একটি মাত্র ছেলে সন্তান। গত মাসে সে ৫ বছরে পড়ল। সে তার মায়ের কাছেই থাকে। মাসের প্রথম দিনেই আমি সাধারণত আমার স্ত্রীর হাতে এলিমনির বরাদ্দকৃত টাকাটা দিয়ে আসি। এর ব্যতিক্রম খুব একটা হয় না।

একদিন বিকেলে, কাজ থেকে ফেরার পথে আমি টাকা দেবার জন্যে তার বাসায় গেলাম। কলিং বেল বাজাতেই আমার ছোট্ট ছেলেটা দৌড়ে এসে দরজার এক পার্ট খুলে লোহার গ্রিল ধরে দাঁড়াল। আমাকে দেখে যে সে খুব খুশি হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। অফিসের কাজে আমাকে এক মাসের ট্যুরে বাইরে যেতে হয়েছিল। এতদিন পরে আমাকে দেখে খুশিতে চিকচিক করে উঠল ছেলেটার দুই চোখ।

বন্ধ দরজার ভেতর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, ‘বাবা তুমি আসছ?’

‘হ্যা বাবা, আমি আসছি।’ আমি বললাম, ‘কেমন আছো তুমি?’

‘আমি ভালো আছি।’ ছোট ছোট করে উত্তর দিল সে।

‘আম্মু আসে নাই এখনও।’

‘না।’ বলেই সে খুব আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, ‘তুমি কি ভিতরে আসবা? চাবি এনে দেই, খুলে ভিতরে আসো।’

‘থাক বাবা, চাবি আনতে হবে না। আমি এখানেই থাকি।’

‘কেন?’

‘ভিতরে আসাটা ঠিক হবে না বাবা।’

‘কেন? কেন ঠিক হবে না?’

‘তোমার আম্মু যে বাসায় নেই।’

আমাকে দেখার পর তার চোখে মুখে যে আনন্দের ঝিলিক দেখা দিয়েছিল, তা যেন হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল। আমি তার গভীর চোখ দুটোতে বিষাদের হাসি দেখতে পেলাম। এমন একটা পরিস্থিতিতে এতটুকুন একটা বাচ্চা নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমি প্রসঙ্গ বদলে দেবার চেষ্টা করলাম যাতে তার ছোট্ট মনের উপর চাপ না পড়ে। কিছুদিন আগেই ওর জন্মদিন ছিল। অফিসের ট্যুরে শহরের বাইরে থাকায় আমি তার জন্মদিনে আসতে পারিনি। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা তোমার বার্থডেতে কী কী মজা করলে বলো।'

সে খুব খুশি হয়ে বলল, 'অনেক মজা করেছি। অনেক মজা।'

'আমাকে মিস করো নি?'

'অনেক মিস করেছি। অনেক।'

বন্ধ দরজার গ্রিলের মধ্যে দিয়ে হাত প্রসারিত করে আমরা দুজন দুজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি। তার মা বাসায় না থাকা অবস্থায় আমি কখনও যদি আসি, আমরা এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকি। ছেলেটা কয়েকবার ভিতরের দিকে তাকাল। আমি বুঝতে পারলাম সে তার বেবি সিটার দূর থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কি না সেটা লক্ষ্য করছে। আমি আরও কিছুক্ষণ খেলাচ্ছলে বিভিন্ন কথা বললাম। তার স্কুল কেমন চলছে, বার্থ-ডে তে কি কি গিফট পেল, সামনের উইকএণ্ডে সে আমার সাথে কোথায় যেতে চায়–এসব অনেক ধরণের কথাই হলো আমাদের মাঝে।

আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম, 'তোমার আম্মুর আসতে বোধ হয় দেরী হবে। আমি তোমার আম্মুর জন্যে কিছু টাকা এনেছি। এগুলো তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। আম্মু এলে বলবে, বাবা এসে দিয়ে গেছে।' কথা বলতে বলতে আমি আমার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা এনভেলপ বের করে তার হাতে দিলাম।

সে এনভেলপ হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নেড়েচেড়ে বলল, 'আম্মু তোমার কাছে অনেক টাকা পায়?'

আমি বললাম, 'না বাবা। অনেক টাকা না। আমি কাজ করে যেই টাকা পাই, তার কিছু অংশ।'

'ও।' বলে সে চুপ করে রইল।

সে আদৌ কিছু বুঝেছে কি না জানি না। তবে সে যেহেতু দেখছে বাবা প্রতিমাসে একটা সময়ে এসে আম্মুর হাতে টাকা দিয়ে যায়, সেহেতু এটাই হয়তো নিয়ম। তবুও আমি একটু বুঝিয়ে বললাম, 'এই ধরো তোমার স্কুল, তোমার ফেভারিট ফুড, ফেভারিট টয়স কেনার জন্যে, বেড়াতে যাওয়ার জন্যে এই টাকাটা আমি দেই।'

সে আবার এনভেলপটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এখানে তো অনেক টাকা! তোমার জন্যে কিছু রেখেছ?'

আমি হেসে দিয়ে বললাম, 'হ্যা বাবা, আমার জন্যে যতটুকু দরকার–রেখেছি। তাছাড়া আমি তো একা। আমার বেশি টাকা লাগে না। তোমরা তিনজন। তুমি, আম্মু, বেবি সিটার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে কিছু একটা ভাবল। তারপর হঠাৎ করেই বলল, 'তুমি একটু দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি।' বলেই সে এক দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। আমি তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ কিছু একটা ভাঙ্গার শব্দ হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে এলো। তার ছোট্ট হাত দুটির মুঠি বন্ধ করে সে আমার সামনে এসে দাড়াল। আমার দিকে তার ছোট্ট হাত দুটি একসাথে এগিয়ে দিয়ে মুঠি মেলে ধরে বলল, 'নাও।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম তার হাত ভর্তি অনেকগুলো কয়েন। তার ছোট্ট হাত দুটিতে যতখানি সম্ভব, ভরে নিয়ে এসেছে।

'আমার মানিবক্সে যা ছিল, নিয়ে এসেছি। এখানে হয়তো অনেক নেই, কিন্তু তুমি কিছু কিনতে পারবে।' বলতে বলতেই তার চোখ ভিজে এলো।

আমি গ্রিলের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলাম। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম।

সেদিনের পর থেকে আমি যেন অন্য এক মানুষ হয়ে গেলাম। আমি মরে গেলাম না আমার পুনর্জন্ম হলো, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারলাম, জীবনে আমি কিছু একটা ভাল কাজ করেছিলাম যার কারণে এমন একটা পুরস্কার পেলাম। ঐ একটা বিকেল আমার জীবনের গতিপথ নতুন করে বদলে দিল।

সেই আনন্দ, সেই ভাললাগা, সেই ভালবাসার কথা আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আমার মনে থাকবে। অতটুকু ক্ষুদে মানুষটির মনের মধ্যে যেই পরিমাণ ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছে, আমি টের পেয়েছি, তার মূল্য আমার কাছে অপরিসীম।

ছেলেটা আমার অনেক বড় হয়ে গেছে। তার বয়স এখন দশ। এখন সে ভায়োলিন বাজাতে জানে। সকার খেলে। স্কুলেও ভাল রেজাল্ট করছে। মাঝে মাঝে সে আমার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকার খেলা খেলে। আমি তার চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারিনা। চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

সে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার চোখে কি হয়েছে বাবা। কাঁদছ কেন?'

আমি চোখ মুছতে মুছতে বলি, 'কাঁদি নারে বাপ। কাঁদি না।'

ছোট্ট দুটি হাতের মুঠি ভরা কতগুলো কয়েন এখনও আমার জ্যাকেটের পকেটে। আমার মন খারাপের দিনগুলিতে আমি জ্যাকেটের পকেট থেকে কয়েনগুলো বের করে হাতে নিয়ে দেখি। যেই কয়েনগুলো সে তার মানিবক্স খালি করে নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছিল, সেই ভালবাসার কয়েনগুলোই আমার জীবনকে এখন পূর্ণ করে দেয়।

আমি নতুন করে বাঁচতে শিখি!

ডালাস, টেক্সাস

ফেরদৌসী পারভিন

মোহভঙ্গ

তোর মনে আছে রুনু?

সেদিন কি ঝুম বৃষ্টিই না হচ্ছিল; যাকে বলে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। পড়তে পড়তে হঠাৎ বইটা বন্ধ করে নোটগুলো গুছিয়ে রেখে বললি, চল তো আমার সাথে। আমি দু'টো ছাতা নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে তোর সাথে হাঁটা ধরলাম।

ঝড়ো বাতাসে বেশ কবার ছাতা উল্টে গেল। যখন এসএম হল পার হলাম তখন বুঝলাম যে আমরা পলাশি বাজারে যাচ্ছি। সেখান থেকে একটা মুরগি কিনলাম কিন্তু পোলাও এর চাল কেনার মত টাকা ছিল না তাই আর চিকন চাল কেনা হলো না। হলে ফিরে তুই খিচুড়ি রান্না করলি মুরগিটা দিয়ে। আমি ভাবলাম যাক আগামীকাল আর রান্নাবান্নার কোনো ঝক্কি-ঝামেলা থাকবে না কেবলই পড়ব।

খেতে বসেছি আরাম করে ঠিক তখনই পাশের রুমের সহপাঠী এল নোট নিতে। বললাম বসে পড় আমাদের সাথে। এসময় তার খোঁজে এল তার এক রুমমেট... এভাবে ৭/৮ জন হয়ে গেল। ডিসট্রিবিউট করতে গিয়ে কতই না হাসাহাসি হলো। মহানন্দে আমরা সেই খিচুড়ি খেলাম হইচই করতে করতে। তখনকার দিনে হাড্ডিসার দেশি মুরগিই ছিল। ভাগে খুব কমই পেয়েছিলাম সবাই কিন্তু আনন্দের কোনো কমতি ছিল না।

এরপর বেডের উপর বসে জুলি গান ধরল... পরানের বান্ধব রে...

তোমার বাড়ির রঙের মেলায় দেখেছিলেম বায়োস্কোপ...

এক মুরগি কিনে আমাদের হাত শূন্য। মাটির ব্যাংক ভাঙলাম। ক'দিন কেবল ডাল আর বাড়ি থেকে আনা আচার দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম। মনে পড়ে তোর সে কথা!

মনে পড়ে সেই ঝড়ো বাতাসে ছাতা উল্টে যাওয়ার কথা। আনন্দ করে সেই খাওয়া ভুলতে পারিনা। সে'সব কথা কিছুই কি তোর মনে পড়ে? আমার বড়ো বেশি রকম মনে পড়েরে..

তোর মনে আছে গাউসিয়া মার্কেটে কম দামের সুতি কাপড় কিনে আমরা কত খুশিই না হয়েছিলাম। আমরা হলের মেশিনে জামা তৈরি করলাম। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এমব্রয়ডারি করলাম। সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল। বলাকা বলেছিল, এত সুন্দর জামা তোমরা কোথা থেকে কিনেছ? ন্যায্য মূল্যের দোকান আমরাই খুঁজে বের করেছিলাম। সবাই যখন প্রতিদিন দামি দামি ভিন্ন ভিন্ন জামা কাপড় পরত তখন আমাদের ছিল মাত্র ৩/৪টা জামা। আমাদের মনে দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না। মাঝে মাঝে তোর জামা আমি পরতাম। আমাদের ভেতর কৃত্রিম কোন কিছু ছিল না। ছিল না আন্তরিকতায় কোনো ভেজাল বা ঘাটতি।

বাংলা একাডেমিতে বইমেলা শুরু হলো। আমাদের চার জনের একটা দল ছিল। আমি, তুই, জুলি আর মুন.... আমরা বই মেলাতে যেতাম হাসিমুখে। সন্ধ্যায় ফিরতাম শুকনো মুখে। কারণ বই কিনে টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম প্রথম দিকে। বই মেলার শেষের দিকে তোর দুলাভাই আসলেন ঢাকায় অফিসের কাজে। তিনি আমাদের মেলায় নিয়ে বই কিনে দিলেন। আমার কাছে এখনো পথের পাঁচালী বইটা আছে। খুব যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছি।

তোর কি মনে পড়ে একবার ঈদের সময় টিউশনির টাকা পেয়ে দু জন গেলাম গাউসিয়া মার্কেটে। কিন্তু পছন্দসই থ্রিপিস কিনতে পারছিলাম না। কারণ টাকা অল্প। দু জনের টাকা এক করলাম। সিদ্ধান্ত হলো একটা দামি থ্রিপিস কিনব। এবার বিপত্তি বাধল রং নিয়ে। তোর মানাতো ঘিয়া রঙে আর আমার গোলাপিতে। শেষে বটল গ্রিন কালারের একটা থ্রিপিস কিনে আমরা হলে ফিরলাম। আমি প্যাকেটটা নিয়ে তোর বেডের উপর রাখলাম। তুই রাতে আমার মাথার কাছে প্যাকেটটা রেখে চিরকূটে লিখলি... আগামীকাল পরে তুই উদ্বোধন কর। শেষে আমার রুমমেট পরে উদ্বোধন করল। থ্রিপিসটা ওর কাছ থেকে আর নেওয়া হয়নি।

আমরা টিউশনি করতে যেতাম। তুই মিরপুর আর আমি মোহাম্মদপুরে। যেদিন ভার্সিটির বাস ধরতে পারতাম না সেদিন অপেক্ষা করতাম ডাসের সামনে রোকেয়া হলের রিক্সার পার্টনার আপাদের জন্য। অনেক মেয়েরা টিউশনি করত বিলাসিতার জন্য। তারা মাস শেষে বেতনের টাকা নিয়ে মার্কেটে ছুটত হাল ফ্যাশনের নতুন জামাকাপড়, কসমেটিক কেনার জন্য। আর আমরা টাকা পেয়ে বসতাম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লিস্ট করতে। কত কাটাকাটির পর সেই লিস্ট পূর্ণতা পেত।

তখন আমরা ফাইনাল ইয়ারে। পাশের রুমের সহপাঠী জুলি বলল, চাকুরির জন্য এখন থেকেই পড়া শুরু করতে হবে। ও ই ছিল আমাদের ভেতর সবচেয়ে তুখোড় আর ফাইটার টাইপের মেয়ে। ও বলল, তুই একটা সেলফ এ্যাসেসমেন্ট কিনে ফেল। কেনা হলো। কদিন মহা উৎসাহে গ্রুপিং করে পড়াশুনা চলল। অবশেষে বইটা জুলির রুমেই থেকে গেল। পরীক্ষা শেষে যখন সবাই হল ত্যাগ করার জন্য গোছগাছ করছি; জুলি এসে বইটা দিল আমাকে। নিতে খুবই লজ্জা করছিল কিন্তু উপায় ছিল না; নিয়েছিলাম। আমি চাকুরি পাওয়ার পর সেটা আরেকজনকে দিয়েছিলাম।

তোর কি মনে পড়ে রুনু... বিকেলে রুমের হিটারে চা তৈরি করে টোস্ট ভিজিয়ে চা খেতাম আমরা চার জন। রাতে ব্যালকনির লাইট অফ করে হেঁটে হেঁটে চুল আঁচড়াতাম। যেদিন টিউশনি থাকত না সেদিন আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে স্যান্ডেল খুলে ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটতাম। হোটেল নীরবের খোঁজ পেয়ে আমরা ১০/১২ জনের একটা গ্রুপ খেতে গিয়েছিলাম ভর্তাভাজি আর ডাল। তোর সিনিয়র রুমমেট লাইজু আপা ছিলেন আমাদের গ্রুপ লিডার। ওখানে ইলিশ মাছের ডিম ভুনাটা খুবই মজার হত কিন্তু দাম বেশি ছিল বলে তেমন খাওয়া হতো না।

তোর কি মনে আছে ফাইনাল পরীক্ষা শেষে আমরা ৪ জন আমার রুমে ঘুমিয়েছিলাম। কারণ আমার রুমমেটরা কেউ ছিল না সেদিন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গল্প করেছিলাম। রাত ৩ টার দিকে ঘুমাতে গেলাম যার যার বেডে... ও আল্লাহ! হঠাৎ মুনের বেড থেকে চাপা ফোঁপানোর আওয়াজ আসল। আমরা ধড়মড় করে উঠে বসলাম নিজ নিজ বেডে কিন্তু কেউ কোনো কথা বললাম না। সবাই অনুভব করতে পারছিলাম যে সে-রাতে কেউই আমরা ঘুমুইনি!

অথচ সবাই চুপচাপ ছিলাম। নিস্তব্ধ রাত কেবল ভোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

তুই ঢাকার বাসায় থাকলি। একটা এনজিওতে চাকুরি পেয়ে গেলি আমি চাকুরি নিয়ে চলে এলাম নিজ উপজেলাতে। চিঠিতে আমাদের যোগাযোগ ছিল। জুলিও চাকুরি নিয়ে চলে গেল নিজের উপজেলাতে। কেবল মুনের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দু-বছর পর ঢাকাতে এলাম। তোদের শাজাহানপুরের বাসায় গিয়ে দেখি অন্য ভাড়াটিয়া। ঠিকানা নিয়ে অনেক খুঁজেছিলাম। না পেয়ে মনটা খারাপ করে গাউসিয়া মার্কেটে গেলাম। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই তোর দেখা পেয়ে গেলাম। আমি চিৎকার দিয়ে ছুটে গিয়ে তোকে জড়িয়ে ধরলাম। আশপাশের মানুষরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। প্রথমেই দুজন মিলে ফুসকা খেলাম। নীলক্ষেতে গিয়ে বিরিয়ানি খেলাম। সেদিন আমরা ঠিক করলাম দামি দুটো থ্রিপিস কিনব। কিন্তু বাড়ির জন্য শপিং করতে গিয়ে টাকা ফুরিয়ে গেল দুজনেরই। অবশেষে আমরা খুশিমনে ঝুড়ি থেকে স্যান্ডেল কিনে দুটো চকবার আইসক্রিম কিনে রিক্সায় উঠে বসলাম।

এখন আমরা কেমন আছি রুনু?

এখনো মাসের মাঝামাঝিতে আমাদের হাত শূন্য হয়ে যায়। ভদ্রগোছের মাঝারি মানের চাকুরি করার পরও!

অতীত নিয়ে আমাদের কোনো দুঃখবোধ নেই কারণ আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলাম। সেই গড়ার ইতিহাস কেবল আমাদের মনের মধ্যেই আছে। কেউ জানেনি, জানবেও না সেই অনুভূতির কথা। আমরা বেঁচে ছিলাম। নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিলাম একদিন আমরা সত্যিকার বাঁচব এই আশায়।

এভাবে বেঁচে থাকাটা কি জীবন রুনু?

আমাদের জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো হারিয়ে গেছে। চলে যাচ্ছে প্রতিটি মুর্হূত .....

একদিন বাঁচব বলে আমরা আর কতোকাল নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখব?

আমরা কি হেরে গেলাম সমাজ-সংসার অথবা সময়ের কাছে? হয়তো, হয়তো বা না। সব হিসেব তো অঙ্ক কষে মেলানো যায় না। তবে আমরা যে হারিনি তা নিশ্চয়ই করে বলা যায়, জিতেছি কি না প্রশ্ন উহ্যই থাক।

তেহরান, ইরান

মৌ মধুবন্তী

কুলফি বউ

গল্প লেখ। অল্প করে লেখ। আচ্ছা কিছু করতে গেলে অল্প করা যায়? বেশি কোনটা? আজকাল তাও বুঝিনা। ঝিম ধরে বসে আছে একটা পোড়া মন। মনের পাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা মন্দির।
মন্দিরের ভিতরে কী আছে? কেউ জানে না। কবে, কোন কালে এই মন্দিরে কেউ ঢুকেছে, এ-কথা কারো মনে নেই। পাশে একটা ধনে পাতা আর শীতকালের সব্জির খেত। খেতের আলে একটা আম গাছ। সে গাছে একটা দড়িতে ঝোলানো দোলনা। দোলনায় যে বসে সেই পড়ে। তবু সবাই একবার করে বসে। কেউ খুঁজে দেখে না, কেন পড়ে? পড়ে। ওঠে। যেন পড়াটাও খেলা। মনে হয়, পড়াটাও একটা খেলা। বয়সহীন খেলা। পাশের পুকুরে ভরতের বউ চাল ধুয়ে মুখে জল দিয়ে মুখ ফেরাতেই দেখে মানিক তার দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে। বুকের আঁচল টানতে টানতে পরনের কাপড় খুলে যায় এমনই তার হাল। মনে মনে ভাবে, আহা! এই রকম করে আর ছয় মাস আগে তাকাতে, তাহলে জীবনটা অন্যরকম হতো। মানিক পড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভরত তার খেলাবেলার বন্ধু। কই ডাণ্ডা, হা ডু-ডু, গোল্লা ছুট খেলে হাঁটু আলগা করে ফেলেছে দুই বন্ধু। কিন্তু জান আলগা হয়নি। বিয়ের দিন ভরত মন্ত্র না পড়ে মনে মনে পড়েছিল, যদি সে আর মানিক এক দিনেই বিয়ে করতে পারত।

এক সাথে বড়ো হয়ে আজ রাতে সে বাসর ঘরে যাবে। ঘর তো ঘর। সেটা বড় কথা না। কথা হলো, এই যে এক অপার রহস্যময় জগতের ভেতরে আজ তাকে গোল্লা নাকি হা ডু ডু - কী খেলা খেলতে হবে কে জানে? ওই দিকে ভরতের হবু বউ চোখের জলে নতুন গ্রহ বানিয়ে ঠিকুজি পড়ছে। যদি আজ মানিক তাকে বিয়ের কথা বলে সে এক্ষুনি এক কাপড়ে ছুটে যাবে। ঘরের দরকার নাই। ওইতো, বেশী দূর তো না। মন্দিরেই থাকা যেত। মানিক মনে মনে ভাবছে, ভরত তুই কোনদিন এই মেয়েটাকে কষ্ট দিস না। আমি তারে যা দিতে পারি নাই, তাই দিয়ে তুই তারে ভরে রাখিস। সামনে পরীক্ষা। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস না হলে মামাতো বোনটাকে হারাবে সে চিরদিনের জন্য। মামা তাকে অনেক আদর করে। কিন্তু বেইমান মন মানল না। শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে মামাত বোনের মনের বন্দরে সে নোঙর ফেললো। এমনই নোঙর, না নড়ে না চড়ে। মনের জাহাজ সমুদ্রে ভাসবে? চট্টগ্রাম বন্দর পাশেই। দেখেও মন শেখে না কেনো? তার

জন্য এখন এত লেখা পড়া করতে হয়। এমন শখের লুঙ্গি পরা ছাড়তে হলো। সখ করেও পুকুরে গোসল করতে পারে না। কলের জলে গোসল প্র্যাক্টিস করে। বারে! বিদেশ গেলে তো পুকুরটা সাথে নিয়ে যেতে পারমিশান দেবে না ইমিগ্রেশন। মনে মনে বড় একটা গালি দেয় নিজের মনকে। প্রেমে পড় এমন আজগুবি শর্তে কেউ প্রেমে পড়ে? কেউ জানে না কি মাছের কাঁটা সে গলায় নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্সের বইগুলো মুখস্থ করে। যত না পড়া দেখে চোখে তার চেয়ে বেশী শর্তটা দেখে। বিদেশে যেতে হবে হায়ার স্টাডিজের জন্য। যেমন তেমন হলে চলবে না। কমনওয়েলথ স্কলারশীপ হতে হবে। আচ্ছা এরপর কি কোনদিন এই মন্দিরের পাশ দিয়ে সে হাঁটতে পারবে? টপ টপ কয়েক ফোঁটা গরম জল বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ আওয়াজ তুলে নেমে গেল নাভিমূলের দিকে। নাভির উপর ওই জলের এতো কেনো রাগ? না জানলো মানিক, না জানলো এই জগতের কেউ।

জানলো না ভরতের হবু বউ। আজ এই যে ঘাটে দাঁড়িয়ে মানিক তাকিয়ে আছে কার দিকে, সে না জানে মানিক না জানে জগতের আর কোন পক্ষীকুল। কি যাতনায় পুড়ে যাচ্ছে পাঁজরের ভেতরের নরম চাদর। কিন্তু কেন পুড়ে যাচ্ছে? কি এমন ঘটল? মানিক তো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েই স্নাতকোত্তর পাশ করল। তা হলে কি মানিকের স্কলারশিপ হয়নি? সেটা কী করে হয়? মানিকের নম্বরের কাছাকাছি নম্বর তো কেউই পায়নি। তাহলে মানিক কেন পুড়ে খাক হচ্ছে? পুকুর ঘাট ছেড়ে মানিক ফিরে যায়, নিজের ঘরে।

বিছানার নিচ থেকে টেনে বের করে সে মুচড়ানো যৌবনহীন কাগজের টুকরা। ইচ্ছে করে একবার, অন্তত একবার জোরে চিৎকার দিয়ে এই কাগজের খবরটা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়। শোন মানুষ! মামাতো বোন এখন ময়ূরপঙ্খি ডানায় চড়ে উড়ে যাচ্ছে কোন দূর অজানায়। পেছনে রেখে গেছে শর্তের এক আবাল্য ভার। যার বোঝা মানিক আর নিতে পারছে না। ধীরে ধীরে পাজামা খুলে সেই শখের লুঙ্গিটা পরে নেয় মানিক। খুব জোরে শ্বাস নিয়ে আবার ছাড়ে। এইভাবে তিনবার করে মানিক বুকের সব ভার নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে আসে। চারদিক দেখে। মাকে একনজর দেখে। মনে মনে বলে, মা এবার তোমার সুখের দিন। আমি ক্যামব্রিজে পৌঁছেই তোমার দারিদ্র্য দূরীকরণে সচেষ্ট হব। এটাই আমার প্রথম কাজ। সালাম নাও মা । মনে মনে সালাম দেয়। শর্ত পালন করতে গিয়ে কতদিন ধরে মাকে সালাম দেয়নি। আজ কেমন যেন লজ্জা করছে। থাক যাবার আগে দেব। আজ তো এমন কিছু ঘটেনি। কেবল মনের যে একটা হালে বলদ খালি গুঁতা মারত, পড়, মানিক পড়। তোরে স্কলারশিপ পাইতে হবে। মানিক পড়তে পড়তে বেলা পড়ে যায়। তবু সে একবিন্দু আপোষ করে না। আজ মানিক মুক্ত। মামাতো বোন তার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে আজ আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। মানিক কি যেন ভাবতে গিয়েই মনকে ফিরিয়ে নেয় মন্দিরের দিকে। আহ! আজ আমি মন্দিরে ঘুমাব। মানিক এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে মন্দিরে গিয়ে ঢোকে। মন্দিরে কেন ঘুমাবে? কারণ এই মন্দিরে মানিক আর ভরতের বউ বাল্যবেলায় বউ-জামাই খেলত। মানিক তাকে আদরে সোহাগে গদগদ হয়ে কুলফি বউ বলে ডাকত।

কেন এই নামে ডাকত? তাও জানে না। ভালো লাগত ডাকতে। সেই যে কত রোমাঞ্চকর স্মৃতি। মনে করেই শিহরিত হয় মানিক। মনে মনে তার কুলফি বউকে ডাকে। আয় আয় আমার কলিজায় আয় পাখি। তোরে নরম কম্বলে জড়ায়ে আজ রাতে আমি গাঙ্গের পানি মন্দিরে ছিটাই। ভরতের কথা মনে হতেই নিজে নিজে কান ধরে। দোস্ত মাফ করে দিস। তুই জানিস না। মন্দির জানে। কি খেলায় আমরা মন্দিরের মাকড়সাদের আনন্দ দিয়েছি। এখন সে তোর। আমার কোন দাবি নাই। মনের তো কোন মামলা খাওয়ার ভয় নাই। যা পারে ভাবে। না ভাবায়। কে জানে? এই সব কথা ভাবত ভাবতেই মানিক গিয়ে ঢোকে পুরোনো সেই জীর্ণ পরিত্যক্ত মন্দিরে। এখানে কোথায় শোবে? সেই স্যাঁতস্যাঁতে পাকা বসার জায়গাটিতে এখন বড় বড় আগাছা। হাত দিয়ে টেনে টেনে তুলে ওই আগাছা দিয়ে বিছানা সাজায়। আর মনে মনে ডাকে, আয় কুলফি বউ, কোলের মধ্যে আয়। মানিক জানে না কোন কুলফি বউ সুড়সুড় করে উঠে এসেছে তার কোলের উপরে। পরদিন পর্যন্ত কোন জায়গায় মানিকের খোঁজ না পেয়ে ভরত বউ ছুটে গেছে মন্দিরে। ভরত আম গাছের নিচ থেকে দেখে বউ দৌড়ে গেছে মন্দিরের দিকে। সেও পিছনে পিছনে দৌড়ে গেছে। কেবল একটা চিৎকার শুনল ভরত, "আমারে নিয়া যাও সাথে।" তাকে নিতেই যেন কাল বিকালে কুলফি বউ ওঁৎ পেতে ছিল। স্মৃতির মন্দিরে পূজার বেদি সাজিয়ে দিল মুহূর্তে। দুই আত্মা এক ভিসাতেই উড়ে গেল ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভরত শুধু কাঁদতে কাঁদতে বললো, দোস্ত তুই চাইলেই তো বউডারে তোরে এমনিতেই দিয়া দিতাম। এমন জানের মামলায় নিতে হইত না। আমি তোর কুলফি বউরে একরত্তির জন্য ছুঁইয়া দেখি নাই দোস্ত। বাসর ঘরে যখন সে কইছিল, এই মন্দিরে তোগো সোহাগ খেলার কথা। আমি বউরে কথা দিছিলাম। তুই চাকরি পাইলে সুযোগ মত তারে আমি তোর কাছে পৌঁছাইয়া দিমু। তুই এমন করে ক্যান নিলি আমার থ্যাইকা? সেদিন আশপাশের মানুষ মানিকের জন্য কাঁদে নাই। কেঁদেছে ভরতের পাগল হবার দৃশ্য দেখে। ওদিকে আমেরিকায় পার্ক চেস্টারের অত্যাধুনিক ফ্ল্যাটে ঢুকেই মামাতো বোন তার স্বামীকে বলে, এবার আমার কথাটা তোমাকে শুনতেই হবে। এবার মামাতো বোনের বিদেশী স্বামী উপেক্ষা করবার কোন পথ পেলো না। মামাতো বোনের এই স্বামী তার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কয়েক ঘন্টার নোটিশে বিয়ে দিয়ে দেয়। কারণ বাবার ভাটির গাঙে নাইয়া এখন পড়ন্ত বেলার দিকে। ব্যবসার বুকে যৌবনপুরী আমদানি রফতানির হাঁকডাক নেই। এইটুকু সময়ে মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে "বিজিনেস কারখানাওয়ালা"র মেয়েকে এমন জৌলুসে বিয়ে দেয়া যাবে না। তাই বিদেশী জামাইকে অই "বিজিনেস কারখানাওয়ালা" আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল মেয়ের ব্যাপারে। তবু তার মন চিনচিন করে উঠলো। স্বামী দু'জনের জন্য দুই কাপ চা করে আরাম করে লাভ সোফায় বসে তাকিয়ে থাকে নতুন বউ-এর দীর্ঘ প্লেইন জার্নিতে শ্রান্ত মুখের দিকে। মুগ্ধ আবেশে চোখ বুজে আসে ।এমন রূপ! একি মানবী নাকি বাঙালী। আমাদেরকে সাদা চামড়া বলে। কিন্তু এই রূপ কই দেখি নাতো? তার সব ধ্যান ভঙ্গ করে মামাতো বোন বলে, লিসেন জিম, আই নো ইউ স্যাংক ইন্টু মাই বিউটি ওসেন।

বাট টেলিং ইউ দি ট্রুথ, দিস বিউটি ইস বীন এডোর্ড ফর এ ক্রেজী লাভার। আই এম সো সরি। আই মাস্ট সে, ইউ ডু বিজিনেস ইউথ ড্যাডি। আই সুইমড এ ফুল চ্যানেল অফ কন্ডিশান টু প্রিপেয়ার হিম ফর মী। নাউ হিয়ার আই এম। জাস্ট ক্যান নট ...জিম তার সদ্য বিবাহিত বাঙালি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু একটি কথাও না বলে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় তার সাজানো প্রথম রাতের ঘরের দিকে। সে আজ রাতের মত বিশ্রাম নিতে পারে। মাঝ রাতেই মামাতো বোন বেরিয়ে পড়ে জিমের ঘর থেকে, কাঁধে শুধু একটা ব্যাগ নিয়ে মুক্তির আস্বাদে গেয়ে ওঠে "ইন দা মিডল অফ নাইট"। আর বুকের ভেতর শর্ত সঙ্গমে বাঁশী বেজে ওঠে, "মানিক আমি আসছি"...

মানিককে শুইয়ে দিল কবরে। আর ভরতের বউকে চিতায় তুলে ভরত থেইয়া থেইয়া নাচছে আর গোঁ গোঁ করে বলছে, বউডা তো তোর লাইগাই রাইখা দিছিলাম। চাকরী পাইলেই তো দিয়া আসতাম। হায় ভরত। হায় মামাতো বোন। কি হতো? এই মন্দির সেদিন এইখানে না থাকলে? মন্দিরগুলো এমনি জীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকে। আর মনগুলো অকালেই...তাল পাতার বাঁশি শুনে কোথায় চলে যায়......?

টরোন্টো, অন্ট্যারিও, কানাডা

মোস্তফা তানিম

উপদেশ

কে যেন বললো, কিছুই পরিবর্তন হয় না। ওহে নির্বোধ- সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত।

ডাক্তার লিয়ান উত্তেজিত হয়ে বললেন, হয়। করা যায়। কার্যকারণের পরম্পরা আছে। একটা কিছু পরিবতর্ন করতে পারলে ফলাফল ভিন্ন হবে। ফলাফল অনেক ভালো হতে পারে।

ঠা ঠা করে হেসে উঠলো সে। তাকিয়ে দেখলেন, ফোনের ভিতরে একটা মুখ দেখা যাচ্ছে। ওহ, এতো মিরি! নিঃসঙ্গ মানুষকে সঙ্গ দেওয়ার একটা সফ্টওয়্যার। সে মানুষের রূপ নিয়েছে। কথাও বলছে যেন অবিকল একটা বুদ্ধিমান মানুষ। কিন্তু সে তো আসলে 'কোড'! মানুষের তৈরি, মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে লেখা সফটওয়্যার! তার কথার গুরুত্ব দেওয়াটাই আসলে ভুল হচ্ছে। একটা খেলনার সঙ্গে মানুষ যুক্তিতর্ক করে?

তিনি চুপ করে রইলেন। সে একটু বিদ্রুপের হাসি যোগ করে বললো, তুমি কি আজ তোমাকে পরিবর্তন করতে পারবে? তোমার অতীতকে? ভুল শুধরাতে পারবে? একটা বাচ্চাও তো উপদেশ শোনে না। বড়রা যা জানে, তা তুমি কোনোভাবেই ছোটদের ভিতরে বলপূর্বক ঢুকাতে পারবে না। পারবে?

এই চ্যালেঞ্জ ডাক্তার লিয়ান নিতে গিয়েও নিলেন না। সামান্য একটা সফটওয়্যার। তার মতো কোনো এক মানুষ একে বিনোদনের জন্যে বানিয়েছে। হয়তো বুদ্ধিদীপ্ত কিছু কথাও তাতে যোগ করেছে। হয়তো বিজ্ঞান-দর্শন এগুলোর বিস্তর তথ্য তার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাতে কী? সব তো মানুষেরই বুদ্ধি। তার বেশি আর কী?

তিনি একটা ফুঁ দিলেন। মিরি নামের বুদ্ধিমতী সবজান্তা মেয়েটি উড়ে গেল। তার ভাল লাগলো। পরক্ষণেই ভাবলেন, আরেকটু কথা বললে হতো না? সে হয়তো একটু বেশি জানে? তাকে যুক্তিতে পরাস্ত করা যেত না? একটু আগে দেওয়া নিজের যুক্তিকেই এবার তার ভুল মনে হচ্ছে। মিরিকে এভাবে জোর করে সরিয়ে দেওয়াটা খানিকটা বুদ্ধিমত্তার হার বলে মনে হচ্ছে। সেটা কেন তা তিনি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছেন না।

নাহ, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর সবার মতো তারও মাথাটা খেয়েছে। এবার তিনি বুঝলেন সমস্যাটা কোথায়। মনে হচ্ছে যেন একটা বুদ্ধিমান মানুষের মুখ চেপে ধরা হলো। তিনি ভালো করেই জানেন সে মানুষ নয়। তার বুদ্ধি, তাকে যে প্রোগ্রাম করেছে, আর যেসব তথ্য উপাত্ত তার ভিতরে ঢুকিয়েছে, তার থেকে মোটেও বেশি নয়। তিনি তাকে আবার ফিরিয়ে এনে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু তা করলেন না। মানুষ

যন্ত্রের কাছ থেকে বুদ্ধি নিতে পারে না। মিরি একটা যন্ত্র। বিনোদনের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই, তাকে আবার ফিরিয়ে এনে গুরুত্বসহকারে কথা বলাটা বড়ই ছেলেমানুষী হবে।

এইসব যুক্তিতর্কে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেলেন। খানিক পরে ভিতরে আরও বড় একটা অস্বস্তি টের পেলেন। কাল তিনি যাবেন। ব্যাংকের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করে, টাইম মেশিনে চড়বেন। বর্তমান ঠিক করলে ভবিষ্যৎ ঠিক হবে। অতীত ঠিক করলে বর্তমান ঠিক হবে। কোনোই ভুল নেই, কোনোই সন্দেহ নেই। পাটিগণিতের সরল অঙ্কের মতোই বিষয়টা অতি সরল। এর জন্যে সক্রেটিস-প্লেটো হওয়া লাগে না। তিনি এক গ্লাস পানির সঙ্গে মেরুদণ্ডের ব্যাথা কমানোর ওষুধ ইস্প্রিনি খেলেন। একটা স্প্রে মুখে দিয়ে প্রায় বিকল ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিলেন। মুহূর্তেই শরীরে আরামের আমেজ ছড়িয়ে পড়লো। যার সাতটা ডিস্কে সমস্যা, ফুসফুস শক্ত হয়ে গেছে, তার নিজেকে মনে হলো তেজি ঘোড়ার মতো। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

বারলুই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক কোন জায়গাটায়?"

"এই তো এই বেঞ্চেই। গাছটা ছোট ছিল এখন অনেক বড় হয়েছে। "

"ভুল হচ্ছে না তো?"

"মোটেও না। এটা শিরিষ গাছ। এর বয়স কম করে হলেও আশি বছর। তখন আমার বয়স ছিল তেরো।"

"দিন তারিখ বলতে হবে। সময়টাও।"

সময় পরিক্রমণের টেকনিশিয়ান বারলুই মনোযোগ দিয়ে একটা ডায়ালে মধ্যে কী কি যেন ঘুরাচ্ছেন।

"বললাম তো, ফেব্রুয়ারি মাসের ছয় তারিখ, সময় বিকেল চারটা। ১৯৯৪ সাল।"

"হুম, ষাট বছর তিন মাস একুশ দিন এগারো ঘন্টা। আচ্ছা, কী করতে হবে মনে আছে? "

এই লোকটা একই কথা বার বার বলে। বিরক্তি চেপে হাতের ছোট্ট সবুজ বলটা দেখলেন তিনি। বললেন, "হ্যাঁ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করতে হবে। তারপর এই তারাটার উপরে তিনটা চাপ দিতে হবে। হাঁটাহাঁটি করা হবে না। কোনো একটা নুড়ি পাথরও যেন পা লেগে কাত হয়ে না যায় সেসব লক্ষ্য রাখতে হবে। আর তাকে ভবিষ্যতের কোনো তথ্য সরাসরি জানানো যাবে না।"

"ঠিক। আপনার হাতে ঘড়ি থাকছে না। পাঁচ মিনিটের কথাবার্তা রিহার্সেল করেছেন?"

"করেছি।"

"দেরি হলে ফিরতে পারবেন না। অথবা অন্য সময়ে ফিরবেন। হয়তো প্যালিওলিথিক যুগে। তখন চোখা পাথর দিয়ে শিকার করে বাইসনের মাংস ঝলসে খাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। "

গত এক ঘণ্টায় এই কথাটির উত্তর তিনি সাত বার দিয়েছেন। ডাক্তার লিয়ান এবার রাগে চুপ করে রইলেন। এর মাঝে হঠাৎ মনে মনে হলো মিরির সঙ্গে একটু কথা বললে

হয় না? তার কি অভিমত? অথবা তাকে একটা বাঁকা কথা ছুঁড়ে দিলে হতো না? যেমন- "তুমি একটা যাচ্ছে তাই। কিছুই জানো না। আমার হাড়গোড় আর ফুসফুসের সমস্ত সমস্যা ঠিক করতে চলেছি, অতীতে। সহজ যুক্তি জানো না? একটি তীর ছুটে এসেছে দেখে একটি পাখি মারা গেছে। একটি পাখি মারা গেছে দেখে তীর ছুটে আসেনি। ঘটনার পরম্পরা, কার্যকারণ। শুধু সামান্য পরিবর্তন। একটু বোঝানো। সব ঠিক হয়ে যাবে। মেরুদণ্ডের সাতটি কার্টিলেজ, এমফাজিমা আক্রান্ত ফুসফুস, না পাওয়া তিনটি সনদ ও খ্যাতি, সব। মিরি, আমি কি পৃথিবীর সেরা সার্জন হতে পারতাম না?"

বারলুই তার অসন্তোষ বুঝতে পেরে আর কথা বাড়ালেন না। ছোট্ট ঘরের মতো দেখতে প্রচুর যন্ত্রপাতিতে ভরা সময়যানটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। দুজন পাশাপাশি সিটে বসে আছেন। মাথা ও শরীরে ভ্যাকুয়াম প্লাগ দিয়ে প্রচুর যন্ত্রপাতি লাগানো। সেগুলো কোনো যন্ত্রণার সৃষ্টি না করে একটা অদ্ভুত মদির অনুভূতি সৃষ্টি করছে।

গভীর রাত। তবু চাঁদের আলোয় সামনে মাঠ, গাছপালা সব দেখতে পাচ্ছেন তিনি। বিচিত্র শব্দ শুরু হলো। কিছু নড়ছে না, কিন্তু ডাক্তার লিয়ানের মনে হলো তিনি প্রবল বেগে পাক খাচ্ছেন। মদির ভাবটা ছলকে উঠছে। হঠাৎ হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠছে। কী যেন ভাঙছে। কী যেন প্রবল বেগে চলছে। কী যেন সীমাহীন বলে মনে হচ্ছে। পার্কের গাছের আবছা অবয়বগুলো একাকার হয়ে রেখা-রেখা হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ কোথায় যেন তিনি বিষম ভাবে আছড়ে পড়লেন।

আরে? এটা কী? চারদিকে আলো! চোখ ধাঁধিয়ে যায়! এই তো সেই পার্ক! ছোট ছোট গাছ। এখানে ওখানে প্লাস্টিকের ব্যাগ, ময়লা কাগজ, বাদামের ঠোঙা! সিনেমা শুরু হওয়ার মতো করে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, মলিন কাপড় পরা মানুষজন এদিক ওদিক হাঁটছে। কেউ কেউ বসে আছে। আরে? এইতো সেই বেঞ্চটা! তিনি বসে আছেন! পাশে একটা ছোট্ট ছেলে। ছেলেটা তাকে দেখছে না। ডাক্তার লিয়ানের বুকের রক্ত ছলকে উঠলো। এ যে তিনি নিজেই! ষাট বছর আগের লিয়ান!

ছোট্ট লিয়ান পার্কের বেঞ্চে বসে কিছু ভাবছে। মধ্যে সিঁথি করা চুল। সময়-যান তাহলে কি সত্যি কাজ করেছে! নাকি করেনি? সবই ভাঁওতা বাজি না তো? এই ছেলেটি হয়তো তাঁর বংশের কোনো উত্তরপুরুষ। একই রকম আদল। তাকে বোকা বানাচ্ছে না কি?

ধাতস্থ হতেই একটা মিনিট চলে গেলো। ছেলেটা বিরক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। খুব চেনা। খুবই চেনা। একেবারে নিজের ছোট্ট সংস্করণ! সময় ভ্রমণ তাহলে সত্যি! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! একবার চকিতে মিরির কথা মনে হলো। তাকে বিদ্রুপের হাসি হেসে বলতে ইচ্ছা করলো, দেখেছো? দেখেছো কি হতে যাচ্ছে? নির্বোধ রোবট। দেখেছো মানুষ কি পারে?

আর সময় নষ্ট করা যায় না। বহু মূল্যবান এই সময়।

তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়েই আদরের স্বরে ডাকলেন, "লিয়ান?"

ছেলেটা চমকে উঠে তাকালো।

"কেমন আছো লিয়ান?"

"আপনি আমার নাম জানেন?"

"হ্যাঁ জানি। তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। শোনো, জরুরি কথা আছে।"

ছেলেটা তার দিকে এবার গভীর সন্দেহ নিয়ে তাকালো।

"শুনছো? আমার কথা শুনলে তোমার ভালো হবে। জীবনে উন্নতি করতে পারবে।"

ছেলেটার চোখেমুখে এখন একরাশ বিরক্তি। কী বলবে বুঝতে পারছে না। শেষে বললো, "আপনি কে? কিভাবে চেনেন আমাকে?"

"সে কথা পরে বলবো। সময় কম। তুমি এই যে বাঁকা হয়ে বসেছো, এটা কোরো না। সোজা হয়ে বসো। লাম্বার ডিস্কের ক্ষতি হচ্ছে। "

ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

অবিকল তিনি নিজেই, কিন্তু অনেক-অনেক যুগ আগের। কী কমনীয় মুখ! নিশ্চয়ই সে ভিতরে ভিতরে অনেক রাগ করছে। নিশ্চয়ই ঝট করে উঠে চলে যাওয়ার চিন্তা করছে।

তিনি বললেন, "শোনো লিয়ান। তোমার উপকার হবে। সিগারেট খেয়ো না, সিগারেট খেলে....." একবার নিজের লাং রিপোর্টের কথা চিন্তা করে বললেন, "এমফাজিমা হয়। লাং নষ্ট হয়ে যায়। "

ছেলেটা বিরক্তি চাপতে না পেরে বললো, "সে তো বাবা সব সময়ই বলেন। আপনি কি আমার গার্জিয়ান?"

"তোমাকে বোঝাতে পারবো না। তোমার কী হবে আমি জানি। কীভাবে জানি তা জিজ্ঞেস করো না।" একটু থেমে তিনি বললেন, "ওই ছেলেটার সাথে মিশো না।"

"কোন ছেলেটা? "

"শাকিল। তার কারণে তোমার অনেক ঝামেলা হবে। বাবা মা কষ্ট পাবে। "

"আপনি শাকিলকেও চিনেন? আপনি কি পুলিশের লোক?"

"আহ। আমার দিকে তাকিয়ে দেখো। চিনতে পারছো? আমি তুমি-ই।"

ছেলেটা কিছুটা ভয় পেয়ে তার দিকে তাকালো। ডাক্তার লিয়ানের এখন ছেলেটাকে এমনকি খুব আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু ছেলেটা কিছুই বিশ্বাস করছে না। এদিকে সোয়া মিনিট সময় মাত্র বাকি আছে। ফিরে না গেলে ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। সে কথা পঁয়ত্রিশ বার বলেছেন বারলুই।

কিশোর লিয়ান বললো, "যত্তসব আজগুবি। আপনি তো বুড়ো একজন মানুষ।"

ডাক্তার লিয়ান অসহায় বোধ করলেন। সামান্য তথ্যগুলো ঠিকমতো জানাতে পারলে এই ছেলে, মানে তিনি নিজে কী ভীষণ সফল, সুন্দর মানুষ হতে পারতেন!

"সময় নেই, আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ থেকে জানাতে এসেছি। এতে তোমার ভালো হবে। ...বায়োলজি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ো। বড় হলে স্পেশালাইজেশন করো। টাকার জন্যে তড়িঘড়ি চাকরিতে ঢুকো না। ....আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা..."

ছেলেটা এবার উঠে দাঁড়ালো। তার মুখটা কোমল, কিন্তু চোখ দুটো তীব্র। "দেখুন, উপদেশ দেওয়ার মানুষের আমার অভাব নেই। আপনাদের কাজই হলো ছোটদের উপদেশ দিয়ে বেড়ানো। আমার কোনো উপদেশের দরকার নেই। "

তিনি বুঝতে পারলেন, এতো কাঠখড় পুড়িয়ে, জীবনের সমস্ত সঞ্চয় খরচ করে এখানে এসে কোনো লাভ হলো না। একে কিছুতেই সংবাদগুলো তিনি দিতে পারবেন না। সামনে বসে থেকেও না। সব জেনেও না। কোনোভাবেই না। কিছুতেই না।

পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। ছেলেটার দিকে আদরের হাত বাড়াতে গিয়েও সরিয়ে নিলেন তিনি। এ তো আদরও নেবে না। মনে হলো কোথায় যেন মিরি ঠা ঠা করে হাসছে। তিনি একবার ক্ষুব্ধ হলেন, একবার দুঃখিত হলেন, শেষে অসহায় হলেন।

ভারাক্রান্ত মনে ডাক্তার লিয়ান হাতের সবুজ বলটির উপরের তারকা চিহ্নে তিনবার চাপ দিলেন। তখনই গাছপালা-বেঞ্চ-মাঠ এবং কিশোর লিয়ান, সবকিছু ঘুরতে শুরু করলো। সবকিছুর অবয়ব একাকার হয়ে যাচ্ছে, রেখা-রেখা হয়ে যাচ্ছে। তার ভিতরে কোথা থেকে যেন অনেকটা নিয়তির মতো ঠা ঠা করে হেসেই চলেছে মিরি।

হার্নডন, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদ ইরফান

ডেস্টিনি

তিন-তিনবার একই ঘটনা ঘটাল এরা। শুরুতে ভেবেছিলাম নূতন ব্যবসা, অনভিজ্ঞ লোকজন। ভুল করছে। ভুল যে আসলে কার?

প্রথমবারের ঘটনাটি বলি। সপ্তাহান্তের সন্ধ্যায় সদাইপাতি সারতে সওয়ারি হয়েছিলাম ওদের। দূরের পথে কিংবা কম আলোতে নিজে চালাই না আর আজকাল। টাকা-কড়ির টানাটানিতে জেরবারও কতক। তাই ঘেটেঘুটে বের করেছিলাম ডেস্টিনি নামের এই শরীকিবাহন। খদ্দের টানার ছাড়ে সর্বোচ্চ ওরা, গ্রাহকসেবায়ও। রীতিমত অংক কষে বের করেছে গুগল কোম্পানীর সন্ধ্যানাকল।

গাড়ী চলে এল দ্রুত। আরোহি আর চালকের, আর আরোহিদের পরস্পরের মাঝে স্বচ্ছ পুরু পলিথিন টানটান করে লাগানো। হাতে দস্তানা মুখে মাস্ক লাগানো চালক যখন উদ্দিষ্ট বড় দোকানে না নিয়ে পাড়ার ভেতরের ছোট দোকানটির সামনে নিয়ে এল। সস্তার তিন অবস্থার প্রথমটির কথাই আমার মনে এল। বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে গিয়ে দেখি চালক ইশারা করছে দোকান থেকে বেরিয়ে আসা লোকজনের দিকে। যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুষ্প্রাপ্য সব দ্রব্য হাতে ঝুলিয়ে বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে আসছে একেকজন। পাড়ার দোকানে এসব পাওয়া যাবে না ভেবেই আমি যেতে চেয়েছিলাম শহরের মাঝের বড় দোকানে। অবাক হলেও ধন্যবাদ দিতে ভুললাম না চালককে। কী করে সে জানল বুঝে উঠতে পারলাম না যদিও? সওয়ারীর কথার বাইরে অন্য জায়গায় নিয়ে আসা কতটা আইনসম্মত সে প্রশ্ন তুলে ভাড়ার টাকাটা ফেরত পাওয়া যায় কিনা ভাবতে ভাবতে দোকানে ঢুকে পড়লাম। ছাড়ফাড় বাদে যে ক'টাকা ভাড়া হল তা এতই কম খুশীতে ভাড়ার ক'টাকার একেবারে সমান সমান বকশিশ লিখে ফেললাম ফোনে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দিইনি আর। বীরবলের গল্পের সেই সওদাগরের মত তুলে রাখলাম পরেরদিনের জন্য। সওদাগর যেমন কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল আমিও তেমনি পাঁচে পাঁচ দিয়ে দিলাম চালকের রিভিউতে। টাকা-পয়সার টানাটানিতে নয় পড়েছি কিছুটা, মনটা তো বড় রাখা চাই।

মনে পড়ছে স্পষ্ট দ্বিতীয়বারের ঘটনাটি। আজব ঘটনা এটিও। সেই ডেস্টিনির সাথেই। মেয়ে আসছে তার কলেজ টাউন থেকে। ছাত্রাবাসের কাছের স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবে বলেছে। ওয়াই-ফাই আছে ট্রেনে। প্রয়োজনে হোমওয়ার্ক, ক্লাস সেরে নেবে পথেই।

বলেছিল নিজেই চলে আসবে রাইডশেয়ারে। আমার মন সায় দেয়নি। মেয়ের দু'ঘণ্টার রেলযাত্রা শেষ হবে পাশের বড় শহরে। মিনিট চল্লিশেক বাকী থাকতেই ফোনে তলব করলাম ওদের। সস্তার দ্বিতীয় অবস্থার ভয় ছিল মনে, আন্তঃনগরের স্টেশনে না নিয়ে এবারে যদি পাড়ার লোকাল কমিউটে নিয়ে যায় ডেস্টিনি তবে মেয়ের বকাঝকা খেতে হবে। আন্তঃনগরও নয়, কমিউটারও নয়। চালক আমায় নিয়ে এল শহরতলীর বড় বাস টার্মিনালে। রেগেমেগে চালকের দিকে ফিরতেই দেখি উইন্ডশীল্ড পেরিয়ে সোজা সামনে তার দৃষ্টি। মিটিমিটি হাসছে সে প্রায়শূন্য বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো একমাত্র বাসটির পাশে স্যুটকেস সামনে নিয়ে দাঁড়ানো আমারই মেয়ের দিকে চেয়ে। ফেরার পথে মেয়ের মুখে শুনলাম, ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে ট্রানজিট কর্মীদের ধর্মঘটে। ভাগ্যিস ট্রেন স্টেশনের পাশ থেকেই বাস পেয়ে গেল ও। বাসের অধিকাংশ সিটই খালি থাকায় আরামেই এসেছে। কাজও হয়েছে পথে

"তোমাকে বলিনি আর। তুমি তো এসব এক টাকার বাসের কথা শুনলেই ক্ষেপে যাও। ভাবলাম নেমেই ফোন দেব।"

রাগ কমতেই মেয়ের কাছে বর্ণনা করেছিলাম ডেস্টিনি-র অদ্ভুত ব্যাপারগুলো।

"তুমি খামোখাই অত টাকার টিপ দিয়েছ বাবা। এটি ড্রাইভারের ক্রেডিট না, সফটোয়ারের। ডেস্টিনি নিশ্চয়ই এমন কোন এল্গোরিদম বের করেছে, যেটি রিয়েল টাইম শপিং বা ট্রাঞ্জিট ডাটা এনালাইজড করতে থাকে থ্রুয়াউট দ্য রাইড।" এরপর ব্যখ্যা করতে থাকে সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়যাত্রার অবিশ্বাস্য সব কাহিনী, যন্ত্র কী করে উপাত্ত ঘেঁটে নিজেই শিখতে পারে তথ্য, তরিকা আগে থেকে জানিয়ে রাখলে, মেশিন লার্নিং, নিউরাল, ডিপ নিউরাল এসব জানা-অজানা সব শব্দ শিখতে শিখতে বাড়ী চলে এল। গাড়ী ছেড়ে যেতেই ফোন থেকে ভেসে এল অদ্ভুত সব শব্দ- "ওনেক ডান ইয়া ব্যাড। গোন্টোবাই পাউচ গেশেন এপ্লাই।"

"এতই আনাড়ী এরা। অ্যাপের দখল নিয়েছে দেখ চীন-জাপানের কোন..." আমার বিরক্তিমাখা বাক্য শেষ হবার আগেই শুনি মেয়ের অস্ফুট স্বগতোক্তি- "এন, এল, পি, এল, আই, ডি, স্পিচ রিকগনিশন, অল ইন ওয়ান এপ, ওয়াও।"

শেষ ঘটনাটি সদ্য। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই কথা বলছি আপনাদের সাথে। সকাল থেকে বসে আছি এখানে। দাঁড়ান, গোড়া থেকে শুরু করি। মেয়ের এবারের আগমনে আনন্দ আশঙ্কা ছিল সমান সমান। চারিদিকে যা ঘটছে সেতো জানেনই সবাই। শুরুতে সতর্ক ছিলাম বাড়ীবন্দী আমরা সবাইও। নীচতলায় নিজ দুর্গে ঢুকে গেল দুহিতা। ছেলে মেয়েদের মা মানতে পারে না কেবল "মেয়ে কি শ্বশুরবাড়ীতে না বাবার বাড়ীতে?"

মারীর চেয়ে মায়া বড় প্রমাণ করে বুহ্য ভেদ হল দ্বিতীয় দিনেই। এর পরের কদিন স্বপ্নের মত। দিনভর নানান কিসিমের কাহিনী- একগাদা খাদ্য-অখাদ্য গলধঃকরণ আর রাত জেগে একের পর এক ভালমন্দ ছবি দেখে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে এক একটি দিন। কাজের দিন আর ছুটির দিনে কোন তফাৎ নেই আর আজকাল- বেলা দুটোর আগে

ঘুম ভাঙ্গে না কারোরই। আজ ভোরে হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তাই অবাক হয়েছিলাম। ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই মনে হল বুকের ওপর কেউ চেপে বসেছে। ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে কাউকে না দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম দুঃস্বপ্ন দেখছি ভেবে। ঘুমোতে আর পারিনি। বুকে, পিঠে, বাহু, কাঁধে সাঁড়াশীর মত চাপ বোধ হতেই আতংক ভর করল মনে। মন শক্ত করে ইন্স্যুরেন্সের কার্ড দেখে হাসপাতালের ঠিকানাটা লিখে নিলাম কাগজে। ছোট্ট একটা নোটও লিখে রেখে দিলাম বাথ্রুমের বেসিনে। ফোনটা হাতে নিয়ে ডাক পাঠালাম ডেস্টিনিতে। সন্তর্পণে কাপড় বদলে চোরের মত চুপিচুপি দরোজা খুলে বেরিয়ে আসতে গিয়ে হোঁচট খেলাম দরোজার সামনে রেখে যাওয়া ডেলিভারী বক্সে। মনে হল পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দিচ্ছে কেউ আমাকে। কোনমতে সামলে নিয়ে গাড়ীতে ওঠার মূহুর্তেই মৃদু স্বরের পিঁইইইই আওয়াজ করোটির ভেতরে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিল ধড়াম ধড়াম করে।

"দে পুট টেম্পারেচার সেন্সরস ইন দ্য ভেহিকলস।" গন্তব্যসারথীর অবিচল দৃষ্টিতে বোঝার উপায় নেই সে কী ভাবছে। নিরাসক্ত ভঙ্গীতে কেবল বলল- "ইউ নিড টু ফিল ইন দ্য কোশ্চেনেয়ার নাউ দ্যাট দ্য বাজার কিকড ইন।"

এটি নূতন। কবে থেকে এ অবস্থা, কোন উপসর্গ কেমন, কখন থেকে ধরে ইত্যাকার নানান প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরই কেবল যাবে ডেস্টিনি।

এ যেন হাবিয়া দোজখের আগে পুলসেরাত । চরম বিরক্তি নিয়ে ফোনের বোতাম চেপে চেপে উত্তর দিতে থাকলাম।

শুধু মনে এল, বাড়িয়ে লিখতে হবে যতটা পারা যায়। বলা তো যায় না আবার যদি বাসায় ফেরত পাঠায় তেমন খারাপ নয় ভেবে? এক এক করে সবার শরীরে যাবে এই জিনিস। তার চেয়ে বরঞ্চ একটু আধটু বেশীই বলি। পুরোপুরি তো আর মিথ্যা বলা হচ্ছে না।

কতদিন ধরে এ অবস্থা- গতকাল, দুদিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, আরো আগে থেকে- চেক আরো আগে থেকে।

কোথায় ব্যাথা- বুকে, পিঠে, পেটে, সব জায়গায়- চেক সব জায়াগায়।

১ থেকে ১০ মাত্রায় ব্যাথার মাত্রা কত- দশ।

গাড়ী চলতে শুরু করেছে এরি মধ্যে। প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে আমি। প্রাণান্ত চেষ্টা করছি নিজেকে একজন সত্যিকারের রোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার। এক প্রশ্ন থেকে আরেক প্রশ্নে যাওয়ার মাঝে বিরতি আর "ইনিশিয়ালাইজিং, ক্যাল্কুলেটিং, রিরাউটিং..." ইত্যাকার নানা শব্দের পুনরাবৃত্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন টের পাইনি।

চটকা ভাঙ্গল চালকের উচ্চস্বরে- "স্যার, ইউ আর হিয়ার।"

প্রস্তুত হয়ে নামতে গিয়ে পরচিত মনে হল না জায়গাটা। সাদার ওপরে লাল হরফে লেখা সেই ইমার্জেন্সী সাইন তো দেখছি না। এ কোথায় নিয়ে এল আমাম্য ডেস্টিনি?

গাড়ীর বাইরে পা দিয়েই দেখি খালি বড় পার্কিং লটের মাঝখানে পার্ক করা আমাদের গাড়ী। লট যেখানে শেষ সেখানে ছোট একটি অফিস। অফিসের সামনে লাইন। অফিস

থেকে মহাকাশযাত্রীদের মত পোশাক পরা দুজন লোক বেরিয়ে এসে লাইন থেকে এক একজন করে লোককে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে। অফিসের মাথায় সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লিখা- "এল্ক গ্রোভ ফিউনারেল হোম।" জিজ্ঞাসু চোখে চালকের দিকে তাকাতেই হাতের ফোনটি দেখিয়ে সে শুধু বলল, সেই একই ভঙ্গীতে, "আস্ক ডেস্টিনি।" ভোরের হিমেল হাওয়া সরে গিয়ে সকালের মিঠে রোদ পার্কিং লটে চলে এসেছে ততক্ষণে। তাপ পৌঁছুল না আমার শরীরে। রোদ এখন অনেক চড়া। তবুও আমার শীত করছে। দাঁড়িয়ে আছি লাইনে। এই বুঝি আমার ডাক আসল।

এল্ক গ্রোভ, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মৌসুমী কাদের

সৎকার

শৈত্যপ্রবাহের কারণে হাসপাতালের ভাঙা জানালা দিয়ে শোঁ শোঁ করে বাতাস ঢুকছে। বিছানায় শুয়ে বাবা আমাকে জিগ্যেস করল-

- জীড়েন রস পাওয়া যাবেরে মা? রস খেলে শরীর গরম হয়।
- খেজুরের রস, বাবা?
- হ্যাঁ।
- আমি বললাম, চেষ্টা করে দেখতে পারি, খেতে চাও?
- একটু হালকা হাসি হেসে মাথা নেড়ে বাবা বলল, হ্যাঁ।

মোবাইল টিপে যোগেন কাকুকে ফোন করলাম। সে আমাদের গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর থাকে। বাবার বন্ধু। তার বাগানে ষাটটা খেজুর গাছ আর বেশ কয়েকটা চন্দন গাছ আছে। যোগেনকাকু গাছগুলোর খুব যত্নআত্তি করে। রসের ব্যবসাও মন্দ না। কেউ আজকাল তেমন একটা বাগান করতে চায় না। তার উপর মাটির যা অবস্থা, বারোটা খেজুর গাছ মিলে এক হাঁড়ি রসও হয় না। এসব কারণেই কাকুর ছেলেরা পেশা বদল করে অন্য ব্যবসায় নেমেছে। রতন কাকুই ছিল শেষ গাছি। গগনচারী মানুষ ছিল সে। যেমনি তরতর করে সে গাছে উঠে যেত আবার তেমনি ঝুপঝুপ করে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে আসত। আজকাল এই রকম গাছির বড়ই অভাব। নিতাই-রতন-যোগেন তিন বন্ধু ছিল হরিহর আত্মা। ওদের সবাই এখন ষাটের কোঠায়। বন্ধুত্ব আগের মতন নেই। তবে গতানুগতিক যোগাযোগটা আছে।

বাবার কাছে গল্প শুনেছি, একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়ে রতন কাকুর কোমর ভেঙেছিল। হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল প্রায় এক মাস। যোগেন মণ্ডলই চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছিল। বাবা আর রতন কাকু গ্রামের একই স্কুলে প্রাইমারি পড়েছে। খবর দিলে সে রস নিয়ে ছুটে আসবে। কিন্তু যোগেন মণ্ডল পাক্কা হিসেবি। স্বার্থ ছাড়া সে এক টাকাও খরচ করবে না। তবে গুলপট্টি মেরে আনলেও আনা যেতে পারে তাকে।

মোবাইল থেকে যোগেন কাকুকে যখন ফোন করলাম, তখন সে হাটে যাবার আগে গ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। গ্রামের মানুষ এখন আর

বাজারের চা ছাড়া কাজ শুরু করে না। গুড়ের চা হারিয়ে গেছে কবে। এখন তারা স্যাকারিনের প্যাকেট ঢেলে দেয় চায়ে। ঘনীভূত কৌটার দুধ হলে তাও লাগে না।

ফোনে চিৎকার করছি, কাকু... কাকু আমি মৃত্তি বলছি, নিতাই মণ্ডলের মেয়ে, চিনতে পারছ?

- হ্যাঁ...হ্যাঁ...পারছি, পারছি... কেমন আছিসরে মা...?

- আছি, কাকু...বাবা হাসপাতালে, হার্ট এটাক করেছে। খেজুরের রস খেতে চাইছে। এখানে তো জোগাড় করা মুশকিল। তুমি কি পাঠাতে পারবে?

মনে মনে ভাবছিলাম, যে চালবাজ লোক, এখুনি হয়তো কোনো বাহানা দাঁড় করাবে।

- ওপাশ থেকে কণ্ঠ শোনা গেল, কোন হাসপাতালে?

- হার্ট ইন্সটিটিউট কাকু, আমি তোমাকে ঠিকানাটা টেক্সট করে দিচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারো, পাঠিয়ে দাও। যত টাকা লাগে আমি দেবো।

- আচ্ছা মা, চিন্তা করিস না... সব ঠিক হয়ে যাবে...

যোগেন মনে মনে ভাবে, এক হাঁড়ি কাঁচা রস ১০০ টাকা। তিন হাঁড়িতে মোট ২৪ কেজি। জাল দেয়ার পর সেই রসে ২ কেজি গুড় হবে। গুড়ের দাম না হলেও তিনশ থেকে চারশো টাকা। আসল পাটালি লন্ডন, কাতার, সৌদি আরব, এমনকি আমেরিকা পর্যন্ত যায়। চল্লিশ বছর ধরে তার পাটালির ব্যবসা। এখন গাছ কমে গেছে বলে ব্যবসা শিকেয় উঠেছে। ঢাকায় রস পাঠানো তো আর কম ঝক্কি না। আসা যাওয়ার খরচ আছে। আর তাছাড়া পাঠাবার লোক কই? রতন ইদানীং আঙুলের দাগে দাগে টাকা গুনে। বাজারে দোকানও দিয়েছে একটা চৌরাস্তার মোড়ে। সেটা ছেড়ে কোথাও সে যাবে না। যোগেন তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকায় আর ভাবে। ছেলেপুলে তো একটাও লেখাপড়া করল না। এমনকি ধান কেটে ফেলা জমিতে যে শীতের সবজি চাষ শুরু হয়েছে তাতেও ওদের মন নেই। একসময় নিতাই আর রতনই ছিল সব। ওরা চাষবাসে সাহায্য করত। নিতাই পড়াশুনা করে ঢাকায় চলে গেল। রতন গুড়ের ব্যবসা আর দোকান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিতাইয়ের এখন দুঃসময়। সাহায্য করাই উচিত। কিন্তু ওর কাছে কি আর খরচের টাকা নেয়া যাবে?

২

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে পড়ছি। পলিটিক্যাল সায়েন্সে। মা গত হয়েছে অনেক আগে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি প্রাইমারি শিক্ষক। নাম নিতাই মণ্ডল। তার টাকা-পয়সার অভাব সবকালেই ছিল এখনও আছে। বাবা আর আমি দুজনেই টিউশনি করে বাড়তি আয় করতাম। মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এর ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে আমাদের বাসা। পাশের পাড়ার অম্বিকা মাসি একবেলা এসে আমাদের বাড়িতে রান্না করে দিয়ে যায়। সেই খেয়ে বাপ-বেটির সংসারটা ভালই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ বাবার হৃৎপিণ্ডে আক্রমণ হওয়াতে বিরাট একটা বিপদ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল। ডাক্তার কিন্তু পই পই করে বলে দিয়েছিল - রক্তে সুগার লেভেল ঠিক না রাখতে

পারলে কিন্তু অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু বাবার যে চার্বাকীয় একটা মন আছে, সেই মনটা সহজে কারো কথা শুনতে চায় না।

সরকারি হাসপাতাল। বাবার বিছানার পাশে আরো পাঁচ ছয়টি বিছানা। প্রতিটি বিছানার চারপাশ জুড়ে চাদর দিয়ে ঢাকবার ব্যবস্থা। দালাল ছাড়া বা উচ্চপদস্থ সরকারি কেউ না হলে কেবিন পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। সাধারণ মানুষ বারান্দাতেই জায়গা পায় না। অম্বিকা মাসির সাথে হঠাৎই দেখা হলো হাসপাতালের বারান্দায়। বেশ কয়েকদিন ধরেই সে বাড়িতে আসছিল না। স্বামীর অসুখ। কোনো রকমে তোষক পেতে বারান্দায় শুইয়ে রেখেছে তাকে। সিট পায়নি, স্যালাইন চলছে। স্বামীর পাশে বসে পানের পাতায় চুন আর খয়ের ঘষছিল। তারপর কৌটা থেকে হাকিমপুরী জর্দা আর সুপারি মিশিয়ে পুরো খিলিটা সে মুখে পুরে দিল। আমাকে দেখেই চোখ বড় বড় করে দৌড়ে এলো। ময়মনসিংহের টানে সুরে সুরে জিজ্ঞেস করলো, "এইডা কিতা কও? হেই দিন না বালা মানুষটারে দেইক্যা আইলাম...! কিতা আর কইতাম, আমার স্বামীরও শইলড্যা বালা না", বলে সে মাথা ঘুরিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আমি বললাম, "কিছু জানাওনি কেন? কবে এসেছো এখানে? কী হল ওনার?"

"হার্ট অ্যাটাক করসেগো মা", বলে আঁচল টেনে মুখের ঘাম মুছলো সে। পরিবেশটা একটু গুমোট হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো মাসি। আমার অপেক্ষা করার মতো অবস্থা ছিল না। বাবার দেখাশোনা করার ছেলেটাকে বাজারে পাঠাতে হবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছেলেটা আঁশহীন গোপালভোগ আম নিয়ে এলো। বাবা সেই আম খুব তৃপ্তি করে খেলো। অম্বিকা মাসির স্বামীকেও দেয়া হলো। আম খাওয়ার সময় বাবা হাসিখুশিই ছিল। স্কুলের সহকর্মীরা তাকে দেখতে আসছে। ঘুরে ফিরে অম্বিকা মাসিও বার বার আসছে। পান খাওয়া লাল ঠোঁটের গোলগাল অম্বিকা মাসিকে দেখলেই বাবার মুখটা ঝলমল করে উঠছে। খাওয়া শেষ হলে বাবা বাথরুমে গেল। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে বিছানায় এলো। তারপর আমাকে জিগ্যেস করলো, "হ্যাঁরে মা... যোগেন কি রস পাঠাচ্ছে?"

আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম।

তারপর হঠাৎই বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। ডাক্তার এসে নেবুলাইজার ঠেসে ধরলো নাকের ওপর। বাবা কিছুতেই সেটি নিতে চাইছিল না। অস্থির অস্থির করে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে থাকল। আমি রাগ হয়ে বললাম, "বাবা, ডাক্তার সাহেবের কথা শোনো।" বাবা কিছুই শুনছিল না। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে নাক থেকে নেবুলাইজারটা সরিয়ে দিচ্ছিল বারবার। তারপর হঠাৎ লম্বা একটা টান দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। সেই শেষ।

আমি বোঝার চেষ্টা করলাম, দমটা আবার ফিরে আসে কিনা। নাকের কাছে হাত রেখে, বুকের মধ্যে মাথা পেতে দেখলাম। ধুক ধুক শব্দটা কি সত্যিই চলে গেল? ঠিক বুঝতেই পারলাম না একটু আগের সেই জীবন্ত মানুষটা কেমন করে হঠাৎ উধাও হয়ে

গেল! বাবা লাশ হয়ে পড়ে রইল বিছানার ওপর। থরথর করে কাঁপতে লাগল আমার শরীর। ডাক্তাররা এসে নাড়ি ধরে তাকে মৃত ঘোষণা করল।

শরীরের কাঁপুনিটা আমার যেন বেড়ে গেল। ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখি অম্বিকা মাসির স্বামী বিছানায় পেশাব করে দেওয়াতে মাসি মহাবিরক্ত হয়ে বিছানার কাপড় বদলাচ্ছে। আমার দিকে তাকাবার সময় নেই তার। বাইরে তখন বিকেলের আলো মরে যাচ্ছে। আকাশে লালচে মেঘগুলো সরে যাচ্ছে দূরে। হাসপাতালের বয় এসে বাবাকে লাশঘরে নিয়ে গেল। অন্ধকার তালাবদ্ধ ঘুপচি ঘরে বাবার লাশ পড়ে থাকলো প্রায় ঘণ্টাখানেক। ডাক্তারের সার্টিফিকেট হলে তবে আত্মীয়স্বজনের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হবে। এর মধ্যেই অম্বিকা মাসি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাদের গ্রামের বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে গেল।

৩

খুব ভোরেই আমরা শবদেহ নিয়ে রওনা হলাম পিরোজপুর, গ্রামের বাড়িতে। একটু পর পর অ্যাম্বুলেন্সের পেঁপু পেঁপু শব্দে চারপাশ কেঁপে উঠছিল। শীত এখনও জেঁকে বসেনি। কিন্তু ঘন কুয়াশায় ফেরি বন্ধ। এদিকে পেটেও ক্ষুধা। ড্রাইভার আর আমরা কয়েকজন মিলে ঘাটে গরম রুটি, সবজি আর মিষ্টি দিয়ে নাস্তা সারলাম। অ্যাম্বুলেন্সে বাবার মরদেহ রাখা আছে। ফেরিঘাট থেকে ওপার যেতে বড়জোর ২০ কি ৩০ মিনিট লাগে। কিন্তু ঘন কুয়াশায় পার খুঁজে পাওয়া না গেলে ঘণ্টা দুয়েকও লেগে যেতে পারে। আজ সে রকম কুয়াশা পড়েছে। হিমেল হাওয়ায় ভিজে যাচ্ছে গায়ের চাদর। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাছ। ছনের ঢিপি। দীর্ঘ ফেরিঘাট পেরিয়ে নদীর ওপারে পরবর্তী গন্তব্য।

ফেরিতে জায়গা নেই। ওজন কমাবার জন্যে শুধু মরদেহটা ড্রাইভারের সাথে গাড়িতে গেল। বাকিদের নৌকাতে উঠতে হবে। কয়েকজনকে নিয়ে আমি ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকায় উঠলাম। যেতে যেতে দেখলাম ছোট ছোট নৌকায় করে মাঝিরা কাঁচা শাকসবজি, তরিতরকারি বিক্রি করছে। পাশের ডিঙায় বড় বড় মিষ্টিকুমড়া।

কৌতূহল আটকাতে না পেরে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম,

- কিনলেন না বেচবেন?

- 'বেচমু।' বলেই সে 'মেয়েমানুষ এত প্রশ্ন করে' এমন একটা টিটকারির ভাব করে তাকিয়ে রইল। নৌকায় ভাজাপোড়া বিক্রির আয়োজনও আছে। গুড়ের পিঠা, ডালের বড়া, চা সব ব্যবস্থাই আছে।

- আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ও কাকা, খেজুরের রস আছে?"

উনি আঙুলের ইশারায় দূরের বাগান দেখিয়ে বললেন, হুইযে... যোগেন মণ্ডলের বাগানে খেজুরের রস পাইবেন। ম্যালা রস!

আমি দূরে যতদূর তাকানো যায় তাকিয়ে দেখি। খেজুর বাগান খোঁজার চেষ্টা করি। যোগেন কাকুকে খুঁজে বের করতেই হবে। বাবার শেষ ইচ্ছাটা সে পূরণ করেনি। রস পাঠায়নি।

এলাকার সবাই দেখছি তাকে এক নামে চেনে। কিন্তু কী এক অজানা কারণে কেউ তার সাথে মেশে না।

৪

বেলা প্রায় পড়ে গেছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির পেছনে খালপাড়ে শ্মশানঘাটে সব আয়োজন শেষ। গ্রামের লোকেরা বাবাকে এমনভাবে সাজিয়েছে যেন শোকের কোনো ব্যাপারই নেই। উৎসব লেগেছে এমন ভাব। আত্মীয়স্বজনরা এসে ভিড় জমিয়েছে বাবাকে শেষবারের মতন দেখবে বলে। এরমধ্যে যোগেন মণ্ডলও এলো। আমি তাকে কাছ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। লোকটা দেখতে অনেকটা সত্যজিৎ রায়ের চরিত্র প্রফেসর শঙ্কু'র মত। শুধু একটু মোটাসোটা গাট্টা গোট্টা। মাথায় একটা বিশাল টাক। তার হাতে ধরা ছিল এক হাঁড়ি খেজুরের রস। ভীষণ বিষণ্ন আর ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। পকেটওয়ালা ঘিয়া রঙের ফতুয়া আর ধুতি পরে আছে সে। পায়ে প্লাস্টিকের চটি। ক্ষণে ক্ষণে তার বাঁ হাতটা দিয়ে বেজায়গায় ধুতিটাকে পুঁটলি করে রাখছে। চেহারাটা বড্ড উশকোখুশকো। দেখে মনে হচ্ছে দুদিন কিছু খায়নি। ঠিক করেছিলাম অনেক কিছু বলব তাকে। ভর্ৎসনা করব। আবার ভাবলাম, কীই-বা হবে এসব বলে। যে চলে গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

শুধু তাকে ডেকে বললাম, "কাকু, রসের হাঁড়িটা একটু দূরে সরিয়ে রাখো।"

উনি খুব গম্ভীর স্বরে মিনমিন করে বললো, "সৎকারে লাগাবো।"

আমি কোনোদিন সরাসরি চিতায় পোড়ানো দেখিনি। মেয়েদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ না দেওয়ার একটা রেওয়াজ আছে এই এলাকায়। অবশ্য অন্য এলাকার কথা আমার জানা নেই। মা, মাসিরাও দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান রাজনীতিবিদের দেহ যখন চন্দনকাঠে শুইয়ে পোড়ানো হচ্ছিল, তখন ইউটিউবে সেই ভিডিওটা দেখেছিলাম। সে কি ভয়াবহ দৃশ্য! লোহার চত্বরে চন্দন কাঠের ওপর মাথাটা উপুড় করে দিয়ে শরীরটা নিচের দিকে শুইয়ে দেওয়া। তারপর মুখাগ্নির পরই এক এক করে হাত পা মুখ সব পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া।

বাবার শরীরটা সেই রকম পটপট শব্দ তুলে জ্বলবে, ভাবতেই প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল আমার। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, জীবিত অবস্থায় যোগেন কাকু বাবাকে রস পান করায়নি, এখন তার মৃতদেহ নিয়ে এত আদিখ্যেতা কেন?

রাগ সামলাতে পুকুরপাড়ে মুক্ত জায়গায় একটু হাঁটতে গেলাম। মা গত হয়েছেন অনেক আগে। আমি ওঁদের একমাত্র সন্তান। প্রতিবেশী আর আত্মীয়স্বজনেরা বিলাপ করছে, করুক। সেই শব্দ আমার কানে পৌঁছোচ্ছে না। এরা কেউ জীবিত অবস্থায় বাবার জন্য কিচ্ছু করেনি। এসবে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। সবাই বলল, দাহের আগে বাবাকে ঘি মাখিয়ে স্নান করানো হবে। তারপর চন্দনকাঠে পোড়ানো হবে। চন্দন কাঠ শুনে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলাম! বাবা কি এতকিছু চেয়েছিল? তাহলে চন্দন কাঠ কেন? রতন কাকু আমাকে বলল, যোগেন কাকুর খেজুরের বাগানে দুর্লভ কয়েকটা চন্দন

গাছ আছে। এই গাছ চুরির বহু চেষ্টা করেছে প্রতিবেশীরা। কিন্তু মণ্ডলের কড়া নজর। কিছুদিন আগেই নাকি দুটো গাছ রাতে চোর এসে কেটে নিয়ে গেছে। কিন্তু সময়মতো সরাতে পারেনি। সেই গাছ কেটে টুকরো টুকরো করে যোগেন মণ্ডল মাচায় তুলে রেখেছে। কিপটে যোগেনের ঘাড় ভেঙে সেই কাঠ নামাবে গ্রামের লোকেরা।

এসবই যোগেনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে এসব টুকটাক কথা শুনে খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম।

দেহ চিতায় স্থাপন করার অপেক্ষায়। হঠাৎ দেখি, যোগেন কাকু লাশের কাছে গিয়ে বাবার মুখ বরাবর মাটির হাড়ি থেকে রস ঢালছেন। খেজুরের রস।

আমি চিৎকার করে উঠলাম...।

সর্বনাশ! কাকু কী করছ এসব? কী করছ?

ততক্ষণে রসের হাড়ি শেষ। বাবার মুখটা হাঁ করা। রস ঢুকেছে মুখের ভেতর। আমি দেখলাম, লোকজন উত্তেজিত হয়ে রেগেমেগে যোগেন মণ্ডলকে শক্ত করে ধরে শ্মশানঘাট থেকে বের করে দিচ্ছে। হৈ চৈ পড়ে গেছে চারদিকে। সবাই মিলে যোগেন কাকুকে টেনে টেনে শ্মশানের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। উনি ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছেন পশ্চিম দিক বরাবর।

এর পরপরই হঠাৎ শুনি চিতার আশপাশে হৈ চৈ! সবাই বলছে লাশ কই? লাশ কই? আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখি বাবা নেই। মানে, বাবার দেহ নেই। এবং এর পরপরই লোকজন ভয়ে ছুটে পালাতে শুরু করল। কে কোনো দিক পালাবে তার হিসেব নেই! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য বটে। পুরোহিত মন্ত্র পড়া ফেলে দিলো একটা লম্বা ভোঁ দৌড়! আমি এমন ঘটনা শুনেছি যে, সুন্দরবনের জঙ্গলে ছেলের সামনে মায়ের লাশ তুলে নিয়ে যায় বাঘ। কিন্তু এই বাড়ির আশেপাশে তো একটি কাঁকড়া পর্যন্ত নেই! তাহলে? এটা কী করে সম্ভব হলো?

৫

গল্পটা এখানেই শেষ করা যেত।

বাবা কোথায় হারিয়ে গেল সেসব কিছুই না বললে আপনারা হয়তো নিজেদের মত করেই গল্পের শেষটা সাজিয়ে নিতে পারতেন। অথবা গল্পটা আরো দুঃখজনক হতো যদি লিখতাম, আমি দূরে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি দেখছি। পুরোহিত নির্লিপ্তভাবে চোখ বুঁজে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য কল্পনায় দেখছি। দাহের সময় আগুনের উত্তাপে দুমড়ে-মুচড়ে দেহটা বারবার শোয়া থেকে উঠে বসছে আর অস্থির অস্থির করছে। মনে হচ্ছে, বাবা যেন চিৎকার করে বলছে, "আমাকে পোড়াসনে, পোড়াসনে! মৃত্তি... ওদের থামা! থামা!" বাবার হাতে পূজোর লাল সুতোটা তখনও জ্বলছে! আর পুরোহিত বলছে, "মৃতদেহ আগুনে সৎকারই উত্তম। আপনি গতকাল মারা গেছেন। এটা মেনে নিন। এ সময়ে কথা বলা অন্যায়।"

কিন্তু গল্পটাকে আমি শোকাবহ বানাতে চাইনি। এটা শোকের গল্প নয়।

আসল ঘটনা যা হোলো সেটি না বললে গল্পের প্রতি অন্যায় করা হবে।

খালপাড়ে শ্মশানঘাটে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত বাবাকে পাওয়া গেল আমাদের মূল বাড়ি থেকে একটু দূরে উঠোনের কোণায়, রান্নাঘরে।

শবের কাপড় পরে খালি গায়ে বাবা একটা চৌকিতে বসে আছে। চোখ দুটো ফুলে ঢোল হয়ে আছে। লেপটানো ভেজা চুল। আর পাশেই মাটির চুলোয় শলা ঢুকাতে ঢুকাতে ব্যস্তভাবে মাছ ভাজি করছে অম্বিকা মাসি। সর্ষে তেলের ওপর মাছ ভাজার ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ শব্দ ছাড়া ওই ঘরে আর টুঁ শব্দটি নেই। আগুনের শিখায় জ্বলজ্বল করছে অম্বিকা মাসির লাল সিঁদুর-রাঙা চুল।

টরোন্টো, অন্টারিও, কানাডা

রঞ্জনা ব্যানার্জী

বম্বে টোস্ট

দোকানের সামনে আসতেই অস্বাভাবিক দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল। গাড়ির লাইন ওঁদের গলি ছাড়িয়ে আমাদের গলিতেও ঢুকে পড়েছে। সাত সকালে কী ব্যাপার? দোকানি ছেলেটাই জানালো, 'ভোর রাতে চলে গেছেন'। ও জানে আমরা ও বাড়ির আত্মীয় । ভুগছিলেন অনেকদিন। সম্পর্কে বাবার আপন জ্যাঠতুতো ভাই তিনি। আমরা বলি, ও বাড়ির জ্যাঠা-জ্যাঠিমা।

ছেলেটাকে আমি আগুন চোখে ভস্ম করি। কী দরকার ছিল জানানোর? ঘুম থেকে উঠেই পাউরুটি কিনতে এসেছিলাম। বম্বে টোস্ট হবে আজ। কাল রাতে বৌদি নিজে থেকেই বলেছে বানাবে। নইলে ছুটির দিনে স্বয়ং ভগবান নামলেও দশটার আগে গা তুলতাম না। এখন সব কেমন কেঁচে গেল! রাগে আমার গা জ্বলতে থাকে। কোনো মানে হয়? মাত্র মাস দুয়েক আগে বম্বে টোস্ট ফের আমাদের বাড়িতে পাত পেড়েছে, এখনো গেড়ে বসেনি। কারণ বম্বে টোস্টের প্রস্তুতকারিনী আমার একমাত্র বৌদি'র মন-মেজাজের পারদের সূচক কোন নিয়মের তোয়াক্কা করছে না আজকাল। এই আলো তো পরক্ষণেই অমাবস্যা। সাত মাস চলছে বৌদির। চুলোর ধারে গেলেই নাকি গা গুলায়! কাল রাতে খাবার টেবিলে হঠাৎ নিজেই কাব্য করে বলল, 'প্রাতরাশে বম্বে টোস্ট বানিয়ে দেবো তোমাদের'। সকালে ভাজাভুজি? মা চোখ কুঁচকেছিল। দাদা আশ্বস্ত করলো, 'ছুটির দিনে 'অম্ল নাস্তি', ভাজাভুজি কেন নিরেট লোহাও হজম হয়'। কিন্তু বাড়িতে পাউরুটিই নেই। 'তবে আর কী? স্বপ্নে খাও আমি ছুটির দিনে দোকানে যাচ্ছি না', দাদা এঁটো হাত ধুতে ধুতে বলেছিল। আমিই আগ বাড়িয়ে দায় নিয়েছিলাম। আর এখন তীরে এসে তরী ডুবছে! বম্বে টোস্টকে ঘিরে আবার হাঙ্গামা! এবার বাড়তি যোগ, এগার দিনের অশৌচ! মানে নিরামিষ!।

বম্বে টোস্টের ওপর অলিখিত সেই নিষেধাজ্ঞা ওঠাতে প্রায় এক বছর লেগেছে। বাবার খুব প্রিয় ছিলো এই বস্তুটি। আমাদের দুই ভাইয়েরও। অফিস থেকে ফেরার সময় প্রতি বৃহস্পতিবারে নিউমার্কেটের 'ডায়মন্ড রেস্তরাঁ' থেকে কিনে আনতেন বাবা। মা কোনোমতেই এই টোস্ট ঠিকঠাক বানাতে পারতো না; হয় কড়া করে ফেলতো নইলে ল্যাতপ্যাতে। সেবার কনে দেখতে গিয়ে বৌদির হাতের বম্বে টোস্ট খেয়ে বাবা মেয়ে না দেখেই পাকা-কথা দিয়ে ফেলেছিল। এ নিয়েই ঝামেলার সূত্রপাত। এবং পরে বাবা

মায়ের মন কষাকষি চরমে উঠেছিল। যৌতুক ফৌতুক নয় মায়ের একটাই দাবী ছিলো কনের রঙ কালো হওয়া চলবে না।

মেয়ে দেখতে যাবার দিন দুপুরে মায়ের হাতে গরম দুধ উথলে পড়েছিল। অনেকখানি পুড়ে গিয়েছিল। দাদা বার্নল দিয়েছিল লেপে, তাও ফোস্‌কা পড়ল। মা বললো, 'সুবোধ কাকাকে ফোন করে জানিয়ে দে আজ যাচ্ছি না আমরা'। বাবা হা-হা করে উঠল, 'ওরা নিশ্চয় আয়োজন করে ফেলেছে। এটা ঠিক দেখায় না'। অতএব সন্ধ্যে বসার আগেই মা'কে ছাড়াই দাদা, বাবা, উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের অনিমা মাসি আর মেসো মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। আমি যাইনি। সুবোধ কাকা আর কাকিমা আগেই চলে গিয়েছিলেন। সুবোধ কাকাই প্রস্তাবটা এনেছিলেন। বৌদি সম্পর্কে সুবোধ কাকার বোনঝি।।

মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে বাবা, দাদা দুজনেই খুশি, 'কী চমৎকার বম্বে টোস্ট বানিয়েছে মেয়ে!' পরদিন অনিমা মাসিই মাকে বিশদ জানিয়েছিল: বৌদি মোটেও ফটোর মতো নয়, বেশ কালো তবে চেহারার ছাপ ভালো, এক ঢাল চুল। বাবা তখনও উচ্ছ্বসিত, 'শান্ত, ভদ্র'। মা চেঁচাচ্ছিল 'তুমি কীভাবে জানো? একবার দেখেই বুঝে গেলে?' এরপরেই গুমর ফাঁস হলো, বাবা মেয়ে দেখবার আগেই মেয়ের হাতে তৈরি বম্বে টোস্ট খেয়েই সাতপাঁচ না-ভেবে পাকা কথা দিয়ে দিয়েছেন। মা আঁতকে উঠেছিল। দু দু'টো সম্বন্ধ তখনো হাতে আছে, তাদের না দেখেই এমন অর্বাচীনের মত কাজ করে কেউ! অশান্তি যখন চরমে তখনই দাদা ঘি ঢেলেছিল, 'এই মেয়ে ছাড়া আমি বিয়ে করব না'।।

মায়ের বদ্ধ ধারণা, দাদার এ সিদ্ধান্তে বাবার হাত ছিলো।

আশির্বাদের দিন আমরা সবাই দেখলাম বৌদি আসলেই রবি ঠাকুরের কৃষ্ণকলির জ্যান্ত রেপ্লিকা। ওবাড়ির জ্যাঠিমা তো মাকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন, 'অমির কি পছন্দের বিয়ে?'। আশির্বাদ অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় মা গুম ধরে বসেছিলো। বাড়ি ফিরেই ইচ্ছেমতো ঝেড়েছিল বাবাকে। সুবোধ কাকাকেও ফোন দিয়ে একহাত নিয়েছিল। সুবোধ কাকারা দাদার বিয়ে কিংবা বৌভাতে আসেনি। আর বাবা বৌদির কালো রঙের দায়ের প্রায়শ্চিত্তের কারণে কি না জানিনা বেঁচে থাকাকালীন সময়ে আর কখনোই বম্বে টোস্টের নাম মুখেও আনেননি।।

দাদার বিয়ের মাস তিনেকের মাথায় বাবা চলে গিয়েছিলেন। ডায়াবেটিস ছিল। হাইপোগ্লাইসিমিয়া। জ্ঞান ফেরেনি আর। সেদিন বাবার মরদেহে চন্দনকাঠের আঁচ লাগার আগেই আমাদের স্বজনেরা আড়েঠাড়ে নতুন বৌয়ের সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মীর চপলতার সুলুক-সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস দাদার এই লম্বা বেতনের চাকরিটা হলো নইলে বৌদিকে নিয়ে কানাঘুষা সহজে থামতো না। বিশাল মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির এক্সিকিউটিভ এখন দাদা। আগের চাকরির চেয়ে ঢের বেশি বেতন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটি ঘটলো দাদার বেতন পাওয়ার দিনে। মিষ্টি কিংবা চাইনিজ নয়, দাদা সেদিন পাউরুটির প্যাকেট হাতে বাড়ি ফিরেছিল। এরপর মায়ের সামনেই বৌদিকে ডেকে বলল, 'মিনু সেদিন তোমাদের বাড়িতে যে বম্বে টোস্ট খাইয়েছিলে ঐরকম করে বানাও তো'। সামনেই আমার টেস্ট পরীক্ষা। ডাইনিং টেবিলে

বসে অংক কষছিলাম। সন্ধ্যা নামতেই মশাদের উৎপাত শুরু হয়ে যায়। মা মশা তাড়াতে ধুনো দিচ্ছিলো। দাদা 'বম্বে টোস্ট' শব্দটা এমন কেটে কেটে বলল যে আমি আর মা দু'জনই চমকে তাকালাম। বৌদির মুখের রঙ আরও গাঢ় হলো। বম্বে টোস্টের সঙ্গে ওর ভাগ্যের যোগটি আমরা কেউ মুখে না বললেও ও জানে। মা আমার পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাতে ধরা ধুনুচি থেকে পাক খেয়ে ধোঁয়া উঠছিল খুব। চোখ জ্বলছিল। একটু পরেই আমাদের অবাক করে দিয়ে মা বলল, 'যাও বৌমা বানিয়ে আনো। আমি তো আর খেতে পারব না দেখি শমিক কী রায় দেয়?' শমিক মানে আমি।

সেদিন সন্ধ্যায় বৌদির করা সেই বম্বে টোস্ট খেয়ে আমিও বাবার মতই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। আসলেই 'অমৃত সমান'। খাবারের স্বাদে এতই বিভোর ছিলাম যে মা কখন সরে গেছে বুঝিনি। একটু পরে বৌদিই জানাল বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মা কাঁদছে সমানে। আমাদের কী করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না। আধঘন্টা পরে মা নিজেই এল। বৌদিকে বলল, 'এখন থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার ওদের জন্যে বম্বে টোস্ট বানিও'। সেই থেকে মাস দুয়েক আগ্‌পর্যন্ত বম্বে টোস্ট বাবা বেঁচে থাকার দিনগুলোর মতোই ফের বৃহস্পতিবার বিকেলের নিত্য অনুষঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এখন এটা সামলাবো কীভাবে? বাবা চলে যাবার পরে ওবাড়ির সঙ্গে খাই-খাতিরও ঢিলে হয়ে গেছে। টাকাওয়ালা মানুষেরা নিজেদের বৈভব দেখাতে সাধারণত কমজোরী আত্মীয়দেরই বেছে নেয়। আর নিজেদের ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই নিরাপদ দূরত্বে সটকে পড়ে। বাবার হঠাৎ চলে যাওয়ায় আমরা বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম। দাদার তখনকার চাকরির টাকায় সংসারের খরচ সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল। এক দুপুরে ওঁর স্ত্রী মানে ও বাড়ির জ্যাঠিমা এসেছিলেন ফল-মিষ্টি নিয়ে। মা কেঁদে কেঁদে এইসব দুর্দশার কাসুন্দি শোনালো। উনি কী বুঝলেন কে জানে সেই যে চলে গেলেন আর কখনই আমাদের বাড়িমুখো হননি। আমি অবশ্য পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনার পরে ও বাড়ির চৌহদ্দিতে পা রাখিনি। কিন্তু সম্পর্ক নামকাওয়াস্তে হলে কি রক্তের দায় ; অশৌচ এড়ানো যাবে না। মা মানিয়ে ছাড়বেই। আমার মুখ ভর্তি করে থুথু জমে। মাথার ভেতর জিভ নড়ে, 'শালার বুইড়া মরবার জন্যে আর দিন পেলো না।'। হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন, সিদ্ধান্ত নিই, এই সংবাদ এখুনি বাড়ি পৌঁছাবে না।।

ছেলেটার হাত থেকে খুচরোগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত বাড়ির পথ ধরি। দুই তিন সিঁড়ি টপকে উঠি। দরোজাটা খোলাই। বৌদি রান্নাঘরে। বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে আমার। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ওঁদের গলির কিছুটা দেখা যায়। গাড়ির বহর দেখতে পেলে বৌদিরও কৌতুহল হবেই। পাউরুটিটা বৌদির হাতে দিয়েই জানালা আড়াল করে দাঁড়াই আমি, 'তাড়াতাড়ি কর খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে'।

শরীর ভারী হওয়ার পর থেকেই অদ্ভুতভাবে হাঁসের মত পা ছড়িয়ে হাঁটে বৌদি। ঠোঁটের কোণে, চোখের কোণে, সারাক্ষণ বিরক্তি এঁটে থাকে। মনে মনে কপালে হাত ঠেকাই আমি, হে ভগবান দয়া কর! বৌদি ধীরেসুস্থে ফ্রিজ থেকে ডিম বার করে। বিরক্ত চোখে দেখে আমাকে। 'পাঁচমিনিট দাও। এখানে ভিড় করে দাঁড়ালে তো তাড়াতাড়ি হবে

না'। অন্যদিন হলে আমিও চোখা কিছু একটা বলতাম কিন্তু আজ চলে যেতে দিই। মুখে হাসি রেখে বলি, 'পেটে ছুঁচো দৌড়াচ্ছে যে!' বৌদি পাউরুটির ধারগুলো ছুরি দিয়ে জ্যামিতি মেনে আরও ধীরে কাটতে থাকে। মুখ না তুলেই বলে, 'টেবিলে গিয়ে ব'স, আনছি আমি'। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে আসি।

ডাইনিং এ বসতেই সেই পুরোনো রাগটা মাথার ভেতরে সলতে পাকায়।

এই তো সেদিনের কথা। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সুবীর দা'র বিয়েতে আমরা সবাই বস্ত্রালঙ্কারে গিয়েছিলাম। সুবীর দা' ওদের, মানে ও বাড়ির জ্যাঠা-জ্যাঠিমার ছোটো ছেলে। টেনে টুনে বিএ পাশ কিন্তু ঝাঁ চকচকে টয়োটা প্রিমিও চালায়। সুবীর দা'র বিয়েতে খুব ঘটা হয়েছিল। আমাদের সবাইকে জামাকাপড় দিয়েছিলেন ওরা। বাড়ির শেষ বিয়ে বলে কথা! বাবা গদগদ হয়ে বলেছিলেন, 'শত হলেও রক্তের টান'। আমি জীবনে এত নতুন কাপড় একসঙ্গে পাইনি! কী সুন্দর সব পাঞ্জাবি-কুর্তা। এক একদিনের এক এক রঙের পোশাক। বস্ত্রালঙ্কারের দিন আগুন রঙের নকশা তোলা পাঞ্জাবি আর সাদা চোস্ত পরেছিলাম সব ছেলেরা। মেয়েরাও রঙ মিলিয়ে লাল খোলের শাড়িতে সাদা নকশার পাড়। তত্ত্বগুলো কী সুন্দর সাজানো হয়েছিল! গাড়িতে আমি সুবীর দা'র মামাতো ভাই, অর্ঘ্য'র পাশে বসেছিলাম। ও ফড়ফড় করে ইংরেজি বলে। নামী স্কুলে পড়ে। শুরুতে আমি একটু আড়ষ্ঠ থাকলেও মিনিট দশেকের মধ্যে বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। খাবার টেবিলে পাশাপাশি বসেছিলাম খেতে। মা, বাবা, দাদা ওরা ওদের মতো অন্য কোথাও। কনের বাড়ির একজন সবাইকে পোলাউ রোস্ট বেড়ে দিচ্ছিলেন। আমার প্লেটেও এই দিলো বলে! হঠাৎ কোথা থেকে জ্যাঠা উদয় হলেন। বিশিষ্ট কেউ জায়গা পায়নি তাকে বসাতে হবে। বললেন, 'পরের ব্যাচে খাবি'। অপমানে আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। কী ভাবলো অর্ঘ্য? আমার আর খাওয়া হয়নি সেদিন। পরের দিন পেট ব্যথার ছুতোয় বিয়েতে যাইনি। পাশের বাড়ির মণি মাসির কাছে আমাকে রেখে মা, বাবা, দাদা বিয়েতে গিয়েছিল। মা'কে সেদিন কী যে সুন্দর লাগছিল! এরপরে ও বাড়িতে কিংবা ওদের কোন অনুষ্ঠানে আমি আর কখনোই যাইনি।

পূজো ঘরে ঘন্টি বাজিয়ে মা ভগবানের কান ঝালাপালা করছেন সেই কবে থেকে। আজ ছুটির দিন বলেই বাঁচোয়া। বুয়া আসবে বেলা করে। বুয়াকে ওদের বাড়ি পার হয়েই আসতে হবে এবং অন্য কেউ জানুক না-জানুক বুয়া নির্ঘাত জানবে। কথাটা মনে হতেই ফের বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে আমার।

আনমনা ছিলাম হয়তো, বৌদির ডাক শুনতে পাইনি। টোস্ট ভর্তি প্লেটটা আমার মুখের সামনে বেশ জোরে ঠুকে রাখে বৌদি। গলায় ঝাঁঝ তুলে বলে, 'সেই কবে থেকে ডাকছি, একেবারে রুম সার্ভিস'! আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ি খাবারের ওপর। বউদি টিপ্পনী কাটে, 'আস্তে খাও গলায় গেঁথে মরবে!' আমি গা করিনা । শেষ টুকরোটা মুখের ভেতর মিলিয়ে যেতেই কলবেলটা হাওয়া কেটে বেজে ওঠে। আমি হাঁফ ছাড়ি। মাকে দেখি প্রসাদের থালা হাতেই যাচ্ছে দরোজা খুলতে; বুয়াই।

হঠাৎ আমার পেট গুলিয়ে ওঠে। মনে হয় গলার অপরে উঠে এসেছে সব কিছু। চেয়ার ঠেলে প্রাণপণে বাথরুমের দিকে ছুটি। বেসিনের সামনে দাঁড়াতেই সব হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসে পেট ঘেঁটে। কেন যেন বাবার জন্যে বুক ভেঙে কান্না আসে আমার। আবছা শুনি দরোজার ওপার থেকে মা, বৌদি আমার নাম ধরে ডাকছে উৎকণ্ঠায়। সারা শরীর মুচড়ে আমি আবার ওয়াক তুলি...

শার্লটটাউন, প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড, কানাডা

রশ্মি ভৌমিক

দীপ্ত কণা

একরাশ কালো চুল হিজাবের মতো সোনিয়ার ঘুমন্ত মুখের সৌন্দর্য ঢেকে রেখেছিলো। সোনিয়া চৌধুরী পাশ ফিরে ধীরে ধীরে চোখ খুললো। ভোরের পাখির গুঞ্জন শুনে তার মুখে একটা হালকা হাসি ফুটে উঠলো। ওদের মিষ্টি কিচিরমিচির-শব্দে যে কারুরই দুঃখী-হৃদয় আনন্দে ভরে উঠবে। সোনিয়ার মনের দুঃখ, তার মনের কথা সে কোনোদিন বলতেই পারলো না। আগামী সপ্তাহ থেকে ওর দীর্ঘকালের সহকর্মী রুপেশ গুরুং বর্তমান চাকরি ছেড়ে অন্য শহরে অন্য কোম্পানিতে কাজ শুরু করবে। মনের মধ্যে অনেক চিন্তা ভিড় করে এসেছে। অন্ধকার ঘরে হাতড়ে বিছানার পাশের আলোটা জ্বালালো। মাথা তুলতেই দেখতে পেলো খাটো আলমিরাটার উপর তার ছোট্ট একুয়ারিয়ামে রং-বেরঙের মাছ খেলা করছে। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের প্রকৃতির শোভা দেখে তার হাসিটা আরো একটু প্রসারিত হলো। দিগন্তের সীমায় রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। পুরোভূমির কালো কালো ডালপালাগুলি চোখের সামনে এক অপরূপ ছবি তুলে ধরেছে। সোনিয়া তখনি ঠিক করলো যে লাল-কালো সালোয়ার কুর্তাটাই সে রুপেশের ফেয়ারওয়েল পার্টিতে পরতে চায়। পার্টিটা কাজের পরে, সন্ধ্যাবেলায়। ওরা রুবিকো'তে গত চার বছর একসঙ্গে কাজ করেছে এবং তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। একে অপরের অনেক গোপন কথাও জানতো।

রুপেশ জানতো যে সোনিয়া ছোটবেলা থেকে তার মা-বাবার থেকেও দিদি নীনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। ওর বাবা-মা সবসময় রেস্টুরেন্টের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ওদের বাবা ঋষিকেশে একটা বাঙালি রেস্টুরেন্টের মালিক ছিলেন। সোনিয়ার দরকারে অদরকারে দিদিই পাশে থাকতো। অনেকদিন নীনা মজা করে টুথপেস্টের টিউবটা লুকিয়ে রাখতো। সোনিয়া আহ্লাদ করে দিদির সাহায্য চাইলে সঙ্গে সঙ্গে খুঁজেও দিতো। এই সুযোগে সে সোনিয়াকে দিয়ে ফরমাশ খাটিয়ে নিতো। নীনা বিয়ের পর দিল্লি চলে যায়। সোনিয়া অনেক সময় তাই দিদির জন্য মন খারাপ করতো। রুপেশ নানান হাসিঠাট্টা করে সোনিয়ার মন ভালো করে দিতো। সোনিয়া জানতো যে রুপেশের পরিবারে আরো তিন ভাই আছে। ওরা নেপাল থেকে কুড়ি বছর আগে দেরাদুনে এসেছিল। খুব কষ্টে বড় হয়েছে রুপেশ।

বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও সোনিয়া তার মনের কিছু গভীর অনুভূতি রুপেশের কাছে প্রকাশ করতে পারেনি। অন্যদিনের থেকে আজকে সোনিয়ার কাজের ব্যস্ততা দুগুণ ছিল। তাই

মিটিং এ যেতে দেরি হয়ে গেলো। ঘরে ঢুকতেই সবার চোখ গেলো সোনিয়ার দিকে। সোনিয়া ফর্সা, সুশ্রী ও মাঝারি গড়নের। কামিজটা সুন্দর আর সামান্য টাইট ফিটিং বলে সোনিয়াকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল। সবার দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে সোনিয়া বাম দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো রুপেশের সাথে। রুপেশকে দেখেই তার মুখটি স্মিত হাসিতে ভরে উঠলো। সুদর্শন চেহারার সঙ্গে রুপেশের দুটো কালো চোখে ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-দীপ্তি। মিটিংয়ে সোনিয়ার মন ছিল না। আগামীকাল রুপেশ মুম্বাই চলে যাচ্ছে। হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না তাদের। শুভেচ্ছা কার্ডে কী লিখে বিদায় জানাবে তাই বারেবারে চিন্তা করছিলো।

রিলায়েন্স কর্পোরেশন এর নারীমন পয়েন্ট অফিসে রুপেশ তার নতুন চাকরি শুরু করবে। রেস্টুরেন্টে রুপেশকে ঘিরে অনেক সহকর্মীরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। বাকিরা টেবিলে বসে চা আর সুস্বাদু জলখাবার আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছিলো। অন্যদিকে, সোনিয়ার টেবিলে আরো চারজন মহিলা বসেছিল। ওরা সবাই চা, সিঙ্গারা আর পনির পাকোড়া অর্ডার দিয়েছিলো। খাওয়া আর আড্ডা দুটোই বেশ জমে উঠেছিল। হঠাৎ সোনিয়ার মোবাইল বেজে উঠলো। ওর দিদি মেসেজ করে জানালো যে ওর মায়ের খুব শরীর খারাপ হয়েছে। ওদের বাবাকে কয়েকদিনের জন্য কাজের সূত্রে কলকাতা যেতে হয়েছে। তাই ওর মা একদম একা আছেন। দিদিকে লিখলো "আমি বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে। পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরোচ্ছি রে।"

সিঙ্গারা শেষ করে পনির পাকোড়ায় কামড় দিলো সে । ভিতরটা তুলতুলে অথচ বাইরেটা কুড়মুড়ে। দারুণ বানিয়েছিলো খাবারটা। কিন্তু সোনিয়ার আর হাতে বেশি সময় ছিল না। কার্ড আর কলমটা বের করে কবিগুরুর একটা পংক্তি লিখলো- " তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে ... অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার সঙ্গে- তোমার সোনিয়া।" টেবিল ছেড়ে উঠে ভিড় ঠেলে রুপেশকে খুঁজতে গেলো সে।

রুপেশের হাতে কার্ডটা দেয়াতে সে ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, "এখনই যাচ্ছিস? কিসের তাড়া পড়লো?" সোনিয়া ঢোক গিলে উত্তর দিলো, "হঠাৎ একটা বাড়ির কাজ এসে পড়েছে। যেতে হবে রে।" ওর আবেগ-ভরা চোখদুটো যেন অন্যকিছু বলতে চাইছিলো। রুপেশ সেটা লক্ষ্য করে। সোনিয়ার হাত ধরে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞেস করলো।: "কিছু বলার ছিল কী? আমার থেকে কী লুকোচ্ছিস?" মাথা নাড়িয়ে, কাঁপা গলায় বললো, "কিছু নারে। আমাকে এখুনি ঋষিকেশ যেতে হবে।" "যাবার আগে একটা বেয়ার-হাগ্ দিবি না?" এই বলে সোনিয়াকে একদম কাছে টেনে জড়িয়ে ধরলো রুপেশ। সোনিয়ার চুলের উপর দিয়ে রুপেশের ঠোঁট ছুঁয়ে গেলো। ক্ষণিকের উষ্ণতায় সোনিয়ার মন বিগলিত হয়ে যাচ্ছিল। হয়তো আরো কিছুক্ষন এভাবে থাকলে সোনিয়া আরো কিছু বলতো। এমন সময় ওর আত্মবিশ্বাসে আঘাত করে মোবাইলটা আবার বেজে উঠলো। সোনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছন ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা দিলো। সেটা দেখে রুপেশও সহকর্মী ও বন্ধুদের থেকে বিদায় নিলো মাথা ধরার অজুহাত দিয়ে। ব্রিফকেস নিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো সে।

সোনিয়া ধীরে ধীরে তার গাড়ীর দিকে হাঁটছিলো। সে সময় হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। "দাড়াও!" সে চমকে উঠে ঘুরে তাকালো।

"তুমি! এখানে কেন? আমি এখন ঋষিকেশে যাচ্ছি।" বিস্মিত সোনিয়া, কিছু না ভেবেই বলে উঠলো।

"আমি তোমাকে ছাড়া মরে যাবো সোনিয়া।" অতি নাটকীয় জবাব এলো। "কিন্তু, এখন কেন ... যখন আমাদের পথ আগেই পৃথক হয়ে গেছে?" সে ভাবলো। ওর চিন্তার সূত্রকে বাধা দিয়ে ওর নাছোড়বান্দা প্রেমিক ওকে চুমু খেতে শুরু করল। বাস্তবতা আর অন্তর্নিহিত আতঙ্ক মিলেমিশে তাকে বিভ্রান্ত করে তুললো। এটা কি দাসত্ব না একটা সুস্থ সম্পর্ক?

দেরাদুন থেকে ঋষিকেশ যেতে গাড়ীতে প্রায় দু'ঘন্টা লাগে ট্রাফিক না থাকলে। সোনিয়া যখন সাত নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে ঋষিকেশের দিকে রওয়ানা হয়েছে তখন বাজে রাত আটটা। সাড়ে দশটায় ওর হোন্ডা গাড়িটা ঋষিকেশের শহর এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলো। বাইরে তখন বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে একটু গরম চা বানাবে ভাবলো।

"গতকাল রাতে আমার ঝোলা-ব্যাগটায় খুঁজতে গিয়ে একটা অমূল্য সম্পদ পেলাম, দেখো," হঠাৎ করে জোর গলায় বলে উঠলো রুপেশ। অন্যমনস্ক হয়ে সোনিয়া ক্ষনিকের জন্য ওর দিকে তাকালো। পকেট থেকে একটা কাপড়ের থলি বেরোলো। তার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে থলির ভেতর থেকে স্ফটিকের শঙ্খটি বার করে দেখালো সোনিয়াকে। "গত বছর বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়ে বালির উপর ওটা দেখতে পেয়েছিলাম। এতো দিন আমার ব্যাগে ছিল। ভুলেই গেছিলাম। গতকাল রাতে আমার হাতে ওটা ঘষা খেয়ে ঝলমল করে উঠলো।" ওর চোখদুটো উত্তেজনায় চকমক করছিলো। রাস্তার ধারের স্তিমিত আলোয় স্ফটিক শঙ্খটাকে একটা বড় অশ্রুবিন্দুর মতো মনে হচ্ছিল।

সোনিয়া ইশারা করে বললো "একটু পরে দেখছি।" সামনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার আগেই বামদিক থেকে একটা উজ্জ্বল আলো দ্রুতগতিতে ওদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। একটা বড় ট্রাক এসে ওদের গাড়িতে জোরে ধাক্কা মেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে এয়ারব্যাগ বেরিয়ে সোনিয়াকে তিনদিক দিয়ে ঢেকে দিলো। একটু সামলে উঠে রুপেশের নাম ধরে ডেকে কোনো সাড়া পেলো না সোনিয়া। কম্পিত হৃদয়ে তাকিয়ে দেখলো যে বড় বড় কটা চোখগুলো নির্জীব দৃষ্টিতে দূরের পানে তাকিয়ে আছে।

রাস্তার পাশের পানের দোকানটা তখনও বন্ধ হয়নি। দোকানদার অ্যাক্সিডেন্ট দেখে তাড়াতাড়ি থানায় ফোন করে জানালো। পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স আসতে আরো চল্লিশ মিনিট লাগলো। গাড়ীর দরজাটা বেঁকে গিয়ে আটকে গেল। দুজন স্বাস্থ্যবান পুলিশের লোক এসে সাহায্য করাতে সোনিয়া অবশেষে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো। হোন্ডা সিটির সামনেটা আর বাঁ দিকটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আহত ট্রাক ড্রাইভারটাকে স্ট্রেচার করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছিলো। দেখে মনে হলো প্রচুর

নেশা করেছিল। একজন পুলিশ অফিসার সোনিয়াকে তার সহযাত্রীর বয়স, নাম ইত্যাদি তথ্য জিজ্ঞেস করছিলো। কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিলছিল সোনিয়া। তার আশঙ্কা বাস্তব রূপ নিলো যখন ও দেখলো যে তার সহযাত্রীর মৃতদেহকে একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবতার যন্ত্রনায় সে অসাড় হয়ে পড়লো, যেন তার সারা শরীরে কেউ অজস্র সূচ বিঁধিয়ে দিয়েছিলো। সে তার দিদি নীনাকে ফোন করে সব বৃত্তান্ত জানালো। নীনা ওর কথা শুনে কাঁদছিলো। "মাকে বলিস যে আমার বাড়ি পৌঁছতে একটু দেরি হবে। তার আগে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সই করতে হবে।" অবশেষে, মাঝরাতে একটা পুলিশের গাড়ি তাকে তার বাবা-মার বাড়িতে পৌঁছে দিলো।

সোনিয়ার কাছে বাড়ির চাবি ছিলো। সদর দরজা খুলে সে মায়ের শোবার ঘরে গেল। ওর মা লেপের নিচে শুয়েছিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছিলো। থার্মোমিটার দিয়ে দেখলো যে একশো চারের উপর জ্বর। তাঁর ঠোঁটগুলো শুকিয়ে গেল যেমনটা পানিশূন্যতার শুরুতে দেখা যায়। সোনিয়া নুন-চিনির পানি আর আইবুপ্রোফেন ট্যাবলেট খাওয়ালো মা'কে। জ্বর কমানোর জন্য ঘন্টা-খানেক ধরে ভেজা গামছা দিয়ে কপাল মুছিয়ে দিলো আর হাত বুলিয়ে দিলো মা'কে। অ্যাকসিডেন্ট সম্বন্ধে ওরা কোনো কথা বললো না। প্রায় রাত তিনটের পর যখন জ্বর একশো একে নামলো তখন কিছুটা আরাম বোধ করে সোনিয়ার মা ঘুমিয়ে পড়লেন।

মায়ের ঘর থেকে নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য বড় হল-ঘর পেরিয়ে পুবদিকে যেতে হলো সোনিয়াকে । একটা দমকা হওয়া আসাতে সোনিয়ার সারা শরীর শিউরে উঠলো। মনে হলো কারুর শীতল স্পর্শ ওকে একটা ভীতিকর স্মৃতি মনে করিয়ে দিলো। হালকা সাদা পর্দাগুলো হাওয়ায় দুলে দুলে তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছিলো। পূর্ণিমার রাতটা একটা অদ্ভুত ভৌতিক রূপ নিয়েছিল। কাঁপতে কাঁপতে হল-ঘরের জানালাগুলো শক্ত করে বন্ধ করলো সে। অ্যাকসিডেন্টের আগের কথোপকথন, টুকরো ছবি ও কল্পনা সোনিয়াকে যন্ত্রনা দিচ্ছিলো। নিজের ঘরে এসে বিছানায় পড়ে সে অঝোরে কাঁদলো। মনে পড়ে গেলো সে এরকম করেই কেঁদেছিলো যখন সুনীলদা নীনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। সেই মাসে নীনা কলেজ পাস করে নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। সুনীলদা ওর বাবার রেস্টুরেন্টে প্রায় গত দশ বছর ধরে কাজ করেছে। সুনীলদা মাঝে মাঝেই নানান কাজের অজুহাত করে ওদের বাড়ি চলে আসত। তার বড় বড় কটা চোখের অদ্ভুত চাহনি সোনিয়ার মনে অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করতো।

বন্ধ ঘরে গুমোট লাগছিলো তাই ছোট জানালাটা খুলে বাইরে তাকালো সে। আকাশ মেঘমুক্ত চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছিলো। চাঁদের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে মনটা হালকা লাগছিলো। হঠাৎ মনে হলো নীনা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। তারপরে ও দেখলো একটা আলোর কণা দ্রুতগতিতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। একটা নুড়ি পাথরের মতো জিনিস ওর কপালে এসে লাগলো। মেঝের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে

দেখলো সে চাঁদের আলোয় একটা স্ফটিকের শঙ্খ চকচক করছে। শঙ্খটা পকেটে ঢোকানোর পর ওর চোখ দুটো ঘুমে ঢুলে পড়লো।

পরের দিন সকালে ঘুমন্ত চোখে সোনিয়া টুথপেস্টটা ধরতে গেলে হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেলো সেটা । পিছন ফিরে মাটি থেকে তুলতে গিয়ে দেখলো নীনা সামনে দাঁড়িয়ে। সোনিয়া ওর দিদিকে আলিঙ্গন করতে গেলে সে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সোনিয়া চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়লো। পশ্চিমের শোবার ঘর থেকে একটা পরিচিত গলা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। "সোনিয়া, তুমি ঠিক আছ?" "হ্যাঁ মা, আমার কিছু হয়নি," প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলো।

সোনিয়া ওর প্রিয় গানের সুর গুনগুন করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। ওর বিয়ের কিছু বছর আগে নীনা নিয়মিত সকালের খাবার বানাতো ওদের দুজনের জন্য। ছুটির দিনে ও অনেক সময় খুব ভালো ছোলে বাতুরা বানাতো। আজ যেন জাদুকরী শক্তি দিয়ে সোনিয়া রান্নাঘরে ছোলে বাতুরা বানানোর সব সঠিক উপাদানগুলি পেয়ে গেলো। মিসেস চৌধুরী বিস্ফারিত চোখে দেখলেন যে সোনিয়া বাটিতে গরম ছোলা আর প্লেটে দুটো ফুলকো বাতুরা নিয়ে তাঁর সামনে হাজির। "অপূর্ব খেতে হয়েছে, সোনিয়া, " উনি মুখে দিয়ে বললেন। মা সোনা তুমি বরং একটু কাপড়গুলো ধুয়ে বাইরে মেলে দিও।"

ছাড়া-কাপড়গুলো একটা উঁচু স্তূপ হয়ে ছিল। তিন ঘণ্টা ধরে সে সব কাপড় কাঁচল। ওর মনে হচ্ছিলো, নীনা ওকে হাতে হাতে সাহায্য করে দিচ্ছিলো। বাইরে জামাগুলো মেলতে গিয়ে ও দেখলো যে ওর বাবা বাড়ি ফিরে এসেছেন। বাবাকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ অঝোরে কাঁদলো সে। উনি সোনিয়ার কাছে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের সব বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে শুনলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "নিয়তি কি আর আটকানো যায়?" "আগামীকাল আমি তোমাকে দেরাদুন পৌঁছে দেবো, কেমন ?"

এরপর সোনিয়া স্নান করতে গেলো। জামা খোলার সময় ও নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন বোধ করলো, যেন কেউ ওকে লক্ষ্য করছিলো। ওর মনে হলো নীল শার্ট-পরা একজন পুরুষলোক পাশের ঝোপের দিকে দৌড়ে পালালো। আচমকা মনে পড়ে গেল প্রায় আট মাস আগে রুপেশের ওকে সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবার কথা ছিল। সোনিয়াকে খুব সুন্দর লাগছিলো একটা লাল জামা আর উঁচু হিল পরে। ও সবে বাড়ি থেকে বেরুবে এমন সময় হঠাৎ সুনীলদা এসে ওকে একরকম জোর করেই সব প্ল্যান বাতিল করালো।

দুপুরের খাবার খেয়ে সোনিয়া বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলো। তার মন অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছিলো। সে দেখলো একটা পুরুষালি হাতে ক্যামেরা ধরা আছে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলো যে ক্যামেরাটিতে একটি নগ্ন কিশোরীর ছবি তোলা হয়েছে। সোনিয়া কিছু বলার চেষ্টা করছিলো কিন্তু তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে দৃশ্যটা অন্ধকার পটভূমিতে বিলীন হয়ে গেল। সে শরীরের উপর একটা ভারী বস্তু অনুভব করছিল। যেটা তার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। সেটাকে স্থানচ্যুত করার তার চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়েছিল। বস্তুটা চেপে আটকে থাকলো ওর ঊরুর উপর

ঘিনঘিনে আঠালো রস ছড়িয়ে দিয়ে। ভয় পেয়ে তার গলা দিয়ে এক বর্ণ আওয়াজ বেরোলো না।

সোনিয়া উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল অন্ধকার ঘরে। ঠান্ডা মেঝেটা ধীরে ধীরে একটা শক্ত গদিতে রূপান্তরিত হল। সে বিছানায় পাশ ফিরলো। সে হাতড়ে বিছানার কাছের আলোটা জ্বালালো। মাথা তুলতেই খাটো আলমিরাটার উপর তার অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে স্ফটিক-শঙ্খটা দেখতে পেলো। ভোরের কিরণ তার দেরাদুনের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলো। সে সাহস জোগাড় করলো তার ভালবাসার উজ্জ্বল আলো দিয়ে অন্ধকারের অবসান করবে বলে।

মোবাইল ফোনটা নিয়ে চেনা নম্বরে ফোন করলো সোনিয়া। অন্যদিকের ফোন বেজে যাওয়ার শব্দ পেয়ে একটু হতাশ হলো। ভাবলো তবু একটা ভয়েস মেসেজ রেখে দেবে। এমন সময় হঠাৎ রুপেশের গলার আওয়াজ শুনতে পেলো সে। জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সোনিয়া। উত্তেজনায় সারা শরীরে শিহরণ জেগে উঠেছিল তার। এমন সময় তার কনুইয়ে লেগে স্ফটিক-শঙ্খটা, একুয়ারিয়ামের পায়ার পিছনে হারিয়ে গেলো। "রুপেশ, আমি আগেই বলতে চেয়েছিলাম নীনার স্বামী সুনীলদা গত শুক্রবার দেরাদুনে এসেছিলো। আমরা ঋষিকেশে যাওয়ার সময় গাড়ী-দুর্ঘটনায় সুনীলদার মৃত্যু হয়।" বলতে গিয়ে ওর গলা কাঁপছিলো। সোনিয়া ঘুরে দেখলো স্ফটিক-শঙ্খটা উধাও হয়ে গেছে।

লংমন্ট, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

রীতা রায় মিঠু

রোমেজা

জ্বালানি কাঠির আঁটি কাঁখে আফিয়া খাতুন ঘরের কাছাকাছি পৌঁছল যখন বাইরে রোদের তেজ কমে গেছে তবে দিনের আলো মরেনি। আফিয়া খাতুন গেছিলো সাহাবাবুর বাগে খড়ি কুড়াতে।

মাসের শেষ, ঘরে অনেক কিছুই বাড়ন্ত, লাকড়িও ফুরিয়ে গেছে ।

সাহাবাবুর বাগে ঢুকলে আফিয়া খাতুনের গা ছমছম করে। দিনের বেলাতেও আন্ধাইর লাগে চারদিক।। জ্বীন ভূতের ভয়ে আফিয়া খাতুন ঘন ঘন আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দেয়। বাগে না গিয়ে উপায়ও নেই। একলা পেট হলে কথা ছিলো না। কিন্তু ঘরে মাইয়া আছে, নাতি নাতনি আছে। নাতি নাতনি দুইটারে একমুঠ ভাত রাইন্দা দিতে হয়। নিজেরও একমুঠ ভাত না হইলে রাইতে ঘুম আসে না। তবে রমারে নিয়া চিন্তা কম। ও তিন বাড়িতে কাজ করে। দিনে তাগো বাড়িতেই খায়। মুখে পান থাকলে রাইতে ওর ভাত না খাইলেও চলে।

আফিয়া খাতুনের ছোট মেয়ে রমা। আসল নাম রোমেজা খাতুন। রমা উপরি পাওয়া নাম। রোমেজা তখন খুব ছোটো, আফিয়া খাতুন কাজ করতো সাহাপাড়ার মাস্টার মাসির ঘরে। সকালে যেতো সন্ধ্যায় ফিরতো। রোমেজারে দেখে রাখার কেউ ছিলো না। তাই রোমেজারে কাঁখে নিয়েই মাস্টার মাসির বাড়ি যেতে হতো।

রোমেজার হাতে কাপড়ের পুতুল দিয়ে মাসির ঘরের মেঝেতে বসিয়ে দিলে ও আপন মনে খেলতো।

মাসি একদিন টেলিভিশনে সিনেমা দেখতে দেখতে কইলো, আফিয়া গো, তোমার মেয়েটা পরীর মতো দেখতে, রোমেজা নামটা ওরে মানায় নাই। ওর নাম দিলাম রমা। সুচিত্রা সেনের নাম শুনেছো? সবচে সুন্দরী নায়িকা, তোমার মেয়ের মতো সুন্দর, তার নামও রমা"।

আফিয়া খাতুন নায়ক নায়িকার খোঁজ রাখে না। মাস্টারমাসি তার রোমেজারে পরীর মতো সুন্দর কইছে এতেই সে খুশি। পান খাওয়া কালচে দাঁতে বিগলিত হেসে বলল, "মাসি, রোমেজা ত আপনের নাতিন, নাতিনরে যেই নামে ডাকতে মন লয় ডাইকেন"। সেই থেকে রোমেজার নাম হয়ে গেলো রমা।

বাগ থেকে ফেরার সময় আফিয়া খাতুন ঝুঁকে হাঁটছিলো। ঘরের কাছে এসে কোমড় সোজা করে কপাল কুঁচকে দাঁড়ালো, ঘরের দরজা খোলা ক্যান?

বাগে যাওয়ার সময় দরজায় সে নিজে হাতে টিপতালা লাগিয়েছিল। একটা চাবি তার আঁচলে বান্ধা, আরেকটা চাবি রমার কাছে। রমার ত এখন ফিরার সময় হয় নাই। নাতিনাতনিও মাদ্রাসা থেকে ফিরে নাই। তাইলে ঘরের দরজা খুললো কেডা? চোর ঢুকছে নি?

কাঠির আঁটি ঝুপ করে ফেলে আফিয়া খাতুন হাঁক দিল, " ঘরের ভিতরে কেডা? বাইর হইয়া আয় কইলাম।"

ঘরের ভেতর থেকে রমার গলা শোনা গেলো, "অ মাইও, চিল্লাও ক্যান? আমি গো আমি।"

- তুই কহন আইছস? আমার বুকের ভিতরডা এহনও ধড়াস ধড়াস করবার লাগছে।

- মাইও, এত্ত ডরাইলে চলব? কিয়ের ডর?

- যদি চোর ঢুকতো ঘরে? সব সাফা কইরা লইয়া যাইতো না?

- আমগোর ঘরে কি এমুন ধন সম্পত্তি আছে যে চোরে লইয়া যাইব? আশেপাশে কত মানুষ, সবাইর চউখ ফাঁকি দিয়া চোরে আমগো ঘরে ডুকবো, এত্ত সাহস চোরের হইব?

- তুই এত সকালে আইসা পড়লি, শইল বালা নাই?

- শইল বালা আছে। জলদি আও ঘরে, কথা আছে।

আফিয়া খাতুন ঘরে ঢুকতেই রমা বললো, " মাইও, পরামর্শ দরকার। আল্লায় মনে লয় এইবার আমগোর দিকে মুখ তুইলা চাইছে। ভাঙ্গা ঘর এইবার পাকা হইবো।

-কি অইছে, খুইলা কইবি তো।

-মাইও গো, বিরাট একখান সুযোগ আইছে। তুমি যদি ইট্টু সাহস দেও, তাইলেই সুযোগটা হাতছাড়া করি না!

২

আফিয়া খাতুনের তিন মেয়ে। খোদেজা, রোমেলা, রোমেজা। দুই মেয়ের বিয়ে বাবা মা দিয়েছে, রমা নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে। খোদেজা আর রোমেলা ঘর সংসার করছে, রমার সংসারটা ভেঙে গেছে। তালাকের পর থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে রমা মায়ের সাথে থাকে।

ছোটোবেলায় রোমেজা মায়ের সাথে প্রতিদিন সকালে মাস্টার দিদিমার বাড়ি আসতো, বিকেলে মায়ের সাথেই বাড়ি ফিরতো। মাস্টার দিদিমা ওকে বাংলা পড়তে লিখতে শিখিয়েছে। দিদিমার স্কুলে ভর্তিও করে দিয়েছিলো। কিন্তু লেখাপড়ায় ওর মন বসতো না। ওর ভালো লাগতো দিদিমার ফাইফরমাশ খাটতে। দিদিমার সাথে থাকতে থাকতে রমার স্বভাবে পরিবর্তন এলো। সে মায়ের মতো ভীতু নয়, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

রমার বয়স তখন ষোলো কি সতেরো, মাস্টার দিদিমার খুব অসুখ করলো। রমার মা একা হাতে দিদিমার সংসার সামলাতে পারছিলো না, রমা মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করতো।

মাস্টার দিদিমারা জাতিতে হিন্দু হলেও তাদের বাড়িতে জাত পাতের বাছ বিচার ছিলো না। বাড়িতে, ঘরে, পাকশালায় হিন্দু মুসলমান সকলেরই যাতায়াত ছিল।
ষোল বছরের রমা দেখতে সদ্য ফোটা পদ্মফুলের মত। কাজলটানা চোখ, ছোট কপাল, মাথা ভর্তি কালো চুল, টিকলো নাক পুরু ঠোঁট। একদিন দিদিমা বললো, "রমার মা, প্রতিদিন রমারে লইয়া আসা যাওয়া করো, আমার দুশ্চিন্তা হয়। রমা তো বড়ো হইছে, দেখতে সুন্দর। আসা যাওয়ার পথে কার কখন কুদৃষ্টি পড়ে। রমারে আমার কাছেই রাইখা যাও, মাঝে মধ্যে বাড়িতে নিয়ে যাবে।
সেদিন থেকেই রমা দিদিমার বাড়িতে থেকে গেলো।

দিদিমাদের বাজার সরকার ছিল জয়নাল মিয়া। বয়স ত্রিশের উপর। দিদিমার সাথে বাজারের ফর্দ মেলানোর সময় কিশোরি রমার সাথে জয়নাল মিয়ার চোখাচোখি হতো। চোখাচোখি করতে করতেই রমা জয়নাল মিয়ার প্রেমে পড়ে যায়। জয়নাল মিয়াও সুন্দরী রমাকে বিয়ের জন্য ফুঁসলায়। কিশোরি রমা সব ফেলে এক সন্ধ্যায় জয়নাল মিয়ার সাথে পালিয়ে যায়।
তিনদিন পর জয়নাল মিয়ার বিবি সেজে রমা দিদিমার বাড়ি আসে, সালাম করে সকলের দোয়া চায়। মাস্টার দিদিমা কিছুই বলে নাই, আঁচলে বারবার চোখ মুছছিলো।

আর রমার মা, "আমার কী সব্বনাশ হইয়া গেলো গো, আর পোলা পাইলি না, এমুন বুইড়া বেডার লগে হাঙ্গা বইলি তুই?" বলে বুক চাপড়েছিলো।

৩

জয়নাল মিয়ার সাথে রমার সংসার ভালোই চলছিলো। বিয়ের পর জয়নাল মিয়া দিদিমার বাড়ির কাজ ছেড়ে সিনেমা হলে টিকেট চেকারের চাকরি নিলো। টিকিট ব্ল্যাক করে উপরি আয় হতো। ততোদিনে রমার কোলে হানিফ এসেছে।

উপরি আয়ের সাথে জয়নাল মিয়ার আনন্দ ফূর্তি বাড়তে লাগলো। রঙচঙে শার্ট, বাবরি চুল, গায়ে আতরের গন্ধ। কাজের চাপ বেড়েছে উসিলায় মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটায়। রমা টের পেলো, জয়নাল মিয়া বেশ্যাবাড়ি যায়।
দুই বছরের হানিফকে কোলে নিয়ে রমা মাস্টার দিদিমার বাড়ি চলে এলো।

তখন জয়নাল মিয়াকে তলব করা হলো, বকা ঝকা হলো, থানা পুলিশের ভয় দেখানো হলো, হানিফকে কোলে নিয়ে রমা আবার নিজের সংসারে ফিরে গেলো।
হানিফের বয়স যখন পাঁচ, রমা দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা হলো। ঠিক সে বছরই আফিয়া খাতুনের স্বামী অসুখে পড়লো। বাপের অসুখের খবর পেয়ে হানিফকে নিয়ে রমা মায়ের বাড়ি চলে এলো। নয় মাসের ভারী শরীরেই রমা বাপের সেবাযত্ন করে। ভরা পেট নিয়ে বাপকে বিছানায় এপাশ ওপাশ করাতে খুব কষ্ট হয়।

জয়নাল মিয়ার তখন প্রচন্ড ব্যস্ততা, বেদের মেয়ে জোছনা প্রতিদিন হাউজফুল। টিকিট ব্ল্যাক হয়, জয়নাল মিয়ার পকেট ভারী হয়। তেমন রমরমা সময়েও জয়নাল

মিয়া অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে এসেছিল এবং একটানা সা্তদিন শ্বশুরের সেবা করেছিলো। মেয়ে জামাইয়ের সেবা যত্ন নিয়ে রমার বাপ আট দিনের মাথায় চোখ বুজেছিল।

বাপের মৃত্যুর কিছুদিন পর রমা কন্যাসন্তান প্রসব করলো। জয়নাল মিয়া কন্যার নাম রাখলো মিনা। মিনা দিনে ঘুমায় রাতে কাঁদে। সারারাত ট্যাঁ ট্যাঁ করে, মুখে স্তনের বোঁটা গুঁজে দিয়েও রমা মেয়ের কান্না থামাতে পারে না।

একদিন জয়নাল মিয়াকে বলে, তুমি তো ভোঁস ভোঁস কইরা ঘুমাও, মিনা তো সারারাইত কান্দে। দুধও খায় না, তুমি কুসুম কাকার কাছ থিকা দুই পুরিয়া 'হোমোপেতি' অষুধ আইনা দাও।

জয়নাল মিয়া অষুধ আনবে বলে, কিন্তু আনে না।

রমা উতলা হয় হোমোপেতির পুরিয়ার জন্য! জয়নাল মিয়া কাজে যায়, বাড়ি ফিরে ভাত খায়, কিন্তু কুসুম কাকার কাছে যেতে ভুলে যায়।

শেষে রমার মা কুসুম কাকার কাছ থেকে হোমোপেতির পুরিয়া এনে দিলো। এক পুরিয়া খেয়েই মিনার কান্না থেমে গেলো।

জয়নাল মিয়ার কাজের চাপ আবারও বেড়ে গেলো, রাতে বাড়ি ফেরার তাগিদ কমে গেলো। একসময় রমা জানতে পারলো, জয়নাল মিয়া আরেকটা বিয়ে করেছে। এবার রমা নালিশ নিয়ে মাস্টার দিদিমার কাছে গেলো না। এক বছরের মিনাকে কাঁখে করে, সাত বছরের হানিফের হাত ধরে মায়ের বাড়ি চলে এলো।

মায়ের বাড়িতে থাকলেও ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের দায় রমা বিধবা মায়ের কাঁধে চাপায়নি। মাস্টার দিদিমার স্কুলে মর্নিং শিফটে আয়ার চাকরি নিয়েছে, সাথে দুই বাড়িতে ঠিকা কাজ। যা আয় হয়, তাতে কায়ক্লেশে ওদের সংসার চলে যায়।

হানিফকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেছে, প্রতি মাসে বেতন ৮০০ টাকা। এভাবেই দুই বছর পার হয়। একদিন হানিফ এসে বলে, আম্মা এখন থিকা তোমারে আর মাদ্রাসায় বেতন দিতে হইবো না। বড় হুজুর এতিম ছাত্রদের বেতন ফ্রি করে দিছে।

রমা বলে, কিন্তু বাজান, তুই তো এতিম না। তোর বেতন মাফ ক্যান?

হানিফের বেতন মাফ পাওয়ার গল্পটা এরকম।

দুই বছর হলো হানিফ মাদ্রাসায় বেতন দিয়ে পড়ছে। সেদিন বড়ো হুজুর ক্লাসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কার কার বাপ নাই হাত উঠাও।

কয়েকজন ছাত্র হাত উঁচু করেছে। হানিফ হাত তোলে না কিন্তু ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। বড়ো হুজুর হানিফকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

হানিফ চোখ মুছতে মুছতে বললো, "হুজুর, আমি এতিম না, আমার বাপ মা আছে। কিন্তু আমার আব্বা আমাদের ছাইড়া অন্য জায়গায় সংসার পাতছে। আমরা নানীর লগে থাকি। আমার মায় বাড়িত বাড়িত ঝিয়ের কাম করে, ইস্কুলে আয়ার কাম করে। অনেক কষ্ট আমার মায়ের"।

হানিফের কথা শুনে বড়ো হুজুর বললেন, এখন থেকে হানিফও ফ্রিতে লেখাপড়া করবে। সেদিনটার কথা মনে পড়লে বড়ো হুজুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আজও রমার চোখে পানি আসে।

৪

আফিয়া খাতুনের চোখে ঘুম নাই। ছোট দুইটা ঘর, একটায় নাতিরে লইয়া সে ঘুমায়, অন্যটায় শোয় রমা আর মিনা। হানিফ বড়ো হইতাছে, কবে যে পাশ দিবো! হুজুর কইছে হানিফ খুব মেধাবী। মাস্টার মাসি কইছিল হানিফরে তাইনের ইস্কুলে ভর্তি করাইতে।

রমা রাজি হয় নাই। রমার ইচ্ছা হানিফ মাদ্রাসায় পড়বো।

মাস্টার মাসি রমারে জিগাইছিল, "কিরে রমা, পোলারে মাদ্রসায় পড়াবি, বড়ো হইয়া পোলা তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইবো না, হইবো হুজুর। বাংলাদেশে কি হুজুরের অভাব আছে যে, তুই ছেলেরে হুজুর বানাইতে চাস?"

রমা কয়, "দিদিমা, তুমি মিছা কও নাই। তারপরেও হানিফ মাদ্রাসাতেই পড়বে। আমার খুব শখ, আমার পোলা আমার জানাজায় ইমামতি করবো।

দিদিমা কইলো, তুই মরার কথা চিন্তা করলি? পোলায় ডাক্তার হইলে যে তোরে চিকিৎসা কইরা সারাইয়া তুলবো, সেইটা ভাবলি না?

- দিদিমা, এইটা আমার অনেক দিনের সাধ। হিন্দু বাড়িতে কাম করি বইলা এমনিতেই গেরামের মাইনষে আমাগো দেখলে টিপ্পনি কাটে। মনে নাই, আরেকবার কি হইছিল? হিন্দু বাড়িতে কাম করি দেইখা মসজিদের ইমামসাব আ্মাগো একঘইরা কইরা দিবো কইছি্লো?

- মনে নাই আবার! আচ্ছা রমা, তুই যে ইমাম সাহেবের সাথে ঝগড়া করতে যাস, ভয় লাগে না?

- ভয় পাইতাম ক্যান? আমি কি চুরি করছি? কাম কইরা খাই, কামের গায়ে হিন্দু মুসলমান লেখা থাকে?

- তুই কতো সাহসী বুদ্ধিমতি মেয়ে। লেখাপড়া করতিস যদি, উকিল হতে পারতি।

পাশেই হানিফ বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আজ রাইতে আফিয়া খাতুনের ঘুম আসে না। অনেক মোটা বেতনে কাজ করার একটা প্রস্তাব পাইছে রমা। মাস্টার মাসি ঠিক কইরা দিছে কাজটা, তাইনের আত্মীয় বাড়িতে।

চিন্তা হইল, রমারে যাইতে হইবো ঢাকা। পোলামাইয়া দুইটারে মায়ের কাছে রাইখা রমা ঢাকা শহরে যাইতে চায়। আফিয়া খাতুন বুঝতে পারে না কি বলবে! ঢাকা শহর কত্ত বড়, কত্ত মানুষ, দালান গাড়ি চাইরদিকে। আফিয়া খাতুন ঢাকা শহর চিনে না, কতো দূরে তাও ঠাহর করতে পারে না। ঢাকা শহরে গিয়া রমার বিপদ হইবো না তো? রমার যদি বিপদ ঘটে, নাতি নাতনি লইয়া সে কই যাইবো।

এদিকে বেতনের টেকাও কম না। মাস যাইতেই কড়কড়া বারো হাজার টেকা হাতে পাইবো। রমা কইছে, চাইর হাজার টাকা আফিয়া খাতুন সংসারে খরচ করবে, বাকি

টাকা জমা রাখবে মাস্টার দিদিমার কাছে। এক থোকে জমলে সেই টাকায় রমা মায়ের দুই খুপরির ঘর ভাইঙ্গা সিমেন্টের পাকা দেয়াল, পাকা মেঝে আর ঢেউ টিনে চাল দিয়া ঘর তুলবে। নিজেগো বাড়িতেই টিউবকল বসাইবো।

কিন্তু রমা হিন্দু বাড়িতে কাম লইয়া যাইব ঢাকা শহরে। পাড়ার মাইনষে কুৎসা গাইবো না তো? পরক্ষণেই ভাবে, কুৎসা গাইলে গাইবো। যারা কুৎসা গাইবো, তারা কি আফিয়া খাতুনরে এক বেলা খাওনের আন্দাজ চাউল দিবো? ঘরের বেড়া নড়বড় করে, খুঁটি ঘুনে খাইছে, তারা কি আফিয়া খাতুনের ঘর বাইন্দা দিবো?

আফিয়া খাতুন মন ঠিক করে ফেললো, হানিফ আর মিনারে দেইখা রাখতে পারবো। রমা যেনো কাইল সকালেই মাস্টার দিদির কাছে সম্মতি জানায়।

৫

মিনারে বুকে জড়ায়ে শুয়ে আছে রমা। রাত কত হইলো কে জানে! চোখে ঘুম নাই। কাইল সকালের মধ্যে মাস্টার দিদিমারে জানাইতে হইব, রমা ঢাকা যাইবো কিনা। রমা বুঝতে পারছে না, কি করা উচিত।

হিন্দু বাড়িতে কাজ করে বলে আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশি সবাই নাখোশ। বড়ো হুজুরের কাছে নালিশও করেছিলো যেনো হানিফকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়। বড়ো হুজুর ওদের নালিশ কানে তোলে নাই। কিন্তু এই কাজটা নিয়া ঢাকা গেলে কি বড়ো হুজুর রাগ করবো?

অনেক দিন পরে আজ মাস্টার দিদিমার বাড়িতে গেছিল রমা। রমাকে দেখে দিদিমা বললো, "ও রমা, তুই এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দে"।

রমা তেলের বাটি নিয়ে বসে গেলো। দিদিমার মাথায় রাশি রাশি চুল, এই চুল তেল দিয়ে ভিজাইতে আধা বোতল তেল শ্যাষ হইয়া যায়। দিদিমার চুলে বিলি কাটছিলো রমা, এমন সময় দিদিমার মোবাইল ফোন বাইজা ওঠে। ফোন কানে লাগাইয়া কথা কইতে পারে না দিদিমা, ফোনের স্পিকার ছাইড়া কথা কয়।

ফোন করছে দিদিমার বইনঝি ইলা। ইলা মাসিরে রমা চিনে, এই বাড়িতে অনেক আসে। সবসময় হৈচৈ আনন্দ ফুর্তিতে থাকে।

ইলা মাসির শাশুড়ি নাকি খুব অসুস্থ, বাথরুমে আছাড় খাইয়া কোমড় ভাঈঙ্গা বিছানা লইছে। মাসিদের মন খারাপ। শাশুড়ির দিনরাইত সেবাযত্ন করার লোক দরকার। তিনারা স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই চাকরি করে। দিনের বেলা কেউই বাসায় থাকে না। শাশুড়ির অসুখ তাই মাসি ছুটি নিছে, কিন্তু ছুটি ফুরাইলে কি হবে!

শাশুড়ির সেবা করার জন্য লোক খুঁজতে খুঁজতে এক দালালের খোঁজ পাইছিল। দালালের লগে খালুর ফোনে কথা হইছে। দালালে কইছে, হের অনেক বড় কোম্পানি, মানুষের বাড়িতে কাজের লোক সাপ্লাই দেয়। মাসিদেরকেও লোক দিবে, সেই লোক রোগির সেবা থেকে শুরু করে বাড়ির সব কাজ করবে। তিনবেলা খাবার, বিছানা বালিশ,

জ্বরজারি হইলে ওষুধ আর বেতন ১২ হাজার টাকা। এডভান্স দিতে হবে ১৭ হাজার টাকা

কোনো উপায় না পাইয়া দালালের চুক্তিতে রাজী হইছে। গত পরশু মাসির স্বামী গেছিল দালালের অফিসে, কাগজপত্রে সই কইরা টাকা দিয়া কাজের মানুষ ঠিক কইরা আইবো। কিন্তু গিয়ে দেখে ঐ নামে ঐ ঠিকানায় কোন অফিস নাই।

স্পিকারে কথা চলছে, রমা সবই শুনছে। কি মনে হলো, রমা বলে ফেলল, "মাসে ১২ হাজার টাকা? ও দিদিমা, ইলা মাসিরে কন, আমারে লইয়া যাইত। আমি মাসির ঘরের কাজও করুম, মাসির শাশুড়ির সেবাও করুম"।

দিদিমা ইলা মাসিকে বলল, " ইলা, শোন রমা কি বলে। বলছে রমাকে নিয়ে যেতে।"

ইলা মাসি সাথে সাথে বলল, "ও রমা, তুই সত্যি আসবি ঢাকায়? তোর মা রাজী হবে? শোন, আমার শাশুড়ি মা একটুও যন্ত্রণা করে না।"

রমা কইল, " মাসি, আমারে আইজকার দিনটা সময় দ্যান। বাড়িত গিয়া মার লগে আলাপ করি। কাইল দিদিমারে জানাইমু"।

সন্ধ্যার সময় হানিফকে বুঝিয়ে বলেছে। হানিফ বলেছে, "আম্মা, আমাগোরে লইয়া চিন্তা কইরো না। তুমি যাও ঢাকা"।

মিনা অনেক ছোট, কয়দিন কানবো মায়েরে কাছে না পাইলে। মিনারে কইতে হইব, ঢাকা থিকা লেহেঙ্গা কিনা আনুম। তাইলেই মিনা রাজী হইব।

বর্ষার দিনে ঘরের চাল ছেইদা বৃষ্টির পানি পড়ে, সারাঘর ভাসে, বিছানা বালিশ ভিজা ত্যানা হইয়া যায়। ঘরের খুঁটিগুলি লড়বড় করে, দমকা বাতাসে খুঁটি কাঁপে, মিনা আর হানিফ ডরায়, যদি ঘর ভাইঙ্গা চাপা পড়ে! ঘর সারানোর উপায়ও নাই। কে দিবো টাকা? মায়ের শইল ভাইঙ্গা গেছে, মায় এখন বাসা বাড়িত কাম করতে পারে না। যেই কয়ডা টাকা রমা কামাই করে, পুরা মাস চলে না। এইভাবে বাঁচা যায়?

ইলা মাসির বাড়িতে কয়েক মাসও যদি কাম করতে পারে, তাইলেই সংসারের চেহারা পাল্টায়ে দিতে পারব।

রমার যে একেবারেই ভয় লাগছে না তা নয়। ঢাকা অনেক দূরের পথ। জীবনে কোনদিন ঢাকা যায়নি। নাটকে সিনেমায় দেখে, ঢাকা শহর অনেক বড়ো, অনেক মানুষ, বড়ো বড়ো দালান, অনেক গাড়ি বাস।

এতো মানুষের ভীড়ে রমা যদি হারায়ে যায়! হারায়ে গেলে রমা কুতুবপুর ফিরবে কেমন করে! রমা যদি অই দালাল বেডার মতো বদ লোকের পাল্লায় পড়ে, যদি ওরে খারাপ পাড়ায় লইয়া যায়, তাইলে তো ও আর ঘরে ফিরতে পারবো না। হানিফ মিনারে দেখতে পাইবো না! মইরা গেলে পুতের হাতের মাটি পাইবো না, জানাজা হইতো না!

পরক্ষণেই রমার মনে হলো, কী আজব চিন্তা করতেছি! আমি হারায়ে যামু ক্যেনো? আমি তো একা একা ঢাকা যামু না। ঢাকা গিয়া রাস্তায় ঘুরমু না। ইলা মাসির বাড়িতে থাকমু, কাজ করুম বুড়ির সেবা করুম। ইলা মাসি আমারে হারিয়ে যেতে দিবে কেনো?

মাস্টার দিদিমা তো রমারে সাহসী বুদ্ধিমতী কয়। একটু সাহস করে ঘরের বাইরে পা রাখতে পারলেই হইলো!

সাহসীর সাথে আল্লাহপাক থাকেন, এটা মনে হতেই রমার বুকের ভার লাঘব হলো। সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললো রমা।

মিসিসিপি, যুক্তরাষ্ট্র

রুপা খানম

অপূর্ণতা

উৎসব মুখরিত চারদিক। আনন্দ আর ভালবাসায় ভরা শফি আর রুনুর ঘর। আজ খোকার জন্ম হলো। প্রথম দিকে সংসারে অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। শফি পেশায় একজন সৎ সরকারি অফিসার। তেমন স্বচ্ছলতা না থাকলেও দুজন মিলে কেটে যাচ্ছিল সুখের দিনগুলি। রুনু ভুল করেনি নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে।

রুনু ছিল বিত্তশালী বাবার একমাত্র কন্যা। রুনুর জন্য এত অল্প আয়ের মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন হওয়ার কথা ছিল। শফির সাথে প্রেম করার কারণে বাবা ত্যাজ্য করে দিল রুনুকে। বঞ্চিত করে দিল তার সব কিছু থেকে তার নিজের সন্তানকে। রুনু সিংহাসন চায়নি। চেয়েছে হাসি আর আনন্দ দিয়ে গড়া একটি সুন্দর জীবন। তাই তো রাজসিংহাসন ছেড়ে পথে এসে নেমেছে সে।

রুনুর বিয়ের পর দাম্ভিক বাবা আর সম্পর্ক রাখতে চায়নি তার সাথে। একদিন হঠাৎ শফির সাথে দেখা তার একটা ট্রেনস্টেশনে। দুজনার আলাপ পরিচয়, প্রেম বিয়ে সব নিয়ে রুনু সুখেই ছিল। শফি রুনুর শূন্যতা ভুলিয়ে দিয়েছে তার ভালবাসা দিয়ে। কয়েক বছর পর ক্যান্সারে বাবার মৃত্যুতে বাবার মুখটি দেখার অনুমতি মিলেনি রুনুর।

মৃত্যুর আগে সব কিছু সৎ মাকে দিয়ে গেছে রুনুর বাবা। ছোটবেলা মা মারা যাবার পর বাবার একঘেয়ে আচরণ রুনুকে দূরে সরিয়ে নেয় দিনের পর দিন। ছোট রুনুকে ভাবিয়ে তুলত, বাবা কেন এমন যান্ত্রিক ছিলেন। বাবা কেন এমন পর তার। তাই নিয়তি হয়তো পরের মত বাবাকে নিয়ে গেছে রুনুর জীবন থেকে।

মানুষ বাঁচার জন্য টাকার দরকার। আজ বাবা নেই, এই যশখ্যাতি কিছুই বাবা নিতে পারেনি। বাবার কাছে সম্পর্কের কোনো মূল্য ছিল না। মা মারা যাওয়ার পর রুনু একাকী বোধ করত। বাবার কাছে ভয়ে যেত না। বিশাল বাড়িতে একা ঘরে থাকতে রুনু ভয় পেত। বাবার ব্যক্তিত্ব তাকে কাছে টানেনি বরং দূরে সরিয়ে দিয়েছে, অনেক দূর। মা'র শূন্যতায় রুনুর কতটুকু সঙ্গ পাবার দরকার ছিল বাবা সেটা অনুভব করেনি। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। সংসারে সৎ মা। সে কখনো মায়ের দায়িত্ব পালন করেনি। একা শূন্য ঘরে রুনু বড় হয়েছে বাড়ির কাজের লোকের সাথে।

শুধু নিজের প্রতিষ্ঠাই ছিল বাবার একমাত্র গুরুত্ব এবং ব্যস্ততা। কোন কিছুর কমতি ছিল না কিন্তু ছিল ভালবাসার অভাব। রুনু বড় হয়ে বুঝতে শিখেছে, বাবা মানে রুনুর

কাছে ছিল ভাল খাবার, দামি গাড়ি করে স্কুলে যাওয়া। যখন বড় হতে লাগলো বুঝতে শিখল, কেউ নেই রুনুর পাশে। জীবনের কত নতুন ধাপ তাকে একা পেরিয়ে আসতে হয়েছে বাড়ির কাজের লোকের হাতে। কাউকে রুনু বলতে পারে নি। একাকিত্ব কুরে কুরে খেয়েছে তাকে । তাই নিজে খুঁজে বেড়িয়েছে ভালবাসার এতটুকু নীড়।

বাবার ধারণা, অভাব অভিশপ্ত। রুনুর মনে পড়ে মা'র বাড়ির লোকেরা ছিল গরীব। বাড়িতে বাবার হুকুম ছিল না মা'র বাড়ির কেউ রুনুদের বাড়ি ঢুকার। সে কারণে মামা খালাদের সাথে একটা দূরত্ব হয়ে যায় তার। বড় একা হয়ে পড়ে রুনু। লেখাপড়ার পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্য কিছুটা হারিয়ে ফেলে সে। স্কুলে রেজাল্ট খারাপ হতে থাকে। মোটা অংকের টাকা দিয়ে বাবা শিক্ষক রেখে দিত রুনুর ভাল রেজাল্ট করার জন্য। তাতেও রুনু পড়ালেখায় খুব একটা ভাল করতে পারত না। সারাদিন নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হতে থাকে তার৷ বাবার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে সে।

রুনু মনে করত তার মায়ের মৃত্যুর জন্য বাবাই দায়ী ছিলেন। বাবা মাকে অবহেলা করত, মা ছিল গরীব ঘরের মেয়ে তাই। তিনি ছিলেন একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের মেয়ে। নম্র, শান্ত, বাবার কোন কথায় তেমন অনুভূতি হত না তার। রুনুর মনে পড়ে মা'র সুন্দর মুখখানি। বাবা বিয়ে করেছিল তার সৌন্দর্য দেখে কিন্তু মা'কে বিয়ে করে তাকে যোগ্য সম্মান করতে পারেনি। এ নিয়ে ঘরে রুনুর সামনে বাবা মা'র মধ্যে মাঝে মাঝে বাগবিতণ্ডা চলত। মা অনেক সহ্য করতেন রুনুর মুখের দিকে চেয়ে। এমনই হতে হতে মা একদিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চলে যান দুনিয়া ছেড়ে। রুনুর ছোট মনে নাড়া দেয় বাবার ইগো এবং অহংকার।

মাকে চলে যেতে হয়েছে। বাবা কখনো তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হতে শিখেনি। মা'কেই যেন সব দায়ভার নিতে হত। মা হারা রাজকন্যার এই ধনসম্পদ সত্যি কি সুখ এনে দিয়েছে সেই ছোট রুনুর জীবনে? রুনুর বেডরুমে স্বপ্নের রাজকন্যার মত ডেকোরেশন করে দিয়েও কেন ভালবাসা আদায় করতে পারেনি বাবা রুনুর? বাবা কখনও বুঝেনি রুনুর কিসের শূন্যতা। এসবে রুনুর আনন্দ হোত না। বিষণ্নতা ঘিরে রাখত তাকে সব সময়। বাবার কাছ থেকে রুনু ধীরে ধীরে অনেক দূরে সরে যায়।

রুনু ছোট থেকে পারিবারিক সমস্যার মধ্যে বড় হয়ে শফির মধ্যে অবশেষে খুঁজে পায় ভালবাসা। তাই এক কাপড়ে শফির ভালবাসার জন্য বাবাকে পিছে ফেলে রুনু চলে এসেছে শফির ঘরে। শফি সেই মর্যাদা দিয়েছে রুনুকে আজ। বুকভরা ভালবাসা আর স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে সুখেই কাটছিল শফি-রুনুর জীবন। একসময় রুনুর কোল জুড়ে এলো চাঁদের মত ফুটফুটে পুত্র সন্তান। সংসারের খরচ থেকে বাঁচিয়ে রাখা টাকাকড়ি থেকে রুনু নিজে খোকার সব শখ পূরণ করত। মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল খোকার জন্মের পর।

সেই ছোট্ট খোকাকে বড় করতে কেটে গেল শফি এবং রুনুর গুছানো সংসারের বাইশটি বছর। কী নেই শফি আর রুনুর সংসারে! অনেক বেশী তো দরকার হয় না। অল্প আয়ে সংসার ছিল পরিপূর্ণ। তাদের খোকা হাঁটি হাঁটি পা করে আজ অনেক বড়

হয়ে গেছে। সুঠাম দেহ তার, দেখতে রাজপুত্রের মত। খোকা আজ বড় একটি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার।

শফি আর রুনু বুঝতে পারে তারা যৌবন পেরিয়ে আজ বার্ধক্যের কোঠায়। চোখে আর আগের মত দেখে না তারা । মেশিনে খননের কাজ করতে গিয়ে শফি কানেও অল্প শুনে। কিছু পড়তে গেলে চোখে ঝাপসা দেখে। এখন আর কষ্ট করতে দেয় না খোকা। সুখের দিন তাদের এসেছে । আর সেই অর্থকষ্ট নেই আজ। দুজনই সিদ্ধান্ত নিল খোকার দায়িত্ব কাউকে দিবে। কিছুদিনের মধ্যে পছন্দের মেয়ের সাথে ধুমধাম করে বিয়ে হোল খোকার। বিয়ের রাতে শফি খোকাকে ডেকে বললো, 'বাবা আমি আজ অনেক খুশি। তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শেষ করে ভাল চাকরি করছ। বিয়ে করেছ। আমি ভাগ্যবান। আমি এটা করতে পেরেছি তোমার মা'র মত এমন মায়াবতী আমার পাশে ছিল বলে। তোমার মা রুনু এমন একজন যাকে পেয়ে আমি ধন্য। এভাবে তোমরাও নিজেরা এবার গুছিয়ে নাও তোমাদের জীবন।' বলতে বলতে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো বাবার।

বছরখানেক ভালই কাটল খোকাদের জীবন। কিছুদিনের মধ্যে শুরু হলো খোকা আর ওর বউয়ের তুমুল ঝগড়া। প্রতিদিনই সন্তানের ঝগড়া রুনু-শফিকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। এক ঘরে থেকেও কিছু করতে পারছে না বাবা-মা। রুনু লক্ষ্য করে, খোকা কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আগে যে খোকা রুনুর ঘরে না এসে ওর নিজের ঘরে যেত না, আজ সেই খোকা মা'কে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। 'মা তুমি আজ কেমন আছ? তোমার বাতের ব্যথা কি বেড়েছে?' এখন আর এসবের কোন খোঁজ রাখে না সে। সেই হাসিমাখা মুখটা মলিন থাকে তার । রুনু খোকাকে জিজ্ঞেস করে 'তোর কি শরীর খারাপ বাবা? তুই ঠিক মত খাস না ঘরে? তোর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে!' খোকা বলে উঠে 'মা আমি ভাল আছি, কোন চিন্তা করো না।' তারপরই উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। একদিন রুনু নিজের কানকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না। খোকার বউ বলছে 'এই বুড়াবুড়িকে কবে তাদের গ্রামের বাড়ি দিয়ে আসবে?' খোকাকে চাপ দিচ্ছে। খোকা বারবার সময় চাচ্ছে। খোকা বলছে 'আর কয়েকটি দিন সময় দাও লক্ষ্মীটি। আমি ওদের দুজনকেই বাড়ীতে রেখে আসব। আগে বুঝিনি রুনু, ওদের সংসারের এই হাল ওদের দুজনার জন্যই।' রুনু চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলো না। অভিমান ভরে শফিকে বললো 'চলো আমরা গ্রামে ফিরে যাই।' শফি রুনুকে অনেক ভালবাসত, তাই শফি রাজি হয়ে গেল। পরের দিন যথারীতি রুনু আর শফি সব কিছু গুছিয়ে গ্রামে চলে গেল। শুধু খোকাকে সুখী দেখার জন্য। আমাদের জন্য আজ আমাদের খোকার এত কষ্ট রুনু সহ্য করতে পারছে না। খোকা বললো 'মা বাবা তোমরা যেওনা আমাদের রেখে।' রুনু বললো 'বাবা আমাদের বাধা দিও না। তোমরা ভাল থাকো। এখন দিন এসেছে তোমাদের একা চলার।' ওদের চলে যাবার কয়েক মাস পর থেকে খোকা আর তেমন যোগাযোগ রাখত না। মাঝে মধ্যে ফোন করে জিজ্ঞেস করত 'তোমরা কেমন আছ মা?'

ভোর থেকে দাঁড়কাকটির কা-কা শব্দে রুনু যেন ভীষণ বিরক্ত। দাঁড়কাকটা কেন ডাকছে রুনুর মনে প্রশ্ন। সকালে বেলাই পুলিশ বাড়িতে ! মুহূর্তে অবাক প্রশ্ন 'আপনারা খোকার বাবা মা শফি এবং রুনু?' রুনু কিছু বলার আগেই শফি বললো 'কেন বলুন তো? আমরা খোকার বাবা মা।' 'গতকাল রাতে খোকা নামে একটি ছেলে আত্মহত্যা করেছে। তার ঘরে ছোট একটা চিঠি পাওয়া গেছে। লিখে গেছে " মা বাবা তোমাদের ঋণ আমি শোধ করতে পারলাম না। আমাকে মাফ করে দিও। আর আমার চলে যাবার পর আমাকে তোমরা তোমাদের কাছে রেখো। আর কোন লোলুপ দৃষ্টি আমাকে আমার প্রিয় মা বাবা থেকে যেন আলাদা করতে না পারে। বিয়ের পর অনেক চেষ্টা করেছি মা তোমাদের শিক্ষা নিয়ে সুন্দরভাবে চলার। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস পারলাম না। বড় লজ্জার মা তাই বেঁচে থাকতে পারলাম না, আমার বউ সামিরা পরকীয়া করে। আমাকে ভালবাসত না। শুধু আমার টাকাকে ভালবাসত। আমি কাজে গেলে সে পরকীয়ায় লিপ্ত হত। আমি বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম মা । আমাকে বাঁচতে দিল না । তাই মা আমি এক সময় অন্যায় সহ্য করতে আর পারিনি।'

রুনু আর শফি ওদের সুখের জন্য সব ছেড়ে এসেও খোকাকে রক্ষা করতে পারল না। মা বাবা তাদের প্রিয় সন্তানকে ভালবাসা দিয়েও ধরে রাখতে পারলো না। রুনু আর শফি যেন আজ তাদের সব হারিয়ে ফেলে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। সত্যি কি ভালবাসা বলে কিছু আছে? রুনু ছলছল চোখে প্রশ্ন নিয়ে বসে আছে খোকার স্মৃতির পানে। খোকা নিজ হাতে তার মোবাইল নম্বর লিখে দিয়ে এসেছিল মাকে। 'মা কল করো এই নম্বরে, ভাল থেকো।' রুনু এত কল করছে খোকার সেই নম্বরে, অথচ মা ডাক তো আর শুনতে পায় না! মোবাইলে ভয়েস মেইলে খোকার গলার স্বর। রুনু কান্না জড়ানো গলায় বলে, 'খোকা তোমাকে দূরে রেখে এসেছি বলে তোমার অভিমান হয়েছে? তুমি তাই এত দূরে চলে গেলে যাতে আর আমি ফিরে না পাই তোমাকে।'

রুনুর অশ্রুসিক্ত নয়নে কেবলই ভেসে আসলো সেই ছোটবেলার স্মৃতি। কেন নিয়তি এমন করে? বাবা মা'কে বিয়ে করে কোনদিনই মর্যাদা দেয়নি। আমরা আমাদের খোকাকে ভালোবেসে কোথায় হারিয়ে ফেললাম। খোকা নিজের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করেও সুখী হতে পারেনি। সুখটা আসলে কী, যার পিছনে আমরা দৌড়াই। প্রশ্নবিদ্ধ মন রুনুর, ছোট এ জীবনে সুখ কি আছে সত্যি? রুনুর কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী আজ। চোখ মুছতে মুছতে রুনুর কেবলই মনে পড়ছে -

"সখী ভালবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়।"

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

রেজা শামীম

পুরনো বন্ধু

১

রফিককে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। যেরকম হারিয়ে ফেললে আর খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা সেরকম হারিয়ে ফেলা। মাঝে মাঝে বন্ধুদের আড্ডায় রফিকের কথা উঠতো। কিন্তু কেউ তার খবর জানতো না। আমি তাকে আর কোনদিন খুঁজে পাবোনা, এটা একরকম মেনেই নিয়েছিলাম।

রফিক আমার ছেলে বেলার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আমরা কথ্য ভাষায় যাকে নেংটাকালের বন্ধু বলি। প্লাটিনাম কলোনীর একই দালানের উপর নিচে আমরা থাকতাম। একই ক্লাসে পড়তাম। ও ছিল অকারণে অনেক খানি লম্বা। লম্বা ও হ্যাংলা ছেলের জন্য দুষ্টু ছেলেদের অভিধানে যে কয়টি 'নিক' নাম থাকে 'বগা' তার মধ্যে অন্যতম। তাই ওর নাম কারো কোন আপত্তি ছাড়াই 'বগা রফিক' হয়ে গেল।

বগা রফিক আমাদের চেয়ে এক কাঠি বেশি বাড়ন্ত ছিল। আমাদের মুখ যখন মেয়েদের মত কোমল, ওর তখন নাকের নীচে হালকা গোঁফ ওঠা শুরু হয়েছে। বাবার পকেট থেকে বিড়ি চুরি করে বাথরুমে যেয়ে খাওয়া শুরু করেছে ছোটবেলা থেকেই। আমাকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে নিতো। আমি যখন বিড়িতে টান দিয়ে কাশি, রফিক তখন কায়দা করে ধোঁয়ার কুন্ডলী বানায়। দোকান থেকে বেলুন কিনে তাতে বিড়ির ধোঁয়া ভরে আকাশে উড়িয়ে দিতো। একটা চিঠি লিখে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে রফিক বলতো,

-দেখিস এই বেলুন উড়ে উড়ে অন্য কোন দেশে যাবে। আর যে এই চিঠি পাবে সে আমাদের চিঠির উত্তর দেবে।

ওকে কোনদিন বলা হয়নি যে, আমি মনে মনে ভাবতাম এই চিঠি কোন ভিনদেশী মেয়ে পাক। কিন্তু ভিনদেশী কোন রাজকন্যার কাছে থেকে কোন চিঠি কোনদিন আসেনি।

রফিকের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল বাচ্চার জন্ম রহস্য উদ্ঘাটন, একদিন আমাকে ডেকে ষড়যন্ত্র করার মত ফিসফিস করে বললো,

-জানিস বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার জন্য স্বামী স্ত্রীদের কিছু একটা করতে হয়।

আমি যুক্তি দেখালাম,আরে না, বয়স হলেই মেয়েদের বাচ্চা হয়।

সে আমার ছেলেমানুষী যুক্তিকে হাত উল্টিয়ে উড়িয়ে দিলো। তারপর আমার সামনে তিনটা উদাহরণ হাজির করলো। বললো- দেখ, মরিয়মের অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে বাচ্চা

হয়েছে অথচ বেবি আপার বয়স হলেও বিয়ে হয়নি বলে বাচ্চা হয়নি। আবার তোর ছোট খালার বিয়ে হলেও স্বামী থাকে না বলে বাচ্চা হচ্ছে না।

অকাট্যযুক্তি, না মেনে উপায় নেই। কিন্তু বড়োরা এরকম খারাপ কাজ কিভাবে করতে পারে এটা ভেবে বিস্ময় জেগেছিলো।

আমরা যখন সবে 'ভালোবাসা' কি সেটা বুঝতে শুরু করেছি রফিক তখন একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে। 'আমি দূর থেকে তোমাকেই দেখেছি' এই ধরনের গান শুনে উদাস হয়ে থাকা শুরু করেছে।

অষ্টম শ্রেনীতে পড়ার সময় আমরা খুলনা ছেড়ে ঢাকা চলে আসি। শুরুর দিকে চিঠি'র যোগাযোগ ছিলো। এরপর ওরাও কলোনী ছেড়ে ওদের গ্রামের বাড়ীতে চলে যায়। তখন থেকে যোগাযোগ বন্ধ। এর মাঝে ৩০ বছর চলে গেছে। ৩০ বছর একটা মানুষকে ভুলে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়। কিন্তু রফিকের সেই মুখ আমি এখনও ভুলিনি।

ফেসবুক আসার পর পুরানো অনেক বন্ধুকে খুঁজে পেলেও রফিককে পেলাম না। ওর কি ফেসবুক একাউন্ট নেই?

কে জানে, হয়তো খুব করে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। রফিকের খোঁজ পাওয়া গেলো। আমাদের আরেক বন্ধু ফরহাদ জানালো যে রফিকরা আবার খুলনায় ফিরে এসেছে। খালিশপুরের 'হাউজিং'য়ে থাকে। বাজারে ওর একটা ফার্মেসির দোকান আছে। ও নাকি মেট্রিকের পরে আর পড়াশুনা করেনি।

সিদ্ধান্ত নেই রফিকের সাথে দেখা করতে খুলনা যাবো। তারপর দুই বন্ধু মিলে সেই দিনগুলোর গল্প করবো।

রফিক হড়বড় করে জিজ্ঞেস করবে 'ইমন তোর মনে আছে সেই কথা", তোর মনে আছে সেই ঘটনা....আমি শুধু হ্যাঁ হুঁ করবো। ও জিজ্ঞেস করবে, কিরে কথা বলিস না ক্যান? আমি বলবো 'তোরে খুঁজে পেয়ে আমি বোবা হয়ে গেছিরে। চোখে বারবার পানি চলে আসতেছে।' অফিসে কাজ করতে করতে আমি চোখ মুছি।

আমার ১৫ বছরের সংসারে আমি আমার স্ত্রী রেখাকে যতটুকু চিন, শুধুমাত্র পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করতে খুলনা যাওয়াকে সে কিছুতেই মেনে নেবেনা। শুধু তাই নয়, আমাকে মনে করিয়ে দেবে আমি শ্বশুর বাড়ীর কোন কোন অনুষ্ঠানে অফিসের কাজের অজুহাত দিয়ে যাইনি। কাজেই আমি একটা অজুহাত বানালাম যে অফিসের কাজে খুলনা যেতে হচ্ছে কদিনের জন্যে। রেখা যে আমাকে শুধু যেতে দিতেই রাজী হলো তা নয়, ব্যাগও গুছিয়ে দিলো। আর আমি তখন ব্যস্ত ছিলাম মাথার অল্প কিছু চুল দিয়ে সারা মাথা ঢাকার গবেষণায়।

২

আমি যখন খালিশপুরে পৌঁছুলাম তখন দুপুর। অনেকদিন পর আমার কৈশোরের শহরে এলাম। পুরনো বাড়ীগুলো আরো পুরানো হয়েছে। রাস্তাগুলোকে আরো সরু মনে হচ্ছে।

হয়তো রাস্তার দুপাশে নতুন দোকানপাট বাসাবাড়ী উঠেছে তাই। রাস্তায় খানাখন্দ আগের মতই আছে।

হাউজিং বাজারে যেয়ে ফার্মেসীটা খুঁজে পেতে তেমন ঝামেলা হয়নি। দোকানে একজন বৃদ্ধ লোক বসে আছেন। আমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করেই চিনে ফেলি, ইনি রফিকের বাবা। শেষবার যখন দেখেছি তখন তার দাড়ী ছিলো না। এখন ছেড়ে দেয়া লম্বা সাদা দাড়ি। মাথায় সাদা টুপি। কপালে নামাজের সিজদার কালো দাগ। উনি আমাকে চিনতে পারলেন না কিন্তু চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক মনে পড়ছেনা এরকম একটা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি নিজের নাম বলতেই উনি দোকানের সামনের কাচের টেবিলের ওপার থেকেই আমার মাথা টেনে তার বুকে চেপে ধরলেন।

-তোরে কতদিন পরে দেখলাম বাপ। কত বড় হয়ে গেছিস তুই।

কলোনীতে ছেলেবেলা কাটানোর এই এক ব্যাপার। বন্ধুরা সব ভাই বোনের মত হয়। বন্ধুর মায়েরা নিজের মায়ের মত। বন্ধুর বাবারা নিজের বাবার মত। ঢাকা শহরে এটা কোনদিন পাইনি। অনেকদিন পর এই সামান্য একটা কথায় আমার কান্না পেয়ে গেলো। আমি তার বুকের সাথে কিছুক্ষন লেগে রইলাম। চোয়াল শক্ত করে কান্না আটকানোর জন্যে কালক্ষেপন।

-যা, বাসায় যা, রফিক বাসায় আছে।

একটা গলির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন-

-বাড়ীর নাম 'পাবনা মঞ্জিল।'

নির্দেশিত আঙুল বরাবর হাঁটতে লাগলাম। এক সময় পেয়ে গেলাম 'পাবনা মঞ্জিল'। রঙজ্বলা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটা জংধরা লোহার গেট। একটু পরেই রফিকের সাথে আমার দেখা হবে। ওর চেহারায় কি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেমন হয়েছে সেই পরিবর্তন? আমার চোখে এখনও সেই ৩০ বছর আগের চেহারাই ভাসছে। আর কিছুক্ষন পরেই আমার প্রিয় বন্ধুকে দেখবো ৩০ বছর পরে। ও জানে আমি আজ আসবো। ও নিশ্চয়ই আমার মতই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে।

আমি লোহার গেটের ছোট দরজায় হাত রাখলাম। শিহরনে আমার হাত কাঁপছে। কিন্তু একটু কি বেশি কাঁপছে। শরীরে কেমন ঝিমঝিম ভাব এলো। হঠাৎ করে চোখে অন্ধকার নেমে এলো। হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্যে।

যখন আলো ফিরে এলো, আমি গেটের ভেতরে। কেউ কি গেইট খুলে দিয়েছে নাকি আমি গেইট গলে ঢুকে পড়েছি মনে করতে পারছিনা। সামনে গ্রিল ঘেরা বারান্দায় যে ছেলেটি দাঁড়ানো সে ১২ -১৩ বছরের একটি কিশোর। বয়সের তুলনায় লম্বা, পাতলা শরীর। নাকের নীচে নতুন ওঠা পাতলা গোঁফ। রফিক দাঁড়িয়ে আছে? আমি ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ঘোর ভাঙ্গলো ওর হাসিতে।

-কিরে তুই এরকম বাবু সেজে এসেছিস কেন? কার জামা কাপড় পরেছিস? তোর বড় ভাইয়ের?

আমি নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম, আসলেই আমার জামা কাপড় ঢুলঢুল করছে। আমিও অবাক হলাম, আমার ছোট পাতলা শরীরে এই ঢোলাঢালা জামা কাপড় কোথা থেকে এলো। কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবার সময় পেলাম না। রফিক তাড়া দিলো।

-ভেতরে চলে আয়।

আমি আমার কপাল পর্যন্ত ঝুঁকে থাকা মাথা ভর্তি চুল হাতের আঙ্গুলে বিশেষ কায়দায় পেছনে ঠেলে বাসার ভেতরে ঢুকলাম। ওর পড়ার ঘরের খাটে পা ঝুলিয়ে বসলাম।

-রফিক বললো, ভালো দিনে এসেছিস। আজ বাসায় কেউ নাই। আব্বা দোকানে। মা বাড়ী গেছে। বাসা ফাঁকা।

বাসা ফাঁকা থাকলেই আমাদের মত অল্পবয়েসী ছেলেদের মনে দুষ্টু চিন্তা আসে। রফিক চোখ মেরে বললো-

-দেখবি?

-আমি কান লাল করে বললাম, নারে।

রফিক আমাকে একটা চ বর্গীয় গালি দিলো এবং আমার মতো ম্যান্দা মার্কা একটা ছেলের সাথে তার যে কিভাবে বন্ধুত্ব হলো, এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলো। আমি মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলাম

-দেশি না বিদেশি?

-সব আছে।

এরপর আমরা দুজনেই দরজা জানালা আটকে কম্পিউটারে ভিডিওগুলো দেখলাম। রফিক এও জানালো দেশি ভিডিওগুলোতে বিদেশি মডেলদের শরীরে দেশি মডেলদের মাথা বসানো। রফিক এত কিছু জানে! আমি এসব কিছুই জানি না।

দুপুরে খেলাম। খাওয়া শেষে বিছানায় আধশোয়া হয়ে রফিক বললো

-সিগারেট খাবি?

বলেই সে আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে বইখাতার ফাঁক ফোকড় থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করলো। আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার বৃত্ত বানিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো-

-আমার মনে হয় খুকুমনি আমাকেও ভালোবাসে।

আমি নড়েচড়ে বসি।

-কিভাবে বুঝলি? তুই চোখ মেরেছিলি বলে স্যারের কাছে নালিশ করে মার খাওয়ালো।

-হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে কয়েকদিন আগে টিফিন পিরিয়ডে চাপাকলের কাছে আমাদের দেখা হয়েছিলো। ও আমার দিকে তাকিয়ে মিচকি হাসছিলো।

আমি রফিকের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর বাউন্ডুলে চেহারায় একটা লাজুক ভাব এসেছে। আমার খুব ভালো লাগে।

-আজকে সন্ধ্যায় আয়। তোকে ওদের বাসার কাছে নিয়ে যাবো।

-ওর বাসা চিনিস?

-হ্যাঁ, স্কুল ছুটির পরে ওর রিক্সার পিছু নিয়ে চিনে এসেছি। যাবি?

-নারে, সন্ধ্যার পরে মা বেরোতে দেবেনা।

মা'র কথা মনে হতেই ঘড়ি দেখলাম। দুপুর ৩টা বেজে গেছে। রফিককে বললাম

-আজ যাইরে, অনেক বেলা হয়ে গেছে, মা চিন্তা করবে?

রফিক বিরক্ত হয়ে বললো-

-যা ভাগ, ফিডারে দুদু খা গে।

আমি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলাম। রফিক বারান্দা পর্যন্ত এলো। গেট পর্যন্ত এলোনা। আমি একাই গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। গেটে হাত রাখতেই আবার আমার শরীরে একটা ঝিমঝিম ভাব এলো। দুচোখে অন্ধকার নেমে এলো। হয়তো এক নিমেষ, একটা মুহূর্তের জন্যে। যখন চোখে আলো ফিরে এলো আমি তখন গেটের বাইরে। আমার পরনে ঢাকা থেকে আসা টি শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট। মাথায় হাত দিয়ে চুলের চেয়ে টাকের স্পর্শই বেশী পেলাম।

আমার সহসাই মনে পড়ে গেলো, ঢাকা ফেরার ফ্লাইট সন্ধ্যা সাতটায়। আমাকে এখনই এয়ারপোর্টের বাস ধরতে ছুটতে হবে। পেছনে ফিরে তাকানোর সময় বা সাহস কোনটাই হলোনা। রফিকের সাথে কাটানো অদ্ভুত সময়ের স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে ঢাকা ফিরে এলাম।

রফিকের সাথে এখন আমার মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। একরাতে ঘুমানোর সময় রেখা তরল গলায় বললো,

-একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, রফিক নামে তোমার বন্ধুটার সাথে যখন ফোনে কথা বলো, তখন তোমার কণ্ঠ অল্পবয়েসী ছেলেদের মত হয়ে যায়। অন্য বন্ধুদের সাথে যখন বলো, তখন হয়না।

আমি রেখার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসি।

বেকারসফিল্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

লিজি রহমান

আঁধারে মিশে গেছে

দিনটি শুভ না অশুভ ছিল কে জানে! ঊনিশশো চুরাশি সালের অক্টোবরের এক সুন্দর দিনে রেবেকা আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। বাড়ির কাছেই তেজগাঁও এয়ারপোর্ট। বাবা-মা, ভাইবোন, শাশুড়ি, আত্মীয়স্বজন -এক বিশাল বহর এসেছে এয়ারপোর্টে ওকে বিদায় দিতে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একসময় রেবেকা বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিশাল প্লেনে চেপে বসলো।

ওর মনে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একদিকে বাবা, মা, ভাইবোনের জন্য মনটা কাঁদছে। আর কোনদিন তাদের সাথে দেখা হবে কিনা, কে জানে! আবার অন্যদিকে দীর্ঘ বিরহের পর স্বামী মঈনের সাথে দেখা হতে যাচ্ছে। এক বছর পর ওর নিজের একটি সংসার হবে। দু'বছরের ছোট্ট মেয়েটা বাবার আদর পাবে, এসব ভেবে খুশিও লাগছিল।

প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পর প্লেন নিউইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্টে নামলো। দু'বছরের শান্ত মেয়েটা এই দীর্ঘ পথযাত্রায় ভালোই ছিলো। কাস্টমস, ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষ করে বাইরে এলো রেবেকা। মঈনের খোঁজে চারিদিকে ইতিউতি তাকাচ্ছে। এতো মানুষের ভিড়ে সেই পরিচিত মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। পায়ে পায়ে এক হাতে স্যুটকেসের ট্রলি আর অন্য হাতে মেয়েটাকে ধরে ভিড়ের সাথে এগুচ্ছে।

হঠাৎ কোথা থেকে যেন মঈন দৌড়ে এলো। রেবেকাকে একটু স্পর্শ করেই মেয়েকে কোলে তুলে নিল। ওর সাথে ওর দু'জন বন্ধুও এসেছে। একজনকে রেবেকা চেনে। মঈনের ছোটবেলার বন্ধু খান। আরেকজনকে চেনে না। তাদের একজন ওর হাত থেকে ট্রলিটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পার্কিং লটের দিকে এগুতে লাগলো। পেছন পেছন ওরা।

এতদিন পর মেয়েকে পেয়ে মঈনের খুশি আর ধরছে না। ওদের ভিসা পাবার খবর পেয়ে মঈন ফোনে কোনো উচ্ছ্বাস বা উত্তাপ না দেখানোতে রেবেকার মনটা একটু খারাপ ছিল। কিন্তু এখন মঈনের খুশি দেখে সে দুঃখ ভুলে গেল। গাড়ির ট্রাংকে মালপত্র তোলা হল। ওরা তিনজন পেছনের সীটে বসল, আর মঈনের দু'বন্ধু গাড়ির সামনের সিটে বসল। ওদের সামনে রেবেকা বেশি উচ্ছ্বসিত হতে পারছিল না। কেমন যেন লাজুকলতা নিয়ে বসে রইল।

এয়ারপোর্টের সীমানা ছাড়িয়ে গাড়ি হাইওয়েতে পড়ল। শুনলো, ওটার নাম নাকি গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে। দু'পাশ দিয়ে সাঁই সাঁই বেগে অসংখ্য গাড়ি চলছে। সবুজ গাছগাছালী পেরিয়ে ওদের গাড়িও এগিয়ে চলছে। সবাই টুকটাক কথা বলছে। রেবেকা দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে পথের ধারে বাড়িঘর, গাছপালা দেখছে।

একসময় গাড়ি এসে এক্সিট নিল ৩১নং স্ট্রীটে। রাস্তার নাম হয়ট এভিনিউ। হাইওয়ে থেকে এক্সিট নিতেই দেখা গেল বিশাল একটি ব্রীজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্রিজের পাশে সুন্দর একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল।

বাড়ির সামনেই চমৎকার একটি পার্ক। দেখেই রেবেকার মনটা খুশি হয়ে গেলো। যাক, প্রতিদিন বিকেলে মেয়েটাকে নিয়ে এই পার্কে এলে ও কি খুশিই না হবে। রাস্তার শেষ বাড়িটাই মঈনের। এরপর খানিকটা খোলা জায়গা, তারপরই দেখা যাচ্ছে কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে একটি নদী। এই নদীর নাম নাকি ইষ্ট রিভার, আর ব্রিজের নাম ট্রাইবরো ব্রিজ। নদীর ওপারে সারি সারি গগনচুম্বী অট্টালিকা। ঠিক যেমনটি ছায়াছবিতে দেখেছে ও। মঈন বলল, ওটাই নাকি ম্যানহাটান।

গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে গাড়ির মালিক বিদায় নিল। মঈন আর ওর বাল্যবন্ধু খান, মালপত্র নিয়ে ভেতরে এলো। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় এসে রেবেকার মনটা আরো খুশি হয়ে গেল। বিশাল বসার ঘর! যদিও ঘরে কয়েকটি বেজোড় সোফা আর একটি টেলিভিশন সেট ছাড়া আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। বিশাল লিভিং রুমটা বলতে গেলে একরকম খাঁ খাঁ করছে। তবুও খোলামেলা বাড়িঘর দেখে রেবেকার ভালোই লাগল। দেশে বিশাল বাড়িতে থেকে অভ্যেস, ছোট বাড়িতে থাকার কথা ভাবতেই পারেনা ও। কিন্তু অবাক হলো যখন দেখল এতো বড়ো বাড়িতে মাত্র একটি বাথরুম। দেশে তো এক বেডরুমের বাড়িতেও দুটো বাথরুম থাকে। প্রশ্ন করতেই মঈন জানালো, "এদেশে খুব কম বাড়িতেই দুটো বাথরুম থাকে।"

নতুন আরদ্ধ জ্ঞান নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাসাটা দেখতে লাগল রেবেকা। বসার ঘরের সাথেই রান্নাঘর। যেটা কিনা বাংলাদেশে ভাবাই যায়না। দেশে রান্নাঘর থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। বাড়ির পেছন দিকে। আর এখানে কিনা বসার ঘরের সাথে! তাও এতো খোলামেলা! কিভাবে এখানে রান্না করবে ভেবে পাচ্ছে না রেবেকা।

বাথরুমের পরেই ভেতরের দিকে ছোট-বড় আর মাঝারি আকারের তিনটি বেডরুম। হলওয়ের শেষ মাথায় মাঝারি আকারের বেডরুমটায় ওদের সুটকেসগুলো রাখা হয়েছে। বুঝতে পারছে ওটাই ওদের বেডরুম। বাকি রুমগুলোতে বিছানা পাতা। বড়টিতে তিনটি আর ছোটটিতে দুটি সিঙ্গল বেড। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মঈনের দিকে তাকাতেই ও জানালো এ বাড়িতে ও একা থাকেনা। ওর সাথে আরো পাঁচজন থাকে। ওর বড়ভাই, চাচাতো ভাই, বাল্যবন্ধু, বড়ভাই সমতূল্য একজন এবং ওদেরই পরিচিত আরেকজন।

শুনেতো রেবেকার চক্ষু চড়কগাছ। বলে কি? এতোগুলো মানুষ এক বাড়িতে? মঈন আরো বলল, "এদেশে সবাই এভাবে মেস করেই থাকে। বিশেষ করে যারা ম্যারেড ব্যাচেলর, অর্থাৎ বৌ-বাচ্চা দেশে রেখে এসেছে। কারণ এখানে বাড়ি ভাড়া অনেক।

সেইসাথে আছে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস আর ফোনের বিল। খাবারের খরচ। টাকা সেভ করতে চাইলে সবাই মিলে এসব খরচ শেয়ার করা ছাড়া উপায় নেই।"

এতোগুলো চেনা-অচেনা মানুষের সাথে এক বাড়িতে থাকতে হবে ভেবে রেবেকার মনটা কুঁকড়ে গেল। বিশেষ করে মঈন যখন কাজে থাকবে তখন কিভাবে ওর সময় কাটবে? ওর প্রাইভেসি বলতে তো কিছুই থাকবে না!

রেবেকাকে ঘাবড়ে যেতে দেখে মঈন আশ্বস্ত করে বলল, "চিন্তার কিছু নেই। ওরা সবাই ভোর বেলায় কাজে চলে যায়। ফেরে সন্ধ্যে বেলা। সারাদিন তোমরা বাড়িতে একাই থাকবে। আর আমি তো আছিই বেলা বারোটা পর্যন্ত। তোমার খারাপ লাগলে মাঝে মাঝে আমার সাথে রেষ্টুরেন্টে চলে যাবে। ওখান থেকে খেয়েদেয়ে গভীর রাতে আমরা একসাথে বাড়ি ফিরবো।"

ওর কথা শুনে মনটা কিছুটা আশ্বস্ত হলেও রেবেকা আর এ নিয়ে কথা বাড়াল না। এতোদিন পর দু'জনার দেখা, ঘরবাড়ি নিয়ে আলাপ করে পরিস্থিতিটা তিক্ত করতে মন চাইল না ওর। এদিকে দু'বছরের মেয়েটাও দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে শ্রান্ত। ওর কাপড়চোপড় বদলে ওকে ঘুমে দিতে হবে। রেবেকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এর মধ্যেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সন্ধ্যে হলে যেমন পাখীরা সব নীড়ে ফেরে, তেমনি একে একে বাড়ির বাসিন্দারা ঘরে ফিরতে শুরু করল। মঈনের বাল্যবন্ধু তো বাসায়ই ছিলেন। এয়ারপোর্টে যেতে হবে বলে উনি ছুটি নিয়েছিলেন। রেবেকার ভাশুর, চাচাতো দেবর এবং আরো দু'জন, যাদেরকে ও আগে কোনদিন দেখেনি, তাদের সাথেও ওর দেখা এবং পরিচয় হলো। কর্মক্লান্ত সবাই কোনরকমে ওকে ওয়েলকাম জানিয়ে গোসল এবং খাওয়া-দাওয়ার জোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেউবা টিভি ছেড়ে রেসলিং দেখতে শুরু করলেন। মেয়েটিও ততোক্ষণে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এতোক্ষণেও মঈনের সাথে একান্তে কথা বলার কোন সুযোগই হয়নি। রেবেকার শুধু মনে হতে লাগল, ওর এতো আপন মানুষটাকে এতো দিন পর এতো কাছে পেলেও যেন কতো দূরে রয়ে গেছে। এতোগুলো চেনা-অচেনা মানুষের মধ্যে ওকে যেন কাছে পেয়েও পাচ্ছে না রেবেকা। অন্তরঙ্গ হওয়া তো দূরের কথা, একান্তে বসে দুটো কথাও বলা যাচ্ছে না। এতো মানুষের মধ্যে কোন প্রাইভেসিই নেই। আস্তে করে মঈনকে ডেকে বলল, "চলো, আমরা একটু রাস্তা থেকে হেঁটে আসি।"

মঈন রাজী হলো। গায়ে একটি জ্যাকেট চাপিয়ে রেবেকাকে নিয়ে নীচে নেমে এলো। বাইরে তখন হালকা ঠাণ্ডা পড়েছে। রাস্তা পার হলেই পার্ক। দিনের আলো প্রায় নিভে এলেও লাইট পোস্টের আলোয় চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। মাথার ওপরে ট্রাইবরো ব্রিজ। তার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে দ্রুত ধাবমান গাড়িগুলোর চলে যাবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সামান্য দূরেই কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে ইষ্ট রিভার। আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন নেই।

পার্কে ঢুকে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বেঞ্চিতে বসল দুজন। পাশেই ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে রেবেকার ভালবাসার মানুষটি। তার বুকে মাথা রেখে রেবেকা যেন হঠাৎ

করেই আধুনিকা হয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে মঙ্গনের কণ্ঠবেষ্টন করে কথা বলছে। রেবেকার মনে হলো,

"সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবলই আঁখি দিয়ে
আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।"

একসময় মঙ্গনের মুখটা ওর মুখের ওপর নেমে এলো। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে রেবেকার মুখে। মঙ্গনের দুটো পুরু ভেজা ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ওকে গভীর চুম্বনে আবদ্ধ করল রেবেকা।

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

লুতফুন নাহার লতা

কালো দুর্গা

সমস্যাটা শুরু হল ঠাকুরমাকে নিয়ে। বাড়ির অন্যরা কাল রাতেই চলে গেছে। সুনীল সরকারের পরিবার এমনিতেই দেশের মায়া করে করে দেরি করে ফেলেছে অনেক। এখুনি না সরে গেলে আর রক্ষা হবে না। এ পাড়ার পঁচাত্তর ভাগই হিন্দু পরিবার। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের আগেই পাড়া শূন্য করে চলে গেছে প্রায় সবাই। কিছু মুসলমান পরিবার, নগেন মাস্টার আর তার ভাই খগেন ডাক্তার আর জোড়াকল বাজারে দু'এক ঘর ব্যবসায়ী ছাড়া তেমন আর কেউ নেই।

বড়মা, মেজো কাকা, মেজো কাকিমা, সুনু পিসি, ফুলতলা থেকে বেড়াতে আসা সুনু পিসির দেবর আশিস আর বাচ্চারা সব, বড় জেঠুর সাথে খুলনা থেকে যশোর হয়ে বেনাপোলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। রয়ে গেছে ঠাকুরমা আর এবাড়ির সবার কাছে অপয়া কালো, কুৎসিত টেমুদি। ওই টেমুদিই ঠাকুরমার দেখাশোনা করে। জন্মের সময় মা মারা গেলে অপয়া বলে জেঠু এ মেয়ের মুখ দেখতেও চাননি। কিছুদিন যেতেই আবার তিনি বিয়ে করেছেন। মায়ের মত কালো দেখতে হয়েছে বলে ওর কপালেও জন্মাবধি জুটেছে অনাদর। অবহেলা আর খোঁটা ছাড়া আর কী জুটেছে কালো মেয়ের?

পাকিস্তান আর্মি, ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় শুরু করেছে গণহত্যা। কিছুদিনের মধ্যেই তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন বলছে মিলিটারি এসে পড়েছে খুলনায়। খালিশপুরে বিহারীদের সাথে নিয়ে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে তারা। জামাতে ইসলামের মাওলানা ইউসুফের মদতপুষ্ট হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা খুলনা। খালিশপুর, দৌলতপুর বাঙালির রক্তে গঙ্গা বইয়ে দিয়েছে মিলিটারিরা। খুলনার বড় বাজার, শিতলাবাড়ি, শিব বাড়ি, কালীমন্দির সব রক্তে আগুনে মাখামাখি।

বড়বাজার এলাকায় ভয়াবহ অবস্থা। রাস্তায় রাস্তায় আর্মি মোতায়েন হয়েছে। বাড়ি থেকে, কলেজ থেকে, ছাত্রাবাস থেকে ট্রাক ভরে তুলে নিয়ে গেছে আটকে পড়া মেয়েদের। শহরে কোথাও কোন তরুণ ছেলে দেখলে আর রক্ষা নেই। চারদিক থম থম করছে।

ওরা আজ বা কাল রওনা দেবে এই মত কথা হয়ে আছে। ঠাকুরমার বয়স প্রায় নব্বই হবে। এখনো পাটকাঠির মত লম্বা, ফর্সা, একহারা গড়নের মানুষ। টনটনে মেজাজ তার। কিছুদিন আগে পুকুরঘাটে নাইতে গিয়ে বাম পা'টা ভেঙেছেন। গাঁদা ফুলের পাতা আর জার্মানিলতার মিশ্রণ বানিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে বেঁধে, পুরোনো ঘিয়ের মালিশ দিয়ে দিয়ে

পা ইদানিং একটু আধটু নাড়তে পারছেন যদিও কিন্তু তাই বলে এই দুঃসময়ে অতটা পথ যশোর রোড বরাবর গ্রামের ভেতর দিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে খুলনা থেকে বনগাঁয় যেতে ঠাকুরমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। ওমর আলী কাঠের তক্তা কেটে বড় সড় বসার পিঁড়ির মত তৈরি করেছে। সেটা মাঝখানে বসিয়ে চারদিকে দড়ি দিয়ে দাঁড়িপাল্লার মত করে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ঠাকুরমাকে।

দরিদ্র বাবার মৃত্যুর পরে স্কুলে পড়া বাদ দিয়ে ওমর আলি এ বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে। বহু বছর ধরে সে আছে এখানে। মুসলমানের ছেলে হয়েও ঠাকুর মা'র আদরে মায়ায় তার মনে হয় না সে ভিন্ন কোথাও আছে। আজান শুনে ঠাকুরমা ওকে নামাজে পাঠায়। রোজার মাসে ওর জন্যে ছোলা ভিজিয়ে রাখে। ইফতার বানায়। এছাড়াও অন্য একটা কারনে সে ঠাকুরমার বিশেষ প্রিয়ভাজন। হরিপদ ঠাকুরমার দূরসম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে। পাঁচ বছর বয়সে কলেরায় বাবা মা মারা যাবার পর থেকে সে এ বাড়িতে আশ্রিত। এ দুজনের উপর ভরসা আছে বলেই জেঠু ওদের উপরে তার মা আর মেয়ের ভার দিয়ে গেছে। তা না হলে জেঠু মাকে কোলে করেই নিয়ে যাবে বলেছিল।

পরদিন সন্ধ্যারাতেই টেমুদি, ওমর আলী আর হরিপদ, ঠাকুরমাকে সেই পিঁড়িতে বসিয়ে নিয়ে রওনার আয়াজন করেছে। ঘরবাড়ি আগেভাগে জেঠুই তালা টালা মেরে বন্ধ করে গেছে। ওমর আলী ঠাকুরমার ঘরখানা তালা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, র্যাকের পাশে বেগুনি সন্ধ্যামালতির গাছটাতে হাতের ঘটির জলটা ঢেলে দিয়ে তুলসী গাছের গোড়ায় প্রণাম সারছেন ঠাকুরমা। উঠে বসবেন পিঁড়িতে এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে যবেদ আলী। ওমর আলির চাচাত ভাই। একবার ওমরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ঠাকুরমাকে বলছে, "ও ঠাউরমা ক্যানে যাও! তা তুমি যাইচ্ছ যাও ওমর আলীরে নিয়ে না। ও গেলি ওর মারে দেকপেনে কিডা! তার তরে আর কেউ নাই।"

ওমর আলী চাচাত ভাইকে কিছু একটা বলে থামিয়ে দেয়। হয়তো সে ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে সেই কথা বলে। হয়তো বলে- দাদা, মা'রে কিছু কইয়ে না। আমি ওনাগো পৌঁছায়ে দিয়েই ফিরে আসতিছি। চাচাত ভাই তব্দা মেয়ে চেয়ে থাকে ওদের যাত্রাপথের দিকে।

ওরা, জোড়াকল বাজার, করের পুকুর, ধর্মসভা, শিতলা বাড়ি হয়ে বড়বাজারের আনাচ কানাচ দিয়ে নদীর ঘাটে এসে অনেক কষ্টে একটা নৌকা জোগাড় করেছে। নৌকার মাঝি মাঝবয়সী, তার মুখ ভরা কালো দাড়ি। পরনের নীল ডোরাকাটা লুঙ্গিটা নতুন। কেমন জানি গা ছম ছম করে। তবু যদি নদীপথে যশোরের দিকে কিছুটা পথ আগানো যায় সেই ভরসায় নৌকায় উঠে বসেন ঠাকুমা। কোমরে গোঁজা টাকার ছোট্ট থলিটা সায়ার ফিতের সাথে কষে বেঁধেছেন তিনি। বাঁধনের ভাঁজ চুলকে উঠছে থেকে থেকে। তবু তিনি চেয়ে আছেন নদীর জলের দিকে। ওমর আলীকে তিনি চোখের ইশারায় পিতলের ঘটিটা ভরে দিতে বলেন নদীর জলে। সব ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তিনি। এই দেশ। এই নদী। এই আকাশ। এই দেশের মাটি আর তার কপালে হবে না।

ওমর আলীর ভাবতে কষ্ট হয় কেমন করে কী হয়ে গেল। অথচ সেদিনও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই এক সাথে ভাই ভাই হয়ে ছিল। পাড়ায় ঈদ, পূজো, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা সব পালন হত সবাইকে নিয়ে। ওমর আলির মা দরিদ্র হলেও বাড়িতে ফেরিওয়ালা ডেকে গজ কাপড় কিনে যেমন ঈদের নতুন জামা বানিয়ে দিত তেমনি পূজোর জামাও। বাড়ির সামনে সুনীল সরকারের বাড়ি। ওনাদের সকল জ্ঞাতি কুটুমের ঘরবাড়ি ঘিরে ছিল এই পাড়া। সে কারণেই এই পাড়ার নাম সরকার পাড়া। সুনীল জেঠুর বাড়ির সামনে কচি টিয়ে সবুজ ঘাসে ভরা বড় মাঠ। মাঠ পেরুলে তাদের পুরোনো দিনের পলেস্তারা খসা লাল খয়েরি ইটের দালানবাড়ি। সেই বাড়ির বারান্দা ছিল অসম্ভব রকমের উঁচু। মাঠে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে তাকালে মনে হত মঞ্চের দিকে চেয়ে আছে সে।

জেঠুর একজন ভাই ছিল, কালী পূজোর দিনে তিনি অনেক কান্নাকাটি করতেন, সম্ভবত একটু আধটু নেশা টেশা করতেন বলে। একবার কলকাতায় গিয়ে আর ফিরে আসেনি সেই ভাই। সবাই বলে নেশা তো করে হয়তো সেই আজব শহরের কোথাও মরে পড়ে আছে। সেই থেকে ঠাকুরমা কলকাতার নামও শুনতে পারে না। তার ধারনা সে শহর ভয়ানক শহর। বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষ পেলে সে শহর আস্ত গিলে খায়।

ঠাকুরমাকে এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই ডাকে ঠাম্মা। ছোটবেলায় ওমর আলীও অন্যদের দেখাদেখি ঐ ডাকই ডাকত। ঠাম্মা কাছে ডেকে নারকেল গুড়ের নাড়ু খেতে দিলে একবারের জায়গায় দুইবার ঠাম্মা ঠাম্মা করত। সন্ধ্যার পরে পাড়ার সব ছেলেমেয়ে দল বেঁধে চাটাইয়ে বসে রাত জেগে কীর্তন শুনত। কীর্তনের সঙ্গে বাজত ঢাক, ঢোল, কাসর, মন্দিরা, আর মাঝে মাঝে শাঁখ, উলুধ্বনি। ভাবতে ভাবতে নৌকার ঢুলুনিতে চোখ লেগে এলো ওমর আলীর। হরিপদ ঘুম, ঠাকুরমাও।

কেবল ঘুম নেই টেমুদির চোখে। কত যে বেদনার ভার তার ওইটুকু বুকে সে কথা সে বলতে পারে না কাউকে। বাবার উপরে তার অভিমান জমে আছে কত সেকথা সে-ই শুধু জানে। কালো বলে, কুৎসিত বলে তার নামটাও রাখেনি কেউ। ঠাকুরমা না থাকলে হয়তো সে বেঁচেও থাকত না এতদিন। অনাদর আর অবহেলা নিয়ে বেড়ে ওঠা মেয়ে সে, সাহস হয়নি মুখ ফুটে কাউকে বলে তার গোপন ভালোবাসার কথা। তবু কেন মনে হয় তার সকল না বলা বাণী বাঙময় হয়ে ওঠে ওমর আলীর কাছে। কী পরম মমতায় সে ডাকে টেমুদি। হয়তো ওরা একই বয়সী তবু ঠাকুরমা'র কড়া নির্দেশ ওমর আলী যেন তাকে দিদি বলে ডাকে। সে যা খুশি ডাকুক তবু একমাত্র ওমর আলীই পারে তার জন্যে সব ছাড়তে। এইযে ভালোবাসাটুকু বুকের তলায় হীরের কুচির মত লুকানো আছে সেই ওর আনন্দ। মন চায় ওকে নিয়ে পালিয়ে যায় কোথাও, কিন্তু ধর্মের কথা ভেবে সে সাহস তার আর হয় না। কিন্তু আজ, আজ যদি তা হয়, যদি ওমর আলীর হাত ধরে সে এইখানে এই নদীর জলে ডুবে মরতে পারত! কি হবে বনগাঁয় গিয়ে ঠাকুরমার কোন দূর সম্পর্কের বোনের বাড়িতে তাও সে বোন স্বর্গত হয়েছে বিশ বছর আগেই। তার

ছেলেমেয়েদের কাছে এতগুলো মানুষ গিয়ে উঠবে কিভাবে! কী অনিশ্চিত আর অজানা এই যাত্রা!

রাত আরো গভীর হয়ে এসেছে। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘোর অন্ধকার। বিদ্যুতের চমক, মেঘের গর্জন। শুরু হল মুষলধারায় বৃষ্টি। বাতাসের তোড়ে আর একটু হলেই ওদের নৌকা ডুবে যাচ্ছিল। মাঝি খুব চেষ্টা করেও হাল ধরে রাখতে পারছে না। ওমর আলী দোয়াদরুদ যা জানে তার সব পড়তে শুরু করেছে। ঠাকুরমা ভগবান, আল্লাহ সবাইকে ডাকছেন। হরিপদ চোখ বন্ধ করে ঠাকুরের নাম জপছে। কেবল স্তব্ধ আঁখি মেলে পাথরের মত বসে আছে টেমুদি। ওকে মনে হচ্ছে জলের ভেতর থেকে উঠে আসা দুর্গা। ওরা নদীপথে জোড়াগেট, খালিশপুরের পাশ দিয়ে দিয়ে ফুলতলা এলাকা পার হয়ে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যখন এসেছে তখন ভোর হয় হয়। ততক্ষণে থেমেছে ঝড়ের তাণ্ডব। শান্ত হয়েছে নদী। ভোরের নরম আকাশ তার দূর দিগন্ত রেখায় পরিয়ে দিয়েছে একটি প্রগাঢ় সোনার বলয়। এ এক অলৌকিক সুন্দর সকাল। দূরে নদীর কিনারে বুড়ো বটের গাছ। জোয়ারের জল থৈ থৈ করছে নৌকার গায়ে। সেখানে আরো নৌকা থামানো, আরো লোকজন। মাঝি ওদের আগেই বলেছিল 'ঘাটে ঘাটে চেক বসাইছে, ডাক দিলি যাতি হবে, না গেলি গুলি করবেনে।' মাঝির কথা ফুরোবার আগেই নৌকা থামিয়ে দিল নদীর কিনারে পাহারারত আর্মি। আরো অনেক নৌকা থেকে লোক নামিয়ে লাইন করিয়েছে। ওদেরকেও নামিয়ে নিল নৌকা থেকে। 'হ্যান্ডস আপ' করতে বলে ও হিন্দু না মুসলমান জানতে চাইল। ওমর আলী হাত উঁচু করেই আছে। মুখে মুসলমান বলাতেও বিশ্বাস করল না ওরা, কাপড় খুলে দেখাতে বলল। দেখে কী জানি মনে করে ওকে ছেড়ে দিয়ে হরিপদকে চেক করে নিয়ে গেল ওদিকে। বলির পাঠার মত ঠক ঠক করে কাঁপছে হরিপদ। ওর পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে ওমর আলীর দিকে একবার সে চাইল। কিছুক্ষন পরে বিকট শব্দ হল। লম্বা সেই লাইনের সব মানুষগুলো পড়ে গেল। ওখানে হরিপদ ছিল। আর্মির জিপ থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো যখন, টেমুদিকে মনে হলো কালো দুর্গা। তখন সূর্য উপরে উঠেছে।

ওমর আলি স্তব্ধ পাথর। বুড়ো বটগাছটার গোড়ায় বসে ঠাকুরমা কেঁপে কেঁপে ডাকছেন ও হরি, ও হরি, জল খাব। দেশ স্বাধীন হল। ওরা কেউ ফিরল না। না ঠাকুরমা, না হরিপদ, না ওমর আলী। খুলনা সদর হাসপাতাল থেকে টেমুদি ফিরে এসেছিল আরো কিছুদিন পরে। সুনীল সরকার টেমুর বাবা। কত মানী লোক! টেমুকে কেমন করে ঘরে তুলবেন তিনি! দেশ নতুন হলে কী হবে সমাজ তো সেই পুরোনো। সমাজের কাছে কী বলবেন তিনি! টেমুদি প্রতিবেশীদের সাথে এবাড়ি ওবাড়ি করে কাটায় কিছুদিন। মুক্তিযুদ্ধে সে মরেনি কিন্তু ফিরে আসবার পরে সংসারে সে যে অন্যবশ্যক এই ভাবনা তাকে কাতর করে তোলে। একদিন মাঝরাতে চাঁদের আলোয় ওদের বাড়ির সামনের মাঠের ভেতর দিয়ে সাদা কাপড় পরা কাকে যেন হেঁটে যেতে দেখে সে। চেনা, খুব চেনা তার এই মানুষ! টেমুদি চিৎকার করে ডাকে- ওমর আলীইইই। কাকে যেন সে খুঁজে

খুঁজে মরে তবু তার সন্ধান সে কিছুতেই বের করে আনতে পারে না। পাড়ার লোকেরা বলে, 'পাকিস্তানি মিলিটারি গো অত্যাচারে মাইয়্যেডার মাথা খারাপ হইয়া গেছে।'

সবসময় ভয়নক বিষাদে ভরে থাকে টেমুদির মন। হঠৎ কী হল টেমুদির, একদিন বোতল ভরে জমিয়ে রাখা এসিড ঢেলে দিল গলায়। পান করল আকণ্ঠ। পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল ওর কণ্ঠনালী। তবু সাথে মাথেই কিন্তু মৃত্যু হল না তার। আরো কতদিন, কত অর্ধদগ্ধ রাত্রির ছেঁড়া তন্ত্রী নিয়ে আর্তনাদ করে করে বেঁচে রইল সে।

শ্রাবণের বর্ষা থেমে গেছে বেশ আগে। শান্ত পরিস্কার আকাশে নিশুতি রাতের চাঁদ ঢেলে দিচ্ছে বিচ্ছেদের ধবল জ্যোস্না। ধীরে ধীরে সে নেমে এসেছে সরকার বাড়ির ঘরের চালে। পুরনো দালানের ভাঙ্গা ইটের খোড়ল থেকে একটি ঢোড়া সাপ নিঃশব্দে নেমে যায় দালান সংলগ্ন পুকুরের জলে।

সেই রাতে রূপসা নদীর ধারে কালীঘাটের শ্মশানে ওকে চির বিদায় দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এলেন ওর বাবা, কাকারা। সকালের আলো তখনো ফোটেনি। ও বাড়ি থেকে, ওর সকল স্মৃতি পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওর সাথে। পাড়ার লোকেরা কেউ কেউ বলে চাঁদনি রাতে কারা যেনো সাদা কাপড় পরে হেঁটে যায় মাঠের ভেতর দিয়ে। তাদেরকে টেমু আর ওমর আলী বলেই ভ্রম হয়। ওরা কোথায় যায় কেউ তা জানে না। যেতে যেতে কচি ঘাসের ডগায় শিশিরে শিশিরে পায়ের চিহ্ন রেখে যায় ওরা।

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

শাহাদুজ্জামান

মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার

মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার, আমি এর ঘোর বিরোধী।

এই যে মানুষটা নানা নল, টিউব ইত্যাদির লতাগুল্মর ভেতর জড়িয়ে অচেতন হয়ে আইসিইউর বিছানায় শুয়ে আছে, সে আমার বাবা। আমার বাবা সেই মানুষ যার একই দিনে দুই বার পকেট মার হয়েছিল। আমি নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে ঢাকা আমার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

গত সপ্তাহে বাবার যখন জ্ঞান ছিলো বাবা আমাকে বলছিলো- 'পলাশ দ্যাখ বুড়া হতে হতে আমার হাতের চামড়াগুলি কেমন বেগুন পোড়ার মত হয়ে গেল।' আমি বাবার বেগুন পোড়ার মত হাতের চামড়ায় হাত বুলিয়ে ছিলাম।

আমি বাবার কানের কাছে গিয়ে বলি- বাবা, আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ?

বাবার নাকে মুখে জটিল সব যন্ত্র, বাবার চোখ বোজা। এর ভেতরই বাবা মৃদুভাবে মাথা নাড়ায়। হ্যাঁ আমার কণ্ঠস্বর বাবা শুনতে পাচ্ছে।

আমি ফিরে আসি ডাক্তারের চেম্বারে। তার মানে বাবার সেন্স আছে? আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি।

ডাক্তার- হ্যাঁ, উনার ব্রেইন সচল আছে। উনার অন্যান্য সব অঙ্গকে আমরা মেশিন দিয়ে চালু করে রেখেছি। উনি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন।

গত কয়েক মাস ধরে দেখতাম বাবা আমার পাঁচ বছরের ছেলে শায়ানের সঙ্গে এক সাথে বসে শুধু নানারকম কার্টুন ছবি দেখে। কার্টুন দেখতে দেখতে বাবা আর শায়ান দুজনে মিলে বিপুল হাসিতে গড়াগড়ি যায়।

র‍্যালি ব্রাদার্সের কুঠিগুলিতে হাইড্রলিক মেশিনে পাটের পাকা গাঁইট বাঁধা হয়ে কি করে সরিষাবাড়ি থেকে বৃটেনের ডান্ডি শহরে চলে যেত, সে গল্প বাবা আমাকে করেছে। বাংলার সোনালি আঁশ তখন ভ্রমণ করছে পৃথিবীর দূর দূরান্তে। বাবার বর্ণনায় আমি দেখতে পেতাম, সরিষাবাড়ির প্রত্যেক বাড়িতে রাখা পাট শুকানোর বাঁশের আড়া, আর দাঁড় করানো ঝুঁটি বাঁধা পাটশোলার সারি। বাবা চরের মানুষ, সমতলের মানুষ তাদের ডাকে 'চইরা'। বাবার তাতেই গর্ব কারণ অবাধ পানির প্রাচুর্যে চর অঞ্চলের পাট সবচেয়ে সরেস। বাবা বর্ণনা করতো, মোরগ ডাকা ভোরে বাড়ির কামলারা কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত খেয়ে পানিতে নামতো পাট ধুতে আর পানি থেকে উঠত মাগরেবের আজানের পর। বাবা অভিনয় করে কামলাদের পাট ধোয়ার নিপুণ ভঙ্গি আর

কসরৎ দেখাতো আমাকে। এক পাট গাছের কত বিবিধ ব্যবহার তার বর্ণনা করতো বাবা। পাটের কচি পাতা খাওয়া হতো নাইল্যা শাক হিসাবে। শুকনা পাট পাতা হতো রোগীর ঔষধ, গোড়ার পাট শোলা হতো জ্বালানি, আগার পাট শোলা ঘরের বেড়া আর সোনালি আঁশ পাট সরিষাবাড়ি থেকে চলে যেত দূর স্কটল্যান্ডের শহরে। এমনভাবে পাটের বর্ণনা দিত বাবা যেন কোন স্বর্ণকেশী রূপকথার রাজকন্যার বর্ণনা দিচ্ছে। সরিষাবাড়ির পাটের রূপ বাবাকে ঘোরগ্রস্ত করে রেখেছিলো আজীবন।

ঐ সরিষাবাড়ির কাছেই জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় একবার এবং নামার সময় আরেকবার বাবার পকেটমার হয়েছিলো।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি- বাবার অবস্থা কি রিভার্সেবল?

ডাক্তার- উনার ক্যান্সার এখন ফোর্থ স্টেজে আর উনার যে বয়স তাতে উনার এই অবস্থা থেকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুব কম।

পাটের মৌসুমে হাটের আগের দিন অনেক রাত জেগে পাট গোছগাছ চলতো ছোট বড় সব গৃহস্থ আর কৃষকদের বাড়িতে। পরদিন সকালে হিড়িক পড়তো খাল, নদী থেকে ডোবা নৌকা তোলার। যাদের নৌকা নাই তারা নৌকাওয়ালাদের নৌকা তুলে লগি, বৈঠা, দড়ি-কাছি, বাদাম নৌকায় তুলে বাইতে সাহায্য করতো। সকালে কড়কড়া ভাত চুলার পাশে রেখে তাতানো শুকনা মরিচ মেখে টকটকা লাল করা হতো, সেই রক্তিম, তীব্র ঝাল ভাত খেয়ে গ্রামের কয়েক শরিকের নৌকা এক সঙ্গে রওনা হতো হাটের উদ্দেশে। নৌকা চলে যেত খাল, বিল পার হয়ে। পড়তো যমুনা নদীতে। নদীতে পড়ার মুহূর্তে নৌকার সবাই একসঙ্গে বলে উঠতো, 'আল্লা আল্লা রসুল বলো, আল্লা আল্লা রসুল।' নদীতে পাল তোলা নৌকার বহরে একটা অলিখিত প্রতিযোগিতা চলতো। গৃহস্থরা তাদের ব্যাপারী নৌকায় পাট বোঝাই করে সরাসরি পাঠিয়ে দিত কুঠিতে। মাপামাপি চলতো সেই পাটের, মাপতো কয়ালেরা। তারা মাপতে মাপতে মন্ত্রের মতো বলতো, লাবে লাব, লাবে দুই, লাবে তিন, লাবে চার. . . .। একেক পাটের একেক দাম, তোষা, বটম, ক্রস বটম। পাট বিক্রি শেষে শুরু হতো হাটবাজার। চলতো বিস্তর সদাই পাতি। নিত্য দরকারি জিনিসের সাথে বাচ্চাদের বাঁশের খেলনা, ছেলেদের গেঞ্জি, লুঙ্গি আর মেয়েদের শাড়ি, ডাপটা, চুড়ি, আলতা। আর সবার সদাইয়ের ঝাঁকায় একটা অনিবার্য আইটেম, লোনা ইলিশ, লবণ মাখানো শুকনা ইলিশ। সবার বাজার শেষে একসঙ্গে ঘাট ছাড়তো নৌকা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। ঘরে অপেক্ষমান মেয়েরা, বাচ্চারা। হাট থেকে ফিরতে যত রাতই হোক সাদা হয়ে যাওয়া পোক্তো চালকুমড়া বেশ ঝাল দিয়ে লোনা ইলিশ সহযোগে রান্না করা হতো। তারপর হারিকেনের আলোয় সবাই মিলে কলরব করতে করতে নিশুতি রাতে ঝাল ঝোলে রান্না নোনা ইলিশের তরকারি দিয়ে ভাত খেত। বাবা এসব এমনভাবে বর্ণণা করতো যেন কোন থিয়েটারের বর্ননা দিচ্ছে।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি- বাবার কি কষ্ট হচ্ছে?

সাদা অ্যাপ্রন পরা নির্বিকার ডাক্তার বলেন- হ্যাঁ হচ্ছে।

আমি- এই যে ভেন্টিলেটর, টিউব এগুলোতে কষ্ট হচ্ছে?

গম্ভীর ডাক্তার- হ্যাঁ হচ্ছে।

আমি- তাহলে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ?

ডাক্তার- এসব যন্ত্রপাতি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এসব মেশিন উইথড্র করলে উনি মারা যেতে পারেন।

আমি বলি- আমি আমার নাম বললে বাবা মাথা নাড়ে। আমি কি এভাবে যতবার আমার নাম বলবো বাবা ততবার মাথা নাড়বেন?

ডাক্তার তার স্টেথো গলা থেকে নামিয়ে বলেন - হ্যাঁ তা নাড়বেন।

ছোটবেলায় একবার গ্রামের বাড়ি গেলে সেই যমুনা নদীতে বাবা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো আমাকে সাঁতার শেখার জন্য। আমি পানিতে পড়ে হাঁসফাঁস করছিলাম, আমার তীব্র শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আর বাবা তীরে দাঁড়িয়ে হাসছিলো। বাবাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়েছিলো আমার। আমি যখন প্রায় ডুবতে বসেছিলাম তখন বাবা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে কোলে তুলে এনেছিলো। বাবার কি এখন ঠিক তেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যেমন আমার হয়েছিলো যমুনার পানিতে? আমি কি ঝাঁপ দিয়ে এখন বাবাকে তুলে আনতে পারি তীরে?

গত সপ্তাহে যখন কথা হচ্ছিল বাবা আমাকে আরো বলেছিলো- তোর মা আগে মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। না হলে তার হাতের চামড়া আমার মত এমন বেগুন পোড়ার মত হতো।

বাবা আমাকে গ্রীক দেবী ইয়োসের গল্প বলেছিলো। ইয়োস ভোরের দেবী যার আঙ্গুলগুলো গোলাপি। ইয়োস প্রেমে পড়েছিলো মানুষ টিথোনাসের। কিন্তু ইয়োস তো দেবী যিনি অমর অথচ মানুষ টিথোনাসের মৃত্যু ঘটবে একদিন। তার প্রেমিক একদিন মারা যাবে এ সত্য কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না ইয়োস। ভোরের দেবি ইয়োস দেবতা জিউসের কাছে প্রার্থনা করলেন টিথোনাসও যেন অমরত্ব লাভ করে। জিউস ইয়োসের ইচ্ছা পূরণ করলেন। টিথোনাসকে অমরত্বের বর দিলেন তিনি। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, প্রেমে দিন কাটে ইয়োস আর টিথোনাসের, বছরের পর বছর কাটে। তারপর হঠাৎ একসময় ইয়োস লক্ষ্য করে টিথোনাসের বয়স বাড়ছে। টিথোনাস ক্রমশ প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হচ্ছে কিন্তু ইয়োস তো অনন্ত যৌবনবতী। ইয়োসের বোধোদয় হয়। সে টের পায় ভুল হয়ে গেছে। জিউসের কাছে টিথোনাসের অমরত্বের বর চাইলেও, চিরযৌবনের বর তো সে চায়নি। জিউসের কাছে আর চাইবার তো উপায় নেই। ফলে চিরযৌবনা ইয়োসের চোখের সামনে টিথোনাস একটু একটু ? বার্ধক্যে নুয়ে পড়তে থাকে। টিথেনোস মরে না কিন্তু থুত্থুরে বুড়ো হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তার আর কথা বলবার শক্তি থাকে না। চলবার কোন শক্তি থাকে না। একটা বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকে টিথোনাস আর শুধু নিজের মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু মৃত্যু তার হয় না। ইয়োস মনে গভীর দুঃখ নিয়ে অমর টিথোনাসের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলে। অমরত্বকে তখন তার মনে হয় অভিশাপ।

বাবা বলে, তোর মাও আমার প্রেমে পড়েছিলো। ইয়োসের মতই তোর মা'র আঙ্গুলগুলো ছিলো গোলাপি। সে আগে মরে ভালোই হয়েছে। সে ইয়োসই থেকে গেল, আমার এই টিথোনাসের রূপ তাকে দেখতে হলো না।

আমি ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করি- বাবা কি আর ফিরবে?

ডাক্তার নির্বিকার বলেন- সে সম্ভাবনা কম।

আমি- তাহলে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ?

ডাক্তার- তার লাইফটা আরেকটু প্রোলং হলো।

আমি- তাতে কি উনি ফিরবেন?

ডাক্তার- সেটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে তিনি বেঁচে থাকবেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি- আমি কানের কাছে গিয়ে যখন বলবো আমি পলাশ উনি তখন মাথা নাড়বেন?

ডাক্তার আবার বলেন- হ্যাঁ তা নাড়বেন।

আমি- কিন্তু আর কখনো উঠে দাঁড়াবেন না?

ডাক্তার সামনের কাগজে সই করতে করতে বলেন- সম্ভাবনা খুব কম।

আমি- তাহলে এই যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ হবে?

ডাক্তার বিরক্ত না হয়ে পুনরাবৃত্তি করেন- তিনি আরো কিছুদিন বাঁচলেন।

আমি- ঐ বিছানায়, ঐ যন্ত্রপাতি নিয়ে?

ডাক্তার- হ্যাঁ।

আমি- এসব যন্ত্রপাতি নাকে মুখে দেয়া থাকলে তিনি কষ্ট পাবেন?

ডাক্তার- হ্যাঁ, তা পাবেন?

আমি ঘোরানো সিঁড়ির মত প্রশ্ন করে চলি- তবু তিনি বেঁচে থাকবেন?

ডাক্তার- হ্যাঁ তা থাকবেন।

আমি- তাতে কী লাভ?

ডাক্তার কোন উত্তেজনা না দেখিয়ে বলেন- লাভ মানে মেডিকেল সাইন্স আপনাকে একটা অপশন দিচ্ছে তার লাইফ প্রলং করার। আপনি চাইলে সেই অপশন নিতে পারেন, নাও নিতে পারেন। না নিতে চাইলে আমরা লাইফ সাপোর্ট খুলে নেব।

আমি- তখন উনি মারা যাবেন?

ডাক্তার- হ্যাঁ, সে সম্ভাবনাই বেশি। আবার সারভাইভ করেও যেতে পারেন।

বাবা আমাকে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী গান শুনিয়েছিলো:

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই
যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই

পেটে ক্ষুধার জ্বালায়
খাব ক্ষীরের মালাই

বাবা আমাকে বলেছিলো-
উত্তর দুয়ারী বাড়ি,
দীঘল ঘোমটা নারী,
পানার তলের শীতল জল,
তিনই মন্দকারী।

বাবা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষার কথা তার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মনে রেখেছিল। বাবা আমাকে শোনাতো " 'কর কর খর খর গর গর ঘর ঘর, ধর বচন কর রচন।' 'কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পায়।' 'উঃ! মেঘের ডাকে কান ফাটিয়া যায়।' "

আমি ডাক্তারকে বলি- মেডিকেল সাইন্স শুধু অপশন দিচ্ছে লাইফকে প্রলং করা মানে অন্যভাবে বললে ডেথকে ডিলে করার, লাইফে ফিরিয়ে আনার না?

ডাক্তার- কেউ কেউ ফেরে কিন্তু আপনার বাবার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম।

আমি- উনি কতদিন এভাবে থাকতে পারেন?

ডাক্তার- সেটা বলা যাবে না। আজকেও অবস্থা ডেটেরিওরেট করতে পারে আবার একমাসও সারভাইভ করতে পারেন।

বাবার এটা তৃতীয় দিন।

বাবা বলেছিলো সরিষাবাড়ি বাজারের হরিপ্রসাদ আগরওয়ালার পাটের গুদাম পরিষ্কার করে টকি বায়োস্কোপ চালানো হয়েছিলো। সেখানে বাবা হান্টারওয়ালী ছবিটা দেখেছিলো। নায়িকার নাম নাদিরা বেগম। আশপাশের গ্রাম ভেঙ্গে লোক এসেছিল টকি দেখতে। গুদামের দরজা খোলা, ভিতরে বাইরে লোক ঠাসাঠাসি, বিজলি বাতি দেখে সবাই তাজ্জব। ডায়নামোর ভট্ ভট্ শব্দের সাথে সাথে বিজলি বাতি জ্বলে ওঠে। আবার পর্দায় ছবি ভেসে ওঠার সাথে সাথে সব বাতি নিভে যায়। এক মহাকাণ্ড। বাবা দেখলো একটা মেয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চাবুক ঘোরাচ্ছে। ঘোড়া করে কিছুদূর যেতেই দুম করে ফিতা ছিঁড়ে গেল। ডায়নামা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিক অন্ধকার, কিন্তু হলে পিনপতন স্তব্ধতা। কখন আবার বাতি জ্বলে উঠবে, পর্দায় ছবি ভাসবে সে জন্য সবার অধীর অপেক্ষা। প্রজেক্টর ম্যান ব্রজবাবু হাঁকডাক দিয়ে ছেঁড়া ফিল্ম জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সবাই ব্রজবাবুর প্রতিটা নড়াচড়া বিস্ময়ের সাথে দেখছে। ব্রজবাবু যেন দেবদূত।

আমি ডাক্তারকে বললাম- প্রতিদিন আইসিইউ'র খরচ চল্লিশ হাজার টাকা!

ডাক্তার- হ্যাঁ।

আমি- প্রতিদিন এই পরিমাণ টাকা দেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার- সেটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনারা বললে আমরা লাইফ সাপোর্ট খুলে নিব।

আমি- কিন্তু মেডিকেল সাইন্স তো বাবার লাইফকে প্রলং করার একটা অপশন দিয়েছে?

ডাক্তার- হ্যাঁ।

আমি- এই অপশনটা সন্তান হিসেবে গ্রহন করা আমার নৈতিক দায়িত্ব, তাই তো?

ডাক্তার- সেটা আপনার ব্যাপার।

আমি- আমি এ খরচ বহন করতে গিয়ে তো নিঃস্ব হয়ে যাবো।

ডাক্তার- সেটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমি- এই অপশনটা না থাকলে তো আমার এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো না। যদিও এই অপশন বাবাকে আবার সুস্থ করে ফিরিয়ে দেবে না।

ডাক্তার- সে সম্ভাবনা কম। তারপরও কিছু বলা যায় না।

আমি- হয়তো আরো দুই দিন, তিন দিন কিংবা দুই সপ্তাহ এই মেশিনের ভেতর থাকবেন বাবা?

ডাক্তার- হয়তো তার চেয়েও বেশি, কিংবা তার চেয়েও কম।

আমি- একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন মৃত্যুর সীমানায় বাবা এভাবে ঝুলতে থাকবে?

ডাক্তার- তা বলতে পারেন।

আমি- তারপরও এভাবে রেখে দিলে আমি জানবো যে বাবা বেঁচে আছে?

ডাক্তার- হ্যাঁ তাই।

আমি- যদিও বাবা আমাদের মধ্যে ফিরে আসবার সম্ভবনা নাই বললেই চলে।

ডাক্তার- হ্যাঁ, সেটা ঠিক।

আমি- তবু প্রতিদিন চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, তাই তো?

ডাক্তার- সেটা আপনি বুঝবেন।

আমি- মেডিকেল সাইন্স জীবন মৃত্যুর কোন সমাধান দিতে পারছে না কিন্তু আমাদের একটা নৈতিক দ্বিধার ভিতর ফেলে দিচ্ছে, তাই না কি?

ডাক্তার- আপনি আমার অনেক সময় নিচ্ছেন। আমি ব্যস্ত আছি। আপনি বাইরে গিয়ে বসেন।

বাবার হাতের চামড়াগুলো পোড়া বেগুনের মত হয়ে গিয়েছিলো। মা'র চামড়াও পুড়ে গিয়েছিলো কিন্তু সেগুলো বেগুনের মত হয়েছিলো কিনা সেটা দেখবার সুযোগ আমাদের হয়নি। মা'র সারা শরীর ব্যান্ডেজে ঢাকা ছিলো। ঘটনাটা আমি আমার চোখের নিচ থেকে কখনই সরাতে পারি না। অবিরাম তা ফুটে থাকে। আমরা টেলিভিশন দেখছিলাম। তখন সাদা কালোর যুগ। বাবা, মা আর আমি টেলিভিশনের সামনে বসে। পাশের ঘরে বোন

পারুল মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। পারুলের ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষা চলছে। টেলিভিশনে মাহমুদুন্নবী গান গাইছিলেন- 'শিল্পী আমি তো নই, তবুও এসেছি আজ শোনাতে যে গান এই জলসায়..।'

বাবা বললো- শিল্পী না তো তুমি এসেছো কেন বাবা গান শোনাতে? বলে হো হো করে হাসতে লাগলো।

মা বললো- পলাশ তোর বাবার সব কিছু নিয়েই ফাইজলামি। এসময় হঠাৎ মা বললো- বেচারা পারুলটা সেই সন্ধ্যা থেকে পড়ছে। ওকে একটু এক গ্লাস দুধ গরম করে দিয়ে আসি।

বাবা বললো- যাও, যাও বেচারা মেয়েটা পড়তে পড়তে কাহিল হয়ে গেল।

আমি টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে গান শুনতে লাগলাম। মা তার খুব পরিচিত ভঙ্গিতে আঁচলটা টেনে হেঁটে গেল রান্না ঘরে। মাহমুদুন্নবী গাইছে- 'ক্ষমা করে দিও মরে ভুল যদি হয়ে যায়. . .।' আর তখনই আমরা রান্নাঘর থেকে বিকট চিৎকারটা শুনতে পেলাম। বাবা আর আমি ছুটে গেলাম। মা গ্যাসের চুলা জ্বালাতে লাইটারটা অন করতেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠে লেগে যায় মা'র শাড়িতে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মা'র শাড়ি। পানি ঢেলে, কাপড় দিয়ে চেপে ধরে বাবা আগুন নেভায় কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে গেছে মা'র সারা শরীর, নিস্তেজ হয়ে গেছে মা। হাসপাতালে নেওয়া হলো মা'কে। মা'র শরীরের প্রায় আশি ভাগ পুড়ে গিয়েছিলো। আর কোন কথা বলতে পারেনি মা। দশ দিন পর মা মরে গেল। টেলিভিশন দেখতে দেখতে, গান শুনতে শুনতে, ঠাট্টা করতে করতে, দুধ গরম করার মত অকিঞ্চিৎকর একটা কাজ করতে করতে মরে গেল মা।

বাবা বলেছিলো তাদের সরিষাবাড়ি বাড়ির কাচারি প্রাঙ্গণে বিরাট বিরাট বকুল আর ঝাউগাছ ছিল। বাতাসে ঝাউগাছের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যেতো। সকাল বেলায় শিশির ভেজা ঘাসের ওপর ঝরা বকুল দেখে মনে হতো কেউ যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। কে কার আগে ঘুম থেকে উঠে বকুল ফুলের মালা গাঁথবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেতো। বাবার শৈশবের খেলার সাথী গীতি, মীরা, বীণা অন্ধকার থাকতে বকুলতলায় গিয়ে ফুল কুড়াতে শুরু করতো। আর বাবা, সাখাওয়াত, মতি, টুকু পরে যোগ দিত তাদের সঙ্গে। লম্বা লম্বা পরগাছা লতা দিয়ে একসঙ্গে মালা গাঁথতো তারা। তারা যখন মালা গাঁথছে উচু গাছ থেকে বকুল ফুলগুলো উল্টানো খোলা ছাতার মত উড়ে উড়ে এসে বাবা আর তার বন্ধুদের মাথার ওপর পড়তো যেন তুষার বৃষ্টি হচ্ছে।

গত সপ্তাহে আমি যখন বাবার বিছানায় বসে তার বেগুন পোড়া চামড়ায় হাত বোলাচ্ছি বাবা বলেছিলো- আমার কী মনে হয় জানিস? রাস্তার পাশে দাঁড়ায়ে সবার কাছে ভিক্ষা চাই, বলি আপনার জীবন থেকে পাঁচটা মিনিট আমাকে দিয়ে দেন। একজনের জীবন থেকে পাঁচ মিনিট দিয়ে দিলে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু এমন অনেকে যদি আমাকে পাঁচ মিনিট করে দেয়, আমি হয়তো আরো একটা বছরের আয়ু পেয়ে যেতে পারি। বেঁচে থাকা মানে তো মানুষকে ভালোবাসতে পারার একটা সুযোগ,

হয়তো মানুষের ভালোবাসা পাওয়ারও একটা সুযোগ। মন ভরা এত ভালোবাসা নিয়েও তোর মা তো সেই সুযোগ পেল না।

ডাক্তার বলে- আমরা আপনার বাবার ব্যাপারে একটা অ্যাটেম্পট নিয়ে দেখতে চাই। আমরা ট্রায়াল বেসিসে কিছু সময়ের জন্য তার ভেন্টিলেটর উইথড্র করে দেখতে চাই। আপনি কালকের মধ্যে আমাদের এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন।

আমি- উইথড্র করলে কী হবে?

ডাক্তার- উনি সারভাইভ করতে পারেন, আমরা দেখব কতক্ষণ উনি নিজের শক্তিতে শ্বাস নিতে পারেন। আবার অনেক সময় ভেন্টিলেটর উইথড্র করলে পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি মারাও যেতে পারে। সে রিস্কও আছে। আপনি কনসেন্ট দিলে আমরা একটা চেষ্টা করবো।

একটা চেনা সিঁড়ি দিয়ে উঠে পরিচিত দরজাটা পাওয়া গেল। চাবি দিয়ে পরিচিত দরজাটা খোলা গেল। তারপর দেখা গেল দরজার ওপাশে আর কোন ঘর নাই, সিঁড়ি নাই, কিছু নাই। একটা গভীর খাদ। আর এক পা এগোলেই সেই খাদে পড়তে হবে। বাবা কি দরজার চাবি খুলে তেমন একটা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে?

আমি অনুমতি নিয়ে সেদিনের মত শেষ আরেকবার মাস্ক, গাউন পড়ে আইসিইতে বাবার কাছে যাই। বাবাকে বলি- আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ?

বাবা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ পাচ্ছে।

আমি বাসায় ফিরে আসি। ঘরে ঢুকবার পর আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। আমি জানালায় গিয়ে দাঁড়াই। তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা ঘাট, মানুষ, গাড়ি। মনে হচ্ছে আজ একদিনেই আকাশ পৃথিবীর কাছে তার সবটুকু ঋণ শোধ করে দেবে।

বাবা টিউব ভেন্টিলেটারের লতাগুল্ম নিয়ে সিঁড়ির খাদে। আমি কাল বাবার কাছে গিয়ে আবার বলতে পারি বাবা আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ? বাবা আবার মাথা নেড়ে বলবে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছে। আমি জানব বাবা বেঁচে আছে। এই দৃশ্যটুকু আমি মঞ্চস্থ করে যেতে পারি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আমি আমার নাম বলব, বাবা তার মাথা নাড়বে, আমি জানব বাবা বেঁচে আছে। বাবার বেঁচে থাকা মানে যদিও ঐ মাথা নাড়া টুকু। বাবার ঐ মাথা নাড়ানোর মূল্য প্রতিদিন চল্লিশ হাজার টাকা। আমরা এই অর্থ যোগান দেবার জন্য নিঃস্ব হয়ে যাব। কিন্তু বাবার জীবনের বিপরীতে টাকার এই হিসাব মর্মান্তিক, অমানবিক, স্বার্থপর। কিন্তু এই জটিল যন্ত্রপাতি কি বাবাকে টিথোনাসের মত অমরত্ব দিতে পারবে? দিতে পারলেও বাবা কি সে সুযোগ গ্রহন করতে চাইবে? আমি কালকে ডাক্তারকে বলতে পারি, হ্যাঁ, ভেন্টিলেটর খুলে দেন। দেখা যাক বাবা নিজের মত শ্বাস নিতে পারে কিনা। ভেন্টিলেটর খুলে নেবার পর বাবা বুক ভরে শ্বাস নিতে পারে আবার ভেন্টিলেটর খুলবার সাথে সাথে বাবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। আমাকে আগামীকাল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

একদিন দেখি বাবা আর আমার পাঁচ বছরের ছেলে শায়ান বসে ওয়াল্ট ডিজনির একটা কার্টুন ফিল্ম দেখছে। একটা হাঁসের ছানা ঝড়ে উড়ে গিয়ে এক গর্তে পড়েছে আর

উঠতে পারছে না। মা হাঁস ঝড় বাদলে জঙ্গলের ভেতর আকুল হয়ে ছানাকে খুঁজছে। পাচ্ছে না। দেখি আমার ছেলে শায়ানের চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। দেখি আমার বাবার চোখ বেয়েও পানি পড়ছে। এক হারিয়ে যাওয়া হাঁসের ছানার জন্য দাদা আর নাতি টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে অঝোরে কাঁদছে।

আমি আবারও স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার, আমি এর ঘোর বিরোধী।

(লেখকের ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখী' গল্পগ্রন্থ থেকে নেয়া)

লন্ডন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাজ্য

সাগুফতা শারমীন তানিয়া

ভবদীয়

ঠা ঠা করে চেঁচিয়ে কাঁদছিল রেবতীর ছেলে। মোজেস সরেন। এমনিতে ভারী হাসিখুশি উচ্ছল স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে জ্বলজ্বলে কালো ছেলেটি। পরে মাদার সুপিরিয়রকে কৈফিয়ত দিচ্ছিল রেবতী– "সবসময় পোশ্ন, এখনি গীর্জায় খাবার দিয়া কহিলু যীশুর দেহ আর গিলিবার দিয়া কহিলু যীশুর রক্ত, পুরোহিত কহিল– যীশুর দেহার রক্ত নিয়ে নে। সেইলা হামরা খামো কেনে? হামরা কি যীশুখোর? হামরা কি ডাকিন?"

মাদারের মুখ উদ্বিগ্ন অথচ স্নিগ্ধ, মৃদু একটি নাতিশীতোষ্ণ হাসি কপালে-গালে স্থির, জোড়া চোখের মণি ঘিরে বয়সের ধুম্রজাল তবু খুব দীপ্তি। সাক্ষাৎ দেবী। বলে রেবতী সবসময়। মাদার হাসিমুখে বললেন, "এই প্রশ্ন আমিও তো করেছি শৈশবে। যীশুর দেহই যে জীবনময় খাদ্য, তা বুঝবার বয়স তো ওর হয়নি। শিশুরা প্রভু যীশুর বড় প্রিয়, মোজেসকে মেরো না!"

লম্বা করে ঘাড় কাত করে রেবতী, মুখটায় বসন্তের অজস্র দাগ। চলে যায় নিজের কুঁড়ের দিকে। ঐ সামান্য কান্নাকাটি-চেঁচামেচি ছাড়া আর তেমন কোনো আওয়াজ হবে না আশ্রমে। কান পাতলে রোদের উত্তাপে পাকতে থাকা ফলমূল আর আনাজে মৌমাছিদের গুনগুন শোনা যাবে এত নিরালা। 'আরাধনা' আশ্রম। মাদার বলেন, এর নাম হওয়া উচিত ছিল– 'চির আরাধনা'। এটি অবিরাম আরাধনা সংঘ, সমস্ত দিবারাত্রি এখানে সন্ন্যাসিনীরা প্রার্থনা করেন।

রেবতী কি আর অত বোঝে? জন্ম জন্মান্তর ধরে তাদের একটিই আরাধনা ছিল, নরকের কুন্ডের মতো চিরকাল পুড়তে থাকা পেটের আগুন নেভানো। প্রশ্ন সে তেমন করে না, কখনোই করেনি। এমনকি অ্যাগ্নেস চলে যাবার পরেও তো তার মনে প্রশ্নের উদয় হয়নি যে তার বউ কোথায় গেল, কার হাত ধরে চলে গেল, চলেই যে যাবে তা যেন কেমন করে জানতো সে। যেন জানতোই আরেকরকম নরককুন্ডের আগুন নিভুনিভু করছিল অ্যাগ্নেসের বুকে, ভেঙচি কেটে সে রেবতীকে বলতো– "শিলপাটার মতোন কড়া কড়া মুখগেনা তোর...তাকাইবারে যাচ্ছে নাই!" মুখের দিকে তাকানোর দরকার হয়না যেসব মুহূর্তে, সেইসব সময়ও তো কম নয় এজীবনে। অতএব যতদিন ছিল, সুখেই ছিল তারা। অন্ততঃ রেবতীর খাতায় সেই সময়টুকুর শিরোনাম 'সুখ'।

কেন যে তারা ছেলেটার নাম রেখেছে মোজেস, ঈশ্বরের সাথে তর্ক করে অভ্যস্ত মোজেসের নামটা দেয়া ঠিক হয়নি। রেবতীর ছেলের নাম হওয়া উচিত ছিল সলোমন,

এই বিরলে ঘাসপাতা গাছ ফুলের সাথে ফুলগাছে আসা পাখির সাথে ভাববিনিময় করবে। মোজেসকে রেবতীর নাতি ভেবে ভুল করে লোকে, অ্যাগ্নেসকেও যেমন রেবতীর মেয়ে ভেবে ভুল করতো তারা। আহা, লোকের কথায় কান দিলে কি চলে! 'কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক'... রেবতী খুরপি চালিয়ে ফুলের কেয়ারির মাটি আলগা করে আগাছা টেনে টেনে তোলে, কোঁকড়ানো ফার্ন লাগায়। এম্নিতে বাগানের কাজ করতে সিস্টারদের জুড়ি নেই, সিস্টার মারিয়া, সিস্টার সিসিলিয়া, সিস্টার লুসিয়া। কাজও যে তাদের আরাধনা। গোবরসারের সাথে খৈল মেশায়, শক্ত মাটির ঢেলা পিটিয়ে ভাঙে, পটোলের পুরুষফুলের পরাগ জলে মিশিয়ে মেয়েফুলে ঢালে। একটা পুরুষগাছের সাথে হেসেখেলে পল্লবিত হয় দশটা স্ত্রী পটোলগাছ। নরম রোদে সরস সবুজ পটোলের নধর গায়ে মিহি আভার মতো ফুটে ওঠে শাদা ডোরা, তাতে ঘুরে বেড়ায় কালো পিঁপড়া। সবজি বাগানের পাশে আগে একটা চাপকল ছিল, কেমন কঁকানোর শব্দ ছাড়তে ছাড়তে কল্লোল তুলে জল আসতো তাতে। তারও আগে ছিল একটা পাতকুয়ো, ভারী মিষ্টি ঠান্ডা জল। একটা অপঘাতে মৃত্যুর পরে কুয়োটা বুজিয়ে দেয়া হয়েছে।

শুধু মোজেসের কান্নার শব্দই ভাসে বাতাসে, সেটা সত্যি নয়। মা-হারা ছেলেটাকে এত দুষলে চলবে কেন? আরো শব্দ আছে তো, রে-রে করে লাঠি ঠুকে তেড়ে যায় রেবতী, চোররা বাগানে ঢুকলে। সব চুরি করে তারা, পয়লা ফাল্গুনে কিংবা অমর একুশের আগের রাতে উপড়ে নিয়ে যায় তাজমহল গোলাপ আর ডাচ-রোজ, ডিনারপ্লেটের মতো বড় বড় ডালিয়া ফুল, ফল-ফসল-সবজি তো খাঁচি ভরে চুরি করেই এমনকি সিস্টারদের শুকোতে দেয়া কাপড়চোপড়ও নিয়ে যায়। রেবতীর বাপ সুনীল সরেন যখন ছিল এখানে, তখন এই অঞ্চলে এত মানুষের বাস ছিল না, মানুষের রকমও আলাদা ছিল, গীর্জা আর আশ্রমের চান্দিক ঘেরাও করা ছিল কাঁটামেহেদির বেড়া দিয়ে। একমানুষ সমান বেড়া। তাতেই হতো, পড়শিদের ছাগল চরতে আসতো না এই প্রাঙ্গণে। পরে বেড়া মুড়িয়ে দেয়াল তোলা হলো। দেখা গেল ছয় ফুটের দেয়ালেও কুলানো যাচ্ছে না, আর্চবিশপ ঘুরে যাবার পরে খাম্বা গেঁথে দেয়াল আরো তিনফুট তোলা হলো, সিমেন্টের ক্বাথে গেঁথে দেয়া হলো ভাঙা বোতলের কাঁচ। মোজেস গাল ফুলিয়ে একবেলা কীসব ভাবতে ভাবতে এরপর প্রশ্ন করলো, "ঈশ্বরের বাগান থাকি অল্প চুরি করিলে সেইলা চুরি হবে কেনে? সেই বাগানত্ তো সবারে অধিকার!" আরেকদফা পিটুনি দেয়া ছাড়া আর রেবতী কী করবে! ছোঁড়া এত কথা জানে! মাদার সুপিরিয়র কিন্তু হাসেন। জবাব করেন না। বাপ তো তাই করছে, মা যা করতো, স্তনলগ্ন করে গল্প শোনাতো, সে গল্পে আছে–

"আ'ল ডিঙাইয়া কে খায় ঘাস
বাছা, মায়ের কথায় প্রত্যয় চা'স..."

কত কথারই তো জবাব নেই, জবাব চাই না বলে মন বেঁধে ফেলতে হয়। মাদার জানেন সেটা, জানে সিনিয়র-জুনিয়র মনাস্টারী সিস্টাররা, জানে নভিসরাও। নৈলে প্রায়োরি স্কুলের বাচ্চারাও তো জানে সেই গল্প, গোলাপায়রারা জলপ্রপাতের গায়ে গায়ে বাসা করে তাতে ধান জমিয়ে রাখতো, বর্ষার আকালে খুঁটে খাবে, তা পাখির জমা করা

সেই ধান মানুষ তুলে আনতো বলে সে মানুষের গায়ে ঈশ্বরের অভিশাপ লাগলো, ঝুলে ঝুলে ধান তুলতে গিয়ে মরে গেল দড়ি ছিঁড়ে। ঈশ্বরের ভূমিতে যত ফুল-ফসল ফলবে, তাতে না সবার অধিকার! যে স্বার্থপর দৈত্য সেটা মানে না, তার বাগানে বসন্ত আসে না।

আশ্রমের এই উঁচু উঁচু দেয়ালের বাইরে সব আছে। আশ্রমের দেয়ালেই সাঁটা আছে পুতুলতন্ত্র দিয়ে বশীকরণের পোস্টার। মফঃস্বলের এইসব ভেঙে পড়া টালির চালাঘর আছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রমত্ত পৌষকালী মেলা। বাসন মাজবার বারোয়ারি কলতলা। 'জনপ্রিয়' লড্রিতে বাজতে থাকা রেডিওটা আছে, মোবাইল ফোনকে টেক্কা দিয়ে কেমন করে যেন এইসব রেডিও এখনো আছে। ফার্মেসিতে আছে দন্ত শেফা। ধানশুকানিয়া চাতালগুলিতে টাপর মাথায় করে ঢেকে আছে ধান, হাইব্রিড যাবে হাস্কিং মিলে, পাইজাম যাবে অটো মিলে। গুমগুম শব্দ করে চিনিকলে আখবোঝাই করে নিয়ে যায় ট্রাক। গ্লাস ফ্যাক্টরি ফেরতা লোকে যায় পথ দিয়ে, রুপালি ছাইয়ে ভুরু শাদা তাদের, হাতগুলি কালো কালো। চৌরাস্তা পেরুলেই জলকচুঝোপে আচ্ছন্ন পানাপুকুর, আর তার ধার ঘেঁষে রাজমিস্ত্রির কারুবাসনার মূর্তপ্রকাশ সব বাড়িঘর। মসজিদের ওয়াজিম চোখের জোলে ভেসে ডাকছেন– 'আসমানের বালা আসমানে তুলিয়া লও, জমিনের বালা তুমি জমিনে দাবায়া দেও'... শৈশবে শীতের রাতে কান পাতলে রেবতী শুনতে পেত যাত্রার কুন্তী কেঁদে কেঁদে কাকে বলছে– "আমার সহদেবরে দেখিও গো মা, মোখে তুলে খাইয়ে দিও!" বোধহয় দ্রৌপদীকে। এইসবই বাইরের। আশ্রমের দেয়ালের ভিতরে ঢুকলে এইসবই নেপথ্যের কোলাহল। ভিতরে ঐ পানাপুকুরগুলির চেয়েও স্তব্ধ হয়ে আছে সময়। বছরের পর বছর একইরকম ঝকঝকে প্রাঙ্গণ, টাইমফুলের পংক্তিঘেরা চত্বর, দিশি কাশীগাঁদা আর শেয়ালমুতো পুটুশ ফুলের পাশেই কতপদের মৌসুমী ডালিয়া, কসমস, গোলাপ। গীর্জায় ঢুকবার পথে কুঞ্জ, তাতে গুল্মগোত্রের গাছ কিছু, গন্ধরাজ- শ্বেতকরবী- হিমচাঁপা- কুন্দ আর ঝুমকোজবা। আশ্রমের দিকটা আড়াল করে ফলের বাগান– মধুকুলকুলি আর খিরসাপাতি আমগাছ, কান্তনগরের বাগান থেকে আনা মাদ্রাজী লিচুগাছ, গোলাপজামগাছ, লটকান, গুটিকয় কাঁঠালগাছ অন্ধকার করে রেখেছে কিছুটা জায়গা। অন্ধকার ছাড়িয়ে উঠলেই সবজিখেত। সমান্তরাল সরলরেখায় বোনা শীতের সবজি। মাচায় শিম- লাউ- কুমড়ো। আগের কালে রেবতী বাপের সাথে গিয়ে রাজবাড়ির ছোটতরফের ঘোড়াশাল থেকে জীর্ণ ঘোড়াগুলোর গোবর নিয়ে আসতো ধামা ভরে, ঘোড়ার গোবর উৎকৃষ্ট সার। এখন তো আর সেই ঘোড়াশাল নেই, যে জমিদাররা রাজা ছিল তারা তো কবে থেকেই নেই, রাজবাড়িতে ডিসি সাহেব থাকেন, রেবতী গোবর কুড়াতে যায় অন্যত্র। রেবতীর হাতের খুব গুণ কিন্তু, আলুটাও ওরা বাইরে থেকে কেনে না। পেঁপেও হয় অফুরন্ত।

গীর্জার ভেতরদিককার দেয়ালে সাঁটা আয়তাকার একটা বাক্স, তাতে সাজানো খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হবার সহযোগী পুস্তিকা। প্রধান ফটকের কাঠে খোদাই করা বাইবেলের দৃশ্য– যীশু অন্ধকে চোখ দিচ্ছেন, কুষ্ঠরোগীকে ত্রাণ করছেন। ধানজোড় প্রায়োরি স্কুলের

হাবা ছেলেপুলেরা এই কাঠের কাজ করে দিয়েছে, 'হাবা' ডাকছে শুনলে মাদার বিরক্ত হবেন, বলতে হয় বুদ্ধিমত্তায় পিছিয়ে পড়া শিশু। মোজেস দ্যাখে আর ভাবে। যিনি মানুষকে এত ভালবাসেন, তিনি অন্ধত্ব দেবেনই বা কেন, কুষ্ঠর মতো ভয়ানক অসুখ দেবেন কেন, কেন শিলপাটার মতো কুঁদে দেবেন বাপের মুখটা? জিজ্ঞেস করলেই থাবড়া খাবে বলে সে জিজ্ঞেস করে না বাপকে। মাদারের কাছে গিয়ে পড়ে প্রশ্নটা নিয়ে, মাদার সুপিরিয়র মৃদু মৃদু হাসেন আর বলেন– কেমন মোজেস, ইস্কুলে পরীক্ষা হবে না? কে ফেল কল্লো আর কে পাশ কল্লো সেটা হেডমাস্টার দেখবেন না? তা ইস্কুলে পরীক্ষা হবার মতো করে ঈশ্বরও আমাদের পরীক্ষা নেন।" মোজেস তক্ষুণি জিজ্ঞেস করে, তবে কি তার বাপ ফেল করেছে চিরতরে, গুটিবসন্তের এই দাগগুলি যেহেতু কোনোদিন আর যাবে না! মাদার স্নেহের সাথে তাড়ন করেন তাকে, বলেন, "ঈশ্বরের পরীক্ষা আর সেই পরীক্ষার রেজাল্ট বোঝা এত সহজ নয়। বহুদিন সাধনা করতে হয়।"

চাপকলটার জলে ভূগর্ভের বিষ ধরা পড়েছিল বলে আর কেউ সেটায় চাপ দেয় না। কিন্তু কখনো কখনো নিস্তব্ধ দিনে রেবতী কান পেতে চাপকলের সেই জল আসবার শব্দ শুনতে পায়, যুবতীর কলহাস্যের মতো শব্দ, পৌরসভার কলের জলের ফোঁসফাস নয়। কলতলায় সুনীল সরেন সমারোহ করে কড়ুয়া তেল ডলতো গায়ে, আচ্ছামতো সাবান ঘষে কত ফেনা তুলতো, তারপর ঝপাঝপ গোসল। সেকালের মাদার একদিন সুনীল সরেনকে ডেকে বললেন এইরকম প্রকাশ্য দিবালোকে উদোম হয়ে গোসল করা চলবে না, এ যে সন্ন্যাসিনীদের মঠ। সুনীলও নড়া ধরে ঘরে নিয়ে গেল রেবতীকে, বাপ-ছেলে তখন থেকে আড়াল হয়েই স্নান করতো। মোজেসকেও এই গল্প বলতে হয়েছে রেবতীর, উজ্জ্বল প্রশস্ত রোদে অজস্র জল ঢেলে স্নানের আনন্দ কেন মোজেস নিতে পারবে না সেটা বোঝাতে গিয়ে বলতে হয়েছে। মোজেস অবশ্য দিবালোক প্রকাশ্য হবে না তো কী হবে এইসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল বলে চড়চাপড় খেয়েছে।

পশ্চিম আকাশে অগাধ আবির মাখামাখি তখনো, বড়গাছগুলির মগডালে রাঙা রোদের লুকোচুরি, ঝোপগুলোয় অন্ধকার নেমে এসেছে। পূবদিকের বাগানে লম্বা লম্বা বেগুনি ছায়া পড়েছে। বাগান যেখান থেকে বন্য হতে শুরু করেছে, সেখানে কিছু কুলগাছে খুব পাখি ডাকছে। রসুইন্যা-জিয়ল-মাদার গাছে জড়াজড়ি জায়গাটা। জংলি মাখনসিমের ফুল ফুটেছে নীল নীল। ছ'টার সাপারের পর মাদার এসে বসেন এই ঘেরা বারান্দায়। তাঁর চারদিকে অনাবিল পৃথিবী সদাপ্রভুর করুণার রঙে নেয়ে উঠছে এমন একটা অনুভূতি হয়, যদিও দেয়ালের বাইরের বাকি পৃথিবী আবিলতায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠেনি এমন ভাবনাটা তিনি করেন না, করতে পারেন না। বরং এইটুকু দ্বীপদেশের মতো গীর্জা আর আশ্রমের প্রাঙ্গণের নির্মলতা ধরে রাখতে তাঁকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়, হয়েছে, বিরামহীন, প্রত্যহ। বাগানের কাকলির দিকে কান পেতে তাঁর মনে পড়ে গেল এক জাতের পাখি আসতো, যুদ্ধের আগে। খাটো কাস্তের মতো পাখা, ছুঁচলো লেজ, ধুলোমাটির সাথে মিশে যাবে এমন রঙ। বদমাস ছেলেরা গীর্জার দেয়ালে চড়ে এয়ারগান দিয়ে শিকার করতো সেই পাখি। বিহারী আসলাম মাঝে মাঝে মাদারদেরকে ভাড়া গাড়ি

চালিয়ে 'জাগরণী' ধর্মপল্লীতে দিয়ে আসতো, সে বলতো– ঐ পাখির নাম কুহর। কী সুন্দর ডাক। কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল সেই পাখি, আর আসে না। সন্ধ্যা ফুরাবার আগেই শুরু হয় ওয়াজ, আগে হতো শীতকালে এবং মমিনপুরা জামে মসজিদে, এখন হয় মোটামুটি সারাবছর, অলিগলি সর্বত্র, পথ-ঘাট বন্ধ করে দিয়ে। মাদার 'দোজাহানের কামিয়াবি হাসিল করুন' মানে বোঝেন, আসলামের ছেলেই শিখিয়ে দিয়েছে এ'কথার অর্থ, অবশ্য কথা যে খুব বোঝা যায় তা নয়, চিৎকার বোঝা যায়। কিন্তু বিরতিহীন আরাধনার এই মঠে ধৈর্যই তো শেষ কথা, মুহূর্তকে একেকটি টনটনে মুক্তোদানার মতো অনুভব করাই তাঁদের শিক্ষা, অস্থিরতার ভিতরে শুভকে জেনে স্থির থাকাই তাঁদের ব্রত। অতএব শান্ত থাকা ছাড়া তাঁর আর কী বা করার আছে। সাধু দামিয়ানের মঠের ভিতর চল্লিশ বছর টানা আরাধনা করে যাওয়া সাধ্বী ক্লারার মতো শান্ত, স্থির। আজ ওয়াজ শুরু হয়নি বলেই যেন পাখিদের আত্মহারা ওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বিকেল চারটা থেকে সোয়া পাঁচটা অব্দি সিস্টারদের কাজের সময় বরাদ্দ করা, এই– রাতের রান্নার কুটনো কোটা, ঘরদোর পরিপাটি করা, থালাবাসন ধোয়া থেকে জানালার কাঁচ মোছা এ'সব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সময় সেটা। সিস্টাররা বয়সের অজুহাতে ওঁকে কুটনো কুটতে দেয় না, তবু কাজ কেড়ে নিয়ে মাদার আনাজপাতি কাটছিলেন। হাত চললেই জীবন চলে। কাটতে কাটতে ভাবছিলেন– একসময় গীর্জার ছাদে উঠলে দেখা যেত শুধু অড়হরের মাঠ, বাতাসের বিসর্পিল দাগ ধানক্ষেতের উপর, সেখানে বিস্তর বাবুইপাখি নেমেছে। দূরে গ্লাস ফ্যাক্টরি আর অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, যেন পাশাপাশি দুইভাই দাঁড়িয়ে। সে কবেকার কথা। এখন শুধু বাড়িঘর দেখা যায়, সেইসব বাড়ির ছাদে বড় বেশি অ্যান্টেনা, বড় বেশি উৎসুক মানুষ, আর তাদের হাতে বড় বেশি দূরবীন। তারা বড় বেশি গল্প শোনে মঠের, সবাই জানতে চায় মনাস্টারী সিস্টাররা সত্যি সারারাত কাঁদে কি না, সারারাত জেগে জেগে নিজেরাই নিজেদের কবর খোঁড়ে কি না, সিস্টাররা চুলে তেল মাখে কি না, অন্তর্বাস পরে কি না, কাপড় বদলানোর সময় তাদেরকে অন্যান্য মেয়েদের মতোই লাগে কি না, তারা লুকিয়ে চটিবই পড়ে কি না, তারা মদ্যপান করে ঢুলতে ঢুলতে কোথায় ফেরত যায়... যাজকদের সাথে শুতে আসে কি না, এমনি হাজার উপযাচক প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের স্বকপোলকল্পিত উত্তরও আছে মানুষের বুকে বুকে। এমনকি প্রায়োরি স্কুলের অভিভাবকদেরও এত কৌতূহল, সিস্টাররা বিরক্ত হন কিন্তু গায়ে মাখেন না, বলেন পূর্ব কেরালার মেয়ে সিস্টার সিসিলিয়া। মাদার বলেন, প্রশ্ন না শুনলে তুমি কেমন করে বুঝবে মানুষ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? মানুষ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা না বুঝলে কী করে তুমি তাঁর কাছে যাবে? যীশু যে মানুষের কাছে যেতে বলে গেছেন!

শ্বাস ফেলে সিস্টার সিসিলিয়া বলেন, "এত বছর ধরে এই প্রান্তরে এ পাথরের গীর্জা দাঁড়িয়ে আছে, আলোর দরজা অবারিত খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তবু মানুষের মনগড়া গল্প কমলো না!"

মাদার শান্তসুরে বলেন, "এ আমাদেরই হয়তো খামতি। তারা আমাদের কাছে আসবে না, আমরাই তাদের কাছে যাব। সেটা হয়তো এখনো সম্পন্ন করতে পারিনি।"

সিস্টার সিসিলিয়া চটপট কোটা-বাছার কাজ সেরে শীতের গরম কাপড় বুনতে বসেছিলেন, মগ্ন বলিষ্ঠ চিবুকে দুয়েকটি বয়সের কোঁকড়া দাড়ি, আবলুসকাঠের মতো কালো শরীর, কপাল ঘিরে ছোট করে ছাঁটা ঢেউখেলানো শাদাকালো চুলের রাশি, আলগোছে পিঠের হাড় উলের কাঁটায় চুলকে নিয়ে সিস্টার চ্যাপেলের মাতা মেরীর মূর্তি ভাঙা নিয়ে কথা তোলেন, এবারের গ্রীষ্মে সুদূর রাজধানীতে জাস্টিসিয়ার মূর্তি নিয়ে তৌহিদবাদী জনতার শোরগোল তুঙ্গে উঠবার পর থেকে ওঁরা খুব বিচলিত। চ্যাপেলের এই ছোট্ট মাতৃমূর্তিটি সন্ন্যাসিনীদের খুব প্রিয়, ক'দিন আগে কারা যেন দেয়াল টপকে এসে ভেঙে দিয়ে গেছে মেরীর ঘাড় আর স্তন। সকালে অশীতিপর মাদার চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন পাথরের ভাঙা বুক, যেন খপ করে এসে পড়েছে দুর্বৃত্তের হাত, যেন সেটা মেরীর মূর্তি নয়, সতেরবছরের নবীনা সন্ন্যাসিনী। থাবাগুলো যেন একই রকম। ভাবতে ভাবতে বেঁকে গেছিল মাদারের মুখ। সিস্টার সিসিলিয়ার পাশে বসে এইসব অশান্তির কথা শুনতে শুনতেই একঝলক নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে গেল মাদারের।

সতের বছর বয়সে এই জীবন আস্বাদ করতে তিন মাসের জন্য এসেছিলেন তিনি, ইসলামপুর রোডের সেই মঠে, মঠের বাইরের ঢাকা তখন রাষ্ট্রভাষার দাবীতে সোচ্চার। তারপর আরো তিনমাস। তারপর পস্টুল্যান্ট হলেন। 'বিরহদহন লাগে', সেই ঝাপটা লাগতো কী তাঁদের নবীন গায়ে, চেরা গলায় সিস্টাররা উচ্চগ্রামে গাইতেন– 'তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' কিন্তু কেমন ছিল তাঁর ধারণাগুলো, মঠে প্রবেশের আগে? সন্ন্যাস নেবার আগে এই জীবনটার কল্পিত রঙগুলি? প্রথমদিকে, যখন ইসলামপুরের সেই দোকানে বিশাল কড়াইয়ে ফুরফুরে দাড়িওয়ালা এক লোক জিলাপি ভাজতো, আর বলতো, "আমি ভি হালায় বাংলা চাই!" গরম জিলাপির প্রলোভন সম্বরণ করে মঠে ঢুকে যেত সতের বছরের মেয়েটি? কিংবা প্রিস্টদের কমিউনিয়নের পরে ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করতে গিয়ে একবার কী কান্ড! পরে প্রিস্ট হাসপাতালে গিয়ে নিজের থুতনি সেলাই করে আনলেন, ডাক্তারকে বললেন গীর্জার সিঁড়িতে পিছলে পড়ে গেছেন তিনি, আর কখনো সেই প্রিস্ট মেয়েটিকে আনুগত্যের শপথ মনে করিয়ে দিতে আসেননি। প্রতিবার একবছরের শপথ নিতে গিয়ে নিজেকে কী জিজ্ঞেস করতো সেই মেয়েটি? ভূতের ভয়ে কনভেন্টের ঘরে আধমরা হয়ে থাকতো সে, সেটা কি ভুলবার!

তবু স্পষ্ট মনে করতে পারেন পঁয়ষট্টি বছর আগের সেই রাত্রির কথা, যেদিন প্রভুর আহ্বান হৃদয়ে শুনতে পেলেন। বাতাসে প্রথম শীতের চোরা আভাসের মতো, সন্তর্পণে আলাদা, খুব অন্যরকম। একটা ফুলে ভরা ইন্ডিয়ান ল্যাবার্নামের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, সেদিনকার বেলা, অসহ্য উল্লাসে ফেটে পড়া হলদে ফুলের অনন্ত ঝর্ণা যেন, তার তলায় দাঁড়িয়ে আলোয়- পাপড়িতে- অহেতুক আনন্দে- যন্ত্রণায় কেন চোখে জল এসে গেছিল ওঁর? কেন সমস্ত অন্তর গেয়ে উঠেছিল প্রভুর জয়গান? প্রিয়পুরুষের ডাকে যত শিহরণ মিশে থাকে, ততখানিই নিশ্চয়ই শিউরে উঠেছিলেন কিশোরী কন্যা, কে জানে!

এক তালপত্র-রোববারের চাঁদনি রাতে নীল-নীল জলপাই পাতারা দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে সাধ্বী ক্লারাকে হাত বাড়িয়ে ডেকেছিল—এসো! যেমন করে সন্ত বার্নাদেত উঁকি দিয়ে দেখেছিলেন গুহার শীতলতায় জ্যোতি ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তোর জপমালা হাতে মাতা মেরী। একটা খাটো তৃপ্তির শ্বাস নিলেন ঈশ্বরের আরেক দীনদাসী এই মাদার, তাজা ঘাসে চরে ফিরতে ফিরতে গাভি যেমন নেয়। সেই সুখস্মৃতি মনে করে যত জায়গায় মাদার গেছেন এই হলদে ঝর্ণার মতো ইন্ডিয়ান ল্যাবার্নামের সারি পুঁতেছেন সেই ভুঁইয়ে।

সিস্টার সিসিলিয়া উলের কাঁটায় ঘর তুলতে তুলতে প্রায় স্বগতোক্তির স্বরে বললেন— রেবতীর পাগল ছেলেটা প্রতিদিন ভোর চারটা থেকে কাঁদতে থাকে। ছেলেটাকে বোধহয় ক্রিমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। অতুলবাবুর হোমিওপ্যাথির গুলিও খাওয়াতে হতে পারে। মৃদুগলায় মাদার বল্লেন— “কাউকে ‘পাগল’ ডাকতে থাকলে তার অবচেতন মন বাতিঘরের আলোর মতো শব্দটার ওপর আছড়ে পড়ে, এই শব্দ ব্যবহার করতে নেই।” যীশুর কৃপা হোক মোজেসের ওপর, ভারী মিষ্টি চঞ্চলস্বভাব ছেলেটি। সিস্টার সিসিলিয়া ঘাড় নাড়লেন, সত্যি, শুধু বড় বেশি প্রশ্ন করে, সেদিন নাকি তিনি মোজেসকে বলেছেন, “বাইবেলের মোজেস মানে মোশী মিশরের, আর তুই আমাদের আরেক মোজেস, তোর নাম আসলে ‘কেনে মোজেস’, সর্বদা কেবল প্রশ্ন তোর!”

রাতে সিস্টার সুখলতা এলেন মাদারের হটওয়াটার বটল হাতে করে, শীত পড়তে শুরু করলে মাদারের শরীর আজকাল বাতের ব্যথায় অচল হয়ে পড়তে চায়, শীত-শীত ভাব তো এসেছেই বাতাসে, রেললাইনের ধারের নয়ানজুলি শুকিয়ে ধুলো-ধুলো হয়ে গেছে, নারকেল তেলের শিশি অস্বচ্ছ হতে শুরু করেছে। সেপ্টেম্বর- ‘আওয়ার লেডি অভ সরোজ’এর মাস। শিশিরের গন্ধে আগামী ভোরের রন্ধ্র ভরে আছে যে সময়টুকুতে, সেই সময়ে সিস্টাররা জেগে ওঠেন, দশমিনিটের ভেতর চ্যাপেলে চলে যাবেন সেই প্রস্তুতি...তখন ঊষার কমলা আভা লাগছে অনতিভোরের বেগনি বেগনি কোদালি মেঘে, ভোরের আজান হয়ে গেছে তার আগেই, গীর্জার হীমও তেমনি একরকম শীর্ণ মাধুর্যের রেখা টেনে দিয়ে যায় আকাশে আর গম্বুজে...যেন সেই অপার্থিব বেগুনি আলোর পাতলা কুয়াশায় ঈশ্বর আর উপাসকের মাঝখানে কোনো আড়াল নেই। করুণাময় ঈশ্বর, তোমার পৃথিবীতে আমার পাপের সমুচিত কুশ্রী আর কিছু নেই, আমায় পরিত্রাণ করো, শুভ-সুকুমার-ঋষি-শুভ্র আমার জীবনকে তোমার পাত্রে ধারণ করো। গীর্জায় একটা বিশাল পিয়ানো আছে, সিস্টার সিসিলিয়া সেটার সুরের চাবি টিপে টিপে ‘অ্যামেইজিং গ্রেস’ বাজান...লোকে বলে, এই পিয়ানো নীলকুঠির সাহেবদের কারো আনা। লোকে তো কত কী-ই বলে। বলে ওয়াইএমসিএ জুনিয়র বয়েজ স্কুলের ক্লাবঘরে যে বিলিয়ার্ড টেবিলটা আছে, সেটাও নীলকরদের ছিল, গ্রানাইটের বিরাট টেবিল, ছয়টা সিংহের থাবার মতো পা সেটার... মাদারের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে কেন! পিয়ানোটা বেলজিয়াম থেকে আসা ফাদার পলের ছিল। বাইসাইকেলে চেপে গ্রামে গ্রামে গিয়ে তিনি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিতেন

প্রভুর সন্তানদের, খুব ভাল বাংলা জানতেন ফাদার পল। যীশুর মতো রূপ ছিল তাঁর, মনে মনে জিভ কাটেন মাদার, ছিঃ, এমন ভাবতে নেই।

রাত্রির প্রথম প্রহরে বেশ গরম থাকে। ঘামতে ঘামতে কাদা হয়ে যাওয়া বালক মোজেসের পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে অন্ধকারে শূন্য ঘরে রেবতীর অ্যাগ্নেসকে মনে পড়ে না, তা নয়। প্রায়ই পড়ে। অ্যাগ্নেসের বুকে একটা জন্মদাগ ছিল, কোনো নাম না জানা পাখির ডানার খয়েরি পট্টির মতো। বড় সমারোহ করে যৌবন এসেছিল তার শরীরে, খুব আলো-ফালো জ্বালিয়ে। হাইড্রিলা ভরা পুকুরে ঝপ করে ঢিল পড়লো যেন, তেমনি করে অনেককিছুই মনে পড়ে রেবতীর। হাতের বিশ কড়ায় স্ত্রীর সাথে তার বয়সের তফাত গুনে শেষ করতে না পেরে সে সভয়ে দেখতো, দাঁতে ফিতে কামড়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে তরুণী অ্যাগ্নেস গাইছে– 'গাও তোলো গাও তোলো কন্যা পেন্দো নাকের ফুল, পাতাবাহার কাঁকই দিয়া তুলিয়া বান্দো চুল'... শ্বাস ফেলে চুপচাপ পাশ ফেরে সে, নাতির সমান সন্তানটির মাথার ভেজা ভেজা ঘ্রাণ নেয়। যেন কবেকার বৃষ্টির রাতের ভেজা ভেজা গন্ধ ফিরে ফিরে আসে তার নাকে। অ্যাগ্নেসের গায়ের সেই স্নো আর কবিরাজি আমলা-তেলের মিলমিশ গন্ধ যেন লেগে আছে মোজেসের গায়ে-মাথায়। যদ্দিন অস্তিত্বসংকট ছিল, অ্যাগ্নেসের তাকে অত বুড়ো লাগতো না, শিলপাটার মতোও লাগতো না, ঠাট্টা-বটকেরা করতো, সোহাগ নিত। গ্লাস ফ্যাক্টরির ফার্নেসের মতো ওটা কী জ্বলে বুকের ভিতর, দিনের বেলা যা জুড়িয়ে আসে অথচ রাতে তিষ্টোতে দেয় না? রেবতী কষ্ট করে এক আগুন থেকে অন্য আগুনে আরেকবার পাশ ফেরে। ফাদার পলকে পুড়িয়ে মেরেছিল কারা যেন, কারা যেন বিশ্বাস করেছিল পুড়িয়ে না মারলে গ্রামকে গ্রাম চরকি দিয়ে বেড়ানো এইসব সাহেবরূপী শয়তানের হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই, কী কষ্টই না মানুষ পায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলে... পরে শুক্রবারের মসজিদ থেকে সম্প্রচারিত হয়েছে ওয়াজ– "কাফেরদের নিয়ে দুঃখ করবেন না, সুরা আল মায়েদায় আল্লা রাব্বুল আলামীন এদের দুর্দশা নিয়ে দুঃখ করতে মানা করেছেন।" সেই হুজুর আর নেই এই অঞ্চলে। ঘুম আসছে না বলে একসময় উঠে পড়ে রেবতী, একটা কিছু পড়বার জন্য টেনে নেয়, বইয়ের নাম 'প্রভুর ডাক'।

ইস্কুলে শারদোৎসবের ছুটির পর থেকে বছরটা যেন হুহু করে চলে যায়। রবিবার বিশ্রাম দিবস। সমগ্র সৃষ্টি নির্মাণ ছয়দিনের কাজ, শেষে সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম নিলেন। তাই ভারী কাজকর্ম করা হয় না এ'দিনে। গীর্জায় আসা ভক্ত উপাসকরা চা পানি খেতে যায় গীর্জার প্রার্থনার শেষে, পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে। পারপেচুয়াল অ্যাডোরেশনের সিস্টারদেরকে কেউ কেউ এসে ফর্ম ফিলাপ করে বলে যায় তাদের কী নিয়ে প্রার্থনা করার ইচ্ছা, সিস্টাররা তাঁদের অবিরাম প্রার্থনায় সেই মনোবাঞ্ছা- সেই প্রার্থনা জুড়ে নেন। 'কলকাকলি' মাইনর স্কুলের শিক্ষিকা শর্মিলা রোজ রিবেরুর বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি, সে এসেছে নতুন সিল্কের শাড়ি আর গোল গোল হাতে ফটফটে শাদা শাঁখা পরে। ইন্ডিয়ান ল্যাবার্নাম গাছের সারিগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা ওর সাথে ঠাট্টা করছিল নীচুস্বরে। গাছভরা ঝলমলে হলদে ফুল, গাছের নীচে নতুন জীবনের মাদক

সেবন করা মেয়েরা...ভারী ভাল দেখাচ্ছিল তাদের আনন্দিত ছবিটা। মোজেস কোথা থেকে একটা মাউথ-অর্গ্যান যোগাড় করেছে, সে সুযোগ পেলেই চোঁ-চোঁ শব্দে সেটা বাজাচ্ছিল। শর্মিলারা থাকতে থাকতেই আজ সাদুল্লাহ নামের একটি যুবক ফটকের সামনে এসে খুব চেঁচাচ্ছিল, হাতে 'দাওয়াতুল হক্ব'এর একগোছা কাগজ, মুখের দাড়ি বুক অব্দি, সে ভেতরে যেতে চায়। নামধাম আর কাজের ফিরিস্তি শুনে দারোয়ান পরিমল দাস আর পিটার বিশ্বাস কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না, পরে সাদুল্লাহ গীর্জার ভেতরের লোকদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়েই যাচ্ছিল টানা– "তুমাদের দাওয়াত পায়াহেনে যেইলা মুসলমান থাকি ঈসায়ী মুসলমান হয়া গেইছেন, ঐলার নাজাতের ব্যবস্থা করিমু মুই। মুই আল্লার বান্দালার ফের আল্লাহপাকের সাথে জুড়ি দিবার চেষ্টা করিমু।" রেবতী মনে মনে হেসেছে, ফাদার পল কি আর আজকে মারা গেছেন! তাঁকে মারবার পর থেকে এই লোকগুলোকে গীর্জা খুব ভাল করে মনে রেখেছে, সাদুল্লাহর অত ব্যাখ্যান করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। পরে ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেল প্রাঙ্গণ। বাগানের ভিতরের কাঁকুরে পথ, বাকি বেলা গোলাপজামগাছটায় বসে বিষণ্ণ সুরে তিলে ঘুঘু ডাকে, তার গায়ে গোলাপি-পাটকিলের উপর শাদা ছিট। সবজিক্ষেতে গোবর এনে ঝুরো করছে রেবতী, খুব মাছি এসেছে তাই।

এইসব অঘ্রাণের রাতে স্মৃতি এসে ঘিরে ধরে মাদারকে। ঘরের টুলে রাখা গোল ডুমের বাতি, ইলেকট্রিসিটি গেছে। অন্ধকার আশ্রমের সারি সারি খিলান দেয়া জানালায় লজেন্সরঙা কাঁচ, অন্ধকারে মাদার সেই করিডোরে পায়চারি করতেন আগে, এখন বাতের ব্যথার প্রকোপে অতটা হয় না। বাগানে গোলাপ ফুটে উঠেছে, বাতাসে গোলাপজলের মতো ঘ্রাণ। একদা সুনীল হিদেনদের মতো কথা বলতো, বলতো গোলাপের গন্ধে গন্ধে সন্ধ্যাবতী মায়ের পেটে জন্মেছিলেন সত্যপীর, তাঁর বাপ আল্লা অর্থাৎ নিরঞ্জন। ময়মনসিংহের সেন্ট মাইকেল মনাস্টারিতে সিস্টার লুসিল বুনো গোলাপের চারায় চোখ-কলম করতেন বাগানে, গারোপাহাড়ের মেয়ে। বাগানের কাজ করে করে সুগঠিত কাঁধ, মোটা মোটা চ্যাটালো হাড়ে পাতলা চামড়া পরানো শরীর, চ্যাপ্টা পেট, পাগুলো ইনকাদের মতো ভারী আর শক্তিশালী। ওঁর ছায়াটা পড়তো একটা ট্রাপিজিয়ামের আকারে। নাকটা বর্তুল, ঠোঁট পুরু আর ছড়ানো, ছোট উজ্জ্বল টানটান কপাল, চোখে তাঁর সোমেশ্বরীর চোরা টান। সন্ধ্যার 'রিক্রিয়েশন'এর বাঁধা সময়টুকুতে দেখা যেত ঘোমটাটুকুর আড়ালে তাঁর চুলগুলি প্রচুর এবং সতেজ। বলতেন– "চৈত্রমাসে রাতের বেলা গারোপাহাড়ের দিকে তাকালেই দেখবে আগুন জ্বলছে! পাহাড়ের লোকে চাষ করবে বলে বনে আগুন দিয়েছে।" যুদ্ধের সময় একজন সিস্টারকেই ওঁরা চিরতরে হারিয়েছেন, তিনি সিস্টার লুসিল। মনাস্টারিতে আর্মি এসেছিল তো, মনে আছে মাদারের। বলে গেছিল, মঠের বাইরের জগত থেকে একেবারে নিজেদের আলাদা করে নিতে পারলে ওঁদের কেউ কিছু বলবে না। তখন মাদারের ছত্রিশ বছর বয়েস। কেবল একজনমাত্র সিস্টার উর্দুতে কথা বলতে জানতেন, ভাগ্যিস জানতেন। আর কেবল আরেকজন সিস্টার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা দিয়েছিলেন। সিস্টার

মারিয়া প্রায়ই সেসব দিনের গল্প জানতে চান। মাদারের দীর্ঘ সন্ন্যাসজীবনে কত সিস্টারকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন, কতজনকে দেখেছেন আত্মহত্যাও করতে, সেসব গল্প। মাদার সুপিরিয়র মুখে অর্গল দিয়ে চুপ করে থাকেন। এ জীবন প্রার্থনার, ত্যাগের, সেবার, আর হয়তো নৈঃশব্দের।

কখনো কখনো নৈঃশব্দের সমুদ্র মন্থন করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মাদারেরও। সেকালের মাদাররা সকলের বাড়ি থেকে আসা চিঠি খুলে পড়তেন। তারও আগে চিঠিই আর আসতে পারতো না। বাড়ির কারো সাথে আর কখনো সাক্ষাতের নিয়মই ছিল না। একেকটি ঘরে একেকজন চিরকুমারী সিস্টার থাকতেন– খটখটে বিছানা-মামুলি দেরাজ আর একখানা টুল, কেউ কারো সাথে সহসা কথা বলতে পারতেন না, কাউকে ছুঁতেন না, নীরব কর্মযোগী ছিলেন তাঁরা। উর্ধ্বতনদের দুর্ব্যবহারে কোনঠাসা হয়ে থাকতে হতো। তারপর মনকে বুঝ দিতেন– এ বড় সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞা, পুর্বাশ্রম ভুলে যেয়ে আরেক নামে জীবন শুরু করতে হয়, সেটাও বড় বেশি নির্বাচিত জীবন, সকলে এমন একনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে পারে না। রোমান সৈন্যদের যেমন প্রতি দশজনে একজনকে বাকিরা পিটিয়ে মেরে ফেলতো, কেউ জানে না সেই মনোনীত কে হবে...খানিকটা তেমনি– কেউ জানে না কার বুকে ঈশ্বরের ডাক পৌঁছবে, তবে এটা মৃত্যুর জন্য মনোনয়ন পাওয়া নয়, ইহলোক এবং পরলোকের জীবনে ঈশ্বরের জন্য কাজ করে যাওয়ার মনোনয়ন। এখন তো বিশপের অনুমতি নিয়ে ওঁরা বাজারসদাই করতে যান, মুদি দোকানদার কী অতুলবাবুর ফার্মেসিতে তো যানই। সাপ্তাহিক একটি বেলা আমিষ আহার করেন ওঁরা, সে'বেলার মাছটা বা মাংসটা অবশ্য রেবতী কিনে আনে। টেলিভিশন নেই তো কী হয়েছে, ধর্মীয় সিডি তো ওঁরা দেখেন, বই-টই পড়েন। এমনকি একটা মোবাইল ফোনও সকলে মিলে ব্যবহার করেন।

ক্রিসমাসের সপ্তাহদুয়েক আগে পরিবারের সদস্যরা ভিজিটার্স পার্লারে দেখতে এসেছিল সিস্টার লুসিয়াকে। ছোট্ট খোপের মতো কাঠের ঘর, নিরাভরণ, শুধু দেয়ালে একটি সোনালি বাইজেন্টাইন আইকন টাঙানো। মায়ের আদরিনী কন্যা লুসিয়া, মা কিছু খাবার তৈরি করে এনেছিলেন। পরে সিস্টার লুসিয়া সিনিয়র-জুনিয়র-নভিস-পস্টুল্যান্ট সব্বাইকে সেসব সুখাদ্য ভাগ করে দিলেন। শীতকালে প্রতিবছর পিকনিক হয় ওঁদের, কোথায় আর, এইতো গীর্জার উঁচু পাঁচিল তোলা ছাদে। এবারও সিস্টাররা বায়না করছেন পিকনিক হওয়া চাই। সকাল চারটায় উঠে চ্যাপেলে গিয়ে প্রার্থনা, ধ্যান, ছ'টার 'মাস', সম্মিলিত প্রার্থনা, ময়দা জলে গুলে পাতলা 'হোস্ট' তৈরি, পৌনে বারটার ভেতর দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ। সিয়েস্তার আর রিক্রিয়েশনের সময়টুকু বাদ দিলে আর যা বাকি থাকে, তা ক্রমাগত প্রার্থনা আর সেই প্রার্থনার জন্য স্বাভাবিক সুস্থতা রাখতে যা যা করণীয়। তাঁরা যে পারপেচুয়াল অ্যাডোরেশনের সন্ন্যাসিনী, বিরতি তো নেই! তবে মানুষের মন তো, একটু আনন্দ তো সে চায়। ওঁরা কেউ চাপাতি বানাতে বানাতে, কেউ পশম বুনতে বুনতে পিকনিকের প্ল্যানটা করেই ফেললেন মাদারের সাথে। সিস্টার

সুখলতা নিয়মবহির্ভূতভাবে সিস্টার লুসিয়ার বিছানায় গেছিলেন, সেটা নিয়ে ক'দিন আশ্রমে বেশ অশান্তি হয়েছে। এখন আবার সবার মুখ প্রশান্ত।

এই শীতকালে ওয়াজ বাড়ে। গ্রামের লোকের হাতে ধানচালের পয়সা আসে, পয়সা এলেই ঈশ্বরভাবনা চাগিয়ে ওঠে। বাইরে মাঠে আব্দুহুদের সাথে ফুটবল খেলে এসেছে মোজেস, এক হাঁটু ধুলো। মোজেসকে হিহি শীতে কাঁপতে কাঁপতে সাবান রগড়ে স্নান করিয়ে দিতে দিতে রেবতী কান পাতলো– "বিদায় হজ্বের ভাষণে আমার নবী এরশাদ করলেন 'তারাকতু ফীকুম আমরাইনি লান তাদ্বিল্লু মা তামাস্সাকতুম বিহিল্লাহ কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতা রাসুলিহী'... অর্থাৎ কিনা হে মানুষ! (হাঁক) তুমি কোরআন হাদিস আঁকড়াইয়া রাখিও, তাইলে পথভ্রষ্ট হবা না। অথচ আমার 'আহলে বয়াত' ছেড়ে, কিতাবাল্লাহ ছেড়ে বান্দা তুমি কাফেরদের দিকে চলে গেলে (কান্না)... তুমি কি আমার পোতি ইনসাফ কল্লে? (হাঁক) তুমি কি নিজের পোতি ইনসাফ কল্লে? (হাঁক)। এই যে এরা বিদেশী সাহায্যের পাহাড়ের উপর বসিয়া তুমাদের কিতাবুল মুকাদ্দস পড়ায়, ইঞ্জীলশরীফের কথা বলে ভাঁওতা দেয়! হে উম্মতে মুহাম্মদী (হাঁক)! তুমাদের আসমানী কিতাব দিয়েছি আল কুরআন যার যের-যবর পর্যন্ত চেঞ্জ হবে না এই গ্যারান্টি আমি দিয়েছি অথচ তোমরা পাদ্রীদের লেখা কিতাব পড়ে জাহান্নামের রাস্তায় চলে গেলে... জাহান্নামীর সংখ্যা বাড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে এই গীর্জা। এই পাদ্রীরা এই মিশনারীরা আমাদের পবিত্র মাটিতে শয়তানের কারখানা চালু রেখেছে। আসমানী কিতাব ইঞ্জীলের নাম করে এরা খ্রীস্টান চার্চগুলি ইসা মসীহ আর মাতা মরিয়মের প্রতিমা দিয়ে সাজায়েছে।" মোজেসের গায়ে সাবানের ফেনা শুকিয়ে আসছিল, সে তাড়া দেয়। রেবতী তাড়াহুড়োয় দুই মগ জল ঢেলে ধুইয়ে দেয় তাকে। মোজেসের গা গামছায় মুড়িয়ে তাকে ঘরে এনে সবেগে মুছতে থাকে। আর শোনে– "বলেন, এই কী সুবিচার আপনাদের? এই কী ইনসাফ আপনাদের? চোখ খুলে দেখেন– এরা তাওহীদ ও শরীয়ত পরিপন্থী। এরা ব্যভিচারী। এরা শেরকী। এরা গোটা দুনিয়াকে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানিয়ে দিচ্ছে অথচ এতটুক ফিকির করছেন না! আপনার ইচ্ছা করে না, এই ইবলিসের কারখানা বন্ধ করে তালা লাগায়ে দিই? এদেরকে ঈমানের আগুনে পুড়ায়ে দিই?" আবার আগুন! বছর চল্লিশেক আগে গীর্জার চত্বরে সদলবলে এসেছিল অতুলবাবুর বড়দা প্রতুলবাবু, লোকে বলতো সে নকশাল হয়ে গেছে। প্রতুলবাবু খুব চিৎকার করে জানিয়ে গেছিল, চাষাদের জমি কেড়ে নিয়ে এই গীর্জা হয়েছে, এই চাষের জমি ভুখা নাঙ্গা মানুষগুলিকে ফিরিয়ে দেয়া হোক। নইলে দলেবলে এসে অচিরেই ওরা ওদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেবে। রাতে গীর্জার ভেস্টিবুলে আগুন দিয়েছিল কারা এসে। তখন কাঁটামেহেদির বেড়া মুড়িয়ে দেয়াল তোলা হলো। প্রতুলবাবুকে পরে পুলিশ নিয়ে গেছিল শোনা যায়, পুলিশ-হেফাজতেই ওর মৃত্যু হয়। মাদারের কাছে এসে উদ্বেগের মুখে আজ অনেক কথা বলে ফেলছিল রেবতী। এই নিত্য-উপদ্রব তো সে বহুকাল হয় দেখছেই দেখছেই। হলুদ আলোয় মাদারের মুখে

কোনো রেখা নেই, যেন হলুদ রেণু গুলে মাখিয়ে রেখে গেছে কেউ তাঁর মুখ। শুধু মৃদুগলায় বললেন, "রেবতী, পাতকুয়াটা তুমি বন্ধ করেছিলে তো?"

রেবতী চমকে উঠে জবাব করলো– "বন্ধো আছে। রুপবান টিন দিয়া চাহিছিনু আগত। পরে সিমেন্ট দিয়া পাকা করি দিছিনু।"

মাদার বিমনা, হাতের আঙুলদুইটিতে শালটায় চিমটি দিয়ে ভাঁজ দিচ্ছেন, যেন পুলি বানাবেন, সাধু ফ্রান্সিস বলে গেছেন, শতবার অন্যমনস্ক হলে শতবার লোকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে– সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা। অবশেষে ধীরে ধীরে বল্লেন– "ক্রোধ লুসিফারের গুণ, প্রতিশোধ নেবার তাগিদ লুসিফারের গুণ। শত্রুকেও ক্ষমা করে দিতে হবে, তার অপরাধের ভার নিতে হবে। যে ভার নিয়েছিলেন সেই যীশু যিনি সশরীরে স্বর্গে গেছেন।" আশ্রমের মেয়েরা আজকাল ছাঁচে ঢেলে লাল-সবুজ-ক্রিমরঙা মোমবাতি বানাচ্ছে, জরির ফুল বানাচ্ছে, ক্রিসমাস আসছে সামনে। টফি আর কেকের গন্ধ আধা-গেঁয়ো বাতাসে। মসজিদের ওয়াজ চার দিগন্তের দালানে দালানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে– "শীতকাল মোমিনের বসন্ত। কেন বলেন? কেননা তা বরকত বয়ে আনে! বড় রাত কি খালি বিবি নিয়া বিছানা গরম করার? নাআআ, বায়হাকি শরীফ মোতাবেক, তা 'কিয়ামুল লাইল'এর জন্য, রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য। আর ছুটো দিনে রোজা রাখতে সোজা! আলহামদুলিল্লাহ!" এইসব শোরগোলের ভেতরই মাদার রেবতীর দিকে পরিষ্কার চোখে তাকালেন, কাঁটার মতো দৃষ্টি। একটি রেখার দুই বিপরীত প্রান্তবিন্দুর মতো ওরা তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত একে অপরের দিকে, প্রিয় গীর্জা আর আশ্রমকে সকল ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচিয়ে রাখবার একটি নিঃশব্দ শপথ নিল যেন দুই অসম মিত্র। ঐ একমুহূর্তই। পরিমল প্রতিবছর খেজুরগাছটায় বেথেলহেমের তারা টাঙায়, ঘুড়ির কাগজের ভিতর আলো জ্বেলে তৈরি করা তারা; মাদার সেইসবের তদারকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, রেবতীকে হুকুম করলেন–গীর্জায় ঢুকবার পথে বাঁদরলাঠি গাছের সারিগুলিতে টুনিবাতি ঝোলানো চাই, যেন স্বর্গে ঢুকবার পথে আলোর গাছ।

রেবতীকে বিদায় করে দিয়ে মাদার সুপিরিয়র বাগানে নামলেন, ওঁর মাথায় বিদ্যুৎ খেলছে। তিনি রেবতীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন খ্রীস্টবাণী– ভালমন্দ সকলের ওপর ঈশ্বরের সূর্যালোক বর্ষিত হয়, পাপী-পূন্যবান সকলের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই আলো এই বৃষ্টি কি সিস্টার লুসিলকে ধরে নিয়ে যাওয়া লোকগুলোর জন্যেও ছিল? সিস্টার লুসিল কি ক্ষমা করতে পেরেছিলেন তাঁর নির্যাতকদের? মঠের নিঃসীম স্তব্ধতায় তিনি নির্বিঘ্নে জন্ম দিয়েছিলেন একটি শিশুর, সেই শিশু বুকে 'সেন্ট অ্যান্থনি'র একটা সোনালি ধুকধুকি ঝুলিয়ে চলে গেছিল শ্বেতাঙ্গ বাপমায়ের কোলে করে। সিস্টার লুসিল বেশিদিন বাঁচেননি, ছোট্ট চ্যাপেলটিতেই পড়ে রইতেন, বিড়বিড় করতেন ছড়া, কারো সাথে কথা বলতেন না! মাদার জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁদের তৎকালীন মাদারকে, "সিস্টার লুসিল কি পাগল?" আর তিনি জবাবে বলেছিলেন "কাউকে 'পাগল' ডাকতে থাকলে তার অবচেতন মন বাতিঘরের আলোর মতো শব্দটার ওপর আছড়ে পড়ে, এই শব্দ ব্যবহার করতে নেই।" ঐ মোজেসের মতো করেই মাদারের সেদিন মনে হয়েছিল, কেন আমরা

গোলাগুলির শব্দ শুরু হবার পরেও মনাস্টারিতে থেকে গেলাম মাদার? কেন আপনি বললেন প্রার্থনার শক্তিতে সব অশুভ দূর হবে? গোটা গ্রাম পালিয়ে গেল, আমরা পঁচিশজন কেন অবিরত প্রার্থনা করতে থেকে গেলাম? সেদিনের মাদার আজকের মাদারকে কী বলতেন তা তিনি জানেন, মনে করিয়ে দিতেন ওঁরা যে পারপেচুয়াল অ্যাডোরেশনের সন্ন্যাসিনী, চব্বিশ ঘন্টা, সপ্তাহের সাত দিন, বছরের ৩৬৫ দিন ওঁরা আরাধনা করে যাবেন, তাইই নিয়ম। ঝড়-ঝঞ্ঝা আসবে, মারী-মড়ক আসবে, মহাযুদ্ধ লাগবে বাইরের পৃথিবীতে, কিন্তু মঠের আরাধনা চলবেই, চলেছেই। কত লক্ষ লক্ষ মানুষের রোগমুক্তি আর দুর্দশালাঘবের জন্য প্রার্থনা করেছেন ওঁরা। প্রার্থনাই আরোগ্যের পথ। একদিন সেই 'কুহর' পাখির মতো ফড়ফড়িয়ে আত্মা উড়ে গেল সিস্টার লুসিলের। সিস্টার লুসিল মারা যাবার পরে মাদার গান লিখেছিলেন একটা– "এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন, ক্ষমা করো তারে সদাপ্রভু সে যে মোদের আপনজন।"

গ্রামে গ্রামে প্রভুর পুত্রের জন্মবার্তা রটে গেল ক্রমে, প্রতি ডিসেম্বরের শুরুতেই যেমন যায়, কীর্তন শুরু হয়ে যাবে... 'শুভদিন এলো রে, ভবে হলো সুপ্রচার/ ঈশনন্দন যীশু ভবে হলেন অবতার'। টিনের বাক্স হাতে-গলায় কীর্তনের দল পাড়ার ঘরে ঘরে যাবে, কেউ টাকা দেবে, কেউ বসিয়ে দুটো পিঠা খাওয়াবে। পিঠা তৈরির ওস্তাদ খ্রীস্টান মেয়েরা দিনরাত এসময় হাত চালায়, তাদের হাতের ভেজা-পিঠার মতোই ভক্তিরসে ফুলে উঠবে সকলের মন, এর কতটা ভক্তি আর কতটা আনন্দ কেউ তার তৌল করবে না। গীর্জায় খড়ের কুঁড়েঘর গড়া হবে, তাতে মাটির পুত্তলি যীশু-মেরী-যোসেফ আর ব্যগ্র গরুভেড়ার দল, যীশুর জন্মস্থান সেই গোশালঘর যত্ন করে আলো দিয়ে সাজানো হবে। বড়দিনের রাতে মাটির হাঁড়িতে করে বারুদ রেখে উঠানে বাজি পোড়াবে বাজিকররা। আর একটু বাংলা মদ, উৎসবের লালিমা। এই তো দেখে এসেছে রেবতী, দেখে এসেছে সুনীল।

হুমকিটা এলো বিশপ বার্নার্ড ডি কস্তার মোবাইলে। এসএমএস আকারে। পরদিন স্থানীয় পুলিশের কর্মকর্তা এলেন কয়েকজন পুলিশ সহ। সকালের প্রাতরাশ করলেন ওঁরা, পাউরুটি-কলা-ডিম-ভাজি আর চা-কফি। আশ্বস্ত করলেন আশ্রমের মাদারকেও, দু'তিনজন পুলিশ অবশ্যই স্থায়ীভাবে গীর্জার প্রহরায় মোতায়েন করা থাকবে। তবে খ্রীস্টজাগের অনুষ্ঠান রাতে না হওয়াটাই তাঁদের জন্য মঙ্গল, সেটা জানালেন পুলিশের বড় অফিসার রকিবুল আলম। গীর্জায় জমায়েত হলো 'জাগরণী' আর 'ফাতেমা রাণী' ধর্মপল্লীর সজ্জনদের, 'কলকাকলি' মাইনর স্কুল আর 'ধানজোড়' প্রায়োরি স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকাদের। সাব্যস্ত হলো বড়দিনের আগের রাত্রির তাবত আনুষ্ঠানিকতা পালিত হবে সেদিনের বিকেলে, দস্তুরমাফিক রাত্রিবেলা নয়। আর মোমবাতি হাতে আলোর মিছিল হবে না। মাদার সুপিরিয়রের চোখে নাকি কাঁটা কম্পাস আছে, বলে সিস্টাররা, ইস্কুলের শিক্ষিকারাও বলে, একবার তাকিয়েই পরিমাপ করে নিতে পারেন...ওজন করে নিতে পারেন মানুষের, ভিতরটা অব্দি খুঁচিয়ে দেখে ফেলেন। মাদার যখন সিস্টারদের অভয় দিলেন, স্থানীয় প্রশাসনের আন্তরিক সহায়তার কথা বললেন, স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারার কথা বললেন, আশ্রমের মেয়েরা বিশ্বাস করলো যে তারা নিরাপদ। তারা

ক্ষুন্নমনে বিকেলবেলা খ্রীস্টজাগের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। রেবতী চল্লো গাছগুলো থেকে টুনিবাতির ঝালর নামাতে, রাতে কেউ না এলে কে আর দেখবে এই আলোকসজ্জা। এ'রাতের খ্রীস্টজাগের ঘন্টা বাজাতো তার বাপ, কতকাল আগে। ক্যারল গাইতো তারা ভক্তিভরে। সিস্টারদের ক্ষার কাচবার জন্যে কলাগাছের ছাল পোড়াতো সুনীল সরেন; বগী-থালার আকারের পাঁপড় ভাজা হতো বড়বাজারের মুখে, সিস্টাররা চায়ের সাথে খাবেন বলে মাঝে মাঝে খবরের কাগজে মুড়িয়ে পাঁপড় আনতো সুনীল। সেই তো বাপের সাথে ঘুরে ঘুরে গীর্জা আর আশ্রমের এই জীবনকে কেন্দ্র করেই রেবতীর জীবন আপূর্যমান। ঘোলাচোখে অন্যমনে সে বসে থাকে বাঁধাকপি ক্ষেতের পাশে। আগে শুধু লোকে ফলমূল চুরি করতেই ঢুকতো... কেমন বদলে যাচ্ছে এই দেয়ালের বাইরের জগত, এত দ্রুত যে দেয়ালের ভিতরটাকেও বদলাতে হচ্ছে। কার ভেলকি? কার কারসাজি? মোজেস একটা পেলাস্টিকের মুখোশ পরে রোদে দেয়া মশলা পাহারা দিচ্ছিল, হাতে গুলতি-ছররা, বাপের মুখভাব সুবিধের নয় বলে সেও উচ্চবাচ্য করে না কোনো। বাতাসে কান পাতলে আবারও শোনা যায় নিরিবিলিতে কেবল ভোমরার গুঞ্জন। ইতিউতি দু'চারটা ক্লান্ত কাকের ডাক।

বড়দিন ধুমধাম করে কেটে গেল, গীর্জা আর আশ্রম ঘুড়ির কাগজের রঙিন শিকলি দিয়ে সাজানো হলো, সুধীজনকে আপ্যায়ন করা হলো গুড়ের পুলি আর পিঠা দিয়ে, জরি মুড়ে দেয়া হলো ক্রিসমাস ট্রিকে মানে ঝাউগাছকে, শিশুরা পেল উপহার। এর একমাস পর পিকনিকও ছোট্ট করে হয়ে গেল আশ্রমের ছাদে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সে এক আশ্চর্য পৃথিবীতে। বিশেষ যত্ন করে সুখলতারা খাবার তৈরি করলেন, বাগানের লেবু দিয়ে লেবুর কেক। সিস্টার সিসিলিয়া করলেন মালাবারের পরোটা। এমনিতে দারিদ্রের প্রতিজ্ঞাও সন্ন্যাসিনীদের একটি প্রতিজ্ঞা, ফলে সারাবছর অসচ্ছল মানুষের মতো করে খেতে হয় ওঁদের। অনেকদিন পর প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল সবাইকে। মাদার গল্প করছিলেন বিলেতি সিস্টার এমিলির, যিনি পাউরুটি ফলের রসে ভিজিয়ে সামার পুডিং বানাতেন, চুরি করে একবার সেটা খেয়ে ফেলেছিলেন সিস্টার দীপশিখা। বড়রা খাবারদাবারের পরে চা-কফি খেলেন, ছোটরা কোকো। সামান্য নাচগান হলো নিজেদের মতো করে, দর্শক বলতে নিজেরাই। মোজেসের সাথে গীর্জার ছাদ থেকে ঘুড়ি ওড়ালেন নভিসরা। অতুলবাবুর হোমিওপ্যাথির কল্যাণে মোজেসের ভোরবেলার কান্নাকাটি কমেছে। স্বাস্থ্যও ভাল হয়েছে আগের চেয়ে। মাথার ওপর তকতকে নীল আকাশে বিকেলের মেঘের গোলাপি গোলাপি পালক। প্রসন্ন চোখে তাকিয়ে দেখলেন মাদার, ঈশ্বরের অনুগৃহীত ভক্তদের মনেও আজ প্রশান্তি।

শর্মিলারা গীর্জায় এলো পরের রবিবার, গায়ে ঝলঝলে নাইলনের শাড়ি, পেট উঁচু হয়ে উঠছে। মাসের পরেও গীর্জাচত্বরে অনেকক্ষণ রইলো ওরা, এই যে পশ্চিমে শিশুদের এত হিতকথা শোনানো হয় না, পূবে হয়, এইসব আলাপ। 'সুশীল বালক' বানাবার মতো করে হিতোপদেশ নয়, আরেক রকম করে দেয়া উচিত... যেখানে শিশু নির্মলতাকে শুভকে জানবে, কাম্য হিসেবে শিখবে, ত্যাগের মহিমা যে সত্যিই আছে তা চাক্ষুষ

দেখবে। এইসব বলতে বলতে শর্মিলা আলগোছে জেরেমির বউয়ের হাতের সোনার চুড়িটা নেড়েচেড়ে দ্যাখে। পিটপিট করে তাকিয়ে মোজেস শোনে, মোজেসের বাপও শোনে। তারা কেউ তেমন কিছু বোঝে বলে মনে হয় না।

মোজেসকে সুলেমানবাহিনীর লোকরা ধরে নিয়ে গেল তার পরের সপ্তাহে, ঐ চ্যাংড়া বন্ধু আব্দুহুর সাথে মাঠে খেলবার সময়ই। গীর্জা আর আশ্রমকে দুষ্পাচ্য বিষের বালির মতো করে গিলছিল আশ্রমের চারদিকের চালাঘর- ছাপড়া মসজিদ- কলতলা- গ্লাস ফ্যাক্টরি- হোমিও হল- আখের ট্রাক- পানাপুকুর, উগড়েও দিচ্ছিল বারবার। প্রতিটা ওয়াজে তারা তো শিখছিল– তাদের গ্রামগুলিতে মেয়েদের সাবান-শ্যাম্পু-লোশন-তেল-কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান দেয় খ্রীস্টান পাদ্রীরা, বাচ্চাদের খেলনা পুতুল-জন্মদিনের কেক- বাদলায় রেইনকোট আর শীতের কম্বল দেয় পাদ্রীরা, প্রত্যেকটি ধর্মান্তরিত শিশুর একটি করে বিদেশী শিশুর সাথে দোস্তালি, এরা পত্রমিতালি করে, এরাই শিশুদের ভবিষ্যত প্রেমাস্পদ... একদিকে এতকিছু আরেকদিকে কেবল জশনে সঙ্গতিহীনের সমবায়ে প্রস্তুত ভিক্ষান্নের খিচুড়ি- সাথে জবাইয়ের একপিস গোস্ত। অতকিছু কি আর মোজেস বোঝে, সে কি বোঝে অত অপরিমিত বিদ্বেষের আকার? শীতশেষের সন্ধ্যাবেলা সে আর ফিরলো না, যেসব শীতের সন্ধ্যায় মোজেসের দাদা সুনীল সরেন মোজেসের বাপ রেবতীকে কিচ্ছা শোনাতো– এমনি সাঁঝের কালে নাকি সোনা রায়ের নাম শুনলে মুখ থেকে গাইগরু ফেলে দিয়ে বাঘ পালাতো!

সুনীল সরেন বুড়ো বয়েসেও মাঠে দুর্বা বুনতে বুনতে মিহি গলায় গাইতো, 'যেমন তোমার মা ফতিমা তেমন আমার দূর্গা শ্যামা'...আর কাঁচাবয়েসের রেবতীও বাপের সাথে গলা মেলাতো। কবে কখন রাতের বাতাসে প্রেমজুরি বাজিয়ে নেচে নেচে গাওয়া মারফতি গানের আওয়াজ কমে এসেছে কেউ টেরও পায়নি, রাতজাগা পিটার কিংবা পরিমল কেউই না। ওয়াজের মৌসুম ফুরায়, দালানে দালানে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে ফিরে আসে হুজুরের গর্জন– "এরা নিজেগো কয় ঈসায়ি মুসলমান! হায়! না খুদা হি মিলা, না বিছালে সনম! এইদিকেও না, ঐদিকেও না। কাউয়াও না, কবুতরও না।" এই কয়দিনে মোজেসের বাপ কোথায় না গেছে। গীর্জায় যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে বসন্তের দাগধরা রেবতী চোখের জল ফেলেছে এমন যেন জলভরা স্পঞ্জ থেকে কেউ চিপড়ে জল বের করছে, হে প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর। ঢেলা পীরের দরগায় গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে শিন্নী মেনে এসেছে। নেত্রমণির দীঘিতে জ্বিন থাকে, টেনে নিয়ে যায় ছোট ছেলেপুলে, প্রয়োজন ফুরালে ফিরিয়ে দেয়, সেখানে গিয়ে কত বসে থেকেছে। বুড়ো আসলামের পরামর্শে খুররম শাহের মাজারে মোমবাতি জ্বেলেছে। মাদার জানতে পারলে কী করবেন তার মনেও আসেনি। আর গেছে থানায় ধরনা দিতে।

একদিন রাতে মোজেসের জামাকাপড় বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রেবতী। হঠাৎ তার চটকা ভেঙে গেল কীসের শব্দে। বসন্তের মাতলামি লেগেছে, গাছগুলির পাতা পত-পত করছে রাতের ঈষৎ উদ্দাম বাতাসে। রূপবান টিনে বাতাসের ঝনঝন শব্দ। কুয়ার দিক থেকে আসছে। পায়ে পায়ে রেবতী বাইরে এসে দ্যাখে, বাঁধাই কুয়ার মুখে সেই

চুলবাঁধার ভঙ্গিতেই অ্যাগ্নেস বসে আছে। চাকায় ফেলে গড়া মাটির কুপির মতো দপদপ করে জ্বলতো অ্যাগ্নেসের চোখ, জ্বলছে না। মুখেচোখে বড্ড ছেনালি ছিল তার, কই, অ্যাগ্নেসকে দেখাচ্ছে ফাতেমা-রাণীর মতো নির্মলহৃদয়া। তাকে দেখে কী যেন হয়ে গেল রেবতীর, ভেউভেউ করে কাঁদতে লাগলো সে, কুকুরের কান্না। অ্যাগ্নেস মায়ায় ভরা মুখ নিয়ে তার কান্না দেখতে লাগলো। একসময় নিজের অশ্রু-লালা-সর্দি মুছতে মুছতে রেবতী জিজ্ঞেস করলো, "তোক মুই মারি ফেলাইছিনু দেখি তোর আর রাগ নাই?"

ছাতার কালো কালো শিকের মতো আঙুল খেলিয়ে অ্যাগ্নেস মাদার সুপিরিয়রের গলায় বল্লো– "না, আমার রাগ নাই। ক্ষমা আর মাজ্জনাই শক্তির পরম পোকাশ।"

রেবতী ফুঁপিয়ে উঠে বল্লো, "মোর আইজ চ্যাংড়াও নাই!"

অ্যাগ্নেস কেমন করে যেন হাসলো। সান্ত্বনার মতো করে। বল্লো– "ফের হবে!" বলেই ঢেউটিনের ঢাকনাটা খুলে কুয়ার ভিতর লাফ দিল। মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট। পুণ্য পুণ্য পরমেশ্বর। তোমার দেহ আর রক্ত দ্বারা পাপ ও অমঙ্গল হতে আমাকে রক্ষা কর। তোমা হতে আমাকে বিচ্ছিন্ন কোরো না।

একটি সর্বজনবোধ্য কোনো বীভৎস কৌতূকের মতো করে রেবতী তার ছেলে ফিরে পেল পরদিন। গীর্জার ফটকে কে ফেলে গেছিল তাকে। আদুল গায়ে বড় বড় নীলে পড়া ক্ষত, মুসলমানি করে দেয়া নুনু। অতুলবাবু ছুটে এলেন, নাড়ি ধরে দেখলেন মোজেস জীবিত আছে, রক্তে-পূঁজে-ধুলোয়-কাদায় আচ্ছন্ন সেই ছোট্ট শরীর বুকে নিয়ে রেবতী সরেন বুকফাটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো, বাইবেলে তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল পুনরুত্থান আর পুনরাগমন, অত ভালবাসার যীশু কি মানুষকে ছেড়ে যেতে পারে! ঈশ্বরের পুত্র, সংসারের ত্রাতা, সংসারের এত পাপ মানুষ সাঁতার দেবে কী করে তাঁকে ছাড়া! তাঁকে যে ফিরতেই হবে।

লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সালমা বাণী

নতুন একটি গল্প লেখার সময়

নতুন ধরনের গল্প চাই। একেবারে নতুন। যে গল্প আগে কখনো লেখা হয়নি। মোবাইল ফোনের ওপাশ থেকে এভাবে বললো এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক অনবদ্য সকাল। সাহিত্য সম্পাদক হওয়ার পর অনবদ্য সকাল বাবা মায়ের দেয়া নাম নূরুল ইসলাম খামবন্দি করে রেখে দেয় তিনখানা মূল্যবান সার্টিফিকেটের সাথে। এবং পত্রিকা অফিস থেকে শুরু করে সাহিত্যপাড়া বা লেখকদের আড্ডা অথবা পাঠকদের কাছে সব জায়গাতে অনবদ্য সকাল হয়ে ওঠে। একজন সাহিত্য সম্পাদকের নাম হওয়া উচিত শ্রুতিমধুর, কাব্যিক এবং আধুনিক। আর কবি সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি জরুরি বলেই মনে করে অনবদ্য সকাল। ঈদ সংখ্যার গল্প চাওয়ার সময় অনবদ্য সকাল অফিসের বড় কর্তার মতো জহির আহমেদকে বলে- আপনাকে কতবার বললাম এই ব্রিটিশ আমলের নামখানা বদলান, কথাই শুনলেন না। এই নামে কি আর আজকাল জনপ্রিয়তা পাওয়া যায়? এই নামে জনপ্রিয় হতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো পঞ্চাশ পার করতে হয়। সে যাক সেটা আপনার ইচ্ছা। আপনার গল্পগুলো খুব একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। শুধু আপনার না। প্রায় সব লেখকেরই। কী সব একই প্যাঁচালপাড়া গল্প- বেকার, চাকরি নাই, রিকশার ভাড়া নাই, বাস-টেম্পু-লেগুনাতে ঝুলাঝুলি, রাস্তায় দাঁড়ায়ে চা খাওয়া, সিগারেটের প্যাকেট খালি, শাহবাগ, গণ আন্দোলন, ফেসবুকে স্ট্যাটাস নিয়া ফাউল তত্ত্ব আর সেলফি আপলোড। শোনেন অভাব, অনটন, দুঃখ কষ্ট এই সব গল্প এখন একেবারে বোরিং। মোবাইল ফোন কানে চেপে ধরে জহির আহমেদ ওপাশে নীরব থাকে।

কী ব্যাপার কথা বলেন না যে জহির? আপনি আছেন লাইনে?

জ্বী শুনছি, আছি, শুনছি, বলেন অনবদ্য ভাই।

লেখকদের বুঝতে হবে পাঠকরা কী চায়। এখনকার পাঠকরা চায় এন্টারটেইনমেন্ট, এন্টারটেইনমেন্ট, এন্টারটেইনমেন্ট। সহজ কথায় বিনোদন। বই পড়া কেন একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে বলতে পারেন? কারণ বইয়ের চাইতে মুভি, সিরিয়াল, নাটক এসব অনেক বেশি এন্টারটেইনিং। সুতরাং পাঠক হারিয়ে যাচ্ছে ওসবের ভেতর। সামান্য যেটুকু বইয়ের মার্কেট আছে সেটা বাঁচিয়ে রেখেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণরা। উচ্চবিত্ত শ্রেণির তরুণরা বাংলা গল্প-উপন্যাসের পাঠক না। ওরা পড়ে ইংলিশ ফিকশন।

একটানা দীর্ঘ কথা বলে অনবদ্য সকাল জানতে চায়, আছেন লাইনে জহির?

জ্বী আছি, জ্বী, শুনছি আপনি বলেন- জহিরের কণ্ঠে বিনয়।

এই রকম চুপ করে থাকলে তো আমি আপনার ওপিনিয়ন ঠিক বুঝতে পারছি না। শুনছেন নাকি শুনছেন না সেটা তো বুঝাতে হবে।

না, না, আমি খুব কেয়ারফুলি শুনছি। আপনি বলেন।

কানের ওপর থেকে মোবাইলের সেট সরিয়ে নিয়ে এবার জহির স্পিকার অন করে। সাহিত্য সম্পাদক বলে কথা, কোন রকম তর্ক বিতর্ক এখন বোকামি । তার কথা মতো লিখে যদি ঈদ ইস্যুতে একটা গল্প ছাপানো যায়!

হ্যাঁ যা বলছিলাম শোনেন জহির, এবার ঈদ ইস্যুতে একটাও মনোটোনাস গল্প নেবো না সে যত বড় লেখকই হউক না কেন। কনটেমপোরারি ওয়ার্ল্ড ক্লাস মডার্ন গল্প চাই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি। যাই লিখবেন ওপেন ল্যাখেন। লাভস্টোরির ডিমান্ড ফরএ্যাভার। লাভস্টোরি ল্যাখেন। ইয়াংস্টারদের নিয়ে ওপেন লাভস্টোরি দেন কিন্তু কেয়ারফুল বেশি র' দিয়েন না, আর হ্যাঁ রাজনীতি ও ধর্ম এই দুটো নিয়ে কিছু লিখবেন না। এখন এই দুইটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস। এই দুইটা টাচ করা যাবে না কোন অবস্থাতেই, মনে রাখবেন।

আছেন?

জ্বী শুনছি,

ধুর মিয়া এত্ত কই আওয়াজ দিয়েন, আচ্ছা, যা কইতেছিলাম আজকালকার রিডারদের যদি ধরতে হয় তাইলে ওদের সাইকোলজি বুঝতে হবে। মধ্যবিত্তের দুই চোখ ভরা একটাই স্বপ্ন উচ্চবিত্তে পৌঁছানোর। দ্যাখেন না উচ্চবিত্তে পৌঁছানোর জন্য দিনরাইত কী হ্যাঁচড়াহেঁচড়ি, পাছড়াপাছড়ি করে? বাস্তবে সেই বিত্তে প্রবেশ করতে না পারলেও গল্প উপন্যাসের ভেতর দিয়ে ওরা সেই সমাজের একজন হয়ে উঠতে চায়। সে কারণে উচ্চবিত্তের জীবন নিয়ে যা কিছু লিখবেন সেটাই হিট। সমস্যা হচ্ছে আমাদের লেখকরা সবাই উঠে আসে মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। আর এই কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাইরে বের হয়ে উচ্চবিত্ত শ্রেণির জীবন নিয়ে কিছুই লেখতে পারে না।

কি জহির আপনি একমত আমার সাথে?

জ্বী অনবদ্য ভাই, নিশ্চয়, আপনি মধ্যবিত্তের সাইকোলজিটা দারুণভাবে ধরতে পেরেছেন! সত্যি আপনি জিনিয়াস অনবদ্য ভাই, এই কারণে আপনার সাহিত্যের পাতার এত পপুলারিটি আজ।

তো আপনি এক কাজ করেন, কয়েকদিন গুলশান, বনানী এসব এলাকায় ঘুরাঘুরি করেন। উচ্চবিত্তদের বাড়ির ভেতরে ঢোকা অথবা ওদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা সহজ কাজ না। মধ্যবিত্ত খুউব ইজিলি যে কোন বিত্তে মিশতে পারে। কিন্তু ওরা! উচ্চবিত্ত, খুউব কঠিন, ওরা ওদের বৃত্তের বাইরে মিশতে চায় না। এ্যাট লিস্ট যে সব জায়গাগুলোতে ওরা আড্ডা দেয় যেমন ধরেন কফি শপ, শপিং প্লাজা, রেস্টুরেন্ট এইসব। এ্যা...এ্যা...রেস্টুরেন্ট অনেক এক্সপেনসিভ হয়ে যাবে আপনার জন্য, নতুন গল্প পাওয়ার বেস্ট প্লেস হলো কফি শপ ... উচ্চবিত্ত শ্রেণিটা বেশ কতগুলো কালচার

ইন্ট্রোডিউস করেছে আমাদের দেশে, তার মধ্যে কফি কালচার বলতে পারেন ওয়ান অফ দ্যা বেস্ট। ও হ্যাঁ, আপনি কখনো গ্লোরিয়া জিন্সে গ্যাছেন?

জ্বী না, ওখানে যাওয়া হয়নি।

জানতাম, আরে ওখানে কি আর আপনার মতো লেখকরা যেতে পারে! যান, যান, ওখানে গিয়ে বসে থাকেন। ওটা এখন গুলশানের মোস্ট পপুলার কফি শপ। এক কাপ কফি নিয়ে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকবেন। গুলশান বনানীর উচ্চবিত্তদের সাইকোলজি বোঝার জন্য ভেরি ইন্টারেস্টিং জায়গা। একটু এক্সট্রা পয়সা খরচা হবে, কিন্তু কী আর করা! যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবেন সেটা হবে প্রাইসলেস।

অনবদ্য সকাল আচ্ছা রাখছি বলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে জহির আহমেদের দুই ভ্রুর মাঝখান কুঁচকে যায় এবং গভীর ক্ষতের মতো রেখা স্পষ্ট হয়। দুপুর বারোটা, অথচ বাইরে সন্ধ্যার মতো অন্ধকার। সেই সাথে থেকে থেকে আকাশ ফাটানো বিদ্যুৎ। গাছেদের ডালপালা দুমড়ানো-মুচড়ানো দমকা হাওয়া আর শহর ভাসানো বৃষ্টি।

প্রায় দু'ঘন্টা বৃষ্টি ছাড়ার অপেক্ষায় জানালায় দাঁড়িয়ে ক্রমশ অধীর হতে থাকে জহির। গত সপ্তাহে বিয়ের চার বছর হলো। আজও নিপাকে নিয়ে সংসার পাতা হয়নি। তার নিজের যা বেতন সেটা দিয়ে রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর এলাকায় কোন মতে এক বেডরুমের একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে আড়াইজনের সংসার হয়ত চালানো যাবে। কিন্তু বাদ বাকি খরচের দায়দায়িত্ব? গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ বাবার চিকিৎসা, ভাইবোনদের পড়ালেখার খরচ?

নিপার চাকরি রাইজিং সান কিন্ডারগার্টেনে। মায়ের বাড়ী থেকে হাঁটা পথ। নিপার মায়ের বাড়ী ফতুল্লা। মায়ের বাড়ীতে থাকার কারণে নিপা যখন ক্লাস নেয় তখন তাদের তিন বছরের মেয়ে কথামালার দেখাশুনা নিয়ে ভাবতে হয় না। বিয়ের পর থেকে নিপা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যদি মোহাম্মদপুর অথবা মিরপুর এলাকায় একটা চাকরি জোটানো যায়। তাহলে দুজন একসাথে সংসার করতে পারত। কবিতা লেখাই জহিরের প্রিয় কিন্তু একটা কবিতার জন্য পাওয়া যায় মাত্র আটশ অথবা হাজার টাকা আর গল্পের জন্য দুই অথবা আড়াই হাজার। ইদানিং জহির তাই গল্প লেখার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। বেশ কয়েকটা গল্প লেখা আছে। সারাদিন পত্রিকা অফিসের কাজের শেষে রাত জেগে গল্পগুলো লিখে জমিয়ে রেখেছে ঈদ সংখ্যায় দেয়ার জন্য। যেন সম্পাদক চাওয়া মাত্র দিতে পারে। কিন্ত এখন সম্পাদকের নতুন ফরমায়েস।

বৃষ্টি একটু ধরে এলে জহির ঘর থেকে বের হয়ে আসে। বাসা থেকে বের হয়ে জহির সাধারণত হেটেই আসে লেগুনাস্ট্যান্ড বা বাসস্ট্যান্ডে। কিন্তু বিরতিহীন বৃষ্টিতে ঢাকা শহরের সমস্ত রাস্তা এরই ভেতর তলিয়ে গেছে।

রায়ের বাজার থেকে লেগুনাস্ট্যান্ডে আসার জন্য আজ জহির রিকশা ডাকে। বাতাসের দাপটে রিকশার পলিথিন উড়ে যেতে চায়। লাফিয়ে লেগুনায় উঠে একেবারে ডান কোণায় এগিয়ে যেতে উদ্যত হতেই বেখেয়ালে ছাদের রডের সাথে তীব্র এক ধাক্কা লাগে তার মাথায়। যন্ত্রণায় মাথায় হাত দিয়ে ধপ্ করে লেগুনার বাম পাশের সিটের

ওপর বসে পড়ে। এবং ব্যথাটা সহনীয় পর্যায়ে আসা পর্যন্ত হাত দিয়ে মাথার ওপর ঘষতে থাকে চোখ বন্ধ করে।

নারী পুরুষ সবরকম প্যাসেঞ্জার ওঠে নামে। একটি মেয়ে এলো। হাতে দুটো ফুলের চারা। পলিথিনের ব্যাগে প্যাঁচানো। জহিরের হাসি পায়। মধ্যবিত্তের সৌখিনতা। লেগুনার ঝাঁকিতে ডানে বাঁয়ে দুবার পড়তে পড়তে রক্ষা পায় মেয়েটি। নিজে সামলাতে না পারলে জহিরকে হয়ত সামাল দিতে হতো ভদ্রতা বজায় রেখে। এত ঝাঁকির ভেতরেও সে গাছের চারা দুটোকে সামলে রাখে। আসাদ গেটের কাছে নেমে যাবার সময় প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। জহির মনে মনে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে গালি দেয়- হারামজাদা বাইনচোতগুলা আইজকাল মেয়েদের নামতে দেখলেও থামায় না। গুলশান দুইয়ে এসে একটু ধীর গতি হতেই জহির লাফিয়ে নামে। কয়েকটি রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে গ্লোরিয়া জিন্স চেনে কিনা। পাঁচজন রিক্সাওয়ালার পর ছয় নম্বর জন জানায় সে গ্লোরিয়া জিন্স চেনে। গুলশানের রিক্সাওয়ালাগুলো হলুদ রঙের বিশেষ পোশাক পরে। শহরের অন্য কোথাও এদের পরনে এমন বিশেষ পোশাক নেই। সেই হলুদ পোশাকের পেছনে আবার ব্যবহার করা হয়েছে অনলাইন ব্যবসার বিজ্ঞাপন। হয়ত গুলশানের ভেতরে রিকশা চালাতে পারার সৌভাগ্য হিসাবে এরা নিজের পিঠের ওপরের অংশ ব্যবহার হতে দিয়েছে বিজ্ঞাপনে।

চিলের চোখের মতো ঘুরতে থাকে জহিরের চোখ। আগুনের মতো হলুদ রঙের বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে লেখা গ্লোরিয়া জিন্স। বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। এর কিছুটা দূরে দেয়ালে সাদা অক্ষরে লেখা লা টার্ট। এর অর্থ কী? জহির লা টার্ট এর অর্থ বুঝতে পারে না। তবে যেহেতু নিচেই লেখা বেকারি। মনে হয়ে ফ্রেঞ্চ কোন শব্দ কফি অথবা চা এর সাথে সম্পর্কিত। কঠিন সিকিউরিটি চেক। পকেটের ওয়ালেটটা পর্যন্ত বের করে দিতে হলো নিরাপত্তার খাতিরে। সিকিউরিটি চেক-আপ পার হয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ানোর সাথে সাথে একজন ওয়েটার এসে জানতে চায়- স্যার কোথায় বসবেন? সেকেন্ড ফ্লোর আছে। সেটা ভেরি কোয়ায়েট। ফার্স্ট ফ্লোরে বসতে পারেন অথবা আপনি চাইলে স্মোকিং লাউঞ্জেও বসতে পারেন। জহিরকে দেখে ওয়েটারের মনে হতেই পারে সে কোন বড়লোকের বখা ছেলে। উজ্জ্বল শ্যামলা রঙের চেহারার ওপর ঘন পাপড়ি ঠাসা ভাসা দুটো চোখ, খাড়া নাক, তার নিচে দুই দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ। মাথা ভরা এলোমেলো কোঁকড়া চুল। পরনে রঙ ওঠা ফেড জিন্স। পায়ের চটি অনেকটা বড়লোকের সৌখিন ডিপ্রেসড ছেলেদের মতো। জহির দ্রুত দেখে নেয় এক নজরে যতটুকু দেখা যায়। জায়গায় জায়গায় জুটি বাঁধা, দল বাঁধা, নানা পোশাকের উচ্চবিত্তের বিনোদন যাপন। ওয়েটারকে অনুসরণ করে জহির স্মোকিং এরিয়াতে ঢোকে।

স্মোকিং লাউঞ্জে এক ঘর মানুষ কুয়াশার মতো সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে আচ্ছন্ন। দু'একজন কি গাঁজাতেও টান মারছে নাকি! মনে হচ্ছে সিগারেটের সাথে হালকা গাঁজার গন্ধ জড়িয়ে আছে। জহির গন্ধটা নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ছোট ছোট নিঃশ্বাস টানে আর ছাড়ে। যেমন করে ক্ষুধার্ত কুকুর খাবারের গন্ধ শুঁকে তেমন গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে

সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অনেক টেবিল। অনেক চেয়ার। অনেক মানুষের দল। টেবিল ঘিরে দুজন, তিনজন, চারজন, ছয়জন এমনকি এক টেবিলে দশজন মানুষের দলও বসেছে। নানা ধরনের কথা, তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা, হাসি উচ্ছ্বাস সব একসাথে তৈরি করেছে উচ্চবিত্তীয় কোলাহল-হৈচৈ। মৃদু আলোয় মাথার ওপরের কালো রঙের ছাদের ব্যক্তিত্বও প্রবল হয়েছে বটে। টেবিলগুলোর ওপর কোনটাতে কফির কাপ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, বার্গার, কোনটাতে খাবার এখনও আসেনি, কোনটাতে পড়ে আছে উচ্ছিষ্ট।

উচ্চবিত্ত জীবনের গল্প লেখতে হবে। নতুন ধরনের গল্প। জহির খরগোশের মতো পাশের টেবিলের মানুষদের কথায় কান পাতে উচ্চবিত্ত জীবনের গল্প শোনার জন্য। ওয়েটার এসে জহিরের সামনে মেনু দিয়ে গেলে জহির মেনুটা নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে। মেনুর ওপরে বড় বড় ইংরেজিতে লেখা গ্লোরিয়াস ড্রিংকস সিলেকশন। গাঢ় কফি রঙের দুই জোড়া কফি কাপের ওপর ওর দৃষ্টি আটকে থাকে কিছুক্ষণ। এসপ্রেসো, ক্যাপুচিনো, মোকা, ক্যারামেল লাতে, এইসব অপরিচিত নামগুলো সে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে আর সেগুলোর দামের ওপর ওর দৃষ্টি ঘুরতে থাকে। কখনো আবার থমকে স্থির হয় । স্মল সাইজ এক কাপ কফির দাম দু'শ নয় টাকা। রেগুলার সাইজ দু'শ পয়ষট্টি টাকা। এছাড়া আরও অনেক বেশি দামি কফি আছে এই মেনুতে। অনবদ্য সকাল ভাই ঠিকই বলেছে। রাস্তায় পাশে দাঁড়িয়ে চা খাওয়া ছাড়া এই কফি খাওয়ার অভিজ্ঞতা তো তার নেই!

উচ্চবিত্তের জীবনের গল্প পেতে তাকে এখানে বসে থাকতে হবে লম্বা সময়। ন্যূনতম এককাপ কফির অর্ডার না দিয়ে খালি টেবিলে নাটকের দর্শকের মতো বসে থাকার কোনও অনুমতি নেই নিশ্চয় এখানে। সুতরাং সে ওয়েটারের কাছে সর্বনিম্ন দামের এক কাপ কফি অর্ডার দিয়ে পুনরায় উচ্চবিত্তের মানুষদের কথায় কান পাতে। এই স্মোকিং লাউঞ্জে এত বেশি হৈ হল্লা যে গল্প, আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের কিছুই সম্পূর্ণ হয়ে কানে আসছে না। সব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আর এই টুকরো টুকরো হাসি ঠাট্টা, কথার কিছুই আগামাথা পাচ্ছে না সে। প্রতিটি টেবিলে নারী পুরুষ সবাই সিগারেট টানছে। মেয়েদের সবার পরনে টি শার্ট, টাইটস, কোর্তা, জিন্স, সালোয়ার কামিজ, কারোরই ওড়না নেই। শাড়ি পরা মেয়ে একজনও এখনও চোখে পড়েনি জহিরের। জহির ভাবে উচ্চবিত্ত নারীরা কি সব শাড়ী পড়া ছেড়ে দিল! নারী দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য শাড়ী অতুলনীয়। সালোয়ার কামিজ, টাইটস, কোর্তা, টি শার্ট এই সব পোশাকে নারীর সৌন্দর্য যেন পুরোপুরি খোলে না। শাড়িকে অপরূপ করার জন্য শুধু মাত্র একটি শব্দ জড়িয়ে আছে সেটা হলো- নারী। নিপাও কথাটা মানতে রাজি না। এই নিয়ে তর্ক করে। নিপা বলে, শাড়িতে সৌন্দর্য থাকতে পারে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তুমি পুরুষ, তুমি কী বুঝবে? নিপার কথা মনে হতেই খুব মায়া হয় ওর জন্য। আহা ওকে যদি সাথে নিয়ে আসা যেত! আরও কয়েক ঘণ্টা বসে থাকতে হলে সবটুকু কফি শেষ না করে কিছুটা রেখে দিলে ভাল দেখায়।

উচ্চবিত্ত মানুষদের গল্প শোনার জন্য বসে থাকলেও জহির ক্রমশ হতাশ ও অধৈর্য হতে থাকে। কাপের শেষ কফিটুকুও শেষ হয়েছে। পাশের টেবিলে নতুন যারা এসেছে

তাদের অর্ডার দেয়া খাবার এসে টেবিলকে থরে থরে সাজিয়ে তুলেছে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, স্যান্ডউইচ, বার্গার, চিকেন উইং, স্টেক এসব খাবারের গন্ধ দাপটের সাথে বাতাসে জায়গা দখল করেছে। এক কাপ কফি অর্ডার দেয়ার আগে জহির বারবার হিসাব করেছে আর দাম দেখেছে। এক কাপ স্মল ক্যাপুচিনোর সাথে এক কাপ রেগুলার এর প্রার্থক্য ছাপান্ন টাকা। এই হিসাব সে তার মোবাইল ফোনের ক্যালকুলেটরে বের করে এবং শেষ পর্যন্ত এককাপ স্মল কফির অর্ডার দেয় ছাপান্ন টাকা বাঁচানোর জন্য। কারণ এই ছাপান্ন টাকা তার কয়েকদিনের চলার খরচ। পাশের টেবিলের খাবারের অর্ডারের বহর দেখে জহির ওদিকে বেশ কয়েকবার বিস্ময়ের চোখে তাকায়। এই সময় মনোযোগ দিয়ে পাশের টেবিলের কথাবার্তা শোনার জন্য মোবাইল ফোন হাতের তালুতে নিয়ে ফেসবুকের পেজ ওপেন করে। ভাবখানা সে ফেসবুকে তন্ময় হয়ে আছে। মূলত এ সময়ে তার কান পাশের টেবিলের মানুষদের কথা শোনার জন্য খাড়া হয়ে ছিল।

ফেসবুকের ওয়াল ভেসে গেছে বৃষ্টি ডোবা ঢাকা শহরের ছবি আর ভিডিওতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে রিকশা উল্টে খাবি খাচ্ছে মা, তবু সন্তানদের সামাল দেয়ার আহা কি আপ্রাণ চেষ্টা! বৃদ্ধা মা'কে পাঁজাকোলা করে কোলে নিয়ে ছেলে পার হচ্ছে নদীর মতো ঢাকা শহরের রাজপথ। ছেলেকে স্কুলে নেয়ার জন্য টুকরির ভেতরে বসিয়ে মাথায় নিয়ে খাল পার হবার মতো পার হচ্ছে বাবা। এই সব দৃশ্যের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে জহির। ক্রমেই সে ভুলে যেতে থাকে উচ্চবিত্ত মানুষদের আলাপচারিতা শোনার বিষয়টি। হঠাৎ ওর চোখ আটকে যায় একটা ভিডিওতে- বিদ্যুতের তার রাস্তার পানির ভেতরে ছিঁড়ে পড়েছে। তৈরি করেছে মরণ ফাঁদ। সেই মরণ ফাঁদে আটকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে একজন পথচারী। মৃত পথচারীর থেকে কিছুটা দূরত্বে গোলাপি সালোয়ার কামিজ পরা একটি মেয়ে পড়ে আছে। একই তারের মরণফাঁদ মেয়েটিকেও পেঁচিয়ে ধরেছে। অসহায় উদ্বিগ্ন মানুষেরা ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছে। মেইন লাইনের সুইচ বন্ধ করো, বন্ধ করো...। মইরা গ্যালো, মইরা গ্যালোরে, আহারে...আহা...মইরা গ্যালোরে...। মানুষ জমেছে রাস্তার দুই পাশে পিঁপড়ার মতো। কয়েকজন মানুষ কাঠের লম্বা তক্তা জোগাড় করে এনেছে হয়ত আশপাশ থেকে। ভারি কাঠের তক্তা দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছে তারা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। গুঁতিয়ে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে মেয়েটিকে। ভারি তক্তার এলোপাথাড়ি আঘাত কখনো মেয়েটির মাথায়, কখনো মেয়েটির পাঁজরে, কখনো মেয়েটির পিঠে এসে পড়ছে। বারবার কাতর, হতাশ চিৎকার ভেসে আসছে- মেইন সুইচটা কোনহানের। আল্লাহরে মেইন সুইচটা বন্ধ করেন না ক্যান! আপনারা, আয় হায়রে, ব্যাডারাতো মরছে। অহন মাইয়াডাও মরবো। জহির ঝুঁকে মেয়েটির মুখ দেখার চেষ্টা করে।

হ্যাঁ এই রকম গোলাপি সালোয়ার কামিজই তো গতমাসে সে কিনেছে নিপার জন্য বিয়ে বার্ষিকীর উপহার হিসেবে। গোলাপি রঙ নিপার খুউব পছন্দের তাই নিজের পছন্দের কলাপাতা সবুজ অথবা বাসন্তী রঙ বাদ দিয়ে নিপার পছন্দের গোলাপি রঙের

সালোয়ার কামিজই কিনেছে সে । জহিরের নিজের একান্ত পছন্দ শাড়ি তারপরও সে নিপার পছন্দকে গুরুত্ব দেয়। আর নিপার পছন্দের কারণ সালোয়ার কামিজ নির্ঝঞ্ঝাট।

জহির ঝুঁকে মুখটা ভালভাবে দেখার চেষ্টা করে। যতবারই সে মুখখানি দেখে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করে ততবারই ভারি তক্তার আঘাত এসে ধাক্কা দেয় মেয়েটির শরীরে। মেয়েটির মুখটা পানির তলে তলিয়ে যায়। তক্তার ধাক্কাটা সরে যাবার পর মুখটা একটুখানি ভেসে উঠতেই মনে হয় মুখটা নিপার-ই। জহির অস্থির হাতে নিপার নম্বরে ডায়াল করে। ফোনের সুইচ অফ। জহির আবার ফেসবুকের পেজ ওপেন করে। একই দৃশ্য। জহির ভুলে যায় তার অবস্থান। শ্বাস বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ঠেলে। তখনও ওর হাতে ফেসবুকের পেজ খোলা। ভেসে ওঠে গোলাপি সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটির মুখটা সামান্য সময়ের জন্য। মুহূর্তে জহির নিশ্চিত হয় নিপা, নিপা-ই তো, তার বউ নিপা। সে ভুলে যায় ওয়েটারকে ডেকে বিল দেয়ার কথা। ছুটে যেতে থাকে যে পথে এসেছিল সেই দরজার দিকে । পেছন থেকে শোনা যায় ওয়েটারের কণ্ঠ স্যার বিল, বিল, আপনার বিল...স্যার স্যার...। ওয়েটারের কথাগুলো হয়ত জহিরের কানে ঢোকে না। সে দৌড়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। পেছন থেকে শোনা যায় ওয়েটার চিৎকার করছে সিকিউরিটি ধরেন, ধরেন, বিল না দিয়ে পালাচ্ছে, ধরেন...ধরেন...।

অরোরা, অন্ট্যারিও, কানাডা

সীমু আফরোজা

অজানা বেদনা

জানা স্কুল থেকে ফিরেই গোসল করে এসে সোজা যায় রান্নাঘরে, দেখি ও চায়ের পাতিল চুলায় বসাল।

ও প্রায় সব সময় কাজ থেকে ফিরে রান্নার কিছু আয়োজন করে, পরে উপরে যেয়ে কাপড় চেঞ্জ করে। আমরা সবাই মিলে বিকাল আর রাতের খাবার খাই। কিন্তু জানা লিকার চা বানিয়ে আগে খেলো। একটু একটু করে রান্নাটা করছে তবে তাড়াতাড়ি করে যেভাবে করছে তার চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে চায়ে চুমুক দিচ্ছে বেশি। হয়ত গলা খুশ খুশ করছে। যাইহোক, সোফায় বসে আমি টিভিতে সি এন এন দেখছি, বাচ্চারা সব উপরে ওদের ঘরে। প্রতিদিন এত যে মানুষ মারা যাচ্ছে, তার মধ্যে বাঙালি প্রচুর আছে। করোনা এখন ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। খবরে বলছে হাসপাতালের কোন জায়গা খালি নেই। রোগীর মরদেহ রাখার হিমাগারে ঠাসাঠাসি অবস্থা, কবরও খালি পাওয়া মুশকিল। ভাবাই যায় না, বেঁচে থেকে যেন কিয়ামত দেখছি। প্রতিদিন ফেসবুকে মৃত্যু সংবাদের সাথে ছবি ও তার বিবরণ দেখে নিজেও ভীত হয়ে যাই। এরমধ্যেই কত পরিচিত মানুষদের চলে যাবার খবর পেলাম। আর ভালো লাগছে না। টিভিটা বন্ধ করে উপরে চলে এলাম। এক পরিচিত বন্ধু কল করে খোঁজ-খবর নিলেন, আমি ও বললাম।

আমাদের বাঙালি সোসাইটির কথা জিজ্ঞস করতেই বললেন, " ভাই কি বলবো একপরিবারের চারজন সদস্য। তারমধ্যে স্বামিটা মারা গেছেন আর বৌ আছেন হাসপাতালে , দুইসন্তানের মধ্যে বড়টার আজকে ধরা পড়লো । পরিবারটির জন্য খুব খারাপ লাগছে । দেখেন এই বিদেশে আসার জন্য আমরা কত কষ্ট করেছি। আবার নিজের পরিশ্রমে এখানে বা দেশে কিছু সম্পত্তি করেছি। সন্তানদের মানুষ করতে চেষ্টা করছি। নিজের প্রতি কখনো খেয়াল করিনি। দৌড়েছি টাকার পিছনে। বৌর জন্য গহনা , বাচ্চাদের দামি খেলনা কিংবা টিকেট কেটে কোন শো দেখেছি। অন্য স্টেট দেখতে ঘুরেছি। কার কত আছে তার চেয়ে আমার আরেকটু বেশি থাকতে হবে। সমাজে নিজের একটা জায়গা বানাতে হবে। কারো বাসায় গেলে আমার গিফটটা যেন সবার থেকে দামি মনে হয়। সোসাইটির কোন অনুষ্ঠানে আমি বেশি টাকা দিয়ে নাম কিনবো।এখন বলেন পরিবারের সবাই যদি ফুট্টুস হয়ে যাই, কে পাবে এই সব? দেশের কেউ তো আসতে পারবে না। কিংবা এখানেই বা আপনি কাকে নমিনি করে যাবেন। সব কিছু তাহলে কিসের জন্য করলাম? এখন কার সাথে করবেন দাম্ভিকতা বা অহংকার? কাকে

দেখাবেন আপনি তার চেয়ে বড়লোক? আপনার যা আছে তাই এখন সুচের মত ফুটবে। ভাই ক্ষমা করবেন এতসব বলে ফেললাম বলে।

ফোনটা রাখার পর আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়লাম। একটা সিগারেট ধরালাম । জানালায় বসে কেমন যেন আকাশের দিকে চেয়ে নিমগ্ন হলাম। জানা খাবারের জন্য ডাকছে শুনতে শুনতেই আর কিছু মনে নেই আমার। চোখ খুলে দেখি হাসপাতালে মানুষের গাদাগাদি অবস্হা, আমি আছি এক রুমে সাথে আরো তিনজনসহ । জানতে পেলাম হার্টের সমস্যার জন্য আমাকে ভর্তি করা হয়েছে ।আমার কোন ফোন নেই কিংবা আমি উঠতেও পারবো না কাউকে জিজ্ঞেস করতে । স্যালাইন আর হার্টের জন্য সব ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে সারা শরীরটাকে পেঁচিয়ে আছে। মানসিক দিক থেকে অসহায় বোধ করছিলাম । বাসায় ওরা কেমন আছে? জানা কেন আসছে না। আমার খোঁজে বা কেনো কল করে আমাকে খুঁজছে না । খুব রাগ হল মনে মনে। ভাবতে ভাবতে দেখছি করোনা রোগীদের কী করুণ অবস্থা। জানতে পারলাম বাইরের থেকে কেউ আসতে পারবে না খোঁজ নেবার জন্য। আমার অবস্হা দিনদিন ভাল হতে শুরু করলে একদিন এক ভদ্রলোকের ফোন নিয়ে বাসায় যোগাযোগ করি। জানা কল ধরেই কাঁদতে থাকে। অনেক দিন পর ওর গলাটা শুনে আমার ও চোখ ভিজে যায় । হাসপাতালের ভিতর মনে হচ্ছে আমি মৃত্যুপুরিতে আছি। কেউ নতুন করে আসছে। কিন্তু যারা মারা যাচ্ছে তাদের কি হচ্ছে জানতে পারিনি। সারাক্ষণ ভয় আর আতঙ্কে ছিলাম। সপ্তাহ দুই-তিন পর ওরাই বাড়ি নিয়ে এলো। আশেপাশের প্রতিবেশিরা জানালা দিয়ে দেখছে এমনভাবে যেন করোনা থেকে বেঁচে এলাম। অবশ্য আমাদের সবার করোনা প্রতিরোধক পিপিই পরা ছিল। বাসায় জানা ছেলে মেয়েদের বললো তোমরা “আব্বুর কাছে যেও না।” আমি ও দেখলাম বড়টা ওর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে, আর ছোটটা ঘর থেকে উঁকি দিয়ে বললো ওয়েল কাম হোম আব্বু। মনটা অস্হির হয়ে চাচ্ছিল ওদের জড়িয়ে ধরি। আমি ওদের কতো ভালবাসি কিন্তু আমি যে নিরুপায় । লিভিং রুমের পাশে একটা ছোটরুম ছিল জানা ওখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিল । সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা না করার জন্যই এই ব্যবস্থা। ও বেশ দূর থেকেই বলে যাচ্ছে ঘরে কোথায় কোন জিনিসটা আছে। গরম পানি করার জন্য একটা কেতলি মানে জগও রেখেছে। বলছিল ফ্রিজে লেবু আছে, কমলা, আরো সব খাবারের কথা। মনে হচ্ছিল সেই পুরনো দিনের কথা যখন জানা দেশে ছিল আর আমি বিদেশ থেকে দেশে যেতাম ও আমাকে কত আদর করে কাছে বসে কথা বলতো। খেতে দিত আর ঝলমলে হাসির ঝিলিক বেয়ে বেয়ে পড়তো। আমি ওকে বারবার বুকে জড়িয়ে ধরতাম। বিরহ মুহুতে। আজ আমার যেন ঠিক তেমনিই লাগছে কিন্তু জানার সেই হাসিটি নেই মুখে। নেই সেই উচ্ছ্বাস। কিন্ত নিজেকে যে দমানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ভিতর থেকে প্রবল এক শক্তি জানার দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু বললাম,   তুমি ঘরে আসবে না? মাথা নেড়ে না জবাবটা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল সে। নিজেকে সংযত করে চলে এলাম ভিতরে। জানা খাবার রেডি করে বললো, “ তুমি যেহেতু হাসপাতাল থেকে এসেছো তাই বার,তের দিন আমাদের

থেকে একটু দূরেই থেকো"। কথাটা চাবুকের মত লাগলেও সবার স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই বলেছে। বিষণ্ণ মনে ঘরে ঢুকলাম। এই রুমটাতে আমরা কেউ কখন থাকিনি। আর আমি একাকি এখানে। ও উপরে চলে গেল। শুনতে পারছি বাচ্চারা দুষ্টামি করছে। ছেলেটার সাথে গেইম খেলতে মনে হচ্ছে বা মেয়েটার গিটারের নতুন কোন সুর শুনতে ..

কি করবো সব কাজ একাই সামলাতে থাকি। এক সপ্তাহ শেষ। আরেক সপ্তাহ শেষ হবার আর কিছুদিন বাকি। বাসায় তেমন কোন বাজার নেই। জানা সকাল বেলা গাড়ি নিয়ে চলে গেলো। আমাকে ছাড়াই বাজার করে আসলো। সব কাজ একা একা করছে। এদিকে স্কুলটাও খোলা। বাসায় থেকে টিভি দেখি নয়তো থাকি ফোনে কিংবা বদ্ধ ঘরে একাকি। অথচ জানা সেই আগের মতই স্কুল থেকে এসেই গোসল করে শুরু করে দেয় সব কাজ। ও যখন বাসায় থাকে ঘরটা ভরা ভরা লাগে। কেননা বাচ্চাদের সাথে উপরে নিচে জোর করে কথা বলে। আমাকে ও অনর্গল কথা বলতেই থাকে। আজ সারাদিন খাটাখাটনি করেছে বেশি। তার উপর ঘর পরিস্কার করা বেশ ঝামেলা।

আমি অসুস্থ বলে আরো বেশি খেয়াল করে। সন্ধ্যায় মেয়ে এল নিচে। রান্নাঘরে কি জানি করছে। আমি জিজ্ঞেস করাতে বললো " আম্মু রং চা বানিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে।" অবাক হলামও কোনদিন এমন কাজ তো করেনি। মেয়ে বললো, জানার একটু কাশি হচ্ছে তো তাই বানাচ্ছে। আমি ওকে কল দিলাম " কি বল? তুমি কি ঠিক আছো? ভালই আছি। সন্ধ্যায় ওআমাদের খেতে দিল। কিন্তু ও শুধু টমেটো স্যুপ খেলো। বেশ বড় এককাপ রং চা হাতে নিয়ে চলে গেলো। আমার ভাল লাগলো না ওকে দেখে। যাইহোক, শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে নাস্তা দিল টেবিলে। আর আমিও আজ ওদের সাথেই খেলাম। জানা গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আবার মুখে ওড়নার দ্বারা মুখটাও ঢেকে রান্নার রাজ করছে। আমি বাহির থেকে চিঠিগুলি নিয়ে আসি। ও চিৎকার দিয়ে বলে তোমাকে না বলেছি হাতে গ্লাভস পরে চিঠি আনবে? আর সেগুলো আবার খুলছো? তুমি এই বাড়িটাতে ভাইরাস ঢুকিয়েই ছাড়বে। কথাটা বলতে বলতে কাশতে থাকে। আমিও বলি কিছুই হবে না। তুমি বেশি চিন্তা কর।জানা দৌড়ে উপরে গেলো কোন কথা না বলে। বুঝলাম রাগ করেছে। এতটাই রাগ করেছে যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ও নিচে নামছে না। ফোন দিলাম, ধরলো না। বাচ্চারা খেতে আসলো আর বললো "আম্মুর ভাল লাগছে না তাই ও খাবে না। আমাদের সবাইকে খেতে বলেছে।" বুঝলাম অভিমান করছে। ভাবলাম থাক রাতে না হয় আমি ওকে ডেকে আনবো খেতে। কিন্তু সোফায় টিভি দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি জানি না। হঠাৎ শব্দ পেলাম গেট খোলার। এত রাতে কে আসলো তবে? তাকিয়ে দেখি ই, এম, টি,- র লোকজন । আমিএকটু চমকে গেলাম। মেয়ে কাঁদছে। আর ছেলেটা উপরে। আর জানা একা একা নেমে আসছে। আমি জোরে কাছে আসতেই ওরা বাঁধা দিয়ে বললো" ডোন্ট কাম এনি ক্লোজার। সি ইজ কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ।"

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'না এটা মিথ্যা কথা। এ হতে পারে না।' জানা জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। ওরা বলল্ কেউ কাছে না যেতে।

যতক্ষণ ওরা না ঘর থেকে বের হয় আমরা যে যেখানে আছি সেখানেই যেন থাকি। আমার নাম্বারটা একজনকে দিলাম। আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কি হচ্ছে! না আর ভাবতে পারছি না। জানার জন্য মনটা ব্যাথায় ভরে উঠলো।

আজ চারদিন হয়ে গেলো কোনো খবর কেউ দিচ্ছে না। অস্থির হয়ে আছি, কোন অশুভ চিন্তায় ম্রিয়মান। ইউটিউব দেখে মেয়ে আর আমি রান্নার চেষ্টা করছি। এমন সময় মেয়ে আমার ফোনটা ধরে আমাকে দিল।

কিছু ভাবার আগেই কঠিন এক শব্দ কানের উপর আছড়ে পড়লো " সি ইজ নো মোর"। আমার চোখের পানি দেখে মেয়ে বলছে, 'আব্বু কি বলছে বলো?' আমি নির্বাক চেয়ে রইলাম ওর দিকে। হাসপাতালের কারো সাথেই যোগাযোগ করতে পারিনি। পরে অন্য মানুষেরা জানতে পেলে কমিউনিটির লোকজন এগিয়ে আসে। জানাকে কবর দেয়ার জন্য কোথাও জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে নিউ জার্সিতে সমাহিত করা হলো। আমি ওঁকে শেষ বিদায় জানাতে যাই। হাতে কোন ফুল ছিল না। ছিল চোখ ভরা বাঁধ ভাঙ্গা নোনা পানি। আকাশটাও মেঘ গুড়গুড় করছিল জানার প্রস্থানে।

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

সুজয় দত্ত

সার্ভিস

হঠাৎই ভাদ্রের এক গুমোট সকালে আলাপ হয়েছিল ছেলে দুটোর সঙ্গে। আমি তখন সদ্য রিটায়ার করেছি। এতদিন দক্ষিণ কলকাতার এক বর্ধিষ্ণু শহরতলীতে ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে নিজের সারাজীবনের সঞ্চয় ঢেলে দমদম এলাকায় একটা ছোট দু'কামরার ফ্ল্যাট কিনেছি। দক্ষিণ থেকে একেবারে উত্তরে চলে আসার উদ্দেশ্য আমার ছোট ছেলে-বৌয়ের কাছাকাছি থাকা। নতুন একতলা বাড়ীতে মোট চারটে ফ্ল্যাট। রাস্তার দিকেরটা আমার। বাকী তিনটেয় তখনো লোক আসেনি। অল্প কিছুদিন পর আমার পাশের ফ্ল্যাটটায় এসে উঠলেন দস্তিদার বাবুরা। রাণিকুঠিতে থাকতেন তারা। টালিগঞ্জের দিকে একটা ব্যাংকে বড় অফিসার ছিলেন। এখন সেই ব্যাংকেরই দত্তপুকুর ব্র্যাঞ্চে বদলি হয়ে এসেছেন। বয়সে আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট, চুলে টুলে পাক ধরেনি তেমন। আমরা এখানে এসে ওঠার পর প্রথম কিছুদিন নাগের বাজারে ছোট ছেলের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করছিলাম। মুভিং কোম্পানি সব জিনিসপত্র দিয়ে গেছে কিন্তু প্যাকিং-ট্যাকিং তখনও খোলা হয়নি। তাছাড়া রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থাও করতে হবে নতুন জায়গায়। আমার তো নাম লেখানো সেই বৈষ্ণবঘাটার ইন্ডেন ডিলারের কাছে। আর কেবল টিভি, ল্যান্ডলাইন ফোন এগুলোও চালু করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার গিন্নীর আবার সন্ধ্যেবেলায় বাংলা সিরিয়াল আর ট্যালেন্ট শো-গুলো না দেখলে ভাত হজম হয় না।

এমন সময় একদিন সকালে জলখাবার খেয়ে বেডরুমের লাগোয়া একফালি বারান্দাটায় খবরের কাগজ নিয়ে একটু বসতে যাব, কানে এল পাশের ফ্ল্যাটের দস্তিদারবাবু কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছেন। ভদ্রলোকের গলাটা একটু বাজখাঁই গোছের। তাই মোটামুটি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

-"হ্যাঁ, আমি এখানে নতুন এসেছি, কাউকে চিনি-টিনি না। এখুনি চাঁদা-টাদা দিতে পারছি না।"

:"না স্যার, চাঁদা না। মানে আপনার কোনো সার্ভিস লাগবে কিনা সেটাই।"

-"সার্ভিস? সে তো অনেক কিছুই লাগবে। ড্রইংরুমের পাখাটা কাজ করছে না। একজন ইলেকট্রিশিয়ান লাগবে। রান্নাঘরের সিঙ্কটা দিয়ে জল যাচ্ছে না। একজন কলের মিস্তিরি লাগবে। বাড়ীতে একটা ঠিকে কাজের লোক লাগবে। তা, কী করা হয়?"

:"ইয়ে, মানে, আমি এ-পাড়ায় সকলকে গ্যাস দিই।"

-"হুঁ, সে তো চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যায়। লোক ঠকিয়ে খাও।"

:"না স্যার, মানে বলতে চাইছি, আমি এ-পাড়ায় ইন্ডেন গ্যাস সিলিন্ডারের ডিস্ট্রিবিউটর। আপনি কি..."

-"ও, তাই বল। আর এই ছেলেটি কী করে? এই যে, অ্যাই, তুমি কী কর?"

:(একটা মিহি গলা) "আমি স্যার বাড়ী-বাড়ী ফোন লাগাই।"

-মানে? কাজ নেই কম্মো নেই সারাদিন বসে বসে লোককে ফোন করে বিরক্ত কর?"

:"না না না, তা বলিনি, আমি সবার বাড়ীতে ল্যান্ডলাইন ফোনের কানেকশান দিই। কেবলেরও দিই স্যার। আপনার টিভিতে ..."

-"অ। আই সি। নাম কী তোমাদের?"

:"ইয়ে, আমি প্রদীপ, ও অশোক। আপনি আমাদের কাল্টু আর ঝন্টু বলেই ডাকবেন স্যার। পাড়ার সবাই তাই..."

-"কী বলে ডাকব সেটা পরের কথা। লাইসেন্স আছে তোমাদের? দেখাতে পার?"

:"ইয়ে, মানে, না তো স্যার, সঙ্গে তো নেই এখন। আপনাকে পরে এনে..."

-"ঠিক এই জিনিসটাই আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। টর‍্যাভেলিং সার্ভিস প্রোভাইডার হয়েছ আর সঙ্গে লাইসেন্স রাখ না? আজকালকার দিনে হু উইল ট্রাস্ট ইউ?"

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম আর হাসছিলাম। এরকম জাঁদরেল ব্যাংক অফিসারের পাল্লায় পড়লে এই হাল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এবার একটু নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াতে হল। অফিসারবাবু যদি লাইসেন্স নেই বলে বকেঝকে ওদের ভাগিয়ে দেন, ওঁর নিজের খুব একটা অসুবিধে হবেনা হয়তো। আফটার অল ইয়ং ম্যান। কিন্তু আমার হবে। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে "হ্যাঁগো কোথায় গ্যাসের অফিস গো? হ্যাঁগো কোথায় কেবলের অফিস গো?" এসব করা আমার পোষাবে না। তাই তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে এতক্ষণ যেন কিছুই শুনিনি সেইভাবে বললাম, "কী ব্যাপার অমিতেশবাবু?"

-"আরে এই দেখুন না, সক্কালবেলা কলিং বেল টিপে বিরক্ত করতে এসেছে।"

:"অ্যাই, খামোখা স্যারকে বিরক্ত করছো কেন তোমরা?" আমি কপট শাসনের ভঙ্গীতে ধমকাই।" এস, এদিকে এস, কী চাই আমায় বল। অমিতেশবাবু, আপনি কাজ করুন, আমি দেখছি এদের।" বলেই সটান ওদের আমার ফ্ল্যাটে চালান করে দিলাম। তারপর নীচুগলায় বললাম "শোনো বাবারা, তোমরা ইন্ডেন আর কেবলের লোক তো? বেশ বেশ। এখন বল আমার এই ফ্ল্যাটে ডবল সিলিন্ডার আর স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো পেতে আমায় ঠিক কী করতে হবে। আর তোমরা কত নেবে।"

-"আপনি কিস্সু চিন্তা করবেন না দাদু, ইয়ে, মেসোমশাই।" ওরা একগাল হেসে বলল, "আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি শুধু একটু ফর্মটর্মগুলো ফিলাপ করে দেবেন। আর টাকার কথা পরে, আগে কাজ হোক। কাজটা দেখে নিন।"

সেই শুরু। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। কাল্টু-ঝন্টু আর শুধু সার্ভিস প্রোভাইডার নেই, প্রায় আমাদের বাড়ীর ছেলেই হয়ে গেছে। কত ব্যাপারে যে সাহায্য করে এই বুড়োবুড়িকে! যা ওদের করার কথাই না। ইলেক্ট্রিসিটি আর ট্যাক্সের বিল জমা

দিয়ে দেওয়া। মোবাইল ফোন খারাপ হয়ে গেলে দোকান থেকে সারিয়ে এনে দেওয়া। মল রোডের মোড়ের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ এনে দেওয়া। গ্যাস ওভেনটা গণ্ডগোল করলে বাড়ী এসে পরিষ্কার করে দেওয়া। আমার চেয়ে আমার গিন্নীর সঙ্গেই ওদের জমে বেশি। মাঝেমাঝেই মাসীমার হাতের চা এবং তার সঙ্গে বেশ ভালরকম 'টা' খেয়ে যায় ফ্ল্যাটে এলে। আমি যদি কোনো ব্যাপারে বলতে যাই "অ্যাই কাল্টু (বা ঝন্টু), এই সামান্য কাজটায় এতো টাকা চাইছিস কেন রে?", ওদের মাসীমাই আমাকে ধমক লাগান, "তুমি থামো তো! ছেলেদুটো রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজগুলো করে না দিলে পারতে তুমি নিজে?" পরে আমার সুপারিশে দস্তিদারবাবু আর এ-বাড়ীর অন্য দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও ওদেরই সব কাজকর্ম দেওয়া শুরু করলেন। তবে দস্তিদারবাবু সব ব্যাপারেই একটু বেশি কড়া তো, তাই প্রতিটা পাইপয়সার রশিদ চাওয়া আর কাজের আগে অ্যাডভান্স দেওয়া নিয়ে ওঁর সঙ্গে ওদের একটু-আধটু খিটিমিটি লেগেই থাকত। সেগুলো ওরা আবার আমার ফ্ল্যাটে বসে ওদের মাসীমার কানে দিত।

এমনি করেই দিন কাটছিল বেশ। ঘুরছিল বছর। আমার ব্যাঙ্গালোরবাসী বড়ছেলের মেয়ে কলেজে ভর্তি হল। আমার ছোটছেলের ছেলে মন্টেসরি ছেড়ে প্রাইমারি ইস্কুলে গেল। ওর আবার একটা ছোট্ট তুলতুলে পুতুলের মতো বোন হল। মানে আমরা তৃতীয়বারের জন্য দাদু-ঠাম্মা হলাম। আর তারপরেই এল ২০২০। মার্চ মাস। পৃথিবীজুড়ে দুরন্ত মহামারী শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। সবাই দিশাহারা, সবাই হাতড়ে হাতড়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে। আমার দেশ, আমার রাজ্য, আমার শহর কেন জানিনা ভেবেছিল কোনো অলৌকিক জাদুবলে বা অজানা শক্তির জোরে অল্পের ওপর দিয়ে রক্ষা পেয়ে যাবে। হয়তো মারণজীবাণুর অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসলীলা এদেশে আসতে একটু দেরী করেছে। তাই জেগেছিল এই অবুঝ আশা। ফলে সর্বোচ্চ প্রশাসন থেকে শুরু করে আমজনতা প্রথমদিকে সবাই গড়িমসি করেছে, গাফিলতি করেছে। এবং পরে তার ফল ভুগেছে হাজারে হাজারে, অযুতে অযুতে। লকডাউনে বাড়ী বসে বসে টিভিতে আর মোবাইলে যত খবর পেতাম, ততই ভাবতাম এবারে বোধহয় দিন ঘনিয়ে এল আমার। কারণ চারিদিকে সবাই বলছে আমার বয়সী কারোর এ-জিনিস একবার হলে আর পরিত্রাণ নেই। এইভাবে বন্দীদশায় প্রায় আড়াই মাস কেটে গেল। কাল্টু-ঝন্টুর এখানে আসা অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেলেও মোবাইলে যোগাযোগ আছে ওদের সঙ্গে। একসময় নানা দিক থেকে আসা রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক চাপে সরকার উঠিয়েই দিল লকডাউন। কিন্তু এমন সময় ওঠাল, যখন মহামারীর আগুন স্তিমিত হয়ে আসার বদলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এবার সেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। উপায়ান্তর না দেখে আমাদের এই শহরকে ভাগ করা হল গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ আর রেড জোনে। রঙ যত লালের কাছাকাছি, সেই জোনের অধিবাসীদের চলাফেরা আর স্বাভাবিক জীবনযাপনের ওপর তত কড়া নিষেধাজ্ঞা। কারণ সেখানে সংক্রমণের মাত্রা তত বেশী। আমাদের এই এলাকাটা অরেঞ্জ জোন।

ঠিক এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আর গ্যালারিতে দর্শক হয়ে দূরে বসে দেখতে পারলাম না এই মৃত্যুলীলা। মাঠে নেমে পড়তে হল এই বাড়ীর বাসিন্দাদের। মানে আমাকে বা আমার স্ত্রীকে নয়, দস্তিদারবাবুকে। ওঁর বাবা-মা থাকেন সল্টলেকের কাছে নয়াবাদে তাঁদের নিজস্ব ফ্ল্যাটে। সত্তরের কোঠায় বয়স দুজনেরই। বাবা বহুবছর আগে রিটায়ার করলেও মোটামুটি শক্তসমর্থ। কিন্তু মা শুনেছি অনেকদিন ধরে অসুস্থ। এমনিতে ওঁরা নিজেদেরটা মোটামুটি নিজেরাই চালিয়ে নেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে দস্তিদারবাবু খবর পেলেন ওঁর বাবা-মা যে পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ীটায় থাকেন তার একতলা আর চারতলায় দুটো পরিবারে একসঙ্গে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সারা পাড়া রেড জোন ঘোষণা। পুরো ফ্ল্যাটবাড়ীর সবাই গৃহবন্দী। আর এমনই কপাল ভদ্রলোকের, ঠিক সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ওঁর মায়ের ফোন এল যে বাবা হঠাৎ বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোড়ালি মচকে বিছানায়। পা ফুলে ঢোল, নড়তে চড়তে পারছেন না। বাড়ীতে আর্নিকা আর চুন-হলুদ ছাড়া কিছু নেই। হাড়-টাড় ভেঙেছে কিনা সে তো হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না। কিন্তু করোনার দৌলতে এখন এসব কারণে হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি নেই। কথায় বলে না, দুঃসংবাদ কখনো একা আসে না? দস্তিদারবাবু যখন আমার ফ্ল্যাটে এসে এই খবর দুটো দিলেন, বেচারাকে বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। আমিও প্রথমটা ঠিক কী করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। বিচলিত মুখে উপায় হাতড়াচ্ছি, এমন সময় গিন্নী বলে উঠল, "আচ্ছা, ওই ছোঁড়াদুটো তেলেঙ্গাবাগানের ওদিকে থাকে না?"

"কোন ছোঁড়া?"

-"আরে বাবা, কাল্টু-ঝন্টুর কথা বলছি। ওদের ডিলারশিপ এখানে। কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা যেন বলেছিল ঐসব দিকে কোথাও একটা থাকে। ওদের একবার জানালে হয় না ব্যাপারটা?"

"বলছ? যদি সত্যিই তেলেঙ্গাবাগান হয়, ওখান থেকে নয়াবাদ অবশ্য কাছে। কিন্তু ওদের জানিয়েই বা কী হবে? কী করবে ওরা?"

দস্তিদারবাবু দেখলাম গিন্নীর এই প্রস্তাবে আশার আলো দেখতে পেলেন। সায় দিয়ে বললেন, "আই থিঙ্ক ইটস এ গুড আইডিয়া। ইন কেস ওরা ওই এলাকার হলে কিছু অ্যাডভাইস দিতে পারবে কীভাবে প্রসিড করা যায়।"

-"বেশ। ওদের ফোননম্বর তো আছে আপনার কাছে, দেখুন যোগাযোগ করে। কী হল আমাকে জানাবেন কিন্তু। চিন্তায় রইলাম।"

:"ইয়ে, মানে, আপনারা একটু কাইন্ডলি যদি করেন।"

বুঝলাম যাদের সবসময় দাবড়ে কথা বলেন আর লেকচার দেন, হঠাৎ করে তাদের সাহায্যপ্রার্থী হতে বাধছে ভদ্রলোকের। বললাম ঠিক আছে, আমিই করছি। দুজনের নম্বরেই বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর কাল্টুকে পাওয়া গেল। অসময়ে ফোন পেয়ে একটু অবাক, তারপর পরিস্থিতি শুনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলল, "চিন্তা করবেন না মেসোমশাই। আমাদের কানে তুলে দিয়েছেন, ব্যস, আর কী? আমি দেখছি কী করা

যায়। ও-জায়গা আমি খুব ভাল করে চিনি। আগে ওখানেই ডিলারশিপ ছিল আমার। শুধু স্যারকে জিজ্ঞেস করে একটু ঠিকানাটা যদি বলেন।"

-"বলছি, কিন্তু ঠিক কী করবি তোরা? ওটা তো রেড জোন।"

:"আপনি নিজমুখে যখন বলেছেন মেসোমশাই, কিছু একটা তো করবই। একটা মানুষ এরকম গাড্ডায় পড়েছে জেনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? আজ রাতে আর কিছু হবে না। শুধু ঝন্টুর কাকাকে দিয়ে এখানকার পার্টি অফিসে একটা ফোন যদি করানো যায়, নাহলে কাউন্সিলারকে। ওর কাকার জানাশোনা আছে পার্টিতে।"

এর পরের কদিন যা যা করল ওরা দুজনে মিলে, আমার ধারণাই ছিল না ঐ ছোটখাটো চেহারার নিরীহ-নিরীহ দেখতে ছেলেদুটো এতো এলেম রাখে। স্থানীয় পার্টির নেতাদের বুঝিয়ে স্পেশাল পারমিট করিয়ে নেওয়া, সেটা দেখিয়ে রেড জোনে ঢুকে দস্তিদারবাবুর বাবা-মার ফ্ল্যাটের দরজায় তিনদিন অন্তর বাজার পৌঁছে দেওয়া। ডাক্তার ফোনে শুনে গোড়ালির চোটের যেসব ওষুধ দিয়েছিলেন সেগুলো আর ওঁদের অন্য সব নিত্তনৈমিত্তিক ওষুধপত্র একসঙ্গে কিনে দিয়ে যাওয়া। ওঁদের খাবার জলের আকুয়াগার্ড ফিল্টার খারাপ হয়ে গেছে শুনে বিশ লিটারের জলের জেরিক্যান ডেলিভারি দেওয়া। এমনকি মচকানো পা নিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতর চলাফেরা করার সুবিধের জন্য একটা ওয়াকার কিনে আনা। একেবারে নিখুঁত সার্ভিস। আর পুরোটাই করল প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার ফ্ল্যাটে একবারও না ঢুকে। ওঁদের সংক্রমিত করার কোনো ঝুঁকি না নিয়ে। দস্তিদারবাবু শুধু ঘরে বসে খোঁজখবর রাখলেন আর স্মার্টফোনে টাকা ট্রান্সফার করে গেলেন। এতো খুশি ভদ্রলোক যে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে বলে গেলেন, ছেলেদুটো যখন এল্ডারকেয়ার আর ইন-হোম অ্যাসিস্টেড লিভিং সার্ভিসে এরকম পটু, ওঁর ব্যাংক থেকে ওদের লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন যদি এই ব্যবসাটা ওরা বড় করে করতে চায়।

না। সে-লোনের আর দরকার হয়নি। দস্তিদারবাবুর বাবা একটু সামলে ওঠার পর ওরা যখন নয়াবাদে যাতায়াত বন্ধ করল, তার কয়েকদিন বাদে ফোন করেছিল কাল্টু। আমাদের রান্নার গ্যাসের দুটো সিলিন্ডারই যে ফুরোনোর মুখে, ঠিক মনে রেখেছে ছেলেটা। বলল অরেঞ্জ জোনে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার পারমিট থাকলে ঢোকা যায়। তাই ও যত তাড়াতাড়ি পারবে একদিন এসে দরজায় নতুন সিলিন্ডার নামিয়ে দিয়ে যাবে। আর অনেকদিন যে মাসীমার হাতের নোনতা হালুয়া বা চিঁড়ের পোলাও খাওয়া হয়নি সে নিয়ে আক্ষেপ করছে শুনে গিন্নী বললেন, বানিয়ে দরজার বাইরে টিফিন কৌটোয় রেখে দেব। কথোপকথনের মধ্যে বারবার কাশছিল ছেলেটা। জিজ্ঞেস করতে বলল ও কিছু না। এই সপ্তাহেই দুদিন বাজার করতে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছিল, তাই বোধহয়।

আর কোনোদিন কথা হয়নি ছেলেটার সঙ্গে। আট-নদিন বাদে ও এখনো কেন গ্যাস দিতে এলনা সেটা জানার জন্য ওকে বারবার ফোন করেও না পেয়ে ঝন্টুকে কল করলাম। ওপ্রান্তে এক বয়স্কা মহিলার গলা। বললেন, ছেলে ভীষণ অসুস্থ, ভাইরাসে ধরেছে। তিনটে হাসপাতাল ঘুরেও ভর্তি করানো যায়নি কারণ তারা বেড খালি রাখতে

চায় আরো ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ আর মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্য। ওর অতটা খারাপ অবস্থা নয়। আমার পাঁজরের ভেতর হাতুড়ির ঘা, গলা কাঁপছে, তবু কোনোরকমে জানতে চাইলাম, "আর কাল্টু? সেও কি..."

"আমার ছেলের চেয়েও বেশী ছিল ও, জানেন, ও আমার ছেলের চেয়েও বেশী ছিল।" কান্না আর হাহাকারটা কি ফোনের ভেতর থেকে আসছে, না আমার নিজের বুকের ভেতর থেকে? গুলিয়ে যায় আমার। "ছিল?" তার মানে নেই? কবে, কোথায়, কী বৃত্তান্ত সেসব জানার কৌতূহল বা শক্তি আমার তখন উধাও। তবু কানে ঢুকল আই ডি হসপিটাল, গত পরশু, বেলা এগারোটায় ভেন্টিলেটরের নল খোলা হয়। এখন আমার যে পিছন ফেরারও সাহস নেই। কয়েকফুট দূরে উদ্বিগ্ন মুখে যে অপেক্ষা করছে। তাকে আমি এই খবরটা কী করে দেব? কী করে দেব তাকে?

বেল টিপে দস্তিদারবাবুকে বললাম দু-ছেলের নয়, চার ছেলের বাবা ছিলাম আমি। আজ, এই ছেষট্টি বছর বয়সে, জীবনে প্রথম পুত্রশোক পেলাম। শুনে নীরব রইলেন ভদ্রলোক, চশমাটা খুলে আস্তে আস্তে হাতে নিলেন। ব্যাংকের অফিসার তো, মাথায় সবসময়েই হিসেব। হয়তো ভাবছিলেন বিনা-অ্যাডভান্স আর বিনা-রশিদে দেওয়া প্রদীপ কর্মকারের এই শেষতম সার্ভিসের ঋণ ঠিক কত জন্মে শোধ করা সম্ভব। আর পিছনে ওঁর ড্রয়িংরুমের টিভির চ্যানেলগুলো তাদের কোভিড সমাচারে হাজার, অযুত, লক্ষের হিসেব দিয়ে যাচ্ছিল অনর্গল।

ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো, যুক্তরাষ্ট্র

সেলিম জাহান

করোনার লন্ডন ও একটি লাল গাড়ী

প্রথমে চোখে পড়েনি কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই দৃশ্যটি দৃষ্টি কাড়লো। না কেড়ে উপায় নেই। সময়টা এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ। লন্ডনে তখন করোনার মৃত্যু মিছিল চলছে। টেলিভিশন দেখতে পারি না। ভাঁজ করা সংবাপত্র খুলি না। বিবিসি এড়িয়ে চলি সযত্নে। তবু শুনতে পাই, বৃটেনে প্রতিদিন এক হাজারের মতো মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে করোনার কারণে - তার একটা বড় অংশই বৃদ্ধাশ্রমে। লন্ডনের রাস্তা-ঘাট প্রায় জনশূন্য, কোন গাড়ী-ঘোড়া দেখি না কোথাও। দোকান-পাট বন্ধ, মানুষ নিজেকে আটকে ফেলেছে স্বগৃহের চৌহদ্দিতে।

আতঙ্ক এতো ঘন হয়ে জমেছিলো চারদিকে যে মনে হয় মাখনের ছুরি দিয়ে তাকে কাটা যাবে। ভয়ে বারান্দায় পর্যন্ত বেরুতাম না। মনে হতো চারদিকে করোনা-সর্পেরা ওঁৎ পেতে বসে আছে - বেরুলেই ছোবল দেবে। সকালেই জানালার ধারের লেখার টেবিলে বসি - লিখি, রাস্তার ওপারের ঝাঁকড়া গাছটা দেখি, নীল আকাশের দিকে তাকাই। দেখি, রাস্তা ঘাটে মানুষ নেই। কেমন এক জনশূন্যতা চারদিকে। কিন্তু তাতে প্রকৃতির পরিবেশে এক কণা ছেদ পড়েনি। ঝক্ ঝকে আকাশ, তাতে ক'টি অলস মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছে গাছে পাতার রঙ কি অদ্ভূত সতেজ সবুজ। ফুল এসেছে নানান গাছে - তারা মাথা দোলাচ্ছে এদিক-ওদিক। মৃদু একটু বাতাস বইছে। চারদিকে কেমন একটা বিশুদ্ধতা ভাব। দেখে শুনে মনে হয়, করোনা মানুষকে বন্দী করেছে, কিন্তু প্রকৃতিকে মুক্ত করে দিয়েছে।

এর মধ্যেই একদিন চোখে পড়ল একটি ছোট লাল গাড়ী - তারপর প্রতিদিনই সেটাকে দেখি। প্রত্যেক দিনই গাড়ীটি রাস্তার ওপারে এসে থামে তারপর বসে থাকে বেড়ালের মতো থাবা পেতে। একই জায়গায় থেমে থাকে না - কখনো ফটক থেকে এগিয়ে, কখনো বা পিছিয়ে এবং একই সময়েও নয় - কখনো সকালে, কখনো দুপুরে, কখনো বা বিকেলে। গাড়ীটির চলে যাওয়ার সময়ও ভিন্ন - তবে সন্ধ্যে সাতটার পরে ওটাকে কখনো দেখিনি।

গাড়ী থেকে নামেন মাঝবয়সী বিরল কেশ এক ভদ্রলোক। ঢিলেঢালা পোশাক পরা। তাঁর হাতে কখনো থাকে একটি কাপড়ের থলে, কখনো তিনি শূন্যহস্ত। আন্দাজ করি, থলেতে বাজার করা সামগ্রী ও সেই সঙ্গে নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র থাকে। আমি অবাক মানি, এ করোনার কালেও তিনি প্রতিদিন রাস্তায় বেরোন, গাড়ী চালান। সবদিনই দেখি,

লাল গাড়ী থেকে নেমে তিনি গাড়ীর দরজা আটকান তারপর ধীর পায়ে ফটক পেরিয়ে সামনের দিকে এগোন।

যে ভবনটির দিকে ভদ্রলোক এগোন, সেটি একটি বৃদ্ধাশ্রম। আমার জানালার উল্টোদিকে রাস্তার ওপারের ওই লাল ইটের বৃদ্ধাশ্রমটিকে আমি বহুদিন ধরেই চিনি। করোনা সঙ্কটের আগে ভবনটির নানান জানালার লেসের পর্দা দেখতাম। চোখ যেত ভবন প্রাঙ্গনের দিকে যেখানে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা ধীর পায়ে হাঁটছেন। গল্প করছেন পরস্পরের সঙ্গে। কখনও কখনও তাঁদের কারো কারো সঙ্গে পরিচর্যাকারী থাকেন। ছুটির দিনে দেখতাম বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের আত্মীয়-স্বজনেরা আসছেন তাঁদের দেখতে। মাঠে বেতের চেয়ার-টেবিল পাতা হত - টেবিলের ওপরে ধবধবে সাদা কাপড়। কেটলি, চায়ের কাপ, নানান মিষ্টান্নের উপস্থিতি আমিও এত দূর থেকে দেখতে পেতাম। বোঝা যেত, হাসি-ঠাট্টা গাল-গল্প চলছে সেখানে। সুসময়ে এটাই তো ছিল পরিচিত দৃশ্য ঐ বৃদ্ধাশ্রমের।

করোনা পরবর্তী সময়ে এ দৃশ্যপট বদলে গেলো। কেমন একটা থমথমে ভাব বৃদ্ধাশ্রমটিকে ঘিরে। ঘরে ঘরে আর বাতি জ্বলে না। ভবন প্রাঙ্গন জনশূন্য। কাউকেই দেখি না বাইরে। স্বজনদের আসা-যাওয়ায় ভাটা পড়েছে। যারা পরিচর্যা করেন তাদের সংখ্যা তলানীতে এসে ঠেকেছে। কাউকেই বৃদ্ধাশ্রমের ফটক পেরিয়ে ঢুকতে বা বেরুতে বড় একটা দেখিনা। শুধু মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে বৃদ্ধাশ্রমের নানান আবাসিকদের জন্যে খাবারের থলে হাতে আসতে দেখি। মনে হয়, এ যেন এক মৃতপুরী।

মনে আছ, কোন এক ভোর রাতে ঐ বৃদ্ধাশ্রমের সামনে এ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শুনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। দুরু দুরু বুকে ভাবছিলাম, কারো কি কিছু হোল! পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানলাম, এমনি নিয়মিত চক্করে এসেছিলো এ্যাম্বুলেন্স - কোন অঘটনের কারনে নয়। ভবনের ফটকের পাশের রাস্তার বাতিটায় যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সে বাতি অন্ধকার তো দূর করে না বরং তা আরও ঘণীভূত করে। খুব ভোরেও হালকা কুয়াশায় সে বাতিকে কেমন যেন ফ্যকাশে লাগে।

এই সব যখন ভাবছিলাম, ততক্ষণে ভদ্রলোক পৌঁছে গেছেন মূলভবনের দরজায় - তারপর ভেতরে মিলিয়ে গেলেন। পড়ার টেবিলে লিখতে লিখতে বেশ কিছুটা পরে চোখ তুলে দেখি ভদ্রলোক একজন অতি বৃদ্ধার হাত ধরে বেরিয়ে আসছেন। ছোট খাটো বৃদ্ধাটির শণের মতো সাদা চুল। গায়ে নীল রঙের একটি শীতের কোট। পরনে হাল্কা গোলাপী প্যান্ট। পায়ে গোলাপী প্যান্টের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাপী কেডস। বৃদ্ধার শরীর বার্ধ্যকের ভারে একটু নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কি পরম যত্নে ভদ্রলোক বৃদ্ধাকে ধরে প্রাঙ্গনের দিকে নিয়ে গেলেন। অশেষ মমতায় তাঁকে ধরে বৃদ্ধার ধীর পায়ে হাঁটার সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। দূর থেকে বুঝতে পারছিলাম তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে গল্প করছেন মৃদু স্বরে। বড় ভালো লাগলো দৃশ্যটি। আন্দাজ করলাম - তাঁরা দু'জনে মা-ছেলে।

তারপর থেকে তাঁদের দু'জনকে প্রায়ই দেখি। আস্তে আস্তে একদিন তাঁরা দু'জনে ফটক খুলে বাইরে এলেন হাঁটতে। আমার জানালার পরে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের পায়ে চলার পথে তাঁরা হাঁটেন। সেই মায়াময় ভঙ্গি আগের মতো। বুঝতে পারি, মা'কে নিয়ে হাঁটাতে বেরিয়েছেন ভদ্রলোক - যা হয়তো বৃদ্ধা মহিলার জন্যে অত্যাবশ্যকীয়। বৃদ্ধার দিকে তাকালে বোঝা যায় যৌবনে দুর্দান্ত সুন্দরী ছিলেন তিনি। কি আদুরে দৃষ্টিতে তাকান তিনি ছেলের দিকে। মাঝে মাঝে তাঁদের মৃদু হাসির শব্দ শুনি আমি আমার জানালা থেকে। কোন কোন দিন তাঁরা অনেকটাই হাঁটেন। কোন কোন দিন একটু হেঁটেই তাঁরা ফেরত যান। কোন কোন দিন বৃদ্ধা মহিলা কিছু দূর হেঁটেই দাঁড়িয়ে পড়েন। বোঝাই যায় যে, আরো হাঁটতে হয়তো তাঁর অনীহা। সে সব দিনে মহিলাটি হয়তো ক্লান্ত বোধ করেন। দূর থেকেও বুঝতে পারি যে সে সব দিনেও ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাটিকে আর একটু হাঁটতে অনুনয় করেন। তাতে কাজ হয়, মহিলা আবার হাঁটতে শুরু করেন।

গত তিন মাস ধরেই কেমন এক নেশায় পেয়েছে আমায়। সকাল থেকেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করি কখন লাল গাড়ীটি আসবে। কখন মা-ছেলেতে হাঁটতে বেরুবেন। কখন তাঁদের মায়াময় মমতার ভঙ্গিটি দেখবো। করোনা প্রকোপকালে মা-ছেলের এ সঙ্গ, এ যৌথ সময় কাটানো আমার বড় ভালো লাগে। বুঝি, ভদ্রলোক প্রতিদিনের বেশির ভাগ সময়টাই কাটান তাঁর মা'কে সঙ্গ দিয়ে। তাঁর সঙ্গে গল্প করে। তাঁর দেখাশোনা করে। হয়তো বহুদূর থেকেই তিনি আসেন। আসতে হয়ত অনেক সময়ও নেয় - তবু তিনি আসেন। ছেদ পড়েনি তা'তে একদিনের তরেও। আসলে চূড়ান্ত বিচারে, সময় আর মায়াটুকুই তো আমরা একে অন্যকে দিতে পারি।

কিন্তু এমনই কি চলতে থাকবে দিনের পর দিন? বোধহয়, না। একদিন হয়তো ভদ্রলোক আর আসবেন না। হয়তো তাঁর আসারও কোন প্রয়োজনও হবে না। করোনা শেষ হবে। সব পরিচর্যাকারীরা ফিরে আসবেন ঐ বৃদ্ধাশ্রমে। তাঁরাই দেখ-ভাল করবেন বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের। 'আবার জমবে মেলা' ঐ ভবনকে ঘিরে।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা কোন একদিন হয়তো ঐ ভদ্রলোকের বৃদ্ধাশ্রমে আসার কারণটিও ফুরিয়ে যাবে। একদিন তাঁর অতিবৃদ্ধা মা পৃথিবীর মায়া কাটাবেন। বৃদ্ধাশ্রমে তাঁকে আর দেখা যাবে না। তখন ঐ লাল গাড়ীটিকে হয়তো আর কোনদিন বৃদ্ধাশ্রমের সামনে দেখা যাবে না। 'গডোর প্রতীক্ষায়' এর মতো আমি অপেক্ষা করবো সকাল-সন্ধ্যে একটি লাল গাড়ীর জন্যে। কিন্তু সে গাড়ীর আর দেখা পাবো না। কে জানে, হয়তো তখন আমিও এ বাড়িতে আর থাকবো না। খুঁজে নেবো অন্য কোন ঠিকানা। হয়তো...।

লন্ডন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাজ্য

স্মৃতি ভদ্র

অন্তর্লীন অন্ধকার

অরণী বেশ কিছুদিন একই স্বপ্ন বারবার দেখছে।
স্বপ্নটি শেষ হতেই প্রতিদিন নিয়মমাফিক অরণীর ঘুম ভেঙে যায় ।

এরপর বাকি রাত কাটে ঘরের শূন্য সাদা ছাদে নির্নিমেষ চোখ মেলে। অরণী লক্ষ্য করে রাত বাড়তে থাকলেই অন্ধকারের রঙেও বদল আসে। কখনো গাঢ় জমাটবাঁধা কালো অন্ধকারের দৌরাত্ম, আবার কখনো ফ্যাকাশে অন্ধকারের উন্মত্ততা।

সেসব রঙ সাদা দেয়ালে ছায়া ফেলে। অনেক রকম ছায়া।

সেসব ছায়ার অতল থেকে অদ্ভুত এক বিষণ্ন ঢেউ এসে আঁকড়ে ধরে অরণীকে। পুঞ্জিভূত দীর্ঘশ্বাসের তলায় হাবুডুবু খেতে শুরু করে অরণীর এক একটি রাত।

একটি দরজা জানালাহীন বন্ধ ঘরে আটকা পড়েছে সে। এই স্বপ্নটিই কয়েক রাত দেখছে অরণী।

'একটি বদ্ধ ঘরে আমি আটকা পড়েছি। আমি বের হবার চেষ্টা করছি কিন্তু দরজা খুঁজে পাই না। বাতাসহীন সে ঘর আমার স্নায়ুতে চাপ দেয়। আতংকিত আমি চিৎকার করে তোমাকে ডাকতে চাই কিন্তু শব্দহীন সেই বিমূঢ় সময় আমাকে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকার এক সুড়ঙ্গের ভেতর।'

সুড়ঙ্গ না গুহা?
কৌশিকের এই প্রশ্ন জড়তাগ্রস্ত করে দেয় অরণীকে। প্রশ্নটির সাথে জড়িয়ে থাকা কৌতুক সংশয়ে ফেলে দেয় তাকে। এরপর এতটাই কাতরভাবে সে প্রশ্ন করে কৌশিককে,

'আগে কী আমি গুহা বলেছিলাম?'

ঠিক যেন এই বিভ্রান্তি থেকে বের করে আনার জন্য অরণী সাহায্য চাইছে কৌশিকের। কৌশিকের প্রতি এই নির্ভরতা অবশ্য একদিনে তৈরি হয়নি অরণীর। প্রায় বছর তিনেকের পরিচয় ওদের।

বাদামী চোখের অরণীকে প্রথম দেখাতেই ভাল লেগে গিয়েছিলো কৌশিকের। আর এরসাথে ছিল অরণীর উচ্ছলতা। কথায় ছলছল করে হেসে ওঠা মেয়েটি খুব তাড়াতাড়িই আপন হয়ে উঠেছিলো কৌশিকের।

কিন্তু এই আপন মানুষ দুটিই অচেনা হয়ে উঠছে ক্রমশ। এই স্বপ্নের দীর্ঘ বৈরি রাত একটু একটু করে বিছিন্ন করছে ওদেরকে অগোচরে।

কৌশিক প্রথম প্রথম বিভ্রান্তি মোচনের সব দায়িত্ব নিয়ে বলতো, ' হোক গুহা বা সুড়ঙ্গ, তাতে কী আসে যায়। সেতো মামুলি এক স্বপ্নই।'

কিন্তু সেই মামুলি স্বপ্ন যখন রাত রাত ভোগাতে শুরু করলো অরণীকে তখন কৌশিক মূলতই রূঢ় হয়ে উঠলো।

'কী হয়েছে তোমার? ওগুলো স্বপ্ন নয়, তোমার ভাবনা। বাজে ভাবনা।'

স্বপ্ন শেষ হবার পর বিক্ষিপ্ত রাত অরণীকে অস্থির করে তোলে। পাশে ঘুমিয়ে থাকা কৌশিকের নির্লিপ্ততা ওকে চেতনারহিত করে দেয়। জাগিয়ে রাখে রাতের পর রাত। সেসব রাতের নিস্তব্ধতা একটু একটু করে পাঁজরে বসত গড়ে অরণীর। মর্মান্তিক এক অস্বস্তি জায়গা করে নেয় সেসব নিভাঁজ রাতের পরতে।

তার এই বিপন্নতায় বিরক্ত কৌশিককে দেখে আরোও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে অরণী।

ঘুম থেকে কৌশিককে জাগিয়ে স্বপ্নের বিভ্রান্তি মোচনের অর্থহীন অবদার করা বন্ধ করে দেয় সে। আর অরণীর বিক্ষিপ্ত রাতকে পেছন পাশে রেখে নির্দ্বিধায় ঘুমায় কৌশিক।

এভাবেই রাতের সাদা দেয়ালে মূর্ত ছায়াগুলোর মতো অতিশয় বাস্তব বিপন্নতায় এক পা দু'পা ফেলে দূরে সরে যেতে থাকে অরণী ও কৌশিক।

তবে এই বিষণ্ণ তরঙ্গিত রাতের সাথে যুদ্ধ করার কৌশলও শিখে ফেলেছে অরণী খুব তাড়াতাড়ি। রাতের রঙ বদলের সাথে নিজেকে মানিয়েও নিয়েছে অবলীলায়।

তবুও যখন ব্যত্যয় হয় তখনই কৌশিকের স্পষ্ট বিরক্তি, 'স্বপ্ন দেখেছো আবার? আশ্চর্য! কতবার বলেছি বাজে ভাবনাগুলো বন্ধ করো।'

এই শব্দগুলো বহুবর্ণরূপ ধরে অরণীর মনের গলি ঘুপচিতে ঢেউ তোলে অস্থিরতার। প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মেয়েটি মনে করার চেষ্টা করে কোন কোন বাজে ভাবনায় তার সময় আবর্তিত হয়। না, পারে না মনে করতে। শুধু ভাবনায় জোড় ফেলে উদ্ধার করে আনে একটি দিন।

দিনটা এমন ছিল –

কৌশিকের সাথে সেদিন ডিনারে গিয়েছিলো অরণী। 'কালারস্ অফ স্পাইস' নামের সদ্য খোলা দামী রেস্টুরেন্ট ছিল সেটি। মেইন খাবারের অর্ডার অরণীই করেছিলো। আর খাবার শেষে ডেজার্টে তিরামিশু ছিল কৌশিকের পছন্দের। বাইরে থেকে ডিনার করে আসার পরেই কৌশিক বসে গিয়েছিলো ল্যাপটপে। স্টাডি রুমে। আর সে রাতে স্কিন কেয়ার শেষ করে অভ্যাসমতো একটি বই হাতে নিয়েছিলো।

'দ্যা গার্ল বিফোর' বইটি চুম্বকের মতো টেনে রেখেছিলো তাকে। পড়তে পড়তে কখন যে মধ্যরাত হয়ে গিয়েছিলো বুঝতে পারেনি সে। হঠাৎ খুট করে একটি আওয়াজ হলো। আর বেডসাইড টেবিলের আলোটাও কোনোরকম সুযোগ না দিয়ে দপ করে নিভে গেলো।

প্রথমে অরণী অবাক হলো। তারপর যতটুকু না ভয় তারচেয়ে বেশি দ্বিধা নিয়ে বিছানা ছেড়ে নামলো। ততক্ষণে অন্ধকারের প্রকটতা অনেকটাই কমে এসেছে টেবিল ঘড়ির সবুজ আলোর কাছে। শব্দহীন সে ঘরে তখন শুধুই উন্মত্ত ফ্যাকাশে অন্ধকার। তবে

থিতিয়ে আসা সে সময় খুব বেশি প্রলম্বিত হলো না। টেবিল ঘড়ির ঝিঁ ঝিঁ শব্দটি উসকে দিলো শব্দের ধারাবাহিকতাকে । এরপর পরই তেড়ে এলো আরেকটি শব্দ।

ঘরটির নিভাঁজ নিস্তব্ধতা অসাড় হলো টিকটিকির 'টিকটিকটিকটিক' ডাকা শব্দে। ঘুরে তাকালো অরণী পেছনের দেয়ালে। একটি নিথর পেতল রঙের টিকটিকি সেখানে। ঠিক যেন দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা পুরাতন কোনো শোপিস। সময়ের প্রাচীনতাকে প্রকট করতেই কারো এই চেষ্টা। তবে সময়ের আবেদন ঠিক অত সরল ছিল না। বিক্ষিপ্ত সময়ের ছেঁড়াখোঁড়ার ফাঁক গলিয়ে তখন উঁকি দিচ্ছিলো দুঃসহ আরেক মুহূর্ত ।

নিথর টিকটিকি আচমকাই থিতিয়ে আসা সময়কে অগ্রাহ্য করে নড়ে উঠলো।

অসংলগ্নভাবে দেয়াল বেয়ে নেমে এলো অরণীর ঠিক পায়ের কাছে। যেন লক্ষ্যটি তার আগে থেকেই স্থির করা ছিল। তারপরেই অরণীকে অপ্রস্তুত করে টিকটিকি উঠে এলো পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর। এরপর...

এরপর তো অরণীর মনে নেই। অনেক চেষ্টা করেও সে সময়ের ধুম্রজাল ভেদ করতে পারে না। শুধু এরপর অন্ধকার একটি রাত। একটি স্বপ্ন। একটি বদ্ধ ঘর আর অন্ধকার গুহা...

'তাহলে সেটা গুহা ছিল?'

কৌশিকের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য অরণী আর নিজের স্মৃতিশক্তিতে জোর দিতে পারে না।

'তুমি বিশ্বাস করছো না আমার কথা?'

অরণীর এই প্রশ্নে কৌশিকের মুখের সুক্ষ্ম হাসি ফুরিয়ে যায়। মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে বলে, 'কে বললো বিশ্বাস করিনি। করেছি তো। আর বিশ্বাস থেকেই বলছি ওটা স্বপ্ন ছিল। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছো।'

এরপর কৌশিকের 'আমার অরণীকে কোনো কালো বদ্ধ ঘর আটকে রাখতে পারবে না' আহ্লাদের শব্দগুলো সন্ধি করে এই এপার্টমেন্টের প্রতিটি দেয়ালে। এরপর প্রায় প্রতিরাতেই অরণী জেগে ওঠে স্বপ্নটি দেখে।

কৌশিক প্রথম প্রথম এই ঘটনাকে উচ্চ হাসি দিয়ে গুরুত্বহীন করে দিতো। এর কিছুদিন পর সুক্ষ্ম হাসি দিয়ে উপেক্ষা করতো। আর তারও পরে অর্থাৎ এখন বিরক্ত হয়ে ঘটনাকে 'বাজে ভাবনা' বলছে। কৌশিক জানে প্রতিদিন রাতে একজন মানুষের একই স্বপ্ন দেখতে পারে না। সে ভাবে, তার স্ত্রী মিথ্যে বলছে।

কিন্তু অরণীর এই চিৎকার, এই আতঙ্ক, এই কান্না মিথ্যে নয়। সে জানে, রাত হলেই দেয়ালের ছায়াগুলো একটি সুড়ঙ্গ বানায়। আর সুযোগ পেলেই স্বপ্নটি তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় সুড়ঙ্গের ভেতর।

তার দম আটকে আসে। একটু বাতাসের জন্য আছাড়িবিছাড়ি করে সে। তবে কৌশিক এটা বিশ্বাস করে না। তার মনে হয়, এগুলো ওইসব থ্রিলার পড়ার দোষ। নয়তো, সারাদিন যে মেয়েটি উচ্ছ্বল, চঞ্চল প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়ায়, সে কেন রাত হলেই এমন আতংকিত হয়ে পড়বে।

' তুমি এবার থ্রিলার পড়া বন্ধ করো।'

অরণী প্রশ্নহীন চোখ নিয়ে তাকায় কিঙ্করের দিকে। উত্তরে বলে, 'বইকে প্রতিযোগী ভাবার কারণ নেই।'

অরণী জানে শুরু থেকেই কৌশিক বই পড়া খুব একটা ভালভাবে নেয়নি। বইয়ের ভেতর তার ডুব দেওয়াকে কৌশিক তাকে ফাঁকি দেওয়া ভাবে। কৌশিকের মনে হয় ওই বইগুলোর একটি নিঃস্তব্ধ কুঠুরি আছে। তাকে উপেক্ষা করতেই এসব দিনগুলোতে অরণী প্রবেশ করে সেই কুঠুরিতে।

উঁহু, তবে আজ সেসব কথা ভাবতে পারলো না কৌশিক।

আজ অরণী যখন ঘুমহীন রাতের যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছিলো, মর্মান্তিক অস্বস্তিতে প্রায় নিঃশব্দে ঘর টপকে বারবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলো একটু দম নেবার আশায়, তখনই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে অরণীকে সে যন্ত্রণামুক্ত করবে। এই বাজে রোগ থেকে মুক্ত করবে অরণীকে।

'আমি আগেই তোমাকে বলেছিলাম ও একটু অসুস্থ। তুমি বিশ্বাস করোনি তখন।' এটুকু বলেই টিভির ভলিউম বাড়িয়ে সেদিক মনোযোগী হয় বড় খালু। কৌশিকের বাকি কথায় তার আগ্রহ নেই।

'অসুস্থ হলে তো তার চিকিৎসা করবে?'

বড় খালা চায়ের কাপ কৌশিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন। খালা অরণীকে দেখাশোনা করছেন সেই কিশোরী বয়স থেকে। বাবা-মা হারিয়ে মেয়েটি যখন তাদের জিম্মায় এলো তখন বয়স চৌদ্দ। অরণী শোকগ্রস্ত হলেও অসুস্থ নয় মোটেও। এর কিছুদিন পর আস্তে আস্তে সে শোক কাটিয়ে মেয়েটি এ বাড়িতে উড়ে বেড়াতে শুরু করলো।

'সে সুস্থ, শুধু একটু ভীতু। বাপ-মা হারা মেয়ে তো, অন্ধকার ভয় পায়। ভয়ের স্বপ্ন দেখে।' মেয়েটার জন্য বড় খালার স্নেহসুর অবশ্য কৌশিক অবধি পৌঁছালো না।

'ওসব ভয় না, ওসব রোগ। বংশগত রোগ।' কৌশিক জানে বড় খালুর এই ইঙ্গিত তার মৃত শ্বশুরের প্রতি।

এবার বড়খালার প্রতিবাদী সুর খালুকে চুপ করিয়ে দিল। 'উনি ছিলেন সৎ মানুষ। বড় অফিসারদের দুর্নীতি ধরে ফেলেছিলেন। তাই মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাঁকে ছাটাই করেছিল। অপমানে মাথাটা একটু ওলটপালট হয়ে গিয়েছিলো।'

কৌশিক এইগল্প অনেক শুনেছে অরণীর কাছে। এসবে তার আগ্রহ নেই। সে এসেছে তার স্ত্রীর গার্ডিয়ানদের পরামর্শ নিতে।

'আরেহ্! পরামর্শ আবার কী? স্বপ্ন দেখে ভয় পেলেই কী তাকে অসুস্থ বলা যায়? ও সুস্থ।' বড় খালা চায়ের কাপ নিয়ে হনহন করে ভেতরে চলে গেলেন। বড় খালু গভীর মন দিয়ে রাত ন'টার নিউজ দেখছেন।

' আজ ৬ষ্ঠ দিনের মতো উত্তাল আমেরিকা বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভে।'

কৌশিক উঠে দাঁড়ালো বাড়ি ফেরবার জন্য। বড় খালুকে পিছনে ফেলে দরজার নব ঘোরালো খোলার জন্য।

'এসব অসুখ চিকিৎসায় ঠিক হয় না।' আচমকা শব্দগুলো ছুটে এলো। কৌশিক হুট করে ঘুরে তাকাতে গেলো। আর তখনি তাড়াহুড়োতে পাশের কর্ণার টেবিলে ধাক্কা খেলো।

টেবিলে সাজানো কিছু শো'পিস নীচে পড়ে গেলো। বড় খালু তখনো মন দিয়ে খবর শুনছেন।

না, অরণী আগে থেকে অসুস্থ ছিল না, কৌশিক জানে। বিয়ের আগে যে ক'বার দেখা হয়েছে তাতে অরণীকে একজন সুশিক্ষিত, উচ্ছল আর রুচিশীল মেয়ে বলেই মনে হয়েছে। বড় খালুর বাসা থেকে ফেরার পথে কৌশিক তার রুচিশীল স্ত্রীর জন্য অনেকদিন পর একগুচ্ছ দোলনচাঁপা কিনলো। দোলনচাঁপার আড়ালে থাকা কৌশিকের ভালবাসাটুকু অরণীকে আজ এক পশলা বাতাস এনে দিলো দম নেবার।

তাই অনেকদিন পর অরণী রাতের খাবার টেবিলে অনেক গল্প করলো। অফিসের গল্প, শপিং এর গল্প। সব বললো কৌশিককে। কৌশিক দেখে তার স্ত্রী আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতোই। তার গল্প বা আচরণে কোনো অসংলগ্নতা নেই। কৌশিক নির্ভার হয়। কিন্তু অরণী জানে তার এই নির্ভার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। মধ্যরাতের স্বপ্নের দিকে সে নির্বোধের মতো এগিয়ে চলেছে অন্য পাঁচটা দিনের মতোই।'

'স্বপ্নের ঘরটাতে কোনো জানালা নেই, তাই না?'

অরণী অবাক হয় কৌশিকের প্রশ্নে। তবুও স্মৃতিতে জোর দেয়। 'না, জানালা নেই। দরজাও খুঁজে পাই না।'

'সত্যি বলছো? ঠিকঠাক মনে করতে পারছো তো?'

অরণী গভীরভাবে তাকায় কৌশিকের দিকে। কৌশিকের চোখ মাটির দিকে। তার ভেতর কোনো অসহিষ্ণুতা নেই। খুব শান্তভাবে আবার প্রশ্ন করে, 'তুমি মনে করতে পারো এই বদ্ধঘর তোমার স্বপ্নে কবে থেকে আসছে?'

মেয়েটির মনে হলো কৌশিক তার দিকে তাকাতে গিয়েও চোখ নামিয়ে নিলো। অরণী ভাবতে শুরু করে। খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে একদম সঠিক সময়। বয়স তখন চৌদ্দ নাকি তেরো ছিল? সে ভাবনায় ডুবে গেলো।

কৌশিক তাকালো অরণীর দিকে। আশপাশের রাস্তা থেকে দু'একটি গাড়ির হর্ণ, বসার ঘরের টিভির একঘেয়েমি টক শো আর শোবার ঘরের ঘড়িটার ঝিঁঝি ডাক - এই সকল স্বাভাবিকতার মধ্যে তার স্ত্রীকে খুব অস্বাভাবিক মনে হলো। আর তা আজ প্রথম মনে হলো।

অরণী ঘেমে উঠছে। অন করা এসির মধ্যেও সে ঘেমে উঠছে। অরণী কিছুতেই মনে করতে পারছে না তখন তার বয়স কত ছিল? কৌশিক তার স্ত্রীকে ভাবার সুযোগ দিয়ে খাবার টেবিল থেকে উঠে এলো। মোবাইল থেকে ফোন নম্বরটা বের করে ভেবে নিলো। আগামীকাল সাইক্রিয়েটিস্টের এপোয়েন্টম্যান্ট কনফার্ম করতে হবে। অরণীর ভেতর

অস্থিরতা বাড়ছে। তখনকার বয়সটা ঠিকঠিক মনে করতে পারছে না। শুধু মনে পড়ছে বড় খালার বিশাল ওই বাড়িতে তারা মাত্র তিনজন ছিল।

না, ভুল হলো।

অধিকাংশ সময় বড় খালু বাইরে থাকতেন। চাকরির জন্য। সপ্তাহে একবার আসতেন। যখন আসতেন বড় খালা সবসময় খালুর সাথে সাথে থাকতেন। তবে এই সাথে থাকায় ব্যত্যয় হয়েছিলো একবার। বড় খালার জা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তখন। তারা দুই জা ছিলেন দু'বোনের মতো। তাই তাকে সেবা করতে হাসপাতালে রাতে থেকে গিয়েছিলেন বড় খালা। আর সে রাতেই বড় খালু তাকে ডেকে নিয়েছিলেন বসার ঘরে। পড়াশুনার খোঁজখবর নিতে। টিভিতে তখন রাত দশটার খবর হচ্ছিলো।

সেদিন টিভির আওয়াজ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। অরণী সব মনে করতে পারছে। এই বদ্ধ ঘরের স্বপ্ন সেদিনের পর নিয়মিত আসতো। শুধু বয়সটাই মনে আসছে না তার। কত বয়স হবে তখন চৌদ্দ নাকি তেরো?

কৌশিক ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার অরণীকে দেখে নিলো। বোঝার চেষ্টা করলো নতুন কোনো অসংলগ্নতা। দেখলো, অরণী কিছু বিড়বিড় করছে আর মাথা নাড়ছে। কৌশিক নিশ্চিত হলো, অরণীর সাইক্রিয়াটিস্টের সাহায্য প্রয়োজন। মনের সবটুকু দ্বিধা দূর হতেই কৌশিক গুনগুন করে উঠলো, 'লেটস স্ট্যা টুগেদার...'

এরপর পকেট থেকে বের করে আনললো একটি টিকটিকি। পেতলের টিকটিকি। এই খেলনা টিকটিকি সেদিন রাতে বেডরুমে কৌশিক ইচ্ছা করেই রেখেছিলো অরণীর সাথে মজা করার জন্য। সে জানতো, অরণী ভয় পায় টিকটিকি। কিন্তু এটা তখন কৌশিকের অজানা ছিল, এই ক্ষুদ্র মজা অরণীকে আবার নতুন করে নিঃক্ষেপ করবে দুঃসহ স্বপ্নের সেই বদ্ধ ঘরে। ঠিক এরকই আরেকটি টিকটিকি আজ কৌশিক দেখে এসেছে বড় মামার জানালাহীন বসার ঘরে, কর্ণার টেবিলে সাজানো। আর অদ্ভুতভাবে সে ঘরের দরজাটিও একটি দীর্ঘ প্যাসেজের পর। যেনো কেউ ইচ্ছে করেই ঘরের দরজাটা আড়ালে রেখেছে।

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

হাসান মাহমুদ

লাব্বায়েক্!!

দুই ছেলে হজ্বে যাবে তাই নিয়ে মাহবুব সওদাগরের বাড়ী খুব ব্যস্ত। বড়ো ছেলে ছোটাছুটি করে যোগাড়যন্ত্র করছে কিন্তু ছোটকে নিয়ে মহাসমস্যা। ছোটবেলা থেকেই তার রহস্যের শেষ নেই। তার রঙ্গরসের পাল্লায় পড়ে চিরকাল সবাই অস্থির। বাবা প্রস্তুতির কথা জিজ্ঞেস করলেই সে বলে-

"হচ্ছে বাবা হচ্ছে, চিন্তা করো না। এ বছর যাদের হজ্ব কবুল হবে তাদের মধ্যে আমারাও থাকব ইনশা-আল্লাহ্"।

বাবা আশ্বস্ত হন কিন্তু ছোট বৌ হয় না। তার বাবাও হজ্ব করেছে। সে জানে হজ্বে যেতে হলে কি হুলুস্থুল আয়োজন করতে হয়, কতো জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয়। সে দেখতে পাচ্ছে স্বামী দিব্যি মহা আরামে গা এলিয়ে আছে। যোগাড়যন্ত্রের কোন খবরই নেই। জিজ্ঞেস করলেই হেসে বলে –"আমারটা আমি করছি- তুমি তোমারটা গুছিয়ে নাও তো। শেষে তোমার জন্য না দেরি হয়"।

বৌ ত্রস্তে এটা ওটা গোছায় কিন্তু মনে গেঁথেই থাকে সন্দেহটা। তারপর একদিন বড় ছেলে গেল হজ্বের ক্যাম্পে বৌয়ের হাত ধরে। বাবা ছোটকে জিজ্ঞেস করলেন-

"তোর হজ্ব-ক্যাম্প, ফ্লাইট, এসবের কিছুই তো বললি না"।

ছোট হেসে বলে- ''ক্যাম্পে কেন যাব। বাড়ি থেকে সোজা হজ্বে যাব - ব্যবস্থা সবই হচ্ছে - তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তো বাবা''।

যাবার দিন এল। রওনা হবার সময় মা অশ্রুসিক্ত চোখে ছেলে-বৌয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে কী বললেন বোঝা গেল না। গাড়ির ড্রাইভার ডিক্কির মধ্যে স্যুটকেস পুরে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। মা'কে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে ছোট বলল -

"মা, পাঁচদিন পর ফিরব। দোয়া কোর আর শুটকি রান্না করে রেখো।"

বাবা অবাক হলেন- "পাঁচদিন পর ফিরবি?''

"ফিরব বাবা, হজ্ব করেই ফিরব। ঠাট্টা নয় বাবা - সত্যি বলছি।"

বৌয়ের কানে গেল কথাটা। সে জানে পাঁচদিনে হজ্ব করে ফেরা যায় না। কিন্তু সে এও জানে স্বামী যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে কথাটা বলেছে নিশ্চিত হয়েই বলেছে। যা সে বলেছে তা করবে। কিন্তু কী করে করবে? পেছনের সিটে বসল দু'জন - গাড়ী চলা শুরু করলে সে জিজ্ঞেস করে,

"আমরা কোথায় যাচ্ছি গো? হ্যাঁ?''

"কোথায় আবার, হজ্বে যাচ্ছি।"
"এভাবে কেউ হজ্বে যায়? আসলে কোথায় যাচ্ছি সত্যি করে বলো না!''
ছোট হেসে বলে - ''হজ্বেই যাচ্ছি। সবুর করো, একটু পরেই দেখতে পাবে।"
বৌ খুব সবুর করল। গাড়ী এসে দাঁড়াল বাস ষ্টেশনে। বৌ বলল -
"এ তো বাস ষ্টেশন!"
"হ্যাঁ - বাস ষ্টেশনই তো।"
"বাসে করে হজ্বে যাচ্ছি?''
"হ্যাঁ। পথে কিছু কষ্ট করতে হবে - পারবে তো?''
"আমরা হজ্বে যাচ্ছি না। বাসে করে কেউ হজ্বে যায় না। ছি ছি, সবাইকে এভাবে ঠকালে?"

"কাউকে ঠকাইনি। এ বছর যাদের হজ্ব কবুল হবে তাদের মধ্যে আমরাও থাকব ইনশা-আল্লাহ্। ওখানে গিয়ে বলবে লাব্বায়েক্।"
"মানে কি?''
"মানে আমি হাজির। অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি ডেকেছ, এই যে আমি হাজির।"
ড্রাইভার ডিক্কি থেকে বাসে তুলে দিল স্যুটকেসগুলো, মৃদু হেসে বলল -
"আপনেরে হাজার সালাম সার। আপনেরে হাজার হাজার সালাম সার। অ্যামতেই ধীরে ধীরে মুসলমানের চক্ষু খুইলা দিব আল্লায়।"
ছোট গম্ভীর স্বরে বলল - ''সব রওনা হয়ে গেছে ঠিক মতো?"
"হ সার। শ্যাষের চালান নিজের হাতে রওনা করাইয়া দিছি পরশু।"
এসব শুনে রমণীয় কৌতুহলের চাপে বৌয়ের অজ্ঞান হবার অবস্থা কিন্তু স্বামীকে মনে হচ্ছে অচেনা। ওই বুকে কী এক অস্থির ঝড় চলছে তা তার চোখ দেখলে বোঝা যায়। তার সদা দুরন্ত কৌতুকময় চোখ দুটো এখন যেন ফ্রেমে বাঁধা ঝড়ের ছবি। বাস চলা শুরু করলে বৌ বলল -
"কোথায় যাচ্ছি আমরা?''
"রংপুর।"
"রং - পু - র"?? আঁৎকে উঠল বৌ, - ''রংপুর কেন? ওখানে তো আমাদের কেউ নেই!!''
স্বামী শক্ত করে চেপে ধরল বৌয়ের হাত। গভীর নিঃশ্বাসে শুধু বলল - ''আমার হাত ধরে থাকো। আমি একা পারব না।"
এবার বৌয়ের হাতও আঁকড়ে ধরল স্বামীর হাত, বুঝল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যা আগে ঘটেনি। স্বামী হাতের ব্যাগ খুলে বের করল কিছু খবরের কাগজ - একটা একটা করে খুলছে আর সেই সাথে শক্ত দৃঢ় হয়ে আসছে তার চিবুক, ঠোঁটে শক্ত হয়ে চেপে বসছে ঠোঁট। একটার পর একটা কাগজের কী যেন খবর পড়ছে, ছবি দেখছে আর ঘন হয়ে আসছে তার নিঃশ্বাস।
দুপুরে রংপুরে বাস থেকে নেমে ঘটঘটে বেবিট্যাক্সিতে গ্রামের পথ। বিকেলে দূর গ্রামের

কাছাকাছি আসতেই কানে এল জনতার হৈ হৈ। কাছে এসে বৌ দেখল দাঁড়িয়ে আছে চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ ভরতি তিনটে ট্রাক। ভয়ংকর বন্যা চলছে উত্তরবঙ্গে। ভেসে গেছে মাঠের ফসল আর গরু বাছুর ছাগল মহিষ, বৌ বাচ্চা নিয়ে ডুবে যাওয়া বাড়ির ছাদে বসে আছে অনাহারে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ। শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু চোখে লুটিয়ে আছে হাড্ডিসার শিশুকন্যা, হাড্ডিসার বালক। অন্য এক ভয়ংকর আতঙ্কে আতঙ্কিত ক্ষুধার্ত যুবতি। গত বন্যায় শুধু দু'টো নুন-ভাতের জন্য নোংরা ফড়িয়ার বিছানার দুঃসহ স্মৃতি আবার তার সামনে কালনাগিনীর ছোবল তুলে এদিক ওদিক দুলছে।

পলকের জন্য টলে উঠল বৌয়ের মাথার ভেতর।

কিন্তু এখন জনতার ক্ষুধিত আর্তনাদ বদলে হয়েছে উৎসবের চিৎকার। ট্রাকের ওপর থেকে তরুণ-কিশোরের দল মহা উৎসাহে লোকজনের মধ্যে বিতরণ করছে চাল-ডাল আলু-লবণ তেল। বৌ মুগ্ধ চোখে দেখল মানুষের আনন্দ, তারপর দুষ্টুমি করে বলল:

"ও! হজুর টাকায় দান-ধ্যান হচ্ছে তাহলে?"

"দান?" চকচক করে উঠল স্বামীর দু'চোখ - "কিসের দান? কাকে দান? আশরাফুল মাখলুকাত ওরা, আপাতত একটু কষ্টে পড়েছে। আমিতো শুধু উপহার দিচ্ছি, মানুষের প্রতি মানুষের উপহার"।

মুগ্ধ বৌয়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল - "তুমি একটা ফেরেশতা!"

"না। আমি বনি আদম, আমি ফেরেশতার চেয়েও বড়। কোরান পড়ে দেখ, সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৬২।"

তারপর সে তার সেই পুরোনো পরিচিত দুষ্টুমি ভরা চোখে বলল:

"আসলে কি জানো? ব্যবসায়ীর ছেলে তো আমি - উপহারের নামে আমি আসলে ব্যবসা করছি। ধারের ব্যবসা - শ-শ-শ-শ....কাউকে বোলনা যেন!"

"ধারের ব্যবসা? এই দুর্ভিক্ষের দেশে??"

বিস্ময়ে বৌয়ের কথা আটকে গেল গলায়। বাকচাতুরী ও দুষ্টুমিতে স্বামী তার অনন্য, কিন্তু একের পর এক এত বিস্ময়ের ধাক্কা সে আর সামলাতে পারছে না।

"কিসের ধার? কাকে ধার?"

"বুঝলে না? আল্লাহকে ধার দিচ্ছি, অনেক লাভ হবে বৌ!"

"আল্লাহকে ধার দিচ্ছ? তওবা তওবা!"

"তওবা মানে? আল্লাহ নিজেই তো মানুষকে ডেকে ডেকে ধার চাচ্ছেন!"

"আল্লাহ মানুষকে ডেকে ডেকে ধার চাচ্ছেন? তওবা তওবা!"

"কিসের তওবা? খুলে দেখ কোরান শরীফ- "এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম কর্জ, আর আল্লাহ তাকে দ্বিগুন বহুগুন বেশি করে দেবেন- সুরা বাকারা আয়াত ২৪৫।"

"কি?" ছিটকে উঠল বৌ- "কি বললে?"

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম কর্জ, আর আল্লাহ তাকে দ্বিগুন বহুগুন বেশি করে দেবেন - সুরা বাকারা আয়াত ২৪৫।

"কি আশ্চর্য! এই দুর্ভিক্ষের সময়ে কেউ এ আয়াতের কথা দেশের সবাইকে বলে না কেন?"
"বলা দরকার, রেডিও -টিভি খবরের কাগজ সব জায়গায় বলা দরকার। ঢাকায় ফিরে পড়ে দেখো সুরা মুয্যাম্মিল ২০, আত্ তাগাবুন ১৭ আর আল্ হাদীদ ১১। 'আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও....যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুন করে দেবেন। .... কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ধার দেবে। এরপর তিনি তা বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন। এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।'

এই দশ ট্রাকের জিনিস ধার দিচ্ছি। রোজ হাশরে বিশ ট্রাকেরও বেশি সওয়াব পাব। তার সবটাই তোমাকে দিয়ে দেব যাও!"
হেসে ফেলল বৌ, মনে মনে স্বামীগর্বে আবার গরবিনী হল সে। স্বামী চলে গেল ট্রাকের কাছে। ছুটে এল মাতবর আর ইমাম- অনেক কথা হল তাদের মধ্যে। বৌ মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল মানুষের আনন্দ। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেবার মতো আনন্দ আছে? ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেবার মতো ইবাদত আছে? দিগন্তে তখন সূর্য ডুবুডুবু, মন্দ মন্থরে সন্ধ্যা নামছে। ঝোপের ডালে উড়োউড়ি করছে একটা ফড়িং। মাটিতে ঘোরাঘুরি করছে নামহীন দুটো পোকা আর পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একদল পিঁপড়ে। কী যেন কী নিয়ে ওরা খুব ব্যস্ত।
বৌয়ের মনে হল, ওদের কেউ কি কখনো না খেয়ে মরেছে?
চমক ভাঙ্গল যখন স্বামী এসে বলল -
"জানো, আমার দেখাদেখি অন্যেরাও কিছু পাঠাচ্ছে"।
"আমার গয়নাগুলো থেকে কিছু না হয়........"
"গুড ! শোন। মন দিয়ে শোন।"
বৌ মন দিয়ে শুনল, অশরীরী এক দৃঢ়কণ্ঠে স্বামী তার ফিসফিস করে উঠল -
"আমাদের বাড়িতে এককণা দানা থাকা পর্যন্ত মানুষের বাচ্চাকে না খেয়ে মরতে দেব না আমি"।
গভীর মমতায় বৌ বলল - "এত অস্থির হয়ো না, নিজেকে এত কষ্ট দিয়ো না। বন্যা চিরদিন থাকবে না। মানুষ আবার উঠে দাঁড়াবে, ফসল ফলাবে, বৌ বাচ্চা নিয়ে ভালই থাকবে। তখন আমরা সত্যিকারের হজ্ব করতে যাব"।
"নিশ্চয়ই। হজ্বের তো বিকল্প নেই, সামনের বছর হজ্ব-এর বুকিং আমি দিয়েই এসেছি। জানো, নবীজি বলেছেন যার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে সে মুসলমান নয়। যে মুসলমানই নয় তার আবার হজ্ব কি? চলো আমরা আগে মুসলমান হই।"
স্বামী দৃঢ়পদে চলে গেল ট্রাকের কাছে। সামনে জলমগ্ন বিশাল জমিন। ওপরে অবারিত আকাশ। বৌ কল্পনায় দেখল এয়ারপোর্টে সাদা কাপড়ে মাথা কামানো হাজার হাজার আনন্দিত হজ্বযাত্রী হুড়োহুড়ি করে প্লেনে উঠছে আর বুক ভরা তৃপ্তিতে বলছে "শুকুর আলহামদুলিল্লাহ"! ওদিকে দূরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট দুটো ক্ষুধার্ত ভাই-বোন হাত ধরাধরি করে করুণ চোখে তা দেখছে।

ভাইটা আস্তে করে বলল- ''বড় হইয়া তরে হজে লইয়া যামু।"
দ্বিধাগ্রস্ত বোনটা কী যেন ভাবল। তারপর ফিসফিস করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল -
"ওইহানে ভাত আছে?"

টরোন্টো, অন্ট্যারিও, কানাডা

হিল্লোল ভট্টাচার্য

মুলাক্করম

১

আজ থেকে দু'শ বছরেরও বেশি আগের কথা, সন ১৮০৩। কেরালার আলাপ্পুঝা জেলার চারথালা গ্রাম, সে সময় ওই অঞ্চলটা ত্রিবাঙ্কুর স্টেটের অধীন ছিল। কেরালার সব গ্রামের মতোই নদী, খাল, বিলে ঘেরা চারথালার যে দিকেই তাকানো যায়, একেবারে সবুজে সবুজ; চোখ জুড়োনো প্রাকৃতিক শোভা ঈশ্বরের এই নিজের দেশে। বর্ষাকালের এক বিকেল; একরাশ নারকেল গাছে ছাওয়া, মেঠো পায়ে চলা পথ বেয়ে পুকুরের দিকে হেঁটে আসছে শিবাম্মা আর রেবতী। বেলা পড়ে আসছে। এবার গা ধোবে তারা। সম্পর্কে রেবতীর পিসি হয় শিবাম্মা, বয়স তার ত্রিশের কোঠায়, কম বয়সে বিধবা হয়ে ভাইয়ের সংসারেই আছে সেই কবে থেকে। গ্রামের যে অঞ্চলে একদম অন্ত্যজ শ্রেণীর বাস। সেখানেই থাকে এই নিম্ন বর্গের 'এজাভা' পরিবার। তৎকালীন কেরালার বর্ণপ্রথা অনুযায়ী 'এজাভা' সম্প্রদায়ের মানুষরা ছিল অচ্ছুৎ, নিচু জাত; সমাজের উপরতলার মানুষ অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের সাথে তাদের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ ছিল।

পিসি-ভাইঝি পুকুরের জলে নামতেই পেছনের খেজুর গাছটার দিক থেকে কতগুলো পুরুষ কণ্ঠের হাসির আওয়াজ এল। চমকে ফিরে তাকাতেই দেখল তারা কতগুলো ১৯-২০ বছরের ছেলে তাদের অনাবৃত শরীরের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, অশালীন ইশারা করে কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসছে। শিবাম্মা চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল। ছেলেগুলো এগিয়ে আসছে, ভয়ে কাঁটা হয়ে রেবতী শিবাম্মার হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। তাড়াতাড়ি করে বুকের কাপড় জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল রেবতী। শিবাম্মা নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। যেন বোঝাতে চাইল লাভ নেই। পঞ্চদশী রেবতী অবাক হয়ে পিসির দিকে তাকালো। বিস্ময়ের সাথে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় মিশ্রিত সে দৃষ্টির অভিব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। ছেলেগুলো আরেকটু কাছে এসে রেবতীর দিকে তাকিয়ে বলল,
-"কি রে মাগি, আমাদের সামনে বুকে কাপড় দিচ্ছিস যে বড়? তোর বাপ কর ভরেছে? মুলাক্করম?"
পাথরের মত শক্ত মুখে তাকিয়ে আছে রেবতী, কি বলবে সে জানে না। নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ

ছেলেগুলোর চোখ মুখ থেকে কামনা ঝরে পড়ছে। নিচু জাত, অস্পৃশ্য বলে হয়ত তাদের শরীর ওরা ছোঁবে না। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে ধর্ষণ করবে। লোলুপ দৃষ্টি লালাঝরা জিভের মত চেটে নেবে ওদের উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গ।

নাহ! দিন এনে দিন খাওয়া হতদরিদ্র এই দলিত পরিবার। চড়া হারের মুলাক্করম বা স্তন শুল্ক জমা করতে পারেনি রাজ তহবিলে। ব্রাহ্মণ ছাড়া এ সমাজে অন্য কোনো নারীর বুক ঢাকার উপায় নেই। যদি ঢাকতে হয় তার জন্য দিতে হবে দুর্মূল্য কর, মুলাক্করম, যার সিংহভাগ জমা পড়বে পদ্মনাভ মন্দিরে।

-"নীচু জাতের মেয়েছেলে আবার বুক ঢাকবি কি? তাও আমাদের মত উচ্চবর্ণের সামনে?"-রাজ পরিবারের কৃপাধন্য ব্রাহ্মণ সমাজ এই করের প্রচলন করেছে, নিজেদের গগনচুম্বী অর্থলোভ চরিতার্থ করতে। কিছুতেই তাদের খাঁই মেটে না।
-"দলিত হয়ে জন্মেছিস, দলিত হয়েই মরবি। আমাদের সামনে কীট পতঙ্গের মত মূল্যহীন জীবন তোদের।" যেন প্রতি পদক্ষেপে নিম্নবর্গকে এই বার্তা দিতে চায় ব্রাহ্মণরা। "আর যদি মাথা তুলে বাঁচতে চাস তাহলে হাজারটা শুল্কের তলায় চাপা পড়ে যাবি"। এই কর, সেই কর, নীচু জাতির জন্য খাজনাতন্ত্রের খোল নলচে আমূল বদলে ফেলা হয়েছে কেরালায়। এমন অদ্ভূত সব শুল্কের প্রবর্তন করা হয়েছে, যার নজির পৃথিবীর আর কোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নেই।

চোখ দিয়ে মাপতে মাপতে শিবাম্মার দিকে তাকিয়ে একটা ছেলে দাঁত বের করে বলল, "মনে হচ্ছে, এ মাগিটার এ বছর কর একটু বেশি লাগবে রে! দেখেছিস... পুরো ডাব"! অন্য ছেলেগুলোও অশ্লীল ভাবে হেসে উঠল। মুলাক্করমের নিয়ম হচ্ছে, বুকের মাপ অনুযায়ী কর দিতে হয়। অর্থাৎ ঢাকতে যতটা কাপড় লাগবে, সেই অনুপাতে শুল্ক নির্ধারিত হবে।
আরেকটা ছেলে রেবতীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "তবে এটাও ডাগর হচ্ছে রে। কদিন পর আরো ডবকা হবে। তখন পুকুর পাড়ে ভীড় জমে যাবে দেখে নিস।"

শিবাম্মা রেবতী কে টেনে নিয়ে গেল জলের আরেকটু গভীরে। বুক ঢাকা জলের গভীরতায় না গেলে এই অবস্থা থেকে আর উদ্ধার নেই। রাগে, লজ্জায়, অপমানে রেবতীর ইচ্ছে হল তলিয়ে যেতে। বোধহয় সেটা আঁচ করেই শিবাম্মা তাকে শক্ত করে ধরে আছে একটা হাত দিয়ে। রেবতী শুনতে পেল, পিসি ফিসফিস করে বলছে, "অভিশাপ! অভিশাপ! হে ঈশ্বর, কোন পাপে আমাদের এই নিচু জাতের ঘরে জন্ম দিলে?"
দুজনেরই গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে। আকাশে একটু শব্দ করে বিদ্যুৎ চমকালো, পরক্ষণেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা নিম্নমুখে ধেয়ে আসল। বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই বোধহয় ছেলেগুলো পুকুর পাড় থেকে দ্রুত বিদায় নিল। দুই নারী স্তব্ধবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। বর্ষার বারিধারা তাদের চোখের জল ধুইয়ে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু নির্নিমেষ দৃষ্টির আগুন কি নেভাতে পারছে?

২

সকাল থেকেই নাঙ্গেলী আজ বেশ খোশ মেজাজে আছে। দু'সপ্তাহ পর তার মরদ চিরু বাড়ি আসবে। প্রান্তিক 'এজাভা' শ্রেণীর মানুষদের সাধারণত স্থায়ী উপার্জনের কোনো বন্দোবস্ত নেই, কখনো ভাগচাষী হিসেবে মাঠে ঘাম ঝরাতে হয় কখনো বা তাঁত বুনে পেট চালাতে হয়। নিম্নবর্গের আর পাঁচটা পরিবারের পুরুষদের মত চিরুও মরশুম বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই কদিন সে গিয়েছিল আলেপ্পীর দিকে, জেলে মাঝিদের সাথে। আলেপ্পী আর কুমারকোমের মধ্যবর্তী জলাশয়ে মাছ ধরার কাজে। রাতের পর রাত নৌকোয় জেগে থাকতে হয়। বড় পরিশ্রমের কাজ। মাসে এক বা দুবার বাড়ি এসে কদিনের বিশ্রাম নিয়েই আবার ছুটতে হয়। গরিব লোকের গায়ের বেদনা জুড়োনোর জন্য দু'দণ্ডের বেশি অবকাশ মঞ্জুর করেন নি যে উপরওয়ালা। নাঙ্গেলী তার ঘরের দাওয়ায় বসে চাল বাছতে বাছতে গুনগুন করে একটা মালয়ালী লোকগীতি গাইছে। তার শ্বাশুড়ি গোয়ালে কালো গাইটার দেখাশোনা করছেন। আজ বোধহয় দোয়ানো দুধ দিয়ে কিছু একটা মিষ্টান্ন বানানো হবে ছেলের ঘরে ফেরার খুশিতে।

গোটা চারথালা গ্রামে নাঙ্গেলীই একমাত্র নারী যাকে সমাজপতিদের রক্তচক্ষু বশে আনতে পারে নি। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও ভয়ডরহীন এই মেয়েটি নিয়মকে কাঁচকলা দেখিয়ে 'মুলাক্করম' প্রথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। সে শুল্ক দিতেও রাজী নয় আবার বুক খোলা রেখে ঘুরতেও তার প্রবল আপত্তি। দু একবার ব্রাহ্মণরা তাকে আকারে ইঙ্গিতে 'ফল ভালো হবে না' বোঝাতে চেয়েছে কিন্তু সে পাত্তা দেয়নি।

তার শ্বাশুড়ি গোয়ালের দিক থেকে কিছু একটা কথা বলার জন্য ডাকছিলেন। চালের পাত্রটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে কথাটা ভালো করে শুনতে যাবে, হঠাৎ বেড়ার দিকটায় বহু লোকের সম্মিলিত কোলাহলের আওয়াজ পাওয়া গেল। নাঙ্গেলী একছুটে বেরিয়ে এল। ঘটনাটা কি বোঝার জন্য। বাইরে এসে চমকে গেল। পাড়া পড়শিদের একটা দল হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটছে। গায়ত্রী নামের পাশের বাড়ির বউটাকে জিজ্ঞেস করাতে সে কোনোক্রমে বলল, সবাই রামনাথনের বাড়ির দিকে যাচ্ছে, আজ সকালে বাড়ির পেছনের বাগানে, একটা গাছের ডালে রামনাথনের মেয়ে রেবতী গলায় দড়ি দিয়েছে! নাঙ্গেলি আর কিছু ভাবতে পারল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ওদের সাথে সেও ছুটল। ওরা রামনাথনের বাড়িতে যখন এসে পৌঁছল, সারা গ্রামে খবর রটে গেছে। পুরো চারথালা ভেঙে পড়েছে উঠোনে। রেবতীর মৃত দেহটা গাছের ডাল থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। একটা চাদরে ঢেকে শোয়ানো আছে বাড়ির সামনে। রেবতীর মা পাগলের মত আছড়ে কাঁদছে। তার কিছু আত্মীয়া তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। রামনাথন মেয়ের মৃতদেহ ধরে বসে আছে পাথরের মত। বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে, কোন শব্দ নেই তার মুখে।

শিবাম্মার গলা থেকে শুধু সাপের মত একটা হিসহিসানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। 'মুলাক্করম, মুলাক্করম এর অভিশাপ লাগবে ওদের। এ পাপের নিস্তার নেই!'

শিবাম্মার বয়ান যারা শুনেছিল, সেই প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গতকালের পুকুর পাড়ের ঘটনাটা পুরো জানল নাঙ্গেলী। ১৫ বছরের মেয়েটার লাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বর্ষাতে শুরু হল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নাঙ্গেলী। "অনেক হয়েছে, আর নয়, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। মুলাক্করমের নিয়ম আমরা আর মানব না। উঁচু জাতের মেয়েদের মত আমাদেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে নিজেদের লজ্জা নিবারণ করবার। আজ একটা মেয়ে এই কুপ্রথার জন্য বলিতে চড়ল। এখনই এর পূর্ণচ্ছেদ টানার সময়।"

হতচকিত জনতার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। হয় তারা শোকের আবহে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না নাঙ্গেলি কি বলতে চাইছে অথবা ব্রাহ্মণ্যসমাজ প্রবর্তিত এই নিয়মের উল্টোপথে হাঁটবার মত মনের জোর তাদের নেই। নাঙ্গেলী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন বুঝল এদের মধ্যে কেউ তার পক্ষ সমর্থন করার সাহস দেখাতে পারছে না তখন কাপুরুষদের দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে, "বেশ কাউকে যদি পাশে নাও পাই ক্ষতি নেই। আমার লড়াই আমি একাই চালিয়ে যাব," বলে হনহন করে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিল ।

খাল, বিলের পাশ কাটিয়ে বাড়ি আসতে মাঝখানে একটা জলা জায়গা পড়ে। ছোট বাঁশের সাঁকো পার হতে হয় সেখানে। নাঙ্গেলী যখন সাঁকোর প্রায় মাঝ বরাবর চলে এসেছে তখন দেখল অন্য দিক থেকে মাঝবয়সী নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ ভেলুস্বামী সাঁকোতে উঠে তার দিকে আসছেন। খুব সরু জায়গা। দুজনে মুখোমুখি পার হলে গায়ে গায়ে ঠেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাকে দেখেই ভেলুস্বামী চেঁচিয়ে উঠলেন।
"এই ছোটোলোকের মেয়ে, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি? দেখতে পাচ্ছিস না আমি আসছি? জানিস না তোর জাতের ছায়া মাড়ানোও পাপ? যা, যা নেমে দাঁড়া!"

নাঙ্গেলীর মাথায় আগুন আগে থেকেই জ্বলছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সংবরণ করে সে বলে উঠল,
-"আমি নামব না, প্রয়োজন হলে আপনি নেমে দাঁড়ান।"
ভেলুস্বামী ভীষণ অবাক হলেন। অচ্ছুৎ নিচু জাতের কাছে এরকম আচরণ প্রত্যাশিত নয়। অভ্যস্ত নন তিনি।
প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন তিনি, "কি বললি? নেমে দাঁড়াবি না? তোর সাহস তো কম নয়। আমার মুখে মুখে তর্ক করছিস। আমার অভিশাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাবি জানিস সে কথা?"
নাঙ্গেলী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ব্রাহ্মণের ওপরে গলা চড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "যা খুশি করার করুন। আমি নেমে দাঁড়াব না"। উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা এগিয়ে যায় সে।

এই একরত্তি মেয়ের সাহস তো কম নয়! তাঁকে একেবারে গ্রাহ্যই করছে না। হনহন করে চলে আসছে! কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন ভেলুস্বামী, হঠাৎ খেয়াল হল, 'আরে এই নিচু জাতের মেয়েছেলেটা তো দিব্যি বুকের ওপর কাপড় চড়িয়ে আছে!' এদের যা আর্থিক অবস্থা তাতে মুলাক্করম দেওয়ার ক্ষমতা থাকার তো কথা নয়।
একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে বললেন, "এই চাঁড়ালের বেটি, কি পেয়েছিস কি তুই? আমার সামনে বুক ঢেকে আছিস যে বড়? দেশে কি আইনকানুন বলে কিছু নেই নাকি? জানিস না বুক ঢাকতে হলে শুল্ক দিতে হয়, মুলাক্করম! দিয়েছিস সে খাজনা?"

-"না, দিইনি, আর কোনো দিন দেবও না"। দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় নাঙ্গেলী।
-"তাহলে খোল, কাপড় খোল"। ধমকের স্বরে বলেন ভেলুস্বামী।

ব্রাহ্মণের চোখে চোখ রেখে আগের মতই আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলে সে, "না খুলব না, মুলাক্করম ও দেব না আর বুকের কাপড় ও সরাব না, দেখি আপনার কত ক্ষমতা!"

ভেলুস্বামীর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে নাঙ্গেলী, ছুঁয়ে দিল বলে। অভিসম্পাতের ভঙ্গিতে ডানহাতের তর্জনী তুলে কিছু একট মন্ত্রোচ্চারণ করেই উল্টো দিকে হাঁটা দিলেন ব্রাহ্মণ। "দেখি কি করে কর না দিয়ে ছাড় পাস তুই", এই বলে শাসিয়ে নাঙ্গেলীর দিকে একটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে নিষ্ক্রান্ত হলেন ভেলুস্বামী।

বাড়ি ফেরার পর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। যা হবার কথা ছিল তাই হল, খবর পেয়ে স্থানীয় শুল্ক আদায়কারী আধিকারিক বা 'পর্ভতাইয়ার' এসে হাজির। ভেলুস্বামী যে সবিস্তারে নাঙ্গেলীর ঔদ্ধত্য বর্ণনা দিয়ে তার কান বিষিয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না।
-"এ বছরের মুলাক্করম জমা পড়েনি, বকেয়া শুল্ক চাই"!

-"না, দেব না"।

-"বেশ, আমি ও না নিয়ে যাব না"। পর্ভতাইয়ার ও ছাড়ার পাত্র নয়।

-"আজ যত বেলাই হোক না কেন, আমি অপেক্ষা করব কিন্তু মুলাক্করম নিয়েই তবে উঠব"।
সকাল গড়িয়ে দুপুর, তার পর বিকেল হতে চলল, কিন্তু কর আধিকারিকের নড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

-"বেশ আপনি বসুন, আমি ভেতর থেকে গিয়ে নিয়ে আসছি"। কি ভেবে যেন শেষমেশ বলে উঠল নাঙ্গেলী।

খুশি হয় 'পর্ভথাইয়ার', "কুকুরের লেজকেও সিধে করার ক্ষমতা রাখি আমি। আর তুই তো কোথাকার এক নীচু জাতের মেয়েছেলে!", মনে মনে ভাবে 'পর্ভথাইয়ার'।
-"এই নিন, ধরুন" বড় কলাপাতায় মুড়ে কি একটা যেন নিয়ে এসেছে নাঙ্গেলী।
-"এটার মধ্যে করে আবার কি..." বলতে বলতে কলাপাতাটা ধরতে যেতেই অবাক হয়

শুল্ক আধিকারিক, ওপর থেকে টুপ টুপ করে রক্ত ঝরছে। চমকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখে নাঙ্গেলীর বুকের কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে, একটা দমকা হাওয়ায় হঠাৎ কাপড়টা সরে যেতেই আতঙ্কে শিউরে উঠল 'পর্ভথাইয়ার', নাঙ্গেলীর উন্নত সুগোল বক্ষদ্বয় আর নিজের জায়গায় নেই, তার বদলে বুকে বীভৎস দু'খানি ক্ষত! কর আধিকারিকের হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। হাতের কলাপাতায় নরম মাংসপিণ্ডের উষ্ণতা অনুভব করে সে। সেখান থেকেও তাজা রক্ত গড়িয়ে মাটির দাওয়া ভিজিয়ে দিচ্ছে। আধিকারিকের শিহরিত হাত থেকে কলাপাতাটা পড়ে যেতেই দেখা গেল রক্তে মাখামাখি নাঙ্গেলীর স্তনযুগল। তার তরফ থেকে রাজকোষকে দেওয়া ভেট, 'মুলাক্করম'!

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

উপসংহার

আধিকারিকের প্রবেশের পর থেকে উপরোল্লিখিত ঘটনার পুরোটাই সত্যি। তার আগের অংশটুকু গল্পের পটভূমি গড়ে তোলার স্বার্থে কল্পনা করা হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সেই দিনই নাঙ্গেলীর মৃত্যু হয়। তার স্বামী চিরুকন্দন শোক সহ্য না করতে পেরে স্ত্রীর জ্বলন্ত চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। এই অসমসাহসী নারীর অভূতপূর্ব বিদ্রোহ পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। তার স্বামী চিরুকন্দনের ঘটনাও অদ্বিতীয়। কারণ স্বামীর সাথে সহমরণের প্রথা চালু থাকলেও আক্ষরিক অর্থে স্ত্রীর চিতায় 'সতী' হওয়ার কাহিনী এর আগে কখনো শোনা যায়নি। নাঙ্গেলীর মৃত্যুর পর ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়, ফলে ক্রমাগত আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কয়েক বছরের মধ্যে মুলাক্করম বা 'ব্রেস্ট ট্যাক্স' নামক এই অভিশপ্ত প্রথা রদ করেন। নাঙ্গেলীর বাড়ি যে জায়গাটায় ছিল, পরবর্তীকালে তার নামকরণ করা হয়, 'মুলাচিপরম্বু' যার অর্থ, "Land of the breasted woman"!

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

ঌ প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা ৎ

অজয় দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ: উজ্জ্বল উদ্ধার

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আসন পোক্ত বলেই জানি। কিন্তু আসলে কি তা সত্য? আমরা যারা এখন জীবনের গোধূলি বেলায় আমাদের জানা আছে একাত্তরে কী হয়েছিল। কী ঘটেছিল পাকিস্তান আমলে। পাকিস্তান ও ভারত দুটো দে ই স্বাধীন হয়েছিল ধর্ম ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গর্ভে। বৃটিশের চাল হোক আর আমাদের অজ্ঞতা হোক সত্য এই কোন সম্প্রদায়ের নেতাই মূলত ধর্মের বাইরে পা রাখতে পারেন নি। বলাবাহুল্য জিন্নাহ যেহেতু মাটির সন্তান ছিলেন না তাই উপমহাদেশের মানুষের জন্য তাঁর তেমন কোন টান ও ছিলো না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই সময় পাকিস্তানে থাকার জন্য ভোট দেয়। সে সুবাদে আমরা পড়ি পূর্ব পাকিস্তানে। যে রাষ্ট্রের সূচনাতেই আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা পড়ে ঘোর বিপদে। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী নেতারা ধরে নিয়েছিল তারাই আমাদের চাইতে সেরা। আর সে কারনে তারা যা বলবে সেটাই চলবে সেটাই আইন। এরা বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি কবি রবীন্দ্রনাথকেও টার্গেট করে। এবং অমুসলিম বলে তাঁর চর্চা তাঁর গান সবকিছু নিষিদ্ধ করা হয়। নিষিদ্ধ করা টা আইনের কাজ হলেও মানুষের মন তা মানবে কি মানবে না তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তখন আমরা দেখেছি আশ্চর্যজনক ভাবে আরো বড় আরো ব্যপ্ত হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শাসকদের লাঠি জুলুম বা আইন রবীন্দ্রনাথকে ঠেকাতে পারেনি। বরং আরো বিপুল বেগে ফিরে আসেন তিনি। এমনই বেগ যে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন তাঁর সতীর্থ ও বাংলার মানুষকে সাথে নিয়ে স্বতন্ত্র আবাস ভূমি রচনার স্বপ্ন দেখছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথই হয়ে উঠেছিলেন দীপশিখা। বাংলার আকাশে ভরসার রবি করোজ্জ্বল এক মানুষ।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান তখন হাতিয়ার। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি ছিলেন শক্তি। দেশ মুক্ত হবার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত করে নেন। কিন্তু বাকী সব অর্জনের মত এই গানটিও দেশবিরোধী রাজাকার আর জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর না পছন্দের। তারা বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে হত্যার পর যেসব অর্জন মুছে ফেলতে চেয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত তার একটি। কিন্তু তাদের সব অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ। সে সময় আমি দেখেছি তারুণ্য কতটা অগ্রগামী আর স্বদেশপ্রেমী ছিলো। আজ এতবছর পর আমরা কি দেখছি? জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিভ্রান্তি

যায়নি। বরং সামাজিক মিডিয়ার এই রমরমা কালে এর বিরুদ্ধে বললেও সমর্থন আর নোংরা মন্তব্যের ঢল বয়ে যায়। এমন সব কথা লিখা হয় যা পড়লে বা দেখলে যেকোন স্বাভাবিক মানুষের শরীর খারাপ হতে বাধ্য।

কেন এমন হলো? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভারত বিরোধীতাই এর কারণ। ভারত মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন আর সহায়তার জন্য বাঙালির মনে জায়গা নিলেও তা এখন ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এর জন্য সেদেশের রাজনীতি ও নেতারা কম দায়ী না। দায়ী তাদের নীতিও। সীমান্ত সমস্যা পানি বন্টন সহ আরো অনেক বিষয়ে তাদের একচোখা নীতি বাঙালি কে শান্তিতে রাখেনি। এই রাজনীতি সংস্কৃতিকে গ্রাস করবে বা করতে পারে। কিন্তু কতটা? আজ দেখছি যুবাদের ভেতরই এই বিরোধিতা প্রকট। তারা এই বিরোধিতাকে রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। সেটাই আজ বড় সমস্যা।

এর ওপরে আছে আরো কিছু সমস্যা। বিরোধিতা সামাজিক মিডিয়ার কালে এমন উগ্ররূপ ধারণ করেছে যে কবির ব্যক্তি চরিত্র ও আক্রমণহীন থাকেনি। জীবনের কোন পর্যায়ে যে অভিযোগ শুনিনি এখন তাও শুনতে হচ্ছে। তারূন্য বিশ্বাস করে ভাই ঝির সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো রহস্যজনক। অথচ কবির সাথে ভাইয়ের মেয়ের সম্পর্ক ছিলো অনাবিল ভালোবাসার। স্পর্শকাতর মননশীল বাঙালির মনোজাগতিক ভূবনের রূপকার রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়লেই বোঝা যায় কতটা উদার কতটা খোলামেলা ছিলেন তিনি। এই উদারতা নিয়েও তারুন্য আজ সন্দেহপ্রবণ। কেন এমন?

কেন আজ তিনি ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে এমন কুয়াশা? এই প্রবণতা কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের? সমাজে আজ নানা ধরণের অন্ধকার। বলা উচিত চারদিকে মানুষের হতাশা আর নিরাপত্তাহীনতা দৃশ্যমান। অথচ বাংলাদেশ উন্নতির রথে এগিয়ে যাওয়া দেশ। উন্নয়ন ও নিরাপত্তাহীনতা এমন পাশাপাশি চলাটা অস্বাভাবিক। এতে বোঝা যায় আমাদের সমাজে এখন আসলে কোন মানদন্ড বা মূল্যবোধের নিক্তি নাই। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ যেখানে আশার বাতিঘর হবেন সেখানে তাঁকে এভাবে অপমান করার কারণ বোঝা মুশকিল। তবে কি আমরা ধরে নেব এই প্রজন্মের মগজ ধোলাই করে দিয়েছে অপইতিহাস। অথবা যে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র দেশ শাসনে সুবিধা করতে পারেনি তারা কি আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে? অগোচরে কি সেই বিষ এখন জাতির তারুন্যকে শেষ করে দিচ্ছে?

রবীন্দ্রনাথের মত সুফি সাধক যিনি তাঁর শান্তিনিকেতনে সর্বধর্মের ধর্মগুরুদের জন্য আলাদা আলাদা গান ঠিক করে রেখেছিলেন। যিনি ফাতেহা ইয়াজদমে বাণী দিতে গিয়ে লিখেছিলেন ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। বলেছিলেন, এই ধর্মের মানুষদের সাথে নিবে না এগুলে ভারতের উন্নতি বা শান্তি নিশ্চিত হবেনা। তাঁকে নিয়ে এ কোন ষড়যন্ত্র? এ কোন ধরণের খেলা?

আমাদের জীবন ও জীবনবোধকে জাগিয়ে রাখার মানুষ ক'জন আছেন? রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির জীবন সুধা। সকাল থেকে রাত অবধি তিনি গানে গানে আমাদের মনে থাকেন। শুধু দেশে না প্রবাসেও আমাদের জীবনকে মধুময় করে

রেখেছেন তিনি। তাঁর কবিতা সংবাদপত্রের শিরোনাম এখনো। এখনো তিনিই আমাদের সাহস ও শৌর্যের প্রতীক। বিশেষত বাঙালির জীবনে যখন নানা ধরণের অনাচার অশান্তি দেখা দেয় যখন সমাজ অধপতনের পথ ধরে আমরা তাঁর কবিতায় নিজেদের বাঁচার তাগিদ খুঁজে পাই। তাঁর প্রবন্ধের গভীরতা একটি বাক্যেই বোঝানো সম্ভব। যেখানে তিনি লিখেছিলেন "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"। সে বিশ্বাস কি আবারো ফিরে আসবে জীবনে?

কে আমাদের বলবে:

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি...

এমন কবিতার কবিকে অকারণে তুচ্ছ সম্প্রদায়গত কারণে আমরা যদি দূরে ঠেলি আবারো পাকি ভূতের আছর প

ড়বে বাঙালির জীবনে। এটা নিশ্চিত তারাই তাঁকে দূরে সরাব দূরে ঠেলে যারা বাঙালির পুর্নজাগরণকে ভয় পায়। রবীন্দ্রনাথ সেই দূত যিনি নতুন যৌবনের, যিনি বাঙালির ভালোবাসার মুক্তিরদূত। বাইশে শ্রাবণে তাঁর প্রতি আমাদের বেদনা ও শোকের ভাষা হোক উদারতার। যাতে আমরা তাঁকে আবারো অন্তরে ধারণ করতে পারি। তাঁর সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি আমাদের জীবনে সে ভালোবাসা ফিরে আসুক যা রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালিকে একসূত্রে গেঁথে রাখবে । আমরা বলতে পারবো

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার ও।

"হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারিদিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে। এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।'

এই আচার ও বাহ্যবিধান সর্বস্বতাকে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন ধর্মতন্ত্র, মানবের নিত্যধর্মের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই। ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই পালটাতে হবে। এ ছাড়া কোনো শর্টকাট নেই। এককালে দুই সম্প্রদায়ে একরকমের মিল ছিল। তার মূলে মধ্যযুগীয় সন্তদের অবদান কম ছিল না। পরস্পরের তফাৎ মেনেও আমরা কাছাকাছি ছিলাম। কিন্তু সেই সহজ ধর্মবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্গত হয়ে আমরা ধর্মের অভিমান আরো বাড়িয়ে তুলেছি। একেবারে টায়ে টায়ে তুলনা দিয়ে তিনি বলেছেন হিন্দুরা মসজিদের সামনে ঠাকুর নেবার সময় ঢাকে জোরে কাঠি দিয়েছে। মুসলমানরা কোরবানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে বাড়িয়ে তুলেছে।

পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধাই দু'দলের প্রেরণা। এই অভিশাপ থেকে উদ্ধার পাবার পথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্টভাষায় লিখে গেছেন। তবে সে পথ এক ভিন্ন যাপনপ্রণালী—সংস্কার মুক্তির দীক্ষা।

'নানা উপলক্ষ্যে এবং বিনা উপলক্ষ্যে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গে ও সাক্ষাৎ আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি। কাছাকাছি আসি। তাহলেই দেখতে পাব মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়।'

ভাবতে খুব অবাক লাগে ১৯৩১-সালে তিনি প্রখর ভবিষ্যচিন্তায় ধরে ফেলেছিলেন আরো কঠিন সময় আসছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অনৈক্য ঘোচাতেই হবে, মানুষে মানুষে ভেদচিহ্ন মোছার প্রয়াস নিতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা যে আসন্ন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু সে কেমন স্বাধীনতা হবে তা নিয়ে অন্তরে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না।

'সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেই খানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।'

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন তাই সমুদ্রহৃদয় যন্ত্রণামথিত করে তাঁকে দেখতে হয়নি কীভাবে রক্তপিচ্ছিল পথে ধ্বংস হত্যা ভ্রাতৃবিরোধের চুনকালি মেখে তাঁর খণ্ডিত দেশের মানুষ জগৎসভায় মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। মুণ্ড হেঁট হলেও হাতে কিন্তু অস্ত্র আছে। অর্জুনবিষাদ যোগ ঘটেনি।"

সব মিলিয়ে তিনি আমাদের, আমার আপনার সব বাঙালির অপার উদ্ধার।

অস্ট্রেলিয়া

আবদুন নূর

একটি মানুষ। একটি উপন্যাস।

সেই বৃদ্ধকে দেখে থমকে গেলাম। অবাক হয়ে। সুদূর গায়ানায় দেখা পাওয়া সৌম্য দীপ্ত ভদ্রলোক হাজী গাজী। দুবাইয়ের সমুদ্র উপকূলে মেরিনার পাশে মাগরিবের সালাত আদায় করছেন। হুবহু এক চেহারা এক আকতি এক অবয়ব। সেই সৌম্যতা সেই শান্তির প্রতিকৃতি। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেলাম। উনি গায়ানার হাজী গাজী হতে পারেননা। সম্ভব নয়। প্রথম যখন দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানায় যাই ১৯৭১ সালে। দেখা হয়। তিনি ৬০ বছরের দীপ্ত পুরুষ। আজ ৪৫ বছর পরে তিনি হয়তো একশো পঞ্চম বর্ষ পুর্তি করেছেন। বৃদ্ধ হয়েছেন। ঋজু হয়েছেন। হয়ত বা আল্লাহর ডাক এসেছে। ফিরে গেছেন। কিন্তু অবয়ব এক। চেহারা এক।

ভাবলাম কাছে যাই। কথা বলি। দুর্বল চিন্তা বাধা দিল। আমি কি সালাতে রত বৃদ্ধের কাছে ফিরে পাবো সেই দীপ্ত ধারণা যা সারাজীবন আমাকে সমুন্নত করেছে। হাজী গাজী জানতেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন। জানতেন পিতামাতা এসেছে ভারত থেকে। কলকাতা বন্দর পাড়ি দিয়ে। খিদিরপুর বলে একটি জাহাজঘাট ছিল। দাদার দাদা নানার নানী বৃটিশের জাহাজে উঠেছিলেন সেই বন্দর থেকে। বৃটিশ উপনিবেশে দরকার পড়েছিল অনেক দাসের। অনেক মজুরের। দরকার পড়েছিল শ্রমের। যে শ্রম দিয়ে গড়ে তুলতে পারবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। গড়তে পারবে। লুটতে পারবে। কলোনীর জন্য। সেই কারণে ওরা সনাতনী দাস প্রথার নাম বদলে নতুন নাম সৃষ্টি করলো। ইনডেনচারড ওয়ার্কার্স লেবারস। বৃটিশরা আইন জানতো। কানুন জানতো। প্রথা জানতো। এবং প্রথাকে মানতে তাদের কোনরকম দ্বিধা ছিল না।

১৮০০ সালের প্রথম দিকে ওরা ভারত থেকে মজুর পাঠানো শুরু করে। জাহাজ ভর্তি মজুর গিয়েছে মরিশাসে, সাউথ আফ্রিকায়, ফিজিতে, ত্রিনিদাদে, টোবাগোতে, গায়ানায়, জ্যামাইকায় এবং ক্যারিবিয়ানের প্রায় প্রতিটি দ্বীপে। যখন যেখানে বৃটিশ কলোনীর মজুরের প্রয়োজন হতো। ভারত বিশাল উপনিবেশ। বিশাল কলোনী। ভারতের মানুষ অধীর হয়ে উঠেছে স্বাধীনতার জন্য। ব্রিটিশের পাগলা ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটানোর জন্য। সেই প্রচেষ্টায় প্রচুর মুক্তমনা যুবক রয়েছেন। যুবতী রয়েছেন। নতুন চিন্তার ধারকরাও রয়েছেন। সাথে সাথে রয়েছে ভারতের অনেক দুঃখী মানুষ। যাদের খাওয়া নেই। অন্ন নেই। পরিবেশ নেই। ঘর নেই। বাড়ী নেই।

শোষণ করা যাদের রীতি তারা কিন্তু শোষণ করে সুন্দরভাবে। শোষিত যারা হবে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিছুটা স্বাস্থ্য দিতে হবে। কিছুটা অন্ন দিতে হবে। কিছুটা বাসস্থান দিতে হবে। কিছুটা আয়ের সুযোগ দিতে হবে। একেবারেই ধুকে ধুকে না বাঁচলেও বাঁচার একটা বিনম্র কামনা উদ্বিগ্ন আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলতে হবে। ধুকে ধুকে

হলেও বাঁচার জন্য মুগ্ধ উপাসনার মনোবৃত্তি তৈরি করতে হবে। ভবিষ্যতের আশা হবে আমরা বাঁচবো। নিজে বাঁচবো। আমার সন্তান সন্ততিকে বাঁচাবো। নিজে হয়ত একজন্মে ধনী হতে পারবো না। কিন্তু আমার সন্তান-সন্ততি সম্পদ পাবে। ধনী হবে। খোলা আকাশের ফালি চিলতে হলেও মেলে ধরতে হবে ওদের চোখের সামনে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে হবে। ব্রিটিশরা সেই খোলা আকাশ ভারতের দুঃখী মজুরকে দিতে পারুক কিনা পারুক সে আকাশের স্বপ্নকে দরিদ্রের প্রলোভনের ফাঁদ তৈরি করেছিলো আকাশটি যেন দরিদ্র মানুষ দেখতে পায়। সিড়ি আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতে চেষ্টা করে।

যুগে যুগে ধূর্ত রাজনীতিবিদ সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে। উন্নয়নের চিলতে আকাশ দেখিয়েছে। কিন্তু আসলে পূর্ণ উন্নয়ন সাধন করতে চায়নি। মুর্খ বিপন্ন জনসাধারণ ওদের প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রেখেছে। রাজনীতিবিদরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই মুর্খ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওরা বার বার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশে উচ্চ অভিলাষী রুটিনমাফিক উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করেছে নব নির্বাচিত সরকার। রাজনীতিবিদরা পরিকল্পনার নীতির মাঝে ইচ্ছাকৃত এমন ধারণা থাকবে সেটা সফল করতে পারবেন না তারা কখনই। তবু বলবেন। কারণ মানুষ আশা করে থাকবে। উপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজনীতির মুর্খ অনুকরণ।

গায়ানাতে ফিরে আসি। ক্যারিবিয়ানে ইনডেনচারড ওয়ার্কাসদের নেয়ার সময় জাগতিক ও আর্থিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কখনো ভারতের দুঃখী মজুরদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে না। তবুও সেই প্রতিশ্রুতি কাগজে কলমে লিখে দিতে ক্ষতি কি? দস্তখতনামা কাগজে লেখা হতো। বলা হতো আমি অমুক খিদিরপুর বন্দর ত্যাগ করছি। আমার পিতামাতা পরিজনবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। কারো প্ররোচনায় নয়। কারো মূর্খ আশায় নয়। বরং স্বইচ্ছায়। আমি জাহাজে উঠছি পাঁচ বছরের জন্য। ব্রিটিশ আমাকে জাহাজে যে দেশে নিয়ে যাবে সেই দেশে আমি নিয়মমাফিক কাজ করব। আমার শ্রম নিয়োগ করবো। আমার শ্রমের পরিবর্তে আমি পাবো খাওয়া, থাকা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও আশ্রয়। আমি পাবো স্বীয় আয় করার সুযোগ। আমার মাসিক পারিশ্রমিক কোম্পানীর খাতায় আমার নাম জমা থাকবে।

পাঁচ বছর কাজ শেষ হওয়ার পর আমার কাছে দুটি পথ খোলা থাকবে। প্রথমটি আমি ইচ্ছা করলে ফিরে আসতে পারবো ভারতে। খিদিরপুরের জাহাজ ঘাটে কলকাতায়। অথবা আমি ইচ্ছে করলে সেই অজানা দেশে যার উদ্দেশ্যে আমি এখন পাড়ি দিচ্ছি সেই দেশে স্থায়ী আস্তানা গড়তে পারবো। চাইলে আরো পাঁচ বছরের জন্য অস্থায়ী আস্তানা গড়তে পারবো। একই শর্তে দাসনামায় আমার কাজের মেয়াদ বাড়বে। দশ বছরের বেশী যদি থেকে যাই তবে সেই দেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার অর্জিত হবে। নাগরিকত্ব পাওয়ার পর দেশে ফিরে আসতে চাইলেও আসতে পারবো। কিন্তু ফিরে আসার কোন খরচ বা দায়িত্ব ব্রিটিশ কোম্পানী দিতে বাধ্য হবে না। শুধু ওদের কাছে জমানো মাসিক পারিশ্রমিক সুদসহ ফেরত দেয়া হবে। সেই দাসখত নামা এখনো ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে লেখা আছে। আইনজীবিদের হাতে সুন্দরভাবে লেখা।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের নানা দেশে যাচ্ছে কর্মের অন্বেষণে। ওদের চুক্তিনামায় কি লেখা হচ্ছে? আশা করছি আমাদের সরকারী দলিল দস্তাবেজে ও নথিপত্রে রক্ষিত হবে ওদের অধিকার। হয়তো কোন গবেষণাবিদ সেই কালের আর এই কালের দাসখতনামা তুলনা করবেন। দাসখতনামা ঘিরে কলকাতার খিদিরপুর জাহাজঘাট থেকে দশ লক্ষ মজুর বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ছিল অবিরল ওদের জাহাজ যাত্রা। মাঝে মাঝে যাত্রার ধারা কিছুটা স্তিমিত হলেও ১৯২০ সাল পর্যন্ত অবিরল চলেছিল।

শ্রমিকরা এসেছে কলকাতায়। কিন্তু কোথা থেকে? কি আশ্চর্য ব্রিটিশদের দাসখত নামায় কোন শহর থেকে ওরা কলকাতায় এসেছে সেটা পুরোপুরিভাবে বর্ণিত হয়নি। কিছু কিছু দাসনামায় লেখা হলেও পূর্ন বর্ণনা নেই। ম্যাপের দিকে তাকালে সহজেই বুঝতে পারবো বেশীরভাগ মজুর এসেছেন বিহার থেকে, বাংলাদেশ থেকে, আসাম থেকে, হয়তো নেপাল থেকেও। দূর পাল্লার মজুর নয়। সে সময়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভাল ছিল না। নৌকোয় করে বজরায় করে ধরে আনা হতো। যদিও বলা হতো স্বইচ্ছায় ওরা দাস পেশাকে গ্রহণ করেছে। ইতিহাসবিদরা যদি পুঁথি দলিল দস্তাবেজ কাগজপত্র ভালভাবে সংগ্রহ করেন, যাচাই করেন, তবে হয়তো দেখতে পারবো আধুনিক ইতিহাস অন্যকথা সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমি ইতিহাসবিদ নই। সেইজন্য ইতিহাসের বর্তমান রুগ্ন অক্ষরগুলো আবার পড়বো না।

আমার ধারণা বেশীরভাগই এসেছে বাংলা থেকে। সেই সময় পূর্ব বাংলায় ও পশ্চিম বাংলায় ব্রিটিশ উপনেবিশকতার বিরুদ্ধে অনেক যুবক পুরুষ মুখর হয়েছে। প্রতিবাদ করেছে। ব্রিটিশরা ভয় পেয়ে জোর করে ওদের তুলে নিয়েছে জাহাজে। দেশ পাড়ি দিতে। বাংলার একটি প্রতিবাদী যুবকের অবদান সাউথ আফ্রিকায় কেপটাউনে এখনো ভাস্বর হয়ে আছে। কেপটাউনের পুরনো আস্তানায় একটি ছোট মসজিদ। নাম হচ্ছে আউয়াল মসজিদ। আউয়াল আল্লাহর শত গুণের একটি গুণ। আউয়াল একটি সংখ্যাও। আউয়াল মসজিদ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম মসজিদ বলেই পরিচিত। ইমামের সাথে আমার কথা হলো। তিনি জানালেন তাঁর প্রপিতামহের কথা থেকে ধারণা হলো মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা আউয়াল এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে। খুব সম্ভব নোয়াখালী অথবা চট্টগ্রাম থেকে। তিনি প্রতিবাদী পুরুষ ছিলেন। ব্রিটিশ উপনেবিশকতার বিরুদ্ধে একদল যুবককে সংহত করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁর উদ্দীপনায় ভীত হয়। ওরা আউয়ালকে গ্রেফতার করে কলকাতার কারাগারে প্রেরণ করে। কিন্তু কারাগারেও আউয়াল দীপ্ত থাকেন। বন্দীদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। জেগে উঠার জন্য। নজরুলের সেই কথার মতো। কারার ঐ বন্দীশালা ভেঙে ফেল। ব্রিটিশরা আউয়ালকে মালয়েশিয়ায় মালাক্কায় পাঠিয়ে দেয়। আশা হলো মালাক্কায় আউয়ালের দীপ্ততা কিছুটা হয়তো প্রশমিত হবে। কারণ মালয়েশিয়ার নারীরা সুন্দরী। ওরা আকর্ষণীয়া। ওরা পুরুষকে ভালোবাসে। মরদ পুরষকে আপন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। বাংলাদেশ থেকে বহু মজুর ১৯০০ সালের প্রথম দিকে মালাক্কায় গিয়েছিলেন। স্থায়ী হয়েছেন। মালাক্কার প্রগতিতে নিজের শ্রম দান

করেছেন। মালাক্কার সুন্দর পরিবেশে আউয়ালের দীপ্ততা কিন্তু প্রশমিত হলো না। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশরা ওকে জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দিল কেপটাউনে। কেপটাউন তখন নির্জন বন্দর। কেউ সেখানে যেতে চায় না। সেখানে ম্যালেরিয়া আছে। রোগ জীর্ণতা আছে।

আউয়াল কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম মসজিদ স্থাপন করলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কিছুটা স্থবির হয়েছেন। কিছুটা বিশ্ব উপনিবেশকতার শক্তির ধার উপলব্ধি করতে পেরেছেন। হয়তো বুঝেছেন ব্রিটিশের বিশাল কলোনিয়ালিজম, উপনিবেশিকতার সাথে একা সংগ্রাম করে দমন করা যাবেনা। তার জন্যে দরকার রাজনৈতিক প্রতিভা। তার জন্য দরকার রাজনৈতিক দল। তার জন্য দরকার সম্মিলিতভাবে সংহত হওয়ার চেষ্টা ও প্রচেষ্টা। আউয়াল মসজিদে আমি দু'রাকাত নামাজ পড়েছি। আউয়ালের আত্মার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি।

হাজী গাজীর কাছে ফিরে যাই। তাঁর পিতার বাবা প্রথমে বিয়ে করেছিলেন গায়ানার এক আদি মহিলাকে। কিন্তু যুগল যাত্রায় ভাষা অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে দেহ নয়। দেহ ভাষা জানেনা। দেহে দেহ মেলানোর জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না। নয়নের ইচ্ছা নারী পুরুষকে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে রাখতে পারে। কিছু কিছু সংসার সেই প্রথায় সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু সুন্দরতম প্রজন্ম গড়ে উঠছে। কিছুদিন অপেক্ষার পর পিতামহ বিয়ে করলেন ভারতের বংশোদ্ভূত রমনীকে। সেই রমনী হিন্দু, কি মুসলিম, কি খ্রিস্টান ছিল সে তথ্য তিনি তখন জানতে চাননি। তাঁর প্রয়োজন জীবন ধারণের যেন এক সহযোগী। যিনি তাঁর ভাষার মর্ম বোঝেন। যিনি তার সংস্কৃতির স্পৃহা ধারণ করেন। জাহাজ থেকে সদ্য নির্গত এক মহিলার কাছে তিনি সেই সহযোগীকে খুঁজে পেলেন। প্রজন্মকে জিইয়ে রাখাই ছিল তাঁদের যুগল ব্রত।

এক সন্ধ্যায় হাজীবাবা আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সুন্দর বাংলো ধরনের বাড়ী। গায়ানার জর্জটাউন শহরের সমুদ্রের পাড়ে। স্ত্রী ওয়ারের কাছে। জুঁই ফুলের শুভ্র ঘ্রাণ। বিশাল বৃক্ষে ফুটে থাকা কাঁঠাল চাঁপার গন্ধ। চারদিকে ফুলের সৌরভ। আকাশ ভরে স্নিগ্ধ পূর্ণিমার আলো। মানুষ হাঁটছে। একদিকে আজান ভেসে উঠল। আরেকদিকে মন্দির থেকে ভেসে এলো কাংস ঘন্টার আওয়াজ।

উনিশ একাত্তর সালে গায়ানার জর্জটাউনের শহর থেকে মনে হলো ঝট করে যেনো আমি ফিরে গেছি উনিশশো পঞ্চাশ সালের পুরনো ঢাকায় কায়েদটুলিতে। আরমানিটোলাতে। ফিরে গেছি ওয়াইজঘাটে সদরঘাটে। ফিরে গেছি সেই জিনাত বিবির কবরের কাছে। ফিরে গেছি শংখের বাজারে। নারায়ণগঞ্জে। ওয়ারী। গেন্ডারিয়ায়। জিঞ্জিরায় মন্দিরের আলো বাঁকা পাথে। স্বপ্নময় সারি সারি আঁকাবাঁকা পাড়ার পথে উঁকিঝুকি দেয়া ছেলে মেয়ের নয়ন কেড়ে।

সেখানেও সন্ধ্যায় একযোগে জেগে উঠতো মসজিদে মাগরিবের আযানের ডাক। একসাথে ধ্বনিত হতো মন্দিরের কাঁসার ঘন্টা। মসজিদে মন্দিরে ধ্বনিত হতো প্রার্থী দাসকুলের প্রার্থনা একক প্রভুর কাছে।

“নামাজ পড়বে। সালাত পড়বে। মাগরিবের।” হাজী সাহেব প্রসন্ন হাসিতে জিজ্ঞেস করলেন।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই সেই বয়সে ইসলামের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও প্রতিদিনের সালাত আদায় করা নামাজ পড়া রোজা রাখা নিয়মমাফিক অনুসরণ করিনি। তবুও ইচ্ছে হলো তাঁর পাশে দাড়িয়ে নামাজ পড়বো।

“আমি আপনার পাশে মৌন হয়ে দাঁড়াই। আপনি নামাজ পড়ান। আমি অনুসরণ করবো”। অনুরোধ করি।

সেই সালাত আমার জীবনের এক মুগ্ধকর সালাত। আল্লাহ্ সেই সালাত আমার গ্রহণ করেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমি তৃপ্ত হাজী গাজী তাঁর সালাতে মহান আল্লাহ্র কাছে তাঁর পবিত্র জীবনকে পূর্ণ মেলে ধরলেন। অঝোর কান্নায় ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় হলেন।

পাশের ঘরে শুনতে পেলাম কাঁসার ঘন্টার আওয়াজ। ফিরে তাকিয়ে দেখি ঘন্টা বাজাচ্ছেন এক সৌম্যা নারী। কপালে বিরাট সিঁদুর। বড় লাল টিপ। কে এই নারী। ঘন্টা বাজানো শেষ করে উনি উঠে দাঁড়ালেন। দুহাত জড়ো করে নমস্কার দিলেন। বললেন সুন্দর ইংরেজীতে। “আমাদের বাসায় আপনি এসেছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।” আমি ফিরে তাকালাম। হাজী বাবা হেসে জানালেন। “তোমার চাচী।” আমি ভাবলাম তাকে কি চাচী ডাকবো না মাসী বলবো। পুরোন ঢাকায় গড়ে উঠা ছেলে আমি। আর্মানিটোলা কায়েদটুলী চষে দেখেছি। গ্রামে গ্রামে হেটেছি। যত্রতত্র পাকা বড়োই খেয়েছি। ঝোপ থেকে তুলে। চলার পথে যখন যাঁকে মায়ের মতো শ্রদ্ধেয় দেখেছি, ডেকেছি কখনো খালাম্মা। ডেকেছি কখনো চাচীমা। ডেকেছি কখনো মাসীমা। ডেকেছি কখনো পিসীমা। চেনা অচেনার সব মায়ের বয়সী মা'র মাঝে কোন দূরত্ব খুঁজে পাইনি। প্রতিটি মায়ের অন্তরঙ্গতা আমাকে সমুন্নত করেছে। আমার জীবনকে উজ্জ্বল করছে। “আপনি আমার মায়ের মত। আপনাকে আমি মাসীমা ডাকবো।” “যেটা মন চায় তাই বলে ডেকো। আজ থেকে জেনে রেখো যতবার তুমি গায়ানায় আসবে আমার ঘরে আসবে। আমার ছেলের মতো হয়ে আসবে। তুমি আমাকে মাসীমা ডেকেছো।” সেই অসামান্যক্ষণে একটি উপন্যাস লেখার দীপ্ত ইচ্ছা জেগে উঠলো। হাজী গাজী বাবাকে কেন্দ্র করে নতুন লেখার প্রেরণা পেলাম। সেই প্রেরণার সেই প্রয়াস থেকেই রচিত হলো আমার প্রবাসী জীবনের প্রথম উপন্যাস “প্যাগাসাস”।

আবদুল আউয়াল। কেপটাউন মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার প্রতিবাদী যুবক। হয়তো তাকেও কেন্দ্র করে রচিত হবে আরো একটি উপন্যাস। আগামীতে। অন্য কোন লেখকের লেখনীতে। হয়তো বা আমারও লেখনীতে। অপেক্ষায় থাকবো।

বেথেসডা, ম্যারীল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

আবদুল গাফফার চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু ও ঐতিহাসিক মার্চ মাস

বাঙালির জীবনে একটি অতুলনীয় ঐতিহাসিক মাস মার্চ। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়ার ঘোষণার বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ। একই বছর ৩ মার্চ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং গণহত্যা শুরু। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা। বছর বছর এ দিবসগুলো আমরা পালন করি। এ বছরও করছি। ১৯৭১ সালের ১ মার্চেই ইয়াহিয়ার নয়া জাতীয় সংসদের ঢাকা অধিবেশন স্থগিত রাখার ঘোষণার প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণবিদ্রোহের শুরু। যার পরিণতি ওই বছরেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

আজ আমরা বিনম্রচিত্তে এই মাসটিকে প্রণতি জানাচ্ছি। এই মাস আমাদের গৌরবের মাস। ক্রন্দনমাখা উৎসবের মাসও। এই মাসটিতে ধর্ম-বর্ণ, গোত্র ও দলীয় পার্থক্য ভুলে জাতি তার স্বাধীনতার উৎসব ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করে। স্মরণ করে এই স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে। স্মরণ করে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের। স্বাধীনতার বেদিমূলে যে চার লাখ নারী সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছেন এবং যারা প্রাণ দিয়েছেন, স্মরণ করে তাদের। 'মুক্তির মন্দির-সোপান তলে' যে লাখো প্রাণ আত্মদান করেছে এই মাসে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করে তাদেরও।

মার্চ মাসের এই বিশেষ দিনগুলো পালনের সময় মনে রাখতে হবে আমরা স্বাধীনতা লাভের ৪৯ বছর পার হয়েছি। আগামী বছর আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। এমন ঐতিহাসিক বছর জাতির জীবনে ফিরে আসবে সুদীর্ঘ কাল পরে। তাই স্বাধীনতার এই পঞ্চাশ বছরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আমাদের গোটা জাতীয় জীবনের সার্বিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। আমাদের ইতিহাসবিদরা সেই দায়িত্বটি পালন করবেন এমন আশা করছি।

আমাদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী ছিল? কী ছিল এই স্বাধীনতার মৌলিক আদর্শ ও স্তম্ভ। জাতির পিতা কী চেয়েছিলেন এবং গত ৪৯ বছরে আমরা কী পেয়েছি? জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের পথে আমরা কতটা এগোতে পেরেছি তার একটা তুলনামূলক বিচার আবশ্যক। এই ব্যাপারেও আমাদের সৎ বুদ্ধিজীবীদের একটা ভূমিকা রয়েছে।

দুইশ' বছর আগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র ও দেশপ্রেমকে কলঙ্কিত করেছিল কিছু ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ও তাদের পদলেহী কিছু বাঙালি ইতিহাসবিদও। নবাবের এই কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ইতিহাসবিদ অক্ষয় কুমার মৈত্রের। দুইশ' বছর পর বাঙালির একালের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রকে মসীলিপ্ত করার চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে পাকিস্তানের সরকারি অনুগ্রহপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী এবং তাদের অনুচর একদল বাঙালি, তাদের চক্রান্ত সফল হয়নি।

বঙ্গবন্ধু আজ নিজের যোগ্যতায় রাষ্ট্রপিতার আসনে আসীন। তবু বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের হোতাদের মিথ্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের একজন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রয়োজন।
বঙ্গবন্ধুর আজীবনের সাধনা ও সংগ্রাম ছিল পরাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। তার আরও লক্ষ্য ছিল, বিশ্বের সব দেশের বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে নিয়ে একটি কালচারাল নেশনহুড বা সাংস্কৃতিক জাতি গড়ে তোলা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরক্ষণেই তিনি দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ করেন। সামন্তবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে বৃহৎ ভূমি মালিকানা উচ্ছেদ করে জমির মালিকানার নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করেন এবং ব্যাংক, বীমা এবং বড় বড় শিল্প ও ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করেন।
শ্রেণিবৈষম্য প্রাথমিকভাবে দূর করার জন্য তিনি নয়াচীনের চেয়েও দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি দেশে পেশাগত শ্রেণিভেদ বিলুপ্ত করেন। উদাহরণ, আইনজীবীদের মধ্যে ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট, উকিল, মোক্তার এই উচ্চ-নিচু শ্রেণিভেদ বিলুপ্ত করা। সব শ্রেণির আইনজীবী, অ্যাডভোকেট বা উকিল নামে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা, ডাক্তারদের মধ্যে এমবিবিএস ও প্যারামেডিকসদের পার্থক্য দূর করে প্যারামেডিকসদের স্বল্পকালীন ট্রেনিং দিয়ে এমবিবিএস টাইটেল গ্রহণের সুযোগ দেওয়া। সংবাদপত্রের প্রুফ রিডারদের সাংবাদিক তালিকাভুক্ত করা। এই পেশাগত শ্রেণিভেদ লুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনি সামাজিক শ্রেণিভেদও বিলোপের সিদ্ধান্ত নেবেন ঠিক করেছিলেন।
বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধনী শ্রেণি আতঙ্কিত হয়। পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ব্যারিস্টাররা বলতে শুরু করেন, 'আমরা এত কষ্ট করে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছি। শেখ মুজিব কলমের এক খোঁচায় আমাদের সকলকে উকিল বানিয়ে দিলেন।' সংবাদপত্রের প্রুফ রিডারদের সাংবাদিকের মর্যাদা দেওয়ায় অনেক প্রগতিমনা সাংবাদিককেও তখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে।
বঙ্গবন্ধু শতাব্দী-প্রাচীন কায়েমি স্বার্থেই বিরাট আঘাত করেছিলেন। সবচেয়ে বড় আঘাত করেছিলেন ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের গণবিরোধী আমলাতন্ত্র উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে। বঙ্গবন্ধু জেলা গভর্নর পদ সৃষ্টি করে নির্বাচিত জেলা গভর্নরদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এটা ছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ। দেশের সামরিক ও অসামরিক কায়েমি স্বার্থ তাতে ক্রুদ্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে এবং কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আঘাত হানেন।
বঙ্গবন্ধু দেশে পশ্চিমা বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি নয়, শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী তখনকার সব দল নিয়ে মোর্চা গঠন করেছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার উত্থান প্রতিহত করা। এর ফলে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রোপাগান্ডা ও গোপন চক্রান্ত।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা এখন স্বীকার করেন, শের শাহ্ তার মাত্র তিন বছরের শাসনে তার ভারত সাম্রাজ্যে ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন, গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডসহ অসংখ্য দীর্ঘ রাস্তা তৈরি, পথিকদের জন্য পান্থশালা স্থাপন, সুবা বাংলাকে বহিরাক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য দুর্গ তৈরি ইত্যাদি করে গেছেন। বর্তমান যুগে শেখ মুজিব তার মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হন। কমনওয়েলথ, জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভসহ আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ, এমনকি পাকিস্তানেরও স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হন। দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি চাঙা করে তুলতে সক্ষম হন। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান দ্বারা গণতান্ত্রিক বিশ্বে তাক লাগান।

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচার করা হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ এবং এক লাখ লোকের মৃত্যু। এখন এটা বিশ্ববিদিত যে, এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মূলে ছিল মার্কিন ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মার্কিন পত্রপত্রিকাতেই এত আলোচনা হয়েছে যে, তা নিয়ে আরও আলোচনা বাহুল্য। ব্রিটিশ রাজনীতিক এবং কলামিস্ট সিরিল ডান এবং লর্ড ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছেন, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্য অতুলনীয়। একটি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। তিনি যদি যথাসময়ে দেশে না ফিরতেন, তাহলে মিত্রপক্ষের বিদেশি সৈন্য বাংলাদেশে থেকে যেত। এত দ্রুত সারাবিশ্বের স্বীকৃতি বাংলাদেশ পেত না। তার যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি এত দ্রুত উন্নতি লাভ করত না। গৃহযুদ্ধে দেশটির বায়াফ্রার মতো অবস্থা হতো।

বঙ্গবন্ধু যদি পাকিস্তানের কাছে প্রাপ্য কোটি কোটি টাকা এবং সম্পদ ফেরত পেতেন, তাহলে দেশের অবস্থা আরও দ্রুত ফেরাতে পারতেন। এ কথা বিদেশি সাংবাদিকরাই বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শুধু দেশের ভাঙা অর্থনীতিই জোড়া দেননি, পাকিস্তানিরা যেসব বড় বড় সেতু ভেঙে দেশটির যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দিয়েছেন, তা দ্রুত মেরামত করেছেন। দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, কিন্তু জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ঊর্ধ্বে যেতে দেননি। '৭৪-এ দেশব্যাপী বন্যা না হলে এখন খাদ্য সরবরাহের চুক্তি পালন না করে মার্কিন সরকার ষড়যন্ত্র না পাকালে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কারণ ছিল না। দেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রকৃত ভিত্তি তিনি তৈরি করে গিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দীর্ঘ ২১ মাস ছিল বাংলাদেশের জন্য অন্ধকার যুগ। সামরিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতা দখল করার পর দেশের স্বাধীনতার ভিত্তিগুলো এক এক করে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সংবিধান থেকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়। তার বদলে ধর্মকে এনে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানি এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দেওয়া শুরু হয়। জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা বদল করার চক্রান্ত শুরু হয়। দেশের

অভ্যন্তরে বাংলাভাইসহ বহু উগ্র মৌলবাদীদের উত্থানে সাহায্য জোগানো হয়। দেশ থেকে গণতন্ত্র সমূলে উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লাগে।

সামরিক শাসনের পরে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত বিএনপি-জামায়াতের রাজত্বকাল আরও ভয়াবহ। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের দুর্গ হাওয়া ভবন এ সময় তৈরি হয়। দেশ থেকে গণতন্ত্র সমূলে উচ্ছেদের জন্য হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। দেশে কৃষকদের অভাব-অভিযোগের জবাবে আলুচাষিদের ওপর গুলি চালিয়ে ১৮ জন আলুচাষিকে হত্যা করা হয়। আলু চাষিদের ন্যায্য দানী অগ্রাহ্য করে তাদের নিজের হাতে পেটায় দুই জিয়া সন্তান, প্রেসক্লাবের জীবনে প্রথমবারের মতো পুলিশ ঢুকে সাংবাদিকদের পেটায়। বিএনপি স্বাধীনতার শত্রু এবং যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতায় অংশীদার করে। সারাদেশে সন্ত্রাসী ও উগ্র মৌলবাদীদের উত্থান ঘটায়। বাংলাদেশ তালেবান রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এমন আশঙ্কা দেখা দেয়।

দেশের গণতান্ত্রিক দলগুলো, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ছিল নেতৃত্বহীন ও অসংগঠিত। ফলে ফ্যাসিবাদ ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। ঠিক এই সময় শেখ হাসিনার ভাঙা নৌকার হাল ধরা। পিতার মতো সাহস নিয়ে তিনি গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ করেছেন বিদেশি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। হাসিনাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে স্বদেশি সামরিক শাসন এবং তার চাইতেও ভয়াবহ গণতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামে সহায়ক শক্তি ছিল জনগণ এবং ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। হাসিনার গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে সহায়ক শক্তি ছিল শুধু দেশের জনগণ। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। হাসিনার জীবনের ওপর গ্রেনেড হামলাসহ ছোট-বড় হামলা হয়েছে এগারোটি।

১৯৯৬ সালে হাসিনা যখন ক্ষমতা হাতে নেন, তখন দেশে জিয়া-এরশাদের কৃপায় তৈরি হয়েছে একটি দুর্নীতিবাজ নব্যধনী শ্রেণি। অধিকাংশ মসজিদ-মাদ্রাসা দখল করেছে জামায়াত। সেখানে ইবাদত ও প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার বদলে ইসলামের জন্য জিহাদ - এই প্রচারণায় যুবকদের মস্তিস্ক ধোলাই করে তৈরি করা হয় সন্ত্রাসী। দেশময় চলেছে হত্যার রাজনীতি। ক্ষমতায় থেকে এবং ক্ষমতার বাইরে এসেও বিএনপি-জামায়াত দেশময় চালিয়েছে সন্ত্রাসের রাজনীতি। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত জিহাদিস্টরা।

শেখ হাসিনার দলের মধ্যেও ছিল চক্রান্ত। একদল প্রবীণ ও নবীন নেতা বারবার তাকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ব্যর্থ করে হাসিনা তিন-তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা তিনি এখনও গড়ে তুলতে পারেননি বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণের পথে এক এক করে বাঁধাগুলো ভাঙছেন। বিএনপি দেশটিকে খাদ্যাভাবের ও দুর্ভিক্ষের দেশ হিসেবে রেখে গিয়েছিল। সে দেশ আজ খাদ্যে স্বনির্ভর। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী, যারা দেশের আইনের ঊর্ধ্বে এবং বিচারের বাইরের লোক বলে সবাই ভাবত, তাদের বিচার ও শাস্তি দিয়েছেন। দেশে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রেখেছেন।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস কঠোর হাতে দমন করেছেন। দেশের অর্থনীতির মতো রাজনীতি এখন অনেকটাই স্থিতিশীল।

দেশে এবং বিদেশে হাসিনার শক্তিশালী নেতৃত্ব এখন স্বীকৃত। অনেকে বলেন, বাংলাদেশে তার নেতৃত্বের এখন কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতার শত্রুদের প্রচারণা হলো হাসিনার শাসন একদলীয় শাসন। তিনি গণতন্ত্র উচ্ছেদ করেছেন। প্রচারণাটা সত্য নয়। তাকে গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই কঠোর হতে হয়েছে। না হলে বঙ্গবন্ধুর মতো অনেক আগেই তাকে জীবন দিতে হতো। দেশেও গণতন্ত্র টিকত না। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যতটুকু কঠোর হওয়া প্রয়োজন তিনি তাই হয়েছেন। তার বেশি নয়। শেখ হাসিনার কোনো ব্যর্থতা ও অসাফল্য নেই, আমি সে কথা বলছি না। কিন্তু তার সাফল্যের তুলনায় অসাফল্যগুলো এত ছোট যে, তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা চলে না।

লন্ডন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাজ্য

আশফাক স্বপন

সৎ সংস্কৃতির সদাজাগ্রত প্রহরী: আনিসুজ্জামান স্মরণে

১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন।
Charles Dickens-এর A Tale of Two Cities উপন্যাসের প্রথম বাক্যটি মনে পড়ে। "It was the best of times, it was the worst of times." সময়টা ছিল সবচাইতে সেরা, আবার সবচাইতে ভয়ঙ্কর।
২৫ মার্চের কালরাত্রি থেকে ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় দিবস। নয়টা মাস গোটা পূর্ববঙ্গ রক্তাক্ত বন্দীশিবির, লক্ষ প্রাণ সংহার, অগণিত নারীর সম্ভ্রমহানি। আর পশ্চিমবঙ্গে কোটির বেশি উদ্বাস্তু। এর চাইতে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে? আবার এই সময়টাতে একটা জনগোষ্ঠী, একটা জাতি তার পরিচয় নির্ণয় করে চূড়ান্ত লড়াইয়ে মগ্ন। এই সময়টাকে একটি নতুন জাতির জন্মের প্রসবযন্ত্রণাও বলতে পারি।
কবে দেশ স্বাধীন হবে তার ঠিক নেই। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ বাজি রেখে নৃশংস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। সহায়হীন শরণার্থীর ভিড় পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়।
তবে এই সময়টা অবিমিশ্র অন্ধকারের সময় নয়। ভাষা, সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য দুই দশকের সংগ্রামের পর পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান তার স্বরূপ অন্বেষণে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের শেষ চিহ্ন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। দুই দশক আগে যেই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভিত্তিতে বাংলা ভেঙে আলাদা রাষ্ট্রের অংশ হওয়াকে সে স্বাগত জানিয়েছে, আজ সেই পরিচয়কে সে প্রত্যাখ্যান করে সামূহিক বাঙালি পরিচয়ের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র রচনার স্বপ্ন দেখছে। পথ মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ নয়, আর স্বপ্নটাও আকাশচুম্বী।
আনিসুজ্জামান যুদ্ধের সময় আরো অজস্র পূর্ববঙ্গের বাঙালির মত শরণার্থী হয়ে কলকাতায় আসেন। তাঁর জীবন, তাঁর অধ্যয়ন, তাঁর গবেষণা পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের অভিজ্ঞতার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।
স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোর দুর্দিনে চিত্তরঞ্জন সাহা স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ ওরফে 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থা থেকে বই প্রকাশ শুরু করলেন। কলকাতা থেকেই। তার একটি বই আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য।' বইটি তাঁর ৫০ দশকের ডক্টরেট অভিসন্দর্ভের পুনঃপ্রকাশ। এর আগে ষাটের দশকের গোড়ায় এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

কলকাতায় মুদ্রিত সংস্করণের মুখবন্ধ লিখে দেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ নীহার রঞ্জন রায়। পঞ্চাশের দশকে ইনি আনিসুজ্জামানের গবেষণার পরীক্ষক ছিলেন। মুখবন্ধে তিনি লেখেন:

'এক সময় পূর্ব বাংলার ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইতিহাস বিভাগ থেকে ডক্টরেট-ডিগ্রির জন্য রচিত কোন কোন গবেষণা-গ্রন্থ আমার কাছে আসতো পরীক্ষা করে তার উপর প্রতিবেদন পাঠাবার জন্যে। সীমানার ওপারে পূর্ব বাংলায় তরুণ লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শ্রম ও নিষ্ঠার, বুদ্ধি ও বোধের, কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কী অর্থগর্ভ বিবর্তন, কী বৈপ্লবিক উদ্দীপনা দেখা দিচ্ছে। এইসব গবেষণা-গ্রন্থের মাধ্যমে তার কিছু কিছু আভাস পেতাম। স্পষ্টতর আভাস পাওয়া যেত তাঁদের কণ্ঠের গানে, রচিত গল্প ও কবিতায়, প্রমাণ পাওয়া যেত তাঁদের নানা অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানান্বেষণের বিচিত্র উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে। দশ-বারো বৎসর আগেই বুঝতে পারছিলাম, পূর্ব বাংলায়– আমার জন্মভূমিতে– সমাজজীবনে এক নবজন্মের সূচনা হচ্ছে।

'দেখতে দেখতে, দু'দিন যেতে না যেতেই নবজাতকের অস্তিত্ব-ঘোষণা শোনা গেল। আমি এসেছি, আমি উপজীত হয়েছি, আমার স্বীকৃতি চাই এই পৃথিবীর মুক্ত উদার আলোয় বাতাসে। আজ সানন্দ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছি তার এই ঘোষণার সর্বতোভদ্র রূপ।

'দশ-এগারো বছর আগে আনিসুজ্জামানের এই গবেষণা-গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমার কাছে এসেছিল পরীক্ষা ও প্রতিবেদনের জন্যে। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আমি তরুণ গবেষকের শ্রম, নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসায়, তাঁর তথ্যসংগ্রহের শৃঙ্খলায়, তাঁর তথ্যনির্ভর যুক্তিতে, সর্বোপরি তাঁর স্বচ্ছ মুক্ত বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্যে সাতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থটি আমার সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল, এবং আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-উপাধি লাভ করেছিলেন।'

১৯৪৭ সালে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্তের খেয়োখেয়িতে রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাগ হলো। তার একটা বড় মর্মন্তুদ শিকার নববিভক্ত দুই বাংলার সংখ্যালঘু মানুষ। আনিসুজ্জামান, নীহার রঞ্জন রায় উভয়েই প্রত্যক্ষ করেছেন, জন্মভূমি কীভাবে ভিন দেশ হয়ে যায়। সংখ্যালঘুর নিগ্রহের বেদনাবিষাক্ত অভিজ্ঞতা যে হিন্দু-মুসলমানের তিক্ততাকে স্থায়ী ও গাঢ় করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ভিন্নতর শুভবুদ্ধির একটা স্রোতও প্রবহমান ছিল। পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী মুসলমানের অবিসংবাদী নেতা ফজলুল হক ইংরেজ শাসনামলে একদিন পাকিস্তান প্রস্তাব করেছিলেন। তিনিই আবার পাকিস্তান সৃষ্টির পর কলকাতায় গিয়ে জনসভায় ভাষণে বলেছিলেন দুই বাংলার মধ্যে কোন তিনি বাধা তুলতে দেবেন না।

১৯৫৭ সালে পূর্ববঙ্গে আওয়ামী লীগের যে কাগমারী সম্মেলন হয় সেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে তোরণ তৈরি হয়। পাকিস্তান সরকার যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেন, বাঙালি মুসলমানের প্রচণ্ড প্রতিবাদে সেই আদেশ ক্ষণস্থায়ী হয়।

দেশভাগের ফলে দেশত্যাগে যারা বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের মধ্য ক্ষোভ আর তিক্ততা বেশি হবে, এটা আশ্চর্য নয়। যেটা বিস্ময়ের এবং বাঙালির পক্ষে আনন্দের সেটা হলো এই দেশত্যাগীদের মধ্যে কিছু শীর্ষস্থানীয় বাঙালি সাহিত্যিক ও পণ্ডিত হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় না দিয়ে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালির সামূহিক পরিচয়কে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন। ফলে রাজনৈতিক সীমানা বাঙালিকে দ্বিখণ্ডিত করে রাখলেও বাঙালির একটা মানসজগৎ রয়েছে যেখানে দেশ ধর্ম নির্বিশেষে একটা অভিন্ন অপার বাংলার অস্তিত্ব আছে। এইসব বিশালহৃদয় মানুষের মধ্যে কবি- কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র আছেন, আছেন কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। আর আছেন বাংলা ভাষার পণ্ডিত আনিসুজ্জামান।

তিনি তাঁর ছেলেবেলা প্রসঙ্গে বলেছেন: 'আমার জন্ম কলকাতায়, এখানেই থেকেছি পার্ক সার্কাসে।... এখানেই ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখি: আমার চোখের সামনে আমাদের অবাঙালি গোয়ালা আর অজ্ঞাতপরিচয় একজন যুবক খুন হয়ে গেল।... অভিনেতা ছবি বিশ্বাসসহ আমাদের হিন্দু প্রতিবেশিরা পুলিশের সাহায্যে পাড়া ছেড়ে চলে গেলেন।'

এই অভিজ্ঞতা আনিসুজ্জামানের শুভবুদ্ধি ও মানবিকতার বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি। পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের অভ্যুদয় মোটামুটি দেশভাগের পর। এর সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। পরবর্তী কয়েক দশকে পূর্ববঙ্গে যে উদার, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার উদ্ভব হয়, তাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অসামান্য। প্রতিটি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনের থেকে স্বাধীন বাংলার পতাকা উন্মোচন- তার স্ফুলিঙ্গ এসেছে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

একটা জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নানান জিনিসের প্রয়োজন। প্রয়োজন নির্ভীক আপসহীন নেতৃত্বের। প্রয়োজন কবি-সাহিত্যিকদের যারা সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে। প্রয়োজন সাহসী পত্র-পত্রিকার, যারা মানুষের বঞ্চনার মুখপাত্র হবে। প্রয়োজন যোদ্ধার যারা সরাসরি শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে।

সেই সাথে প্রয়োজন গবেষক বুদ্ধিজীবীর যারা সার্বিক অগ্রগতি ও রূপান্তরের প্রকৃতি চিহ্নিত করবেন। এদের কণ্ঠস্বর হয়ত অতটা উচ্চকিত নয় কিন্তু তাই বলে এদের গুরুত্ব কিছু কম নয়।

অধ্যাপনা, গবেষণা আর লেখালেখির বাইরেও তাঁর আরেকটা পরিচয় ছিল- ফরাসি দেশে যাকে বলে public intellectual বা জনস্বার্থে সোচ্চার বুদ্ধিজীবী।

যেই আকাশচুম্বী স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, তার সবটা রক্ষিত হয়নি। গরিষ্ঠতান্ত্রিক মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বেনোজল আবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে, বাংলাদেশি মুসলমানের চেতনায় প্রবেশ করেছে। কখনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রবেশ করানো হয়েছে। সিসিফাসের প্রস্তরখণ্ড ওপর দিকে ঠেলবার মতই যেন ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর ফুরোয় না।

এই সময়ে আনিসুজ্জামানের মত একজন সৎ মিতবাক বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন বড় বেশি। এই তো কদিন আগে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে, ধর্ম মানার সাথে সাথে ধর্ম না মানার অধিকারও থাকতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় পরিবেশ, এই কথা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

আনিসুজ্জামান, আপনি আজ আমাদের মাঝে নেই। আপনার জ্ঞান ও মানবিকতার আলোকবর্তিকা আমাদের শুভবুদ্ধির পথযাত্রাকে আলোকিত করে রাখুক।

(যারা এই পর্যন্ত পড়েছেন, অনুমান করি তারা আনিসুজ্জামানের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান জানাবার, তাঁকে জানবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর নিজের রচনা পড়া। বাঙালি মুসলমানের অভ্যুদয় সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা পাবেন, অনেক অজানা তথ্য জানবেন।)

আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আশরাফ আহ্‌মেদ

সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র বসু

[আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। পিতৃপুরুষের ভিটা ঢাকার বিক্রমপুরে। প্রাথমিক শিক্ষা ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে। পরাধীন ভারতে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় তিনি সুদূরপ্রসারী অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে করে ক্ষণজন্মা হয়ে আছেন। আজ ফাইভ-জি নামের যে প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শতগুণ গতিশীল করে দিতে যাচ্ছে, সেই প্রযুক্তির প্রাণ ভোমরা মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন আজ থেকে সোয়া'শ বছর পূর্বে! জগদীশচন্দ্রের ভাষায় 'এই বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্বলের নহে। ... বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননী, তোমারই আশীর্বাদে আমি বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।'। অথচ এই মহাপুরুষকে আমরা ভুলে গেছি। বাংলাদেশের জন্য এ অতি দুর্ভাগ্য! বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যে যে আমরা দৈন্য নই, নূতন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ তাঁকে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তা প্রমাণ করবেন। আমি এই আশা পোষণ করি।]

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে, ১৯২০ সালে। প্রকাশনার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার নাট্যকার, কলামনিস্ট এবং ত্রৈমাসিক 'শিক্ষালোক' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান একটি আলোচনা লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। সাথে ২০০৭ সালে কলকাতার দে'জ পাবলিশিং থেকে পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থটির একটি পিডিএফ কপি'ও পাঠিয়েছিলেন। অপ্রকাশিত সেই আলোচনার কিছু কিছু অংশ নিচে দেয়া হলো।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রচনা ও বক্তৃতার সংকলন 'অব্যক্ত' মূলত লেখকের বৈজ্ঞানিক স্বত্তার পরিচয় দিলেও তাতে তাঁকে এক উচুমানের সাহিত্যিক হিসেবে আমরা দেখতে পাই। এই দেখা শুধু ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত তার সভাপতির ভাষণের ('বিজ্ঞানে সাহিত্য') মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। বইটির প্রতিটি লেখায় শাস্ত্রে বর্ণিত সাহিত্যরসের যে সফল প্রয়োগ তিনি করেছেন তা খুব কম লেখকের পক্ষেই সম্ভব। ফলে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও পদার্থবিজ্ঞানের মতো কাঠোখোট্টা বিষয়ও রসালো হয়ে উঠেছে। কঠিন বিজ্ঞানকে সহজ বাংলায় প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর গভীর দেশপ্রেম, বাংলা ভাষার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, এবং ক্ষেত্রবিশেষে পশ্চিমা বিশেষ করে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সবকিছু ছাপিয়ে একজন শুদ্ধ মানুষের ছবিও পাঠকের মনে আঁকা হয়ে যায়। সাবেকি হলেও বইটি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, এর রচনাশৈলী এবং অন্তর্নিহিত দর্শন ও উপলব্ধি আজও শিক্ষনীয় হয়ে আছে।

ভক্তিমূলক রচনা ‘যুক্তকর’-এ লেখক দৃশ্যমান জগতের বাইরে এক ‘অবৈজ্ঞানিক’ কিন্তু সাধনালব্ধ অতীন্দ্রীয় জগতের দিকে পাঠককে আহ্বান করেন, যা সাধারণতঃ কবিরাই করতে পারেন। ফলে বিজ্ঞানে পুরোপুরি অজ্ঞ পাঠকও পরবর্তী ‘আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব’ রচনায় নির্ভয়ে প্রবেশ করতে পারে। এই প্রবন্ধে লেখক আমাদের বস্তু ও শক্তির অবিনশ্বরতার কথা বলেছেন। অবিনশ্বরতা হচ্ছে যাকে ধ্বংস করা যায় না। কিন্তু একটি রূপ থেকে অন্যতে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন ধান ধ্বংস হয় না, কিন্তু চাউল ও ভাতে রূপান্তরিত হয়। তেমনি শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে যার কয়েকটি হচ্ছে শব্দ, তাপ, ও আলো। এর একটি আরেকটিতে রূপান্তরযোগ্য। যেমন সূর্যের আলো থেকে আমরা তাপ পাই; আবার লোহা গরম করলে তা থেকে লাল আলো বেরিয়ে আসে। জড়বস্তু ও শক্তি যে একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপ তাও বুঝিয়েছেন আমাদের মনে কোন সংশয় না রেখে। জড় পদার্থ এবং শক্তিও পরস্পরে রূপান্তর যোগ্য। যেমন ভাত একটি জড় পদার্থ, তা খেয়ে আমরা শক্তি পাই; কয়লা একটি জড়বস্তু, তা পুড়িয়ে তাপ পাই।

শক্তির এই রূপগুলো যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অভিন্ন কিন্তু অদৃশ্য স্পন্দন, তরঙ্গ, বা ঢেউয়েরই প্রকাশ, তা বর্ণনা করেছেন সহজ ও দৃশ্যমান উদাহরণ দিয়ে। বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারের উপমা টেনে তরঙ্গ দৈর্ঘের পার্থক্যের ফলে শব্দ কেন জোরালো অথবা তীব্রভাবে কানে বাজে তাও বুঝিয়েছেন।

আকাশের সহস্র-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে আমাদের বোধগম্য ক্ষুদ্রতম কণিকাও এই তরঙ্গ দ্বারা আলোড়িত হয়ে চলেছে দিবানিশি। এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে দার্শনিক উপলব্ধি একাকার হয়ে গেছে। ফলে উপসংহারে লেখক বলছেন, ‘এ জগতে আরম্ভও নাই, শেষও নাই’, এবং ‘এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই’। এই উক্তিকে সমস্ত ব্যবহারিক অর্থে আজকের কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু অনেক দার্শনিকের উচ্চারিত ‘জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব’ সর্বকালের জন্য, একথা মানতে লেখক রাজি নন! কারণ বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি বিশ্বাস করেন, যে শক্তি দ্বারা ‘আদিম ‘জীববিন্দু’ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে (অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রমবিবর্তিত হয়ে চলেছে), সেই শক্তি এখনও গতিশীল ও প্রবাহিত। ‘আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব’ রচনাটিকে ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলোর সারসংক্ষেপও বলা যেতে পারে।

সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র

প্রাচীন ভারতীয় নাটক পাঠ এবং দর্শন, এবং কবিতা পাঠের ফলে মনে যে দশটি ভাব বা রস-সৃষ্টির ফলে রচনাটি স্বার্থক বলে বিবেচিত হতো, তার সব ক’টিই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জগদীশচন্দ্র বসু এই দশটি রসের মাঝে নয়টিই তাঁর লেখায় স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি স্বজ্ঞানেই তা করেছিলেন কিনা তা বোঝা মুশকিল। কারণ ‘অব্যক্ত’ বইয়ের রচনাগুলো বিভিন্ন ধরণের। কোনোটি বিজ্ঞান বিষয়ক, কোনোটি ভ্রমণ, কোনোটি শিশুদের উদ্দেশ্যে,

কোনোটি গল্প, কোনোটি প্রবন্ধ, আবার কোনোটি তাঁর বক্তৃতা। তবে সাহিত্যে রসের প্রয়োজনীয়তা যে তাঁর শিক্ষায় ছিল তা বোধ হয় জোর দিয়েই বলা যায়।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর লেখাগুলো অদ্ভুতরসে ভরপুর। কারণ আলো অদৃশ্য হতে পারে অথবা গাছ মানুষের মতো অনুভব করতে পারে। পাঠ মাত্রই মনে একটি অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের মিশ্রণে একটি গল্প লিখলেও এর প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখায়। হাস্যরস প্রয়োগটি তাঁর লেখার বিশেষত্বও বলা যায়। এব্যাপারে নিচে বিষদ আলোচনা করেছি। ভয়ানক রস এবং বীভৎস রসের প্রয়োগ দেখি গাছকে এসিড দিয়ে পোড়ানো, এবং ব্যাঙের 'কাটা ঘায়ে নুন' লাগানোর উল্লেখে ('স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ')। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' ভ্রমণ কাহিনীতে প্রকৃতির যে শান্ত রূপের বর্ণনা পাই, 'যুক্তকর', 'দীক্ষা', এবং 'হাজির' রচনাতেও সেই শান্তরসের সুর ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিক গল্প 'অগ্নি পরীক্ষা'য় তিনি এনেছেন বীররস ও রৌদ্ররস। 'রানী সন্দর্শন' রচনাটি শুধুমাত্র করুণরস ও বাতসল্যরসের পরিচয়ই দেয় না, নারী জাগরণেরও আহবান জানায়।

'আহত উদ্ভিদ' প্রবন্ধে খানিকটা ছোঁয়া থাকলেও 'অব্যক্ত' বইটিতে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত দশটি রসের মাঝে শৃঙ্গার রসের সুস্পষ্ট উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তবে এই অভাবটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূরণ করেছেন তাঁর 'প্রথম বন্ধু' জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা-নির্ভর (আমার ধারণা) 'ল্যাবরেটরি' উপন্যাসে।

আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান তেল ও পানির মত বিপরীতধর্মী মনে হলেও দুটির মাঝে যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, অতি চমৎকার ভাবে জগদীশচন্দ্র তা দেখিয়েছেন 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' বক্তৃতার 'কবিতা ও বিজ্ঞান' অংশে। ব্যপারটি অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে আমি প্রথম অনুচ্ছেদের কিছু অংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি। 'কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অপরূপকে দেখিতে পান। তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায়। সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাষে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়। সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।' (কবিতা ও বিজ্ঞান, পৃ ৭৫)।

সাহিত্যে কৌতুক ও ব্যঙ্গ

কল্প-বিজ্ঞান রচয়িতা এবং আলোচকরা জগদীশচন্দ্র বসুর 'পলাতক তুফান' কে বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম কল্পবিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। একই গল্প পরবর্তীতে 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' নামে 'অব্যক্ত' বইতে সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু আমার কাছে গল্পটিকে কোনোভাবেই কল্পবিজ্ঞান মনে হয় না। কল্পবিজ্ঞান হচ্ছে ভবিষ্যতমুখী। সুদূর

ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হবে সেই পরিবেশের কাল্পনিক কোনো গল্পই হচ্ছে কল্পবিজ্ঞানের গল্প। 'পলাতক তুফান'-এ এরকম কিছুই নেই। এটিকে আমি বরং বিজ্ঞানকে ঘিরে একটি ব্যাঙ্গ ও রম্য রচনাই মনে করি। যে বিষয়টি আমার কাছে প্রধান মনে হয়েছে তা হচ্ছে দেশের শিক্ষিত, শাসক, নীতিনির্ধারক, এবং বুদ্ধিজীবীদের বিজ্ঞান সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণার ওপর এটি একটি ব্যাঙ্গ-কৌতুক রচনা।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস করা হয় কিছুটা বৈজ্ঞানিক মাপজোখ, কিছুটা ঐতিহাসিক তথ্য, এবং কিছুটা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বছর বিশেক আগে এই খোদ আমেরিকাতেও আবহাওয়ার পূর্বাভাষকে যাদুকরের ভেল্কিবাজিই বলে বিদ্রূপ করা হতো। 'পলাতক তুফান' গল্পে একটি বিশেষ দিনে ও সময়ে বৃটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে তলিয়ে যাবে বলে সরকার থেকে প্রচারণা চালানো হয়। কিন্তু সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকলেও সেদিন কিছুই ঘটলো না। পূর্বাভাষটি ফলপ্রসূ না হওয়াতেই এই কল্পকাহিনীর অবতারণা। গল্পের দুটি অংশ, প্রথমটি এরকম। পত্রপত্রিকাগুলো ছিল বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বুঝতে অনিচ্ছুক। তারা আবহাওয়া অপিসের কোনো যুক্তিই আমলে না নিয়ে 'বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা' বলে সম্পাদকীয় মন্তব্য করলো। শুধু তাই নয়, আবহাওয়া অপিস সম্প্রতি ব্যারোমিটার কিনতে 'লক্ষাধিক টাকা'র শ্রাদ্ধ কেন করা হলো, সেই প্রশ্নও করে বসলো!

তীব্র সমালোচনার মুখে বিজ্ঞানে আরো অনভিজ্ঞ সরকার দেখলো বিপদ! উদ্ধার পেতে কোলকাতা মেডিকেল কলেজকে অনুরোধ করলো আবহাওয়া অপিসের ব্যারোমিটারটি দিয়ে মানুষের রক্তচাপ নির্ণয় করার জন্য এক অধ্যাপক নিয়োগ করতে। উল্লেখ্য: ব্যারোমিটার হচ্ছে বাতাস বা আবহাওয়ার চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র। কলেজের প্রিন্সিপাল উত্তরে লিখলেন যে কলকাতাবাসীরা এমনিতেই বিভিন্ন দ্রব্যমূল্য, রোগশোক, এবং একাধিক ট্যাক্সের বোঝার চাপের মধ্যে আছে। ব্যারোমিটার চালানোর জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাপকের নিয়োগ 'বায়ুর দুই-এক ইঞ্চি চাপের ইতর-বৃদ্ধি বোঝার জন্য বোঝার ওপর শাকের আটি স্বরূপ হইবে'!

এরপর 'কোনো অদৃশ্য ধুমকেতুর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল (অর্থাৎ ঝড়) আকৃষ্ট হইয়া উর্ধে চলিয়া গিয়াছে' বলে এক বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা প্রকাশিত হলো। এরপর 'কেহ কেহ বলিলেন যে সেই সময় ছোটলাট ডায়মণ্ডহারবার পরিদর্শন করিতে যান। তাহার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। তাহার ভয়ে ঝড় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছে'।

'পলাতক তুফান' এর দ্বিতীয় অংশটিও একটি কৌতুকপূর্ণ গল্প। এতে কোলকাতার সাম্ভব্য ঝড়টি না হওয়ার একটি (কৌতুক-) বৈজ্ঞানিক কারণ হাতে কলমে দেখানো ও ব্যখ্যা করা হয়েছে। লেখক সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করবেন। তাঁর মাথার অবশিষ্ট গুটিকয় চুল বাঁচানোর ইচ্ছায় স্নেহময়ী কন্যা এক শিশি তেল সাথে দিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড সমুদ্রিক ঝড়ে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার অবস্থা হলে লেখক তেল এবং পানির বিপরীত ধর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের(?) কথা বিবেচনায় নিলেন। সাথে সাথে তিনি তেলের শিশির ছিপি খুলে সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করলেন। ফলে 'ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায়

মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল।' এই গল্পটিও সম্ভবত তেল ও পানির সমসাময়িক কোনো অবৈজ্ঞানিক মন্তব্যকে ব্যঙ্গ করতেই লেখা হয়েছিল বলে আমার ধারণা। নিজে পাঠ না করলে এ দুটি গল্প যে স্যাটায়ার বা কৌতুক-ব্যাঙ্গ, তা পাঠক হয়তো ধরতে পারবেন না।

বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় রস, কৌতুক ও ব্যাঙ্গে পারদর্শিকতা জগদীশচন্দ্র শুধু 'পলাতক তুফান' গল্পেই দেখাননি। তার কৌতুকরসবোধ 'অব্যক্ত' বইটির অনেক স্থানেই ফুটে উঠেছে। 'অদৃশ্য আলোক' প্রবন্ধে সর্বমুখী অদৃশ্য আলো-কে একমুখী করার ক্ষমতাধারী দ্রব্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে এই ক্ষমতা হীরকের চেয়েও বেশি ধারণ করে চীনা(মাটির) বাসন। এই কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন 'অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনা বাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলানায় হীরক কোথায় লাগে! সেদিন সৌখিন রমনীগণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান করিয়া পেয়ালা পিরিচের মালা সগর্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিনী নারীদিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখিবেন'।

আলো-কে একমুখী করার চেষ্টায় একই প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন যে, বহু জাতের মানুষের চুলের নমুনা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এসবের মাঝে ফরাসী নারীদের কালো চুল জার্মান নারীদের স্বর্ণাভ চুল থেকে অনেক ভালোভাবে আলোকে একমুখী করতে পারে। পরীক্ষাটি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে দেখানোর সময় 'ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী এই নতুন তত্ব দেখিয়া উল্লাসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতীর উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে, ইহার কোনো সন্দেহই রহিল না। বলা বাহুল্য, বার্লিনে (জার্মানীর রাজধানী) এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত ছিলাম'।

একই ভাবে 'পলাতক তুফান' গল্পের একটি আলোচনায় বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের (যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন) আপেক্ষিক গুরুত্বের (লঘু ও গুরু ওজনের) তারতম্য হেতু কোনোটি উন্মুক্ত হয়ে ওপরে উঠে যায় বলে মন্তব্য করলেন। পরক্ষণে এই আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণের সম্পর্কটি পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য কিনা তাতে সন্দেহ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখলেন 'কারণ ইন্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষ জাতি গুরু, তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রী জাতিই সে দেশে আবদ্ধ'।

'আহত উদ্ভিদ' প্রবন্ধে গাছ পাতাকে নাড়ায়, না পাতার নড়ার ফলেই গাছ আন্দোলিত হয়- এই প্রশ্নের দার্শনিক আলোচনার সময়ও লেখক একটি রসালো উদাহরণ দিয়েছেন। 'বিলাতে আমাদের সমাজ লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়া থাকে। এদেশে নাকি নারীজাতি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারেন না। কেবল পুরুষের ইঙ্গিতে পুতুলের ন্যায় তাহারা চলফেরা করিয়া থাকেন।...ভুক্তভোগীরা যাহা বলেন, তাহা অন্যরূপ। বাহিরে যতই প্রতাপ, যতই আস্ফালন, এ সকল পুতুলের নাচ মাত্র, চালাইবার সূত্র নাকি অন্তঃপুরে'। (পৃ ১২৯)।

গাছের অনুভূতি বোঝার জন্য নতুন কোনো লিপির প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাবার প্রসঙ্গে লিখলেন 'সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত-

অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য' ('বিজ্ঞানে সাহিত্য বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস')। এই শেষোক্ত বাক্যটি সম্ভবতঃ তথাকথিত শিক্ষিত, যারা না বুঝেও বোঝার ভান করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা।

জগদীশ্চন্দ্র বসুকে সবাই একজন সফল বিজ্ঞানী হিসেবেই জানেন। এই সিদ্ধান্তটি সম্ভবতঃ সর্বদা মাথায় থাকে বলেই সাহিত্যে তাঁর এই কৌতুক ও ব্যঙ্গরসবোধটি হয়তো সবার দৃষ্টিগোচর হয় না।

বাংলা ভাষার প্রতি দায়িত্ববোধ

বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অসীম দায়িত্ববোধের প্রথম পরিচয় মেলে 'অব্যক্ত' প্রকাশ উপলক্ষে 'কথারম্ভ' ভূমিকায়। শুরুটি করেছেন এভাবেঃ 'ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে।' এরপর আমাদের জানাচ্ছেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার সময় বেতন বৈষম্য এবং অনুমতি ব্যাতিরেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কয়েকটি মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে ভারত বা কলকাতায় এ সংক্রান্ত কোনো আদালত না থাকায় আদালতটি ছিল বিলাতে। আদালতের ভাষাও ছিল ইংরেজি। জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছেন 'জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে'?

অত্যন্ত সীমিত অর্থ, পরিবেশ, এবং উপকরণে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর সফলতায় যে কোনো ব্যক্তি আশ্চর্য হবেন। আরো একটি ব্যপারে আশ্চর্য না হয়ে আমি পারি নি। আর তা হচ্ছে অসীম পরিশ্রমলব্ধ এবং অধ্যাবসায়ে অর্জিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল তিনি সর্বপ্রথমে প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন প্রবন্ধে, মাতৃভাষা বাংলায়! আর সেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলোও সর্বপ্রথমে প্রদর্শন করেছিলেন স্বদেশবাসীর সামনে, বিদেশে নয়! ('মনন ও করণ')। অথচ সোয়া'শ বছর পর বাংলা ভাষার এতো উন্নতির পরও আজকের বাংলাদেশ বা ভারতের কোনো বিজ্ঞানী ইংরেজির আগে বাংলায় তাঁর গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে। বাংলা ভাষা বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত নয় বলে যারা অর্থ না বুঝেও বিদেশি ইংরেজি শব্দ মুখস্ত করেন, তাঁরা জগদীশচন্দ্রের লেখাগুলো একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। বাংলা ভাষার জন্য জীবন দানের পর প্রায় সত্তর বছর কেটে গেল। বিজ্ঞানের বিষয় তো বটেই, শিক্ষাদানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিষয়গুলোতেও ইংরেজির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়! আমাদের শিক্ষাবিদরা এতে কি অপমান বোধ করেন না?

তাঁর অন্তরে বাংলাভাষার প্রতি আনুগত্যের বীজ রোপিত হয়েছিল সেই শিশুকালেই। 'তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত'। কিন্তু 'শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলাস্কুলে প্রেরণ করেন।' ('বোধন')। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন বিদেশি ভাষার আগে নিজের মাতৃভাষাকে ভালোমতো রপ্ত করা উচিৎ।

সেই বাংলা স্কুল যে অভিজাতহীন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর দুই পাশে বসা সহপাঠীর একজন জেলের সন্তান এবং অপরজন পিতার চাপরাশির পুত্রের উল্লেখে। শিশুকালের সেই বাংলা শিক্ষা তাঁকে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী হতে কোনো বাঁধা দেয়নি, ররং তাঁকে নিজ দেশ ও ভাষার প্রতি অনুগত করে তৈরি করেছিল। ইংরেজি স্কুলে পাঠিয়ে বর্তমান কালের স্বচ্ছল মা বাবা যে 'শিক্ষিত' সন্তান গড়ে তোলেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলে সেই সন্তানের সাথেই দূরত্ব গড়ে ওঠে ভাষাগত ব্যবধানের ফলে। বাংলা ভাষাটি জগদীশচন্দ্র যে ভালোই রপ্ত করেছিলেন তার উদাহরণ আমরা পেয়েছি এই 'অব্যক্ত' বইটির মাধ্যমে।

নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবল নিষ্ঠার আরও একটি উদাহরণও পাই তাঁর 'আহত উদ্ভিদ' প্রবন্ধে। গাছের অনুভুতি এবং বৃদ্ধি মাপার জন্য তাঁর আবিষ্কৃত ও নির্মিত যন্ত্রটির নাম কেন 'ক্রেস্কোগ্রাফ' দিলেন তার একটি ব্যখ্যা দিয়েছেন। প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে যন্ত্রটির নাম হওয়া উচিৎ ছিল বাংলা শব্দ 'বৃদ্ধিমান'। কিন্তু পশ্চিমারা সাধারণতঃ নতুন কিছু আবিষ্কারের নাম প্রাচীন গ্রিক অথবা ল্যাটিন ভাষা থেকে নিয়ে থাকে। অনেকটা সেই আদর্শে যন্ত্রটির নাম তিনি ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার 'কুঞ্চনমান' রাখলেন। কিন্তু বিদেশি বিজ্ঞানীরা নামটিকে শুধু বিকৃত উচ্চারণই করলেন না, বিলাতি পত্রিকায় উপহাসও করা হলো। 'তিনি লিখলেন এই সকল দেখিয়া 'বৃদ্ধিমান নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান, তাহা হইতে 'বারডোয়ান' হইত। তার চেয়ে ক্রেস্কোগ্রাফই ভাল'।

পটোম্যাক, ম্যারিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

আহমাদ মাযহার

করোনাক্রান্তি: গৃহবন্দিত্ব নয়, গৃহবাস

ক্ষুদ্র অনুজীবের আক্রমণ ঠেকাতে অভূতপূর্ব গৃহবাসী দিন পার করে চলেছি। অনুজীবের বিরুদ্ধের এই সংগ্রামের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। দৃশ্যত বাহ্যিক নিষ্ক্রিয়তাই সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এই সংগ্রামে। কিন্তু মানুষের চেতনাপ্রবাহ তো ঘুমের সময়টুকু ছাড়া কখনোই নিষ্ক্রিয় থাকে না। সুতরাং আপাত নিশ্চেষ্টতা ঠিক স্তব্ধতা নয়। চেতনায় স্রোতপ্রবাহ তো চলতেই থাকে সবসময়। কিন্তু প্রাযুক্তিক আবিষ্কার-আবির্ভাবের দ্রুতগতির সূত্রে মানুষের বাহ্যিক সক্রিয়তা তার চেতনার সচলতার কথা ভাবতে পর্যন্ত দেয়নি। ব্যাপারটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল শিশুসাহিত্যিক আমীরুল ইসলাম। ওর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার কথাবার্তা চলছে সেই আশির দশক থেকে। অনধিক তিন বছরের সুদূরবাস সত্ত্বেও আমাদের আলাপসালাপ তর্কাতর্কিতে বিরতি পড়েনি যন্ত্রমাধ্যমের অধুনাতম অগ্রগতির সুবাদে। চ্যানেল আইয়ের উচ্চ পদের কাজে দিন-রাতের ব্যস্ততার ফাঁকেও প্রায়ই ওর সঙ্গে কথা হয়। সে-ও এখন করোনাকবলিত বাংলাদেশে গৃহবাসী। দিনরাত পড়া লেখা আর ভাতিজা শিশু রাজিনের কৌতূহলী কথা শুনে সময় পার হচ্ছে ওর। ঘরে থাকার সূত্রে ব্যস্ততামুক্ত জীবনে লক্ষ করতে পারছে রাজিনের শিশুত্বকে। আজ রাজিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যখন *চাইল্ড ক্র্যাফট এসাইক্লোপিডিয়ার* পাতা ওল্টাচ্ছিল তখনই আমার ফোন। কথায় কথায় বলল গত পঞ্চাশ ষাট বছরে বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির এত অগ্রগতি হয়েছে যে মানুষ আর স্থির হয়ে চারপাশ নিয়ে ভাববার অবকাশ পায়নি। আমরাও তো পুরোটা সময় ধরে কেবল ছুটেই চলেছি। এর বিপরীতে প্রকৃতিই যেন করোনা ভাইরাস ছেড়ে দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষকে ভাবনা করার একটু সুযোগ করে দিল।

আমাদের যাদের বাস করার মতো অন্তত গৃহ আছে তাদের অনেকের কাছেই এই গৃহবাসকে বন্দিত্ব মনে হচ্ছে। কিন্তু যাদের গৃহ নেই বা যাদের গৃহ ন্যূনতম বাসযোগ্য নয় তাদের কাছে তো কারাগারের বন্দিত্বও এর চেয়ে ভালো। সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়ছেন। গৃহে থাকবার আহ্বানসহ বাংলাদেশে দীর্ঘ যে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে তাতে তাদের গৃহে থাকতে না পারার মনস্তত্ত্বের এ-ও যে এক উৎস তা বুঝতে না পারার কারণ নেই। করোনাসূত্রে নিউইয়র্কের লকডাউনে ঘরে থাকাকে আমি তাই গৃহবন্দিত্ব না বলে গৃহবাস বলি।

করোনার গৃহবাস আমাদের জীবন থেকে অনেক বাহুল্য কমিয়ে দিয়েছে। আপাত গুরুত্বহীন কিন্তু প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন চলে এসেছে আমাদের সামনে। সেদিক থেকে মৃত্যুর মিছিল থামাতে অর্থনীতির সচলতার ওপর এই হামলার বোধ হয় দরকার ছিল। অর্থনীতির উদ্দামতা যেভাবে সব কিছুর চালিকা হয়ে উঠেছিল তার গতি হঠাৎ শ্লথ করতে বাধ্য হওয়ায় পর অর্থনীতির জয়যাত্রার অসারতাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সবকিছুকে অর্থনীতি এমনভাবে বিন্যস্ত করছিল যে অনেকটা যেন এমন মনে হচ্ছিল, খাদ্যবস্তু উৎপাদন, চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্পকলা তথা সবকিছুরই সার্থকতা কেবল তার অর্থসংগ্রহের সামর্থ্যে; এসব ক্ষেত্রে জরুরি করণীয়গুলো এমনভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে যাতে কেবল অর্থের বিস্তার প্রাধান্য পায়, শিক্ষার সার্থকতা যেন কেবল ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনে, যে কোনো ধরনের শিল্পকলা চর্চার বিচার প্রধানত তার আর্থিক মূল্যে। শুধু অর্থের বিস্তারকেই যেভাবে সবকিছুর ওপরে গুরুত্ব দেয়া হয় তাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো এই করোনা পরিস্থিতিতে। করোনাক্রান্তি আমাদের সামনে সুযোগ ঘটিয়ে দিল এই অভিমুখগুলোকে নিয়ে চিন্তা করার। ভাববার অবকাশ দেয়া করোনাকালের এই ঘরে থাকাকে সেজন্যই আমি গৃহবন্দিত্ব না বলে গৃহবাস বলি। এই গৃহবাস তো আমার বোহেমীয় হৃদয়কে স্থৈর্য দিয়েছে। বুঝতে সাহায্য করেছে এর সৌন্দর্যকে। অবকাশ দিয়েছে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার তাৎপর্যকে বিচার করে দেখতে।

অনেকেই বলছেন, তাঁরা ঘরে থেকে থেকে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তুলনায় যাঁরা সচল চিত্তের তাঁরা উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করছেন গৃহবাসকে সহনীয় তথা আনন্দময় করে তুলতে। আমার বিবেচনা একটু অন্য রকম। গৃহবাসই যখন করোনাক্রন্তির ভবিতব্য বলে বুঝেছি তখনই ভাবতে শুরু করেছি এই অসুবিধাকে কীভাবে সুবিধায় পরিণত করব তা নিয়ে। সেজন্যেই বোধ হয় আমি অবসাদগ্রস্ত বোধ করিনি। আমার অস্থিরতার কারণ বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক মানুষের মানবিক মহাসংকট! বিশ্বমানবের সংকটের চেয়েও বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের সংকট আমাকে অস্থির করে তুলেছে বেশি। ধীরে ধীরে অনুভব করেছি রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিমুখদর্শনের বাস্তবতায় ও সংকট উত্তরণের প্রক্রিয়ায় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন বাংলাদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তৃপক্ষ যে দেশের শঙ্কাজনক পরিণতির ভয়াবহতা আমাকে বিমূঢ় করে তুলেছে। নিজেকে রক্ষায় করণীয় নিয়ে দুর্ভাবনা না করার মতো মহৎ মানুষ তো আমি নই! কিন্তু তা হলেও মনে মনে এ-ও জেনেছি যে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের তুলনায় আমি বরং সুবিধাজনক অবস্থাতেই রয়েছি। এই সন্তুষ্টির বোধ আমাকে উৎকণ্ঠা থেকে খানিকটা পরিত্রাণ দিয়েছে। সেই সঙ্গে এমন ভাবনায়ও উজ্জীবিত করছে যে জীবনমানকে আরও সীমিত করতে হবে। টিকে থাকার পরিস্থিতিকে করে তুলতে হবে দীর্ঘকালের জন্য সহনীয়। আমার কার্পণ্য হয়তো সহজ করে দেবে অন্যের প্রয়োজনীয় প্রাপ্তিকে। সুতরাং যতটা সম্ভব বাহুল্য কমাতে হবে। সহজতার পক্ষে কৃপণতাই এখনকার যথার্থ পরিমিতি। সুতরাং স্থির করলাম যতটা সম্ভব পরিমিত হবার সাধনায় নিবেদিত হব।

সাহিত্য আমার আহার-নিদ্রা তথা দৈনন্দিন জীবন যাপনের অনিবার্য অংশ! তাই আমার সব আহরণ ও উপভোগ কিংবা আনন্দ-বেদনাই আসলে নিজের সাহিত্যসম্পদের বিনিয়োগ-উৎস। মানতেই হবে করোনার এই গৃহবাস আমাকে এর কিছুটা সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। বিনিয়োগ শব্দটি বোধ হয় এখানে যথাপ্রযুক্ত মনে হচ্ছে না। কারণ এটি অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সাহিত্যে তা চলে কী করে! বিনিয়োগে তো থাকে মুনাফা লাভের প্রত্যাশা। অথচ সাহিত্য একটি মুনাফা বিহীন মাধ্যম। এর দ্বারা কারো কারো কাছে মুনাফা আসে বটে তবে তা একে পণ্যে রূপান্তরের পর। সেই পণ্যের ধর্ম আলাদা। সেই মুনাফার প্রত্যাশা বাংলা ভাষার সাহিত্য খুব একটা পছন্দ করে না। হাঁ, মুনাফা এর একটা আছে বটে, তবে তা অবস্তুগত ও অমূল্য। সেই অবস্তুগত মুনাফার জন্য ভাবনার বিনিয়োগ দরকার বইকি। করোনার গৃহবাসিত্ব আমাকে সে সুযোগ করে দিয়েছে।

ভেবে দেখলাম, আমার সাহিত্যিকতা যাঁদের অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনার কাছে গভীরভাবে ঋণী তাঁদের সেই অনুপ্রেরণার চিহ্নগুলো আমার এই গৃহবাসকালের অবস্তুগত সম্পদ হতে পারে। তাই ভাবলাম করোনায় বিষাদিত না হয়ে সততই যা সুখের সেই স্মৃতিকে মন্থন করে তুলব। এই ক্ষুদ্র রচনাটি হবে স্মৃতিমন্থনের সানন্দ মুখবন্ধ!

নিউ ইয়র্ক

গোলাম মুরশিদ

বাঙালিত্বের বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ

একটা সময় ছিল যখন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, 'বাঙালি' বললে বোঝাত শুধু বাংলাভাষী হিন্দুদের। ('ভদ্রলোক' বললেও বোঝাত কমবেশি তাদেরই)। 'বাঙালি' ও 'মুসলমান' শব্দ দুটির অর্থ ছিল হিন্দু আর মুসলমান। এই পরিচিতি সম্পর্কে মুসলমানদেরও বিশেষ কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ, শিক্ষিত মুসলমানরা তখন অনেকেই মনে করত যে তাদের স্বদেশ-ভূমি সুদূর মধ্যপ্রাচ্য অথবা উত্তর ভারত এবং তাদের মাতৃভাষা ফারসি অথবা নিদেনপক্ষে উর্দু। বাংলাকে যারা মাতৃভাষা বলে বিবেচনা করত, তারা বলত এবং মক্তবে শিখত 'মুসলমানি বাংলা'। কিন্তু বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমানরা ধীরে ধীরে নিজেদের শনাক্ত করে বাঙালি বলে। বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, তারা আরব-ইরানের যে স্বপ্নে বিভোর থাকত, সেখান থেকে স্বদেশে ফিরে আসে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের মুখে নিজেদের আঞ্চলিক ও ভাষাগত পরিচয়কেই বড় করে তোলা ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না।

বস্তুত, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, সেই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে ছিল তাদের এই 'বাঙালি' পরিচয়। এই 'বাঙালি' পরিচয় যেমন তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে শক্তি ও উৎসাহ জুগিয়েছিল, তেমনি সেই রাজনৈতিক আন্দোলনও 'বাঙালি' পরিচয়কে মুসলমানদের কাছে আন্তরিক করে তুলেছিল। পরিণতিতে 'আমরা সবাই বাঙালি'-এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান- সবাই মিলে একাত্তরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর ফলে বারো-তেরো'শ বছর ধরে যে বঙ্গভূমি ছিল পরাধীন। একাত্তরের সংগ্রামের মাধ্যমে, সেই পরাধীন ভূখণ্ড একটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করল। আমরা প্রথমবারের মতো একটা স্বাধীন দেশের পতাকা ওড়ালাম।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আগেকার এবং তার পরবর্তীকালের 'বাঙালি' শব্দের অভিধা এক নয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনা দানা বাঁধছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সেই অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনায় ফাটল ধরে। যে দেশের জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগের বেশি মুসলমান এবং যে মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে যোগ দিয়েছিল পাকিস্তানে, তারা মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক হয়নি কখনোই। অত অল্প সময়ের মধ্যে হতে পারেনি। বরং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বৈরি পরিবেশের মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা

নিজেদের আঞ্চলিক ও ভাষিক পরিচয়কে জোরালো করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে তাদের সেই স্বল্পকালের জন্য ধার করা পালকটি খসে পড়তে খুব দেরি হলো না।

এই দ্রুত রূপান্তরের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল তীব্র অর্থনৈতিক সংকট এবং ভারতভীতি তথা হিন্দুবিদ্বেষ। এর ফলস্বরূপ অল্প কালের মধ্যেই তাদের চেতনার ওপর অসাম্প্রদায়িকতার যে হালকা প্রলেপটুকু পড়েছিল, তা মুছে যেতে সময় লাগল না। বরং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি পরিচয়ের জায়গায় জোরেশোরে ফিরে এল জাতি হিসেবে তাদের ধর্মীয় পরিচয়। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং পেট্রো-ডলারের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, তা এতে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তবে ষোলোকলা পূর্ণ হলো ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পালাবদলের মাধ্যমে। টিকে থাকার জন্য পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকার যেসব রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করেছিল, নিজেদের মুসলিম পরিচয় ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান। ক্ষমতাসীন নেতারা ব্যক্তিজীবনে ধর্মভীরু হন অথবা না-ই হন, তাঁরা ধর্মীয় লেবাস পরলেন এবং অন্যদেরও তা পরতে উৎসাহ দিলেন।

কিন্তু যা কৌতুহলোদ্দীপক, তা হলো বাংলাদেশে নতুন করে যে মুসলিম পরিচয় দেখা দিল, তা খাঁটি হলেও, মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তারা যে ভাষাভিত্তিক 'বাঙালি' পরিচয় অর্জন করেছিল, সেই পরিচয়কেও তারা বিসর্জন দিতে পারল না। বরং বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা দিয়ে তাকে আঁকড়ে রাখল। কেবল তাই নয়, নিজেদের সেই নব্য-বাঙালিত্বের বলয় থেকে অমুসলমানদের বহিষ্কার করার একটা প্রবণতাও তাদের মধ্যে লক্ষ করা গেল। এবং এই নতুন সংজ্ঞায়িত 'বাঙালিত্ব' অচিরেই তাদের কাছে 'বাংলাভাষী মুসলমানত্বে' পরিণত হলো। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালিত্বের অভিধা এক প্রান্ত থেকে একেবারে উল্টো প্রান্তে পৌঁছে গেল। কয়েক দশক আগেও যা ছিল 'হিন্দু বাঙালিত্ব', তাই 'মুসলমান বাঙালিত্বে' পরিণত হলো। তবে 'বাঙালি' শব্দটা দিয়ে যেহেতু অমুসলমানদেরও বোঝায়, সে জন্য 'বাঙালি' শব্দটাকে তাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হলো না। তাই ব্যবহৃত হলো নতুন একটি পরিভাষা- 'বাংলাদেশি'। এই শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার কয়েক বছর আগে আবুল মনসুর আহমদ 'পাক-বাংলার কালচার' কথাটি দিয়ে 'কেবল মুসলমানি বাঙালিত্বে'র ধারণাই প্রকাশ করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বাঙালিত্বের রূপান্তর সম্পর্কে যা বললাম, অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে তাকে ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা যা অর্জন করেছিলাম, তাকে বিসর্জন দেওয়ার অবাঞ্ছিত ঘটনা বলে মনে হতে পারে। মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বাঙালিত্বের সঙ্গে ধর্মকেও জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আমাদের ভাষিক পরিচয়কে লুপ্ত করেছিল। বরং রূপান্তরের মাধ্যমে হলেও বাঙালিত্বের অস্তিত্ব রক্ষায় এবং তার সমৃদ্ধিতে স্থায়ী ও ইতিবাচক অবদান রেখেছিল।

অন্যপক্ষে, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম না হলে ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিত্ব ধুকে ধুকে বেঁচে থাকত। তারপর হিন্দি ও ইংরেজির ক্রমবর্ধমান চাপে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাঙালি পরিচয় ধীরে ধীরে শুকিয়ে গিয়ে ভারতীয়ত্বে পরিণত হতো। সেখানকার নাগরিকেরা নিজেদের বাঙালি বলে শনাক্ত না করে ক্রমেই নিজেদের পরিচয় দিত ভারতীয় অথবা ইন্ডিয়ান বলে। বস্তুত, এরই মধ্যে তা করতে শুরুও করেছে।

বাঙালিত্বের প্রাণভোমরা যে বাঙালি সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গে তা-ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রাণ হয়ে যেত। ইতোমধ্যে তাতে যে হিন্দি এবং সর্বভারতীয় প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে তাও বাড়তে থাকত। বস্তুত, ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ যে স্থায়ীভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়, তা ছিল বাঙালিত্বের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি। এর ফলে বঙ্গদেশ কেবল দুই ভাগে বিভক্ত হয়নি, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলমান- উভয়েই রীতিমতো পরাধীন হয়েছিল। কারণ, ভারতের উপনিবেশে পরিণত না হলেও, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি দুর্বল অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। অন্যপক্ষে, পূর্ব বাংলা স্বাধীন ভূখণ্ড নয়, পরিণত হয়েছিল রীতিমতো পাকিস্তানের উপনিবেশে। সেখানে শুধু বাঙালিত্ব নয়, বাংলা ভাষাও বিপন্ন হয়েছিল। এই পরিবেশে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সদ্যোজাত বাঙালিত্ব এবং তার সর্বপ্রধান অঙ্গ বাংলা ভাষার দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। ফলে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির মরা গাঙে কেবল যে জোয়ার এল, তাই নয়, বরং পূর্ব বাংলায় একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ জন্ম নিল- যা থেকে জন্ম নিল আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। এবং সেই দেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির চিরজীবী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। বস্তুত, তাদের ক্রমবিকাশের সিংহদুয়ার খুলে গেল।

অন্যপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অধীন। সেখানে ভাষা-সংস্কৃতির ওপর যেমন কোনো সরকারি হামলা আসেনি। তেমনি কোনো পৃষ্ঠপোষকতার বন্যাও দেখা দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বিরোধিতা অথবা হামলা হলে সেখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে যে প্রতিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে পারত, এবং সেই আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতি যে নতুন প্রাণশক্তি লাভ করতে পারত, তাও হয়নি। ফলে সেখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে গেছে। এরপর বার্ধক্য দেখা দেবে এবং পরিণতিতে সে ধারা সেখানে একেবারে শুকিয়ে যাবে বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের ছবিটা এর একেবারে উল্টো। প্রথমত, বাংলা যেহেতু বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা, সে জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে বাংলা ভাষায় নিত্যনতুন পরিভাষা এবং দেশি-বিদেশি শব্দ আমদানি করতে হবে। নতুন নতুন শব্দ এবং অনুবাক্যও গঠিত হবে। এসব শব্দ ছাড়া বহু আঞ্চলিক আর ধর্মীয় শব্দও এখানকার প্রমাণ্য বাংলায় ঢুকে পড়বে। তারপর এই শব্দাবলী রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হবে। সংবাদমাধ্যমে ব্যবহৃত হবে। পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হবে। সাহিত্য ও সংগীতেও ব্যবহৃত হবে। অতঃপর তাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে প্রাত্যহিক জীবনের ভাষায়। আজ হোক, কাল হোক, সব উচ্চশিক্ষার

মাধ্যমও বাংলা হতে বাধ্য। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা শুধু যে বেঁচে থাকবে তাই নয়, ক্রমেই তা বিকাশ লাভ করবে। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ বস্তুত বাংলাদেশে।

বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তরও ঘটবে, কিন্তু সে সংস্কৃতির ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি পয়লা ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারি ও পয়লা বৈশাখের মতো নতুন নতুন ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবও পালিত হবে। সত্যি সত্যি, ভবিষ্যতের বাংলা সংস্কৃতিও বিকাশ লাভ করবে বাংলাদেশে। তবে সেই সংস্কৃতিতে সাধারণভাবে মুসলমানি বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাবে। যারা অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, তাদের কাছে এ কথা হতাশাজনক মনে হতে পারে, কিন্তু এই মুসলমান-প্রধান দেশে তা হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক ইসলামী উন্মাদনা ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ যে রকম প্রবল হয়ে উঠেছে। তাতে অন্য কিছুর প্রত্যাশা করা অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু রূপান্তর যেমনই হোক, ভবিষ্যতে বাঙালি) অথবা বাংলাদেশি (বলে গর্বিত পরিচয় দেওয়ার মতো লোক বাংলাদেশেই থাকবে, পশ্চিমবঙ্গে নয়।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়ও বিস্তার লাভ করবে বাংলাদেশের মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে নয়। যদিও স্বীকার করতে হবে যে এখন থেকে এক'শ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর আন্তর্জাতিক বিশ্ব যখন বাংলা ভাষার সেই গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়কে প্রায় ভুলে যাচ্ছিল। তেমন পরিবেশে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন করে বাংলা ভাষার পতাকা উড়ল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বসভার সদস্যরা প্রথমবারের মতো একটি ভাষণ শুনলেন বাংলা ভাষায়। সেই ঐতিহ্য এখনো বহাল আছে। তাঁর ৭ মার্চের বাংলা ভাষণও সম্প্রতি স্বীকৃতি পেল বিশ্ববাসীর অমর ঐতিহ্য বলে। তবে বাঙালিয়ানার এই বিজয়যাত্রার সূচনা হলো বাংলা ভাষা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার জন্য।

লন্ডন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাজ্য

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিরে দেখা আমার তৃতীয় জীবন

মায়ের পেটে সব শিশুরা মেয়ে হয়ে প্রথম জীবন শুরু করে। তারপর ছয় সপ্তাহ পরে প্রকৃতির খামখেয়ালীতে কিছু শিশু পাল্টে গিয়ে ছেলে হয়ে জন্মায়। তাই সব ছেলেরা শুরুতেই পায় দ্বিতীয় জীবন। কিন্তু আমার দ্বিতীয় জীবন শুরুতেই ব্যাহত হয়। সে কথায় পরে আসছি।

আমাদের পরিবার বাসা নিয়েছিল কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর শহরে। শহর না বলে শহরতলী বলা যেতে পারে। আমার জন্মের কয়েকমাস পর বাবা চাকুরী বদল করে চাঁদপুর ছেড়ে ফ্যামিলিকে অন্য শহরতলীতে নিয়ে এলেন। নতুন বাসস্থান কুমিল্লা জেলারই ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে। সেখানে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার একটা সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্থ ছিলো যে পাড়ায় বাস তার চারপাশে ছড়িয়ে অনেক হিন্দু-মুসলমান পরিবারের ঘর ছিলো। কেউ ছিলো একটু ধনী আর বাকিরা আমাদের মতোই। সেখানে আরো ছিলো তিনটে পুকুর এবং তিনটে খেলার মাঠ। কাজেই খেলাধুলো আর সাঁতার কাটার বিরতি ছিলো না বললেই হয়। পাড়ার অন্যান্য পরিবারদের সাথে সম্পর্ক যেমন হয় তেমনই ছিলো-অনেক গল্প গুজব-একটু পরচর্চা, মাঝে মাঝে একটু কথা কাটাকাটি-এই আর কি।

তবে পাড়ার পরিবারদের মধ্যে কলিম আলী মির্জা সাহেবের পরিবারের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিলো। ওনার স্ত্রী শীলা চাচী, ছোটো ছেলে আকরাম ও বড়ো মেয়ে সালেহাকে নিয়ে ওরা বেশ আনন্দেই থাকতো। কলিম চাচা ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ওনার দুটো ডিস্পেন্সারী ছিলো। একটা বাড়ির বসার ঘরে, আরেকটা শহরের বাজারের কাছে। সকালটা বাড়িতেই রোগী দেখতেন আর বিকেলে শহরের ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে বসতেন। শহরে আর কোনো হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিল না। মায়েরা বাচ্চাদের দেখাতে ওনার কাছে আসতে পছন্দ করতেন। কালিম চাচার দুটো বিশেষ গুণ ছিল। উনি জোরে হা হা করে হাসতে ভালোবাসতেন (প্রায়শঃ ওনার হাসি দূর থেকে শোনা যেত) এবং ঘন ঘন ক্যামেরায় ছবি তোলার নেশায় আসক্ত ছিলেন। পাড়ার ঘরে ঘরে ওনার তোলা ছবির নিদর্শন পাওয়া যেত। একটা ক্যামেরা হয় ওনার কাঁধে থাকবে নয় ডিস্পেন্সারীর ডেস্কের উপরে থাকবে যাতে উনি যখন তখন ওটা ব্যবহার করতে পারেন। ওনার স্ত্রী শিলা চাচী ছিলেন মৃদুভাষী দিবাস্বপ্ন দেখায় আসক্ত।

আজগুবী কথা বলে মজা করতে ভালোবাসতেন বলে ওনার সাথে আড্ডা দিতে পাড়ার মহিলারা আকর্ষণবোধ করতেন। ওসব আড্ডায় উনি কম কথা বলতেন কিন্তু যা বলতেন মজা করে বলতেন। তাছাড়া উনি যা যা রান্না করতেন তার স্বাদ কেমন হয়েছে সেটা জানতে আড্ডায় অংশগ্রহণকারীদের একটু একটু প্রসাদ দিতেন। শীলা চাচীর দিবাস্বপ্ন দেখার অভ্যাসটা বোধহয় বলিউডের প্রভাব। উনি সপ্তাহে অন্তত দুবার হিন্দি সিনেমা দেখতে যেতেন এবং ভালো লাগলে একটা সিনেমা তিন-চার বার দেখতেন। বাড়িতে "উল্টোরথ" পড়তেন। ওনার মুখে "নার্গিস", "মীনা কুমারী" আর "মধুবালার" রসালো গল্প শোনা যেতো। শীলা চাচী সুশ্রী ছিলেন। ওনাকে পাড়ার সবাই "বাংলার মধুবালা" বলে বলাবলি করতো। মধুবালার সাথে আমার তখনও পরিচয় হয়নি। ওদের মেয়ে সালেহার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা একসাথে ছুটোছুটি খেলাধুলো করতাম।

আমার নাম কাজল। আমার বড়দি আমার চেয়ে এগারো বছরের বড়ো। অবশ্য আমার আর দিদির মাঝে আরও দুজন আছে, এক দাদা আর এক দিদি। আমিই পরিবারের সবচেয়ে ছোট। মা বরাবরই একটু অসুস্থ ও কমজোরি ছিলেন। ফলে বড়দি হয়ে উঠলেন আমার গার্জেন। মা আমার দেখাশুনার ভার ওই স্কুলের ছাত্রী মেয়ের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। কাজের বাইরে বাবা সময় কাটাতেন বন্ধুদের জটলায় নাটকের রিহার্সাল দিয়ে। ওদের "ভার্নাল থিয়েটার" শহরে শহরে নাটক করে বেড়াতো। দিদি প্রথম শ্রেণীতে দুটো লেটার্স নিয়ে ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পাস করে এখন কলেজে পড়বে। সেটাও একটা মনে রাখার মতো ঘটনা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পনেরোজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে দুজন দুটো লেটার্স পেয়েছে। বড়দি তার মধ্যে একজন। স্থানীয় পত্রিকায় দিদির ছবি ছাপিয়ে প্রশংসা করেছে। এই খবরটা আশেপাশের সবাই জেনে গেছে। পাড়াতে দিদির সম্মান বেড়ে গেছে। বাবা-মা চায় দিদি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ পড়ুক। আমার আরেক দিদি হাইস্কুলে উঠেছে। সেও কয়েক বছর বাদে কলেজে যাবে। কাজেই বাড়িতে কথা চলছে যে বড়দিকে বোর্ডিংয়ে রেখে পড়ানো যেতে পারে কিন্তু ছোটদি কলেজে গেলে দুজনকে বোর্ডিংয়ে রেখে পড়ানোর খরচা চালানো যাবে না। একটা অন্য সমাধান ভাবতে হবে। বড়দি এখন মনের খুশীতে দিন কাটাচ্ছে আসন্ন কলেজ জীবনের কথা ভেবে। একটা নতুন জগৎ খুলে যাবে। স্বাধীনতা, যৌবন ও বসন্তের দিন শুরু হবে। পড়াশুনার পাহাড় পেরিয়ে কর্মজীবন আসবে।

আমার বড়দির নাম কবিতা। বড়দিকে সুশ্রী বলা যায়। বিশেষ করে ফ্রক পড়া ছেড়ে শাড়ি পড়া শুরু করার পর ওর সৌন্দর্য আরও খুলে যায়। বড়দি শহরতলীর রাস্তায় মাথায় ছাতা নিয়ে বেরুলে আসে পাশের লোকেরা একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখতো। বড়দির উচ্ছল মিষ্টি চরিত্রের মধ্যে একটা খামখেয়ালির প্রবণতা লুকানো ছিল যার পরিচয় আমি পেয়েছিলাম কিন্তু তার ব্যাখ্যা কোনোদিন পাইনি। যদিও দিদি নিজে ছিল স্কুলের ছাত্রী, আমার গার্জেন হিসাবে ওই বয়সেই দিদি আমাকে আক্ষরিক অর্থে কোলেপিঠে করে রাখতো। পুরোনো অনেক ছবিতে দেখেছি তরুণী দিদি আমাকে কোলে

নিয়ে মজা করছে। দিদির কোলে আমি- সেই পুরোনো ছবিগুলো দেখলে আমি আজও শিউরে উঠি। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে দিদির কোলে একটি বাচ্চা মেয়ে মুচকি হাসছে আর দিদি তার গালে চুমু খাচ্ছে।

হ্যাঁ, একটি মেয়ে দিদির কোলে। আর সেই মেয়েটি হচ্ছে আমি, কাজল। জন্মের পর থেকেই দিদি আমাকে মেয়ে সাজিয়ে রাখতো। যেনো আমি একটা জীবন্ত খেলনা। শুনেছি মা প্রথমে মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু আদুরে মেয়ের খামখেয়ালীতে আর বাধা দেননি এই ভেবে যে এইসব পাগলামি কিছুদিন পর কেটে যাবে। প্রথম দিকে বাবা এবং অন্য দাদা দিদিরা হাসাহাসি করতো। তারপর ওরাও চুপ করে যায়। ফলে কিছু সময় পর এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে কাজল একটি মেয়ে। নতুন শহরে বদলি হয়ে আসার পর পাড়াপড়শীর কাছে এটাই জানা হয়ে যায় যে কাজল একটি মেয়ে। এবং সেই সাথে আমিও জেনে গেছি যে আমি একজন মেয়ে। একজন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া আর কি তফাৎ সেই জ্ঞান তখনও আমার হয়নি। কাজেই আমার মেয়েলি জীবন চলতে থাকে।

আমার সেই মেয়েলি জীবনের সাথী হয়ে গেলো কলিম চাচা ও শীলাচাচির বড়ো মেয়ে সালেহা। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার সুবাদে আমাদের মেলামেশার সুযোগ অনেক বেশি ছিল। সকালে একটু লেখাপড়া করে বাকি সারাদিন শুধু ছুটাছুটি আর বিভিন্ন মেয়েলি খেলা। তখন আমাদের সাথে যোগ দিতো পাড়ার আরও কয়েকটি সমবয়েসী মেয়ে। সালেহা ছিল চটপটে দুরন্ত মেয়ে, তাই দলে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে নিতো। পুতুলখেলা ওর ধাতে সইতো না। তার চাইতে রান্না-বাটি বা কানামাছি খেলা ভালো লাগতো। আমরা প্রায়ই তাই খেলতাম। তখন আকরামও খেলায় যোগ দিতো। একটা বিশেষ কারণে রান্না-বাটি খেলা সালেহার বেশি প্রিয় ছিল। শিলা চাচী একটা কাপড় কেটে সিলাই করে সালেহার জন্য একটা শাড়ী বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সাথে খেলনার দোকান থেকে ছোট ছোট থালা, গ্লাস, বাটি, রং করা মাটির মাছ, ডেকচি, হাতা ও চামুচ কিনে দিয়েছিলেন। এইসব আয়োজনের আকর্ষণ কি ছাড়া যায়? সালেহা শাড়ী পড়ে গিন্নির মতো রাধুনী হতো। বাড়ির রান্না ঘর থেকে, এক দলা আটা মাখা, কাটা আলু, গাজর, ও বেগুন নিয়ে আসতো। তাই প্রায়ই অনেক কিছু রান্না হতো। আর একটা খেলা আকরাম ছাড়া আমাদের সবার প্রিয় ছিল। সেটা হলো পুকুর জলে নেমে হুটোপুটি করা। আকরাম জলে ভয় পেতো আর আমরা কেউ তখন সাঁতার শিখিনি। তাতে কিছু যায় আসে না। সালেহাদের বাড়ির সামনেই পুকুর। কোমড়জলে নেবে জলে ডুব দেয়া আর জল ছেটানো খুব মজা লাগতো। তারপর যেদিন কলিম চাচা একটা কলাগাছ কেটে উপরের পাতা ছেটে গাছটাকে দড়ি দিয়ে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে জলে ছেড়ে দিলেন, সেদিন আমরা আনন্দে আত্মহারা। দেখলাম কলাগাছটা জলে ভাসছে। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছ ধরে পা দিয়ে জল ঝাপটিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। বোধ হয়

সেটাই আমাদের সাঁতার কাটার হাতেখড়ি। বেচারা আকরাম। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতো কিন্তু সাহস করে নামতে পারতো না।

তারপর হঠাৎ করে ঘটলো একটা মর্মান্তিক ঘটনা যার ক্ষত আমার মনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকবে। একদিন দুপুরে খাবারের পর বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষন ছটপট করে আমি উঠে পড়ে মাঠে চলে এসেছি। দেখি মাঠ খাঁ খাঁ। কেউ নেই। সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি হাটতে হাটতে কলিম চাচার বাড়ীর সামনের পুকুরের ধারে চলে এলাম, যে পুকুরে আমরা জলে নেমে খেলি। চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আঁতকে উঠলাম। দেখলাম একজন ছোট্ট মানুষ জলে আধডোবা অবস্থায় খাবি খাচ্ছে। সন্দেহ হলো এটা কি আকরাম? দেখে বোবা হয়ে গেলাম। চিৎকার করার চেষ্টা করলাম কিন্তু একটা গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরুলোনা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করে গেলাম- কতক্ষন জানিনা। পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়া একটা ইটের রাস্তা দিয়ে একটা রিক্সা যাচ্ছিলো। রিক্সাওয়ালা ওই দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে রিক্সা থামিয়ে ঝাঁপ দিয়ে জলে নেমে বাচ্চাটাকে তুলে পাড়ে নিয়ে এসে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। সেই সাথে রিক্সাওয়ালা চেঁচালেন, “সর্বনাশ হইয়া গেছে। সর্বনাশ হইয়া গেছে। কে আছেন আসেন। তাড়াতাড়ি আসেন।”

রিক্সাওয়ালা আকরামের বুকের উপর ঘন ঘন চাপ দিতে লাগলেন। চিৎকার শুনে কলিম চাচা ও শীলা চাচী ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসলেন। শীলা চাচি আকরামের দেহের উপর “হায় আল্লা” বলে আছড়ে পেলেন। কলিম চাচা বাকরুদ্ধ অবস্থায় রিক্সাওয়ালাকে সরিয়ে নিজে আকরামের বুকের উপর কিছুক্ষন চাপ দিলেন। তারপর আকরামের শরীর নিজের কাঁধের উপর ঝুলিয়ে পিঠে চাপড় লাগাতে থাকলেন। শীলা চাচীর কান্না শুনে আশেপাশের অনেকেই এসে জমায়েত হলো। আমিও ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর মনে মনে নিজেকে অপরাধী মনে করছিলাম। কিছুক্ষন পর সালেহা ছলছল চোখে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। তখন আমার দুজনেই কেঁদে ফেললাম। আমিই তো প্রথম দেখেছি কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। এই অপরাধবোধ চিরকাল আমার মনে থেকে গেছে। আমি এখনো ছবির মতো দৃশ্যটা দেখতে পাই। আকরামকে হারানোর পর ওদের পরিবার বহুদিন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল।

তারপর বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেও মাঝে মাঝে শীলা চাচীকে মুখচেপে ডুকরে কাঁদতে দেখেছি। সালেহা আর আমি আবার খেলাধুলা করি। একদিন খেলার সময় কাছাকাছি কোথা থেকে যেন সাপুড়ের বীনের সুর কানে এসে পৌঁছুলো। একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখতে পেলাম এক সাপুড়ে কাঁধে করে ঢাকনা দেওয়া দুই ঝুড়িতে সাপ বোঝাই করে বীন বাজাতে বাজাতে সালেহাদের বাড়ির পাশের বাসায় ঢুকছে। পাশের বাসায় বুলুরা থাকে। ছেলে বলে বুলু আমাদের সাথে খেলে না। এই দুই বাসার মধ্যে একটা মাঠ আছে। বুঝলাম যে ওই বাসায় সাপের খেলা দেখাবার আসর বসবে। আমরা ছুটে মাঠ পেড়িয়ে বুলুদের বাসার উঠানে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিক থেকে আরো অনেক ছেলেমেয়ে আর পাড়ার কয়েকজন

ভাবী চলে এলেন। বুলুর আব্বার হাবভাব দেখে মনে হলো না যে উনি খুব একটা উৎসাহী। কিন্তু ওর আম্মার উৎসাহে উনি রাজি হয়ে সাপুড়েকে কত পয়সা দেবেন তা নিয়ে দরাদরি শুরু করলেন। শেষে পাঁচ টাকায় রফা হওয়ায় সাপুড়ে খেলা শুরু করলো। একের পর এক রঙ বেরঙের ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখতে সাপ ঝুড়ি থেকে বেরুতে লাগলো। সাপুড়ে বসে ভাজ করা হাটু দোলাতে লাগলেন এবং বীণ বাজাতে থাকলেন। দুটো সাপ ফণা তুলে দোলানো হাঁটুর সাথে মাথা দোলাতে থাকলো। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো হা করে দেখছিলাম। হঠাৎ লক্ষ করলাম যে সালেহা একটু উসখুস করছে। একটু পরে বুঝতে পারলাম যে ওর "হিসু" পেয়েছে। ওর দেখাদেখি মনে হলো আমারও যেন "হিসু" পেয়েছে। কিন্তু আমরা দুজনেই নড়তে চাইছিলাম না। আরো কিছুক্ষণ পর আর পারা যাচ্ছিলো না। আর অপেক্ষা করলে হয়তো প্যান্টেই "হিসু" হয়ে যাবে। দুজনে চোখাচুখি হলো। ঠিক হলো আমাদের বাসা অবধি যাওয়া যাবে না, চট করে কাছাকাছি কোথায়ও এই "পানিত্যাগ" কর্মটা সেরে নিতে হবে। সালেহা ঠিক করলো ওদের বাসার পিছনে একটা জংলা জায়গা আছে যেখানে লোকজন দেখা যায় না। সেখানেই কাজটা সেরে নিতে হবে। আমরা সেখানে গেলাম এবং দুজন একটু দূরত্বে দুজায়গায় বসে গেলাম "পানিত্যাগ" করতে। সালেহার আমার একটু আগে কাজ শেষ হওয়ায় ও উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে প্যান্টটা বেঁধে ফেললো। তারপর আমার কাজ শেষ হওয়ায় আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টটা তুলতে যাবো, তখন সালেহা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে সালেহা বিস্ফারিত মুখে ওদের বাড়ীর দিকে হঠাৎ ছুটতে লাগলো এবং চিৎকার করতে লাগলো-"আব্বা, আম্মা, কাজ্লাটা মাইয়া না, পোলা, পোলা। কাজ্লাটা মাইয়া না, পোলা, পোলা"।

আমি শুনে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষন নিশ্চল হয়ে রইলাম। প্যান্টটা তখনও হাঁটুর নিচে পড়ে আছে। সালেহার চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গিয়ে কলিম চাচা ডিস্পেন্সারী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে হা হা করে হাসতে লাগলেন। আর শীলাচাচী বেরিয়ে এসে মুখে কাপড় ঢেকে হাসতে লাগলেন। অনেকদিন পর ওদের হাসতে দেখলাম। কলিমচাচা আবার ছুটে ভিতর থেকে ক্যামেরা এনে ক্লিক ক্লিক করে ওই অবস্থায় আমার কয়েকটা ছবি তুলে ফেললেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আমি প্যান্টটা তুলে কোমড়ে বেঁধে দৌড়ে আমার নিজের বাসার দিকে ছুটলাম। সাপের খেলা দেখা মাথায় উঠলো।

ছুটে বাসায় যাওয়ার সময় আমার মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিলো বড়দির উপর। এতো রাগ আগে আমি কখনও অনুভব করিনি। বাসায় গিয়ে দেখি বড়দি চেয়ারে বসে গুন্ গুন্ করে গান গাইছে আর কী একটা কাপড় সেলাই করছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে দিদিকে কিল ঘুসি ছুঁড়ে দিয়ে তারপর খামচানো কামড়ানো শুরু করলাম। সেই সাথে চেঁচিয়ে বললাম, "আমি তো পোলা, আমারে মাইয়া সাজাইয়া রাখছো কেন, কও?"

আচমকা আক্রমণে দিদি ভেবাচেকা খেয়ে বললো, "কি হইলো, এমন পাগলামি করতাছিস কেন, থাম, থাম, গায়ে সুইচ ফুইট্টা যাইবো"

"কে কইছে তোরে, সালেহা? তাতে কী হইছে, কিচ্ছু না। ঠিক আছে এখন থাইকা তোরে পোলাগো জামা প্যান্ট পোড়ামু। মাইয়া হইলে কেমন লাগে বুঝলি। এইবার পোলা হইলে কেমন লাগে বুঝতে পারবি, খারাপ কী?"

ওদিকে অন্য দাদা দিদি ও মায়ের চাপা হাসি ও কথা শুনতে পেলাম, "যা এতো দিনে সব ফাঁস। এখন ঠেলা বুঝো "

বড়দির কল্পনাতেই ছিলোনা যে ওর ওই আদুরে অপকর্মের পরিণাম আমাকে কী রকম পোহাতে হবে। আমার পোশাক বদলে গেলো। কিছুদিন আমি বাসার বাইরে গেলাম না। ইতিমধ্যে পাড়ায় খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে। আবিষ্কার করলাম যে কলিম চাচার তোলা আমার সেই কুখ্যাত ছবির একটা কপি বড়দির হাতে এসেছে। কলিম চাচা রসিক লোক বটে। বড়দি ছবিটি লুকিয়ে ফেললো। একদিন সাহস করে খেলার মাঠে গিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করছিলাম। ছেলেরা খেলা থামিয়ে একটু চাপা হেসে মন্তব্য করলো, "এই তুই নাকি পোলা? সত্য কিনা দেখাবি?"

সালেহার সাথে আর কথা হয় না, কদাচিৎ দেখা হয়। পাড়ার অন্য কোনো মেয়ের সাথে দেখা হলে ওরা মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। আমি বাসার ভিতরে বিমর্ষ হয়ে ঘোরাঘুরি করি। কদাচিৎ বাইরে যাই। মনে হচ্ছিলো যেন এই কোণঠাসা জীবন থেকে আর মুক্তি নাই। বেচারা বড়দি, অপরাধী হয়ে আমাকে উৎফুল্ল রাখার অনেক চেষ্টা করে। কোনো কাজ হয় না।

ইতিমধ্যে বড়দির কলেজে যাওয়ার সময় হয়ে এলো। বাবা-মা ঠিক করেছিলেন যে আমাদের কুমিল্লা শহরে চলে যাওয়াই ঠিক হবে। দুই মেয়েকে বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াতে পারবেন না। সেই অনুযায়ী বাবা ব্যাঙ্কের কুমিল্লার কোনো একটা ব্রাঞ্চে বদলি হবার চেষ্টা করছিলেন। সে চেষ্টা সফল হলো। আমরা কয়েক সপ্তাহ পর কুমিল্লাতে চলে গেলাম। আমার পরিত্রাণ। নতুন জায়গায় নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ এলো। বলা যায় তৃতীয় জীবন ছেড়ে দ্বিতীয় জীবনে ফিরে আসা।

বড়দির লুকানো কলিমচাচার তোলা সেই ছবি হাত ঘুরে প্রথমে আমার বৌদির হাতে এবং তারপর আমার বৌয়ের হাতে আসে। অবশেষে বহুযুগ পর আমার একান্ত ব্যক্তিগত অর্ধউলঙ্গ ছবিটি আমি দেখতে পাই। দেখলেই মনে পড়ে যায় বড়দির কথা, সালেহার কথা আর কলিম চাচার কথা।

সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

সেই সময়, একাত্তরে

কী সহজেই না সব ভোলা যায়! দুঃসময়ের কথা কিছু মনে থাকে না। অথবা এই কি ঠিক যে অমোঘ সময় সব মুছে নিয়ে যায়? তাই একই ছবিতে সকলে এক দৃশ্য দেখে না। না হলে আজকের বাংলাদেশ দেখে কে বলবে উনিশ শো একাত্তরে অমন ছিল?

একাত্তরের সেই মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আমরা ফিলাডেলফিয়ায় ছিলাম। যদিও এইখানে আমি বলতে পারি যে, আসলে কেউ তখন আমরা ওই স্থানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই শহরে আবদ্ধ ছিলাম না। সমস্ত বোধ ও অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এক জনপদের অযুত মানুষের সঙ্গে জন্মভূমি স্বাধীন করার মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু হায়, ওয়াশিংটনে ক্যাপিটলের সামনে মৌন সমাবেশ, ফিলাডেলফিয়ার জাহাজঘাটে পিকেটিং, বাল্টিমোর বন্দরে পাকিস্তানি সামুদ্রিক পোত অবরোধ অথবা নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ, কি মিছিলে শত ঘন্টা খরচ করলেও কেউ আমরা জলে-জঙ্গলে, অন্ধকারে, অনাহারে, শৈত্যতাপে পীড়িত সেই মুক্তিসেনার মৃত্যু যন্ত্রণার অংশভাক তো আসলেই হতে পারি নি। তবুও মনে হয় রাত্রির অন্ধকারে পথ চলার উপায় না থাকলে অনেক দূরের ক্ষীণপ্রভ তারা্রা যেমন যথাসাধ্য আলো দেবার চেষ্টা করে, আমরা তেমনি করেছিলাম। এখন দিনের আলোয় সেই সব তারা হারিয়ে যাবে এ-ই স্বাভাবিক।

কিছু তবুও কিছু কথা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের এক শহর থেকে আরেক শহরে ছুটে বেড়ানো, সভাসমিতির আয়োজন, মিছিল, অর্থসগ্রহসহ সেদেশে জনমত গঠন, রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন আদায়ের জন্যে তাদের সঙ্গে দেখা করা; স্কুলে, সিটিসেন্টারে, পথসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলা; এমনি করে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নমাস কেটেছিল আমাদের। এমন মনে হয়েছিল অনন্তকাল যেন কোনো এক ঘোরের মধ্যে, দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। আমরা যারা ছাত্র ছিলাম তখন, ক্লাসে যাইনি; চাকরিজীবী যারা, কর্তৃপক্ষর করুণা প্রার্থনা করে অফিস কামাই করেছি। আমি নিজে মাস্টার্স ডিগ্রির থিসিস লেখা ঠিক নয় মাস পিছিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সব কথা খুব নিচু স্বরে হলেও বলার দরকার আছে বোধহয়।

নিজের কথা অপরকে বলার মধ্যে প্রচারের আশঙ্কা আছে, অহমিকাও আছে , কিছু গ্লানিও আছে। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্র যারা, তারা ক্রমে ইতিহাসের পাদটীকায় স্থান

পাবে না এমন সম্ভাবনা দেখা দিলে অভিযোগের আঙ্গুল উপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

দেশপ্রেম অন্তরজাত, সম্ভবত মানুষের প্রতি ভালোবাসাও। ছাত্র বা গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ সেই ভালোবাসায় জোয়ার বইয়ে দেয়। উনিশ শো বাহান্ন থেকে আটষট্টি পর্যন্ত অবরুদ্ধ ক্রোধবহ্নি ক্রমে যে সূর্যের মতো তাপ সঞ্চার করেছিল উনসত্তরে, কোটি মানুষের মিছিলে তা দেখেছিলাম। সেই সব চিন্তা ও ঘটনা কিন্তু তাৎক্ষণিক ছিল না। কার্যকারণ সম্পর্ক ও ব্যাখ্যা অনেক আছে ঘটনার কিন্তু স্বদেশপ্রেম তার প্রধান শক্তি ছিল এ কথা কে অস্বীকার করবে? তবে আজ এত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে শুধু মনে হয়, সেই স্বদেশের ছবি কি সকলের চোখেও এরকম করে আঁকা ছিল না? আমরা ফিলাডেলফিয়ার মাত্র কজন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নাগরিক, আমাদের চোখেও কি ওই রকম আলাদা আলাদা ছবি আঁকা ছিল ?

আমি তখন ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে, আমার স্ত্রী পূরবী মেডিক্যাল কলেজ অব পেনসিইয়ভ্যানিয়ায়, মাস্টার্স শেষ করার মুখে। সুলতান আহমদ ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভ্যানিয়ায় পিএইচডি-র ডিসার্টেশন লেখায় ব্যস্ত, তার স্ত্রী সুফিয়াও ছাত্রী ছিলেন মনে পড়ে; সুলতানের ভাই আজহার টেম্পল- এ পড়তে এসেছিলেন; আমাদের নেতা মজহারুল হক, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, এবং তার স্ত্রী ফরিদা হক থাকতেন ফিলাডেলফিয়ার পাশেই নদীর ওপারে; মোনায়েম চৌধুরী টেম্পল-এ পিএইচডি-র পাঠক্রম শেষ করছিলেন, তাঁর স্ত্রী রওশনআরা সদ্য চাকুরি শুরু করেছিলেন; মমতাজউদ্দিন আহমদও ছিলেন টেম্পল ইউনিভার্সিটির ছাত্র, তিনিও সস্ত্রীক থাকতেন ফিলাডেলফিয়াতে; আর ছিলেন সস্ত্রীক নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া। তাঁর পিএইচডি ওই সময়ে প্রায় শেষ। দেশে ফিরবেন বলে গাড়ি কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঢাকার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আলমের কন্যাদ্বয় সুলতানা ও নাজমা আলম তখন ফিলাডেলফিয়ায়। আরো একজন দুজন ছাত্র তখন ছিলেন শহরে অল্প সময়ের জন্যে। উনিশশ একাত্তরে ফিলাডেলফিয়ায় এই তো আমরা কজন, এবং আমাদের একটি দুটি পুত্রকন্যা, আর পশ্চিম বাংলার ডঃ নুরুল ইসলাম সরকার ও রাবেয়া সরকার, ড. বিশ্বনাথ মুখার্জী ও মনীষা মুখার্জীর মতো কিছু সহানুভূতিশীল বন্ধুবান্ধব। পর্বত নড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবুও আমরা তাই করতে চাইতাম।

পঁচিশে মার্চের সেই কালরাত্রির কথা প্রথম বহির্বিশ্বে পৌছানোর সময়ই আমি শুনেছিলাম। টেম্পল-এর সাংবাদিকতা বিভাগে গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দিনের প্রথম কাজ আমার ছিল নিউজ ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেলিপ্রিন্টারটি চালিয়ে দেয়া। ছাব্বিশে মার্চের সকালে আমি তা-ই করেছিলাম। সেটি চালিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছি যখন, ঠিক তখন টেলিপ্রিন্টারের ঘন্টার অনবরত শব্দে দ্রুত ফিরে গেলাম মেশিনের সামনে। খুব উত্তেজক, গুরুত্বপূর্ণ খবর আসতে থাকলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর পুরনো দিনের টেলিপ্রিন্টারে অমন শব্দ হতো। খটখট শব্দে ক্রমাগত ছাপা হতে থাকা হলুদ কাগজের মাথায় ফেলে আসা প্রিয় শহরের নাম দেখে বিস্মিত ও পরমুহূর্তে চমকে

উঠেছিলাম। এ অভাবিত খবর কি বিশ্বাস হয়! রাতের অন্ধকারে দেশের বাইরে পালিয়ে আসা বাঙালি প্রতিবেদকের বয়ানে যে খবর এসেছিল তখন, খন্ডে খন্ডে, সে খবর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। আমার শহরের বিভিন্ন স্থানে আগুনের আভা, গুলির শব্দ, সাঁজোয়া গাড়ির যাতায়াত! কী করে বিশ্বাস করা যায়। যখন আর ক'দিন পরেই বাঙালি তার বিজয় পতাকা ওড়াবে!

আমি পূরবীকে ঘরে ফোন করে পেলাম না। ল্যাবরেটরিতে খবর দিয়ে তাকে স্তম্ভিত করে রেখে টেলিফোন করেছিলাম সুলতান আহমেদকে। একবার নয়, কয়েকবার চেষ্টার পর তাকে পেয়েছিলাম। যে খবর তখনও রেডিও-টেলিভিশনে যায়নি, সে খবর শুনে সুলতানের পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হয়েছিল।

বিকেলে আমি ও পূরবী সুলতানের বাসায় গিয়েছিলাম। ততক্ষণে অন্ধকারে মোড়া আগুনে ঝলসানো ঢাকার কথা সবাই জানতে শুরু করেছে। সুলতান, মজহারুল হক, মোনায়েম চৌধুরী ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে ওয়াশিংটনে টেলিফোন করেছিলাম এনায়েতুর রহিমকে। সম্ভবত তার দুদিন পরেই ওয়াশিংটনে যাই আমরা ক্যাপিটল হিলে বাংলাভাষী এক জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম সমাবেশে যোগ দিতে।

গাড়ি চালিয়ে ওয়াশিংটনে যাওয়ার পথে মজহারুল হক বারবার কেবল লেন বদলাচ্ছিলেন। গাড়িতে আমি ও সুলতান ছিলাম। অত ঘন ঘন লেন পাল্টানোয় সুলতান মৃদু আপত্তি করেছিলেন। হক সাহেব কী বলেছিলেন স্পষ্ট মনে পড়ে না। সেই সময়, সেই মুহূর্তে দ্রুত ওয়াশিংটনে পৌছনো কত না জরুরি বুঝেছিলাম।

নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনস্যুলেটের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করে জাতিসংঘে যাওয়া তার পরেই ঘটে। সেদিন সকালে নিউইয়র্ক টাইমস-এ কী লিখেছিল তখনও পড়িনি। ফারুকুল ইসলাম আমাকে বলেছিলেন। ঢাকা ছাড়ার পরে সেই প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা। পিতৃস্নেহে যিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন সেই ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবও যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিহত অধ্যাপকদের তালিকায় আছেন এই খবর সত্য না-ও হতে পারে শচীদুলাল ধর এ কথা বলেছিলেন, সম্ভবত আমার মুখ দেখেই। পূরবী দূর থেকেই আমাকে দেখে কিছু বুঝেছিল নিশ্চয়ই। হয়তো তাই সেই মুহূর্তে আমার ফিলাডেলফিয়া ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় সে বাধা দেয়নি। মমতাজউদ্দীনের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে আসার পথে আমি নিউইয়র্ক টাইমস-এ কী লিখেছে পড়েছিলাম।

পাকিস্তানি এক মালবাহী জাহাজ থেকে নেমে ফিলাডেলফিয়া শহরে ঢুকে পড়েছিলেন কয়েকজন বাঙালি নাবিক। আর জাহাজে ফিরে যাবেন না বলে ইমিগ্রেশনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা। (পাকিস্তানি সেই জাহাজ সামরিক উপকরণ নিয়ে যাচ্ছিল বলে খবর ছিল)। কিন্তু ব্যাপারটি অত সহজে ঘটে নি। ওই জাহাজিরা শহরে নেমেছিলেন আমাদেরই ভরসায়। মোনায়েম চৌধুরী নিজের বাসায় তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন।

পাকিস্তানি ওই জাহাজের সঙ্গে আমরা প্রথম মুখোমুখি হই বাল্টিমোরের বন্দরে। ওই জাহাজিদের সঙ্গে দেখাও হয় সেখানে, সাময়িক বিশ্রামের জন্য মাটিতে নেমে এলে।

ফিলাডেলফিয়ায় একেবারে নেমে আসার জন্য তখনই তাদের বলা হয়। আমরা বাল্টিমোরে গিয়েছিলাম ওই জাহাজকে বন্দরে ভিড়তে দেবো না বলে। এই ব্যাপারটি কী করে সম্ভব হতে পারে ঠিক না বুঝলেও যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল ওই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার অভিনবত্বের কথা আজ ভাবলেও অবাক লাগে। সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামান্য প্রতিবাদও যে অমিত শক্তিময় হতে পারে অমন করে আগে কখনো বুঝিনি।

বাল্টিমারে পাকিস্তানি জাহাজ অবরোধের মূল ভূমিকায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার কোয়েকার সম্প্রদায়ের শান্তিবাদীরা। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক চার্লস কান (বর্তমান বাংলাদেশ সংসদ ভবনের স্থপতি লুই কান-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) তাদের অন্যতম নেতা, একটি ছোট ডিঙ্গি নৌকা বেঁধে নিয়েছিলেন তাঁর গাড়ির মাথায়। কোয়েকারদের অন্যান্য নেতারাও ছিলেন। ছিলেন অনেক কর্মী, ডিক টেইলর (এই বাল্টিমোরর অবরোধের ওপরেই তাঁর লেখা ”ব্লকেড” গ্রন্থ পরে প্রকাশিত হয়) ও বিল ময়্যার। তাদের সঙ্গে ছিল একটি রাবারের ভেলা। সেই ডিঙ্গি আর ভেলা নিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজকে থামানোর চেষ্টা কেবল হাস্যকর নয়, বিপজ্জনকও নিশ্চয়ই ছিল।

পোতাশ্রয়ের জলে নেমে তারা বেশি দূর যেতে পারেননি। কোস্টগার্ড তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানি জাহাজ ডকে ভিড়লেও মাল নামাতে না পেরে চলে গিয়েছিল। বাল্টিমোর বন্দরে ডক শ্রমিকরা (লংশোরম্যান) পাকিস্তানি জাহাজ থেকে মাল নামাতে অস্বীকার করেছিলেন। কেননা ওই দিন সকালে আমাদের প্রথম কাজ ছিল তাদের সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সাহায্য কামনা করা। তাঁরা সাহায্য করেছিলেন। বাল্টিমোরের সেই জাহাজকে আবার আমরা আটকেছিলাম ফিলাডেলফিয়াতে-লংশোরম্যানদের সাহায্য নিয়েই।

ফিলাডেলফিয়ার ডক শ্রমিকরা আমাদের পিকেট লাইন পার হয়ে যেতে অস্বীকার করেন তখন। আমাদের যোগাগোগের মূলসূত্র ছিলেন মজহারুল হক। অতি সাধারণ কথাবার্তার মধ্য দিয়েই হক সাহেবের সঙ্গে চার্লস কান-এর যোগাযোগ হয়। চার্লস কান তাঁর সম্প্রদায়ের উৎসাহী কর্মী ও নিজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের আন্দোলনে যোগ দেন। ফিলাডেলফিয়ার কোয়েকার সম্প্রদায় অবশ্য ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি নৃশংসতার প্রতিবাদেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা যে সমিতি গঠন করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন ”ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল”। সত্যাগ্রহে তাদের বিশ্বাস, শান্তি=প্রতিবাদে তাদের আস্থা যে আদৌ অবহেলার নয় বুঝেছিলাম যখন ডিঙ্গি আর ভেলা নিয়ে জাহাজ আটকানোর সচিত্র খবর ছাপা হয়েছিল “বাল্টিমোর সান”=এর মত কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়। ছাপা হয়েছিল আরো অনেক কাগজে। ওয়াশিংটনে, হোয়াইট হাউসের সামনে, লাফিয়েত স্কোয়ারে সিমেন্টের পাইপের মধ্যে বাস করে তারা পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের দুর্দশার কথা বলতে চেয়েছিলেন। সেই সিমেন্ট পাইপ দিয়ে তৈরি নকল উদ্বাস্তুদের গ্রামের ছবি সারা পৃথিবীর কাগজে ছাপা হয়েছিল।

চার্লস কান বাঙালি নাবিকদের জন্যে কত-না খেটেছেন। ফিলাডেলফিয়ায় লন্ডন থেকে আসা প্লেনে লুকিয়ে থাকা এক বাঙালি তরুণ ধরা পড়েছিল। চার্লস কান অপত্য স্নেহ তাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন। এই সময় ফিলাডেলফিয়াতে আমরা তাদের পাশে পেয়েছিলাম বলে অনেক কিছু করা সম্ভব হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ওই সামান্য কজন বাঙালির চোখে প্রতিজ্ঞার আগুনও কোয়েকারদের চোখ এড়ায়নি এ-ওতো নিশ্চিত। ফিলাডেলফিয়ার কাগজে, রেডিওতে, টেলিভিশনে আমাদের কর্মকাণ্ডের কথা যে নিয়মিত বলা হতো তা দেশের ঘটনার বিশালতার জন্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কর্মীদের কর্তব্যনিষ্ঠাও সেখানে গৌণ ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সময় পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি প্রচারের সব কিছু ঠিক আছে রব শুনে মন যে ছোট হয়ে আসতো না তা নয়। কিন্তু মন খারাপ হতো অন্য কারণে আরো বেশি। আমাদের কারো কারো মধ্যে তখন লক্ষ্য করেছি অধিক হতাশা আর দূরে থাকার চেষ্টা। কিন্তু যে ঘর আগুনে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, সেই ঘরে যে আর ঢোকা যাবে না, এই কথা সবাই বোঝে না। মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র বা অন্যান্য সাজ=সরঞ্জাম সংগ্রহের কিছু দায়িত্ব প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের উপর বর্তাবে এ স্বাভাবিক কিন্তু আশ্চর্য হতাম যখন গোপনীয় বৈঠকে আমার ডাক পড়তো না। দীর্ঘকাল এর কারণ বুঝিনি। এখন বাংলাদেশের চেহারা দেখে বুঝি।

সভা-সমিতি, বিক্ষোভ, মিছিল, সিনেটর-কংগ্রেসম্যানদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমর্থন আদায়, তাদের কাছে চিঠি লেখা, এই সবই আমরা করেছি। কিন্তু তখনই আমরা জানতাম দেশের জন্যে আরো বেশি কিছু চাই। অর্থ চাই। বিচিত্রানুষ্ঠান করে টাকা তোলা, জর্জ হ্যারিসনের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর টিকেট বিক্রি, বিভিন্ন শপিং সেন্টারে 'স্টল' বানিয়ে নানারকম ঘরে তৈরি খাবার আর বাংলার উপহার সামগ্রী বিক্রি করা, ছোট ছোট স্মারকের বিনিময়ে টাকা তোলা সবই আমরা করেছি। টাকা যা উঠতো অন্য কাজের জন্য তা নগণ্য না-হলেও একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে যে কিছুই নয় তা বুঝেছিলাম বলেই আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে হতাশা প্রায় ছুঁয়ে এসেছিল আমাদের অনেককেই।

চার্লস কা'ন-এর ছাত্রী জুডি বার্নস্টাইনের সঙ্গে আমি গেছিলাম একবার ওয়াশিংটনে-- যে কজন কংগ্রেসম্যান-সেনেটরদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব, করতে। বঙ্গপ্রেমিক ডেভিড নলিন-এর একটি অফিস ছিল ওয়াশিংটনে। নলিন সিয়াটোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ঢাকার কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সুবাদে। তাঁর অফিসে বসেই সেদিন খবর পেয়েছিলাম কজন বুদ্ধিজীবী এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানে সব ঠিক আছে' এই কথা বলার জন্যে। হামিদুল হক চৌধুরীও ছিলেন সেই দলে। আমি 'অবজার্ভার'=এর প্রাক্তন সাংবাদিক এই সুবাদে তিনি যদি _আমার সঙ্গে দেখা করেন আশায় পাকিস্তান দূতাবাসে টেলিফোন করেছিলাম, নিউইয়র্কে তাঁর ঠিকানার জন্যে। কীভাবে সেই ঠিকানা পেয়েছিলাম মনে নেই। কিন্তু মনে আছে ডেভিড নলিনের অফিস থেকে তখনো দূতাবাসে আসীন এ.এম.এ মুহিতের সঙ্গে বাক্যালাপকালে কোনো পরামর্শের জন্যে টেলিফোনের

মুখ ঢেকে আমি জুডি ও নলিনের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে শুরু করি। আমি যে কোন ঘোরের মধ্যে আছি তারা হয়তো বুঝেছিলেন।

হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম পল সোয়ানসনকে সঙ্গে নিয়ে। পল সোয়ানসন এক সময় 'মিনিয়াপোলিস স্টার ট্রিবিউনে'-এর সম্পাদক ছিলেন, টেম্পল এ ছিলেন আমার শিক্ষক। ওই সময়ে তিনি সদ্য টেম্পল ছেড়ে ইন্টার-আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখনও আমি জানি না, নলিন আমাকে কেন একা চৌধুরীর কাছে যেতে মানা করেছিলেন।

ওই একই দিন সন্ধ্যায় চৌধুরীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। এবার সঙ্গে ছিল নিউইয়র্কের দশ পনেরোজন বাঙালি। খোন্দকার আলমগীর ছিলেন আমাদের সামনে। চৌধুরীর ঘর থেকে বেরিয়ে দুপুরে আমি "বিট অব বেঙ্গল' রেস্তোরাঁয় গিয়ে হামিদুল হক চৌধুরীর ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। 'কোন লজ্জায়, কোন সাহসে আপনারা এমন কাজ করতে এসেছেন?' নিউইয়র্কের বাঙালি তরুণদের উত্তেজিত প্রশ্নের জবাবে চৌধুরী বলেছিলেন, 'তোমরা কিছুই বুঝছো না, ভারত আমাদের নিয়ে যাবে।' সম্ভবত ওই বছর সে-ই আমার শেষ নিউইয়র্ক যাওয়া।

অক্টোবরের শেষ দিকে জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী ফিলাডেলফিয়াতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এম. আর. সিদ্দিকীও ছিলেন। মজহারুল হকের বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠকে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ড. দেব আমেরিকা থেকে ফেরার এক মাসের মধ্যেই এসব ঘটলো। আপনারা কি কিছুই বুঝতে পারেননি। ড. দেবকে আপনি ফিরে যেতে বলেছিলেন কেন? তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, আমি তো তাঁকে ফিরে যেতে বলিনি। বরং তিনি আরো কিছুকাল থেকে যান তাই আমি চেয়েছিলাম। তাঁর সেক্রেটারি কি তাহলে নিজ স্বার্থেই ড. দেবকে ফিরে যেতে বলেছিলেন? আজও ভাবি, ভাইস চ্যান্সলরের সেই সেক্রেটারির যদি ড. দেবের কাছে আসন্ন পিএইচডি'র তাগাদা না থাকত তাহলে কি তিনি ড. দেবকে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই চিঠি লিখতেন?

প্রায় কাছাকাছি সময়ে ড. এ.আর. মল্লিক এসেছিলেন ফিলাডেলফিয়ায়। বাঙালিদের এক সভায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের এই অবস্থায় দেশ কবে স্বাধীন হবে? তিনি বলেছিলেন, নভেম্বরের দিকে সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, নিশ্চিত থাকুন। তাঁর কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝি তিনি এমন কিছু জানতেন যেটা আমি জানতাম না।

নভেম্বরের শেষেই আমি শিকাগো চলে যাই, পূরবীকে ফিলাডেলফিয়ায় রেখেই। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো আমাকে যে বৃত্তি দিয়েছিল, তা শুরু হবার কথা ছিল সেপ্টেম্বরেই। দুই মাস দেরি করে ফেললেও এডওয়ার্ড ডিমক ও ক্লিন্ট সীলি আমাকে শিকাগোতে চলে আসতে বলেছিলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ ও বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি স্থপতি এ. আর. খানকে কেন্দ্র করে সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। ওই উদ্দেশ্যে যে সংগঠন তাঁরা তৈরি করেছিলেন শামসুল বারি ছিলেন তার সম্পাদক। তৎকালে বাংলাদেশ আন্দোলনে যাঁরা

অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা সবাই বারিকে চিনতেন তাঁর কর্মক্ষমতার জন্যে। ডিসেম্বরের সেই যুদ্ধের খবর শিকাগোতে বসেই পড়েছি। শামসুল বারি তখন শিকাগো ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মিনিয়াপোলিসে। ছিলেন আইনুল হক। হক সাহেবকে শিকাগোর লোকজনের বাইরে বড় কেউ চিনতো না। কিন্তু শুনেছি তাঁর বাসায় ওই ন'মাসে কয়েকশত লোকের রাত্রিবাস ঘটেছিল। হক সাহেবের মতো ছিলেন জগন্নাথ হলের ছাত্র ড. জ্ঞান ভট্টাচার্য। আটষট্টি সন পর্যন্ত তিনি ফিলাডেলফিয়ায় ছিলেন। তারপরে চলে যান ওহাইয়োর মায়ামী ইউনিভার্সিটিতে-- ছোট শহর অক্সফোর্ডে তিনি প্রায় একাকী বাংলাদেশ আন্দোলনকে সেখানকার জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন খবরের কাগজ, রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে। কেবল মধ্য আমেরিকা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব জায়গায় তিনি ছুটে গেছেন ওই সময় সভায়, মিছিলে। তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, সারা দিন গাড়ি চালিয়ে শিকাগো থেকে ফিরে এসে নিউইয়র্কে মিছিলের কথা শুনে তক্ষুনি বিছানা ছেড়ে তিনি রাস্তায় নামেন। অসুস্থ স্ত্রীকে ফেলে আসা যায় না বলে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে ভোরে তিনি নিউইয়র্ক পৌঁছেন।

ওই অবস্থায়ই একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর এসেছিল।

বহুকাল পরে মজহারুল হকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওয়াশিংটনে, প্রথম বাংলাদেশ সম্মেলনে। ওয়াশিংটনের কাছেই থাকেন। সুলতান আহমদ ও নূরুল ইসলাম ভূঁইয়াও ওয়াশিংটনে। মোনায়েম ও রওশনআরা চৌধুরীও ফিলাডেলফিয়ার কাছেই থাকেন। এনায়েতুর রহিম ভিন্নলোকে। আইনুল হক কয়েক বছর আগে দেশে গিয়েছিলেন বেড়াতে আর ফেরেননি। দেশের মাটিতে মিশে গেছেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র যুক্তরাষ্ট্রেই আছেন। শামসুল বারি ও তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া এতকাল পরে ঢাকায় ফিরেছেন এই সেদিন। এফ.আর. খান লোকান্তরিত। নাজমা আলম ফিলাডেলফিয়ায়। সুলতানা শুনেছি ভিন্ন দেশে আছেন। মমতাজউদ্দিন পেনসিলভ্যানিয়ার কোন এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। ড. জ্ঞান ভট্টাচার্য সপরিবারে ছিলেন অক্সফোর্ডে। তিনিও এখন লোকান্তরিত। আমি ও পূরবী এই সেদিন পর্যন্ত ছিলাম নিউইয়র্কেই। ডাগ হ্যামারশোল্ড প্লাজায় আবার কাঁধে ফেস্টুন বয়ে যেন হাজির হতে না হয়, এই শুধু আশা।

দেশপ্রেম অন্ধ, প্রতিদানের অপেক্ষাহীন। স্বদেশের ছবি চিরউজ্জ্বল। ওই সময়ে ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, শিকাগো, নিউইয়র্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যখানে যেসব বাঙালি বাংলাদেশের স্বপ্নে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের প্রায় কেউই স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে যাননি; কোনো পুরস্কারের ডালি আশা করেননি। বরং যারা বিরুদ্ধ শক্তির পাশে দাঁড়িয়েছিল তখন, বিবিধ পুরস্কারে তাদেরই দুহাত বোঝাই আজ।

সুসময় কী সহজেই না দুঃসময়ের রূপ নেয়।

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী

গোয়ালন্দি মাল্লার হেঁসেল

সৈয়দ মুজতবা আলীসাহেবের সেই গোয়ালন্দ চাঁদপুরী জাহাজের কথা মনে পড়ে? সেই যে গো, সেই যে জাহাজের 'মেজো সারেঙ' সিল্কের লুঙ্গি, আর মুগার কিস্তি টুপি পরে আলীসাহেবকে; চাঁদপুর ছেড়ে 'কুলুম' (কলম্বো), 'পুর্সই' (পোর্ট সঈদ), 'মার্সই' (মার্সেলস), 'হামবুর' (হ্যামবুর্গ) হয়ে 'নুউক' (নিউ ইয়র্ক) যাবার গল্প শোনায়। যে জাহাজটা দেখে মনে হয় "আস্ত একটা মুরগি, তার পেটের মধ্যেই তার কারি রান্না হচ্ছে।" নাঃ আলীসাহেব বেজায় পেটুক ছিলেন। যেকোনো কথাতেই খাওয়া দাওয়ার গপ্পো জুড়ে দিতেন। কায়রোর কফিশপ, কাবুলীর পোলাও, হাঙ্গেরির গুলাশ, প্যারিসের রেঁস্তোরার আলুভাজার গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর লেখায়। বাঙালিকে বারবার বলেছেন গোয়ালন্দি জাহাজের মুরগির ঝোলের কথা। সে জাহাজের অনেক কিছুই বদলে ছিল শুধু সেই মুরগির ঝোল নাকি বদলায়নি কখনো। জাহাজের "ভেজা ভেজা" সোঁদা গন্ধ ছাপিয়ে সেই ঝোলের গন্ধ নাকি জাহাজের যাত্রীদের আর পরবর্তীকালে আলীসাহেবের পাঠক পাঠিকাদের মনকে উদাস করে দিয়েছে বারবার।

বড় জ্যাঠামশায়ের ছোটবেলার গপ্পে শুনেছি, পেটভর্তি করে 'ইলশা মাছ' খেয়ে চাঁদপুরে এসে স্টিমারে ওঠার সাথে সাথে নাকে যেই ওই মুরগির ঝোলের গন্ধ ঢুকতো অমনি আবার পেটটা কেমন খালি খালি লাগতে শুরু করতো। আবার খিদে পেয়ে যেত। সেই লাল লঙ্কাবাটা দিয়ে কষা মাংস, সেই গোয়ালন্দি সুবাস জ্যাঠামশায় কোনো তাজ, গ্র্যান্ড হোটেলের তাবড় তাবড় রাঁধুনিদের ঝোলেও কোনোদিন খুঁজে পাননি বলে দুঃখ করেন আজও।

সেই ঝোলের রেসিপির সন্ধানে বার পনেরো উল্টে পাল্টে পড়ে নিয়েছি তাঁর সমস্ত লেখা। এতো কিছুর রেসিপি লিখলেন আর এই রেসিপিটার সন্ধান কোথথাও দিয়ে যাননি! গাদা গাদা পাতা জুড়ে হরেক রকম সালাডের রেসিপি লিখেছেন। ইতালিয়ান রিসোত্তোর সারসত্য পাঠককে বুঝিয়ে বলেছেন। আফগানী জরদ চোপ আর কিউবান সিগারের মাল মশলার সন্ধান দিয়েছেন বাঙালিকে অথচ ওঁনার এতো পছন্দের এমন একখানা মুরগির ঝোলের একখানা রেসিপি; কেন যে লিখে যান নি কে জানে! হয়তো ওঁনার বাঙালির ওপর বিশেষ ভরসা ছিল না। ওঁনার মতে বাঙালি নাকি খালি কুটনো কুটে আর বাটনা বেটে হেঁসেল ঠ্যালে। মাছ ছেড়ে মাংসের দিকে বিশেষ হাত বাড়ায় না। উনি হয়তো আন্দাজ করতে পারেননি আজকের বাঙালি ফুচকা সিঙ্গাড়ার মোহ ছেড়ে তিব্বতি মোমো, আফগানী কাবাব, পার্সিয়ান তাহছিন, হিস্পানিক অক্টোপাস, মেক্সিকান

বারিতো চেটেপুটে খাবে। কিংবা হয়তো ভাবতে পারেননি যে সেই গোয়ালন্দি জাহাজ, তার সেই চিকেন কারি, এমন কি সে জাহাজের মাল্লারাও এপার বাংলার মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। জলে ভাসা জাহাজে চেপে আর কেউ পাড়ি দেবে না 'পুর্সই', 'মার্সই', 'হামবুর', 'নুউক'। হাওয়াই জাহাজের হেঁসেল; জাহাজের খোল ছেড়ে মুখ শুকনো করে পড়ে থাকবে বন্দরে বন্দরেই।

সেই হারিয়ে যাওয়া রেসিপির খোঁজ তো করেছি অনেক। আলীসাহেব তো লিখে যান নি। গোয়ালন্দি মাল্লাদের তো ডাঙায় আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। সবজান্তা গুগল ঘাড় নেড়ে যে রেসিপি দিয়েছেন তার সাথে আপনার ওই সর্দি-জ্বরের দিনের পাতলা ঝোলের কোনো ফারাক নেই। ও জিনিস আর যেখানেই হোক স্টিমারে রান্না হতো না। অনেক খুঁজে খুঁজে খোঁজ পেলাম শেষে ঘরের কাছেই। সেই রেসিপি আর সেই রেসিপি খুঁজে পাবার গপ্পোই আজ বলবো। নোলা সামলে চুপ করে বসে শুনুন আর নোটবই খুলে নোট নিন। এই গোপন তথ্য এবং তত্ত্ব কিন্তু গুগল জ্যাঠামশায়ের কাছেও নেই।

দিদির বাড়ি গেছিলাম সরস্বতী পূজোর খিচুড়ি খেতে। হলদে শাড়ি, হলদে খিচুড়ি, হলদে গাঁদার অঞ্জলি তো মিটে গেলো বেলা দেড়টা বাজতে না বাজতেই। তারপর সোফার ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে জামাইবাবু পাড়লেন আসল পূজোর কথা। বাঙালি বারো মাসে তেরোখানা পূজো করে। দুগ্গা, কালী, লক্ষ্মী, গণেশ তো আছেই তার সাথে শেতলা, মনসা, ঘেঁটু, ইতু, ইত্যাদি তেত্রিশকোটির কোনো দেবদেবীই আমাদের ঘর থেকে খালি হাতে ফেরেন না। ইদানিং দেখছি আবার সে দলে এসে জুটেছেন পহেলবান বজরংবশী গণপতি বাপ্পা, ছটপূজোর ঠেকুয়াও। কিন্তু বাঙালির সেরা পূজোটা কি বলুন তো! আমি তো অনেক ভাবনা চিন্তা করে কান চুলকে, গাল খিমচে বললাম 'দুগ্গাপূজো' এদিকে দেখি জামাইবাবু শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো দুলে দুলে বলছেন, "হয়নি হয়নি, ফেল"। ভর দুপুরে ভরা পেটে তক্কাতক্কি বিশেষ আসে না মশাই। তাই জামাইবাবুকে খ্যামাঘেন্না করে দিয়ে বললুম ঝেড়ে কাশতে। পেটের মধ্যে যা সব আইডিয়া ভসভস করছে সেসব চেপে রাখলে পেটের ব্যামোয় ধরবে যে।

ব্যাপার হলো, আলীসাহেব এবং আর পাঁচজন বাঙালিদের মতোই আমার জামাইবাবুও পেটুকচাঁদ। শাশুড়িমায়েদের রান্নাঘরের সাথর্কতা আর শ্বশুরের বাজারের থলির উদ্ধারকর্তা। তাই ওঁনার ধারণা, বাঙালির সেরা পূজো নাকি পেট পূজোয়। এ পূজোয় চিত্তের শুদ্ধি যদি নাও বা হয় তবু পিত্তের শুদ্ধি হবেই। তিথি নক্ষত্রের বালাই নেই, আসন, গঙ্গাজলও চাই না। খালি এক খান ভর্তি প্লেট আর খালি পেট হলেই এ পূজো উৎরে যায়। ওঁনার এসব আবোলতাবোল বুকনি শুনে দিদি গেলো খেপে। তেড়েফুঁড়ে উঠে বললো, সারাদিন খাটাখাটনির পর আর জামাইবাবুর পেট পূজোর আয়োজন করা সম্ভব নয়। এবং তার সাথে সাথে বাচ্চা মেয়েটাকে এসব কু-শিক্ষা দেওয়ার জন্য তুমুল বকাও দিলো। বাচ্চা মেয়ে বলতে অবশ্য ও যে কার কথা বললো তা বুঝলুম না! আমার না ওর মেয়ের!

জামাইবাবুর অবশ্য ওইটুকু বকায় কিস্যু আসে যায় না। তড়াক করে লাফ মেরে উঠে ফ্রিজের পেটের ভেতর থেকে বার করে আনলেন আগের দিনের কেনা কেজি খানেক চিকেন। দিদি তো কিছু করবে না তাই নিজের ফাইলপত্তর ঘেঁটে বার করলেন মায়ের লিখে দেওয়া গোপন সব রেসিপি। তারপর দেখি একবার রেসিপির পাতা ওল্টায় আর একবার ওল্টায় রান্নাঘরের মসলার কৌটো, আনাজের ঝুড়ি। দিদি দেখি 'রেগে আগুন তেলে বেগুন', হুকুম দিলো রান্নাঘরে; পূজোর দিনে ওসব মুরগি-মাটন চলবে না। হাতা, খুন্তি, কড়াই আর কেরোসিনের উনুন নিয়ে তেতলার ছাদে বসে রান্না করতে হবে। যেই না বলা অমনি জামাইবাবু 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠে, দিদির গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে কোমরে গামছা বেঁধে বসে গেলেন পেঁয়াজ কুচোতে। চোখের জল আর নাকের জলের সাথে শুরু করলেন তাঁর সেই ইস্পেশাল রেসিপির গল্প, গোয়ালন্দি স্টিমার কারি।

জামাইবাবুরা "উচ্চঘর, কংসরাজের বংশধর"। তা সেই বংশেরই এক সুপুত্তুর মানে জামাইবাবুর মেজো জ্যাঠামশায়ের পিসতুতো বোনের খুড়তুতো মামার এক মাত্তর ভাইপো নাকি একবার সওয়ারি হয়েছিল এক গোয়ালন্দি স্টিমারে। তখন গোয়ালন্দি জাহাজের সুখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। সারেঙ সাহেব সিল্কের লুঙ্গি আর পরেন না। টেরিলিনের শার্ট গায়ে দিয়ে জাহাজের সিটে হেলান দিয়ে বিড়ি খান। আলীসাহেবের সময়কার সেসব ডেকচেয়ারের দিনও নাকি গেছে। সরকারবাহাদুর ওসব তুলে দিয়ে লোহার সিট বসিয়ে দিয়েছেন। 'ভেজা ভেজা', সোঁদা গন্ধের সাথে পাল্লা দিচ্ছে এদিকে পানের পিক খৈনির দাগ আর ওদিকের পঁচা ডাস্টবিনের গন্ধ। দেখে শুনে সেই ভাইপো বাবাজীর খুব দুখখু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেসব গলে জল হয়ে গেছিলো খেতে বসে। গরম ভাতের সাথে সে এক অমৃত এনে দিয়েছিলো গোয়ালন্দি জাহাজের মাল্লা। তাড়াতাড়ি সাপটে খেয়েই মাথায় হাত মুছে মাল্লা সাহেবকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করেছিল রেসিপিটা কি। মাল্লাসাহেব নানান সুখ দুঃখের গল্পের মসলা মিশিয়ে ঢাকাই বাংলায় বলেছিলো সেই গুপ্ত রহস্য, যা নাকি এতো দিন বাঙালির ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছিলো। আমার অবশ্য ঢাকাই বাংলা রপ্ত হয়নি তাই আমি জামাইবাবুর বাংলাতেই বলি।

মাল্লাসাহেবের কথা বলতে বলতে জামাইবাবু চোখের জল মুছে, পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখা মাংসের ডেকচিটা টেনে এনে তাতে এক খাবলা রসুন বাটা ঢাললেন। মাল্লা সাহেব জেতে মোছলমান, রসুন আর হলুদ ছাড়া রাঁধলে ওঁনার গোস্তাকি হয়। তাই রসুন মাখা মাংসে এক খাবলা হলুদও দিতে হবে। এরপর হয়তো আপনা-আপনি হাত চলে যায় আদা বাটা, জিরে বাটা, গরম মসলার দিকে। কিন্তু ওসবে হাত দিলে সেই গোয়ালন্দি সোয়াদ আসবে না। গোয়ালন্দি মাল্লারা দিনের পর দিন জলের মধ্যে থেকে অতসব মশলাপাতি পাবে কোত্থেকে! আর ওগুলোর দামও তো কম না। গরিব মাল্লা ওগুলোর পেছনে কড়ি ঢালবেই বা কেন! সে যা হোক, বেশ কিছুটা লঙ্কা বাটা কিন্তু দিতেই হবে। গোয়ালন্দি স্টিমার কারি খাবো আর মুখপোড়া ঝাল খাবো না, সে তো আর হয় না, তাই

লঙ্কা বাটা মাস্ট। (আমি অবশ্য বলবো, জিভ বুঝে আর পেট বুঝে ঝাল দেবেন। ঝাল খেয়ে মুখ পোড়ানো কোনো কাজের কথা নয়)। ব্যাস মসলা মেখে আপনার মাংস নতুন কনের মতো রাঙা হয়ে বসে থাকুক না হয় কিছুক্ষন। আমাদের এবার খুঁজে পেতে আনতে হবে এই রেসিপির আসল রসদ। যা হলো গে' কুঁচো চিংড়ি।

আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন, কুঁচো চিংড়িই করবে আসলে ম্যাজিক এই মাংসের ঝোলে। জলে ভাসা মাল্লাদের হাতে আর কোনো মশলা বা সবজির অভাব থাকুক বা না থাকুক কুঁচো চিংড়ির কোনো অভাব ছিলো না। জলে জাল ফেললেই উঠতো একরাশ। তা জামাইবাবু প্রায় এক কেজি মাংসের জন্য পাঁচশো গ্রাম ওজনের কুঁচো চিংড়ি জুটিয়ে আনলেন। হাতের হলুদ পরনের পাজামায় মুছে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে ফেললেন চিংড়ির খোলা, মাথা, শিরা মানে যা যা ছাড়ানো যায় সব আর কি। তারপর সেই চিংড়িগুলো পোয়াটাক জলে ডুবিয়ে, ভস ভস করে মিক্সি চালিয়ে বানিয়ে ফেললেন বেশ মিহি থকথকে একটা পেস্ট। তা থেকে যা আঁশটে গন্ধ ছাড়লো সে আর কি বলবো! ওই গন্ধের চোটে দিদি দুর্গা শ্রীহরি স্মরণ করতে শুরু করলো আর আমি স্মরণ করছিলাম আলীসাহেবকে।

গোয়ালন্দি মুরগির ঝোলের আসল জিনিসগুলো মানে মুরগি আর চিংড়িবাটা তো তৈরি। তাহলে আর কি! এবার ওদুটোকে বেশ ভালো করে মাখেয়ে ফেললেই হয়। চিংড়ি দিয়ে মুরগি ম্যারিনেট, ব্যাস আপনার কুটো কোটা আর বাটনা বাটার হ্যাঙ্গাম শেষ। এবার দরকার একটা কাঠের উনুন। গোয়ালন্দি মাল্লার হেঁসেলে গ্যাসের উনুন পাবে কোত্থেকে! আর যাঁরা কাঠের উনুনের রান্না খেয়েছেন তারা জানেন যে কাঠপোড়া গন্ধ ঝোলের সাথে মিশে গিয়ে একটা অদ্ভুত স্বাদ হয়। কিন্তু ও জিনিসের আজ ভারী অমিল। জামাইবাবুরও কাঠের উনুন নেই তার বদলে উনি কড়াই চাপালেন কেরোসিনের স্টোভে। কাঠ না হোক কেরোসিনই সই। তাও না জুটলে গ্যাস কিংবা ইলেক্ট্রিসিটিই ভরসা, কি আর করা যাবে! সে যা হোক এবার রান্না শুরু করা যাক। এতক্ষন ধরে খালি গৌরচন্দ্রিকা আর সহ্য হচ্ছে না।

কড়াইয়ের মধ্যে বেশ আধসের সর্ষের তেল ঢালা হলো। আমি অবশ্য মেপে তো আর দেখিনি। আপনার যদি কোলেস্টেরল কি ব্লাড প্রেসারের সমস্যা থাকে তাহলে না হয় একটু কমই নেবেন তবে সর্ষের তেল ছাড়া এ রান্না হবে না। ভেজিটেবল অয়েলে রাঁধলে মাল্লাসাহেবের ভূত মাঝরাত্তিরে আপনার ঘাড়ে চাপবে আর আপনি বদহজমের চোটে ভুলভাল স্বপ্ন দেখবেন। এই বার ওই তেলে ঠিক এক চিমটি পাঁচ ফোড়ন আর একটা শুকনো লঙ্কা ছেড়ে দিন। আপনার যদি নিজেকে সামলানো একদম সম্ভব নাহয় তাহলে একখানা তেজপাতা দিতে পারেন কিন্তু লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনির কৌটোয় হাত দিলেই এ রান্না ভণ্ডুল। নিজেকে জাহাজের মাল্লা ভাবতে খুব অসুবিধা হলে কোমরে একটা লুঙ্গি আর মাথায় একটা ভেজা গামছা চাপিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দামি মশলার দিকে হাত যাবে না। জামাইবাবুও মাথায় গামছা জড়িয়ে, ভুঁড়ি বাগিয়ে, হাঁটু গেড়ে বসলেন উনুনের ধারে। কড়াইতে পেঁয়াজ ঢেলে মোল্লাসাহেবের কায়দাতেই গল্প শুরু করলেন। তারপর

পেঁয়াজটা একটু বাদামি হতে আর দিদি একখান বকুনি দিতে, পুরো মাংসটা, তার গায়ে মাখানো চিংড়ি, রসুন, হলুদ, লঙ্কা সমস্তটা কড়াইতে ঢেলে ঢাকনা চাপা দিয়ে, আগুনের আঁচ কমিয়ে দিয়ে চায়ের জন্য হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিলেন।

চায়ের কাপ শেষ হতে না হতেই ওই ঢাকা দেওয়া কড়াইয়ের দিক থেকে একটা মন কেমন করা গন্ধ ভেসে এলো। কাছে গিয়ে দেখি মাংস থেকে জল বেরিয়ে এসে বুড়বুড় করে ফুটছে। এ সময় অল্প একটু নেড়েচেড়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে তলা ধরে না যায়। যত নাড়বেন তত খোসবাই বেরোবে আর শাস্তরে তো বলাই আছে "ঘ্রানেন অর্ধভোজনম"। আমরা সেই অর্ধভোজন করতে করতে জাহাজের গল্প শুনতে লাগলাম। আধঘন্টা পর ঢাকনা খুলে চামচে করে সেই লালচে হলুদ ঝোল তুলে জামাইবাবু দিদির মুখের সামনে ধরলেন। জিভে লাগতেই দিদিভাইয়ের আমার, মুখ বেঁকে গেলো। "ইঃ নুন দাও নি তো!" মা কালীর মতো জিভ বার করে জামাইবাবু এক খাবলা নুন মিশিয়ে দিলেন ঝোলে। ঐটে ভুললে চলবে না। যে কোনো মাংস রান্নাতেই ও জিনিসটা দিতেই হবে। ওদিকে দিদি টেবিলে থালার ওপর সাদা ভাত আর তার ওপর এক চিমটি ঘি, পাশে দুটো কাঁচা লংকা আর কাঁচা পেঁয়াজ সাজিয়ে তৈরী। সেই ভাতের সাথে সেই ঝোল মিশিয়ে মুখে দিয়ে থালা থেকে মুখ তুলে দেখি জামাইদাদা যুদ্ধ জয়ের হাসি হাসছেন আর বলছেন "কেমন বানিয়েছি বল দেখি! এ একেবারে জন্মসূত্রে পাওয়া বংশের সম্পদ।" দিদি অমনি মুখ বেঁকিয়ে বলে দিলো "যত্তো বাজে কথা, নির্ঘাত কোনো রেসিপির বই, কিংবা কোনো ব্লগ থেকে চুরি করে মেরেছে, এখন নিজের গুষ্টির নামে চালাচ্ছে........"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১ অবশ্যই আলীসাহেব মানে সৈয়দ মুজতবা আলী। যিনি বাংলা সাহিত্যকে দিয়ে গেছেন এক অতুল রসের ভান্ডার রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনীর মোড়কে।

২ আমার জ্যাঠতুতো দিদি। নাঃ তার বর পেটুকচাঁদ নয় তবে রাঁধতে ভারী ভালোবাসে। সে ও ভারী শান্ত শিষ্ট ভালোমানুষ, বরকে ধমকায় ঠিকই কিন্তু চমকায় না। তার কাছ থেকেই পাওয়া এই রেসিপি। সে সম্ভবতঃ পেয়েছিলো কোনো এক রেসিপির ব্লগ থেকে।

সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

ড. নুরুন নবী

আযান এবং শঙ্খধ্বনি

জ্ঞান ফিরে এলে চোখ খুললাম। দেখি আমি মা'র কোলে। চারপাশে মানুষের ভিড়। আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং দোয়া-দরুদ পড়ছে। মনে পড়লো জ্ঞান হারাবার আগে মা'র কোলে ছটফট করছিলাম। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর, মাথায় অসহ্য ব্যাথা।

খালাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে বড় খালার বাড়ি গিয়েছিলাম। ঘটনাটি সেখানেই ঘটেছিল। তখন বর্ষাকাল। বর্ষার পানি কাছের নদীটির পাড় উপচিয়ে সারা গ্রাম প্লাবিত করেছে। বাড়ির সম্মুখের খোলা জায়গায় দু-তিন ফুট পানি। আকাশ নীল, রৌদ্রকোজ্জ্বল। ধানক্ষেত পেরিয়ে আসা পানি স্বচ্ছ; সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা মাছ ত্বরিত গতিতে একদিক থেকে আরেক দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। বিয়েবাড়িতে সবাই ব্যস্ত। এই ফাঁকে মামাত ভাইবোনদের নিয়ে আমি সারাদিন পানিতে খেলেছি। রাতেই প্রচণ্ড জ্বর এলো। বিয়ের আগের দিন বাড়তি ঝামেলা বাধানোর জন্য মা খুব বকাবকি করলেন।

সময়টা ছিল ৫০ দশকের প্রথম দিকে। তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয়।

আমি সারাদিন ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে কাটালাম। আমাকে ছাড়াই ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল। মা আমার জন্য নিজকে খুব অপরাধী মনে করলেন। বড় খালা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন; এতে মন খারাপ করার কিছু নেই, অসুখ তো হতেই পারে।

বিয়ের পরদিন আমরা নৌকায় বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আমাকে আর মাকে আদর করে বড়খালা বিদায় দিলেন।

গত ক'দিনে বর্ষার পানি আরও ফুলে উঠেছে। এখন সারা অঞ্চল প্লাবিত। আসার সময় আঁকাবাঁকা নদীপথে অনেক সময় লেগেছিল। এখন নৌকা চলছে সোজা হাঁটাপথের উপর দিয়ে। নৌকাতে বাবা, মা এবং আমি। দুজন মাঝি নৌকা বাইছে। বাবা নৌকার সামনে বসেছন এবং পথে পথে গ্রামের মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন। ছইয়ের ভিতর মা আর আমি। বাইরে এসে বাবার পাশে বসার জন্য মনটা ছটফট করছিল। কিন্তু মায়ের বারণ। তাঁর ভয় বাতাস লেগে আবার যদি জ্বর আসে।

মায়ের ভয়ের কারণ আছে। তাঁদের প্রথম সন্তান, আমাদের এক বড়ভাই, নজরুল, মাত্র ৬/৭ বছর বয়সে এই রকম একটা জ্বরে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাঁর মৃত্যু বাবা-মাকে খুব শোকাহত করেছিল।

আমি ছইয়ের বাইরে আসার জন্য কান্নাকাটি শুরু করলাম। বাবা বললেন, জ্বর কেটে গিয়েছে, বাইরে এলে কোন ক্ষতি হবে না। আমি ছইয়ের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে বাবার পাশে এসে বসলাম।

আষাঢ়ের বিকেলে পড়ন্ত রোদ। বন্যার প্রকোপ থেকে বাচার জন্য এ অঞ্চলের বাড়িগুলি অনেক উঁচুতে বানানো হয়েছে। বর্ষার পানিতে মাঠঘাট ডুবে গেলে ওগুলিকে এখন এক-একটি দ্বীপের মত দেখাচ্ছিল। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাবার একমাত্র উপায় নৌকা। অনেক বাড়ির উঠানে ধান মাড়ানো হচ্ছে। গরুগুলি বাধ্য হয়ে ভিজা ধানের উপর চক্রাকারে ঘুরছে। আর সুযোগ পেলেই একমুখ ধান মুখে পুরে নিচ্ছে। সাথে সাথে রাখাল হাতের কঞ্চি দিয়ে লাগাচ্ছে ঘা গরুগুলির প্রশস্ত পিঠে।

কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করার পর এখন আমাদের সোজাসুজি একটি বিল পাড়ি দিতে হবে। মাঝি লগি ছেড়ে এবার পাল উড়িয়ে দিল। আমাদের গ্রাম খামারপাড়ার পুব পাশের বিলটি এখন যেন একটি সমুদ্র। দক্ষিন থেকে উত্তরের গ্রামটি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণের ফলদা গ্রাম থেকে উত্তরের বর্ণিগ্রাম, পুবের কুমিল্লা, বেলুয়া থেকে পশ্চিমে ফুলবাড়ি, খামারপাড়া- এই পুরো এলাকায় পানি আর পানি। আদিগন্ত আকাশের প্রান্তছোঁয়া এত বিশাল জলের বিস্তৃতি আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রক্তিম সূর্যের শেষ আলোতে ঢেউগুলি কেমন মায়াবী হয়ে উঠল। হিন্দুপ্রধান ফলদা এলাকা থেকে সন্ধ্যার শঙ্খ এবং পশ্চিমের মুসলিম এলাকার গ্রামগুলি থেকে ভেসে এল মাগরেবের আযান ধ্বনি। একটা অনাবিল প্রশান্তি নেমে এল বিলের বুকে। পুরো এলাকার আকাশ বাতাস জুড়ে।

বাবা মাগরেবের নামাজ শুরু করলেন।

নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

পূরবী বসু

বিদ্যাসাগর: নারী প্রগতি ও বাংলা ভাষা সংস্কারের পথিকৃৎ

ধর্ম ও ধর্মীয় বিধান, আর পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা বা অশিক্ষার ভারে নত, বহু সন্তানের জননী, বছরের পর বছর অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে ও প্রগাঢ় শারীরিক পরিশ্রমে ভগ্ন-স্বাস্থ্যের অধিকারী ভারত উপমহাদেশের নারীর যে করুণ অবস্থা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তার থেকে প্রথম মুক্তির আলোর যে সন্ধান পায় মেয়েরা, পায় বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার অর্জনের সুযোগ, তার পেছনে ছিলেন প্রধানত বাংলার দুই মহাপুরুষ- দুই নারীবাদী সমাজ সংস্কারক। তাঁদের একজন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। অপরজন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তাঁরাই প্রথম জোরেসোরে প্রতিবাদ করেছিলেন, প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন মেয়েদের এই চরম দুরবস্থা, হীন অবস্থার পরিবর্তন করতে।

শাসকের সিংহাসনে ইংরেজদের উপস্থিতি তাঁদের এই কঠিন প্রচেষ্টাকে সার্থক ও জয়ী হতে সাহায্য করেছে। সেই সঙ্গে কুসংস্কার ও কুনীতি- বর্জিত পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল তরুণদের নিয়ে গঠিত সমাজ সংস্কারের ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্মের উত্থান, ডিরোজারিও কর্তৃক প্রবর্তিত ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের কুসংস্কার দূরীকরণ, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও কিছু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবোধের আমদানী সমাজে নারীর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে অনেকাংশে দায়ী ছিল। একই সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন এবং দেশকে স্বাধীন করার বিপ্লবী ও অহিংস সংগ্রামের জোয়ারে নারীর অন্তর্ভুক্তিও নারী আন্দোলণকে আরও প্রাণবন্ত ও গতিশীল করেছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্যে নারী ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের জন্যেও এক উন্মুক্ত পৃথিবী আবিষ্কার করে ফেলে।

সময়ের বিচার করলে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে এই উপমহাদেশকে আলোকিত করে একসঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন বেশ কিছু ক্ষণজন্মা মানুষ - নারী পুরুষ নির্বিশেষে। বাংলার সেই রেনেসাঁসের যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রে-- হোক সে রাজনৈতিক অঙ্গন, অথবা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, সমাজ সংস্কার, নারী প্রগতি কিংবা স্ত্রী-স্বাধীনতা, সকল রকম উন্নয়নমূলক কাজে এতোজন সাহসী, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও মৌলিক চিন্তার অধিকারী মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন যে মাত্র একশ বছরে এই ভূখন্ডকে তারা মিলিতভাবে যতখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা আর অন্য কোন শতাব্দীতে ঘটেছে বলে মনে হয় না। এই সময়টাতে কী ধরনের নারীবান্ধব নীতির সংযোজন ঘটেছিল বা সামাজিক সংস্কারে কী রকম বা কী ধারার বৈপ্লবিক কাজ

চলছিল, এবং সেইসব বিপ্লবী কাজ সম্পাদিত হবার ব্যাপারে কারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, নারীদের বা অগ্রসরমান পুরুষদের কল্যাণে নারীরা কতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিল, গেলে কোন্ কোন্ মহল বা শক্তি তাদের সহযোগিতা করেছিল, কারা বাধা দিয়েছিল, তার আভাস পেতে পারি আমরা, এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে তখন বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়ে ওঠে।

আমরা জানি রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত বাংলার গৌরবোজ্জ্বল এই সময়টা, মোটামুটি বলা চলে আঠারো শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মধ্যেকার সময়টা, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের, বিশেষ করে নারীর অবস্থার উন্নয়নের, এক স্বর্ণযুগ ছিল। একে বাংলার নবযুগ-ও বলা চলে। উনবিংশ-বিংশ শতকের বাংলার এই জাগরণ সমাজসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম, ও বিজ্ঞানের পথিকৃৎদের এক অনন্য সমাহার ঘটায়।

এই সময় প্রধান ও প্রথম নারীকল্যাণকর যে আইনটি পাশ হয়, তা হচ্ছে রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথা রহিত আইন (১৮২৯)। মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারা থেকে রক্ষা পেয়ে নারী যখন তার জীবন ফিরে পেলো, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অহর্নিশি প্রচেষ্টা ও সুযোগ্য নেতৃত্বে একে একে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে মেনে নেওয়া হয় (১৮৫৭), বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্যে আইন পাশ হয় (১৮৭১-- সহবাসসম্মত বয়স ১২ -এর কম নয়)। বহুবিবাহ, সমাজের আরেকটি ব্যাধি সমাজ থেকে দূর করার জন্যে বিদ্যাসাগর বহুরকম চেষ্টা করেন, আইনের সহায়তা কামনা করেন। কিন্তু কার্যত বাংলায় বহুবিবাহ রোধের আইনী অনুমতি মিললেও (১৮৭১) ভারতের অন্যান্য জায়গায় তখন পর্যন্ত এই প্রথা রহিতের ছাড়পত্র মেলে না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে আইন করে তা বন্ধ করা না গেলেও সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজে ও ব্যক্তির মনস্তত্ত্বে, সাহিত্য আর নাটকের (বিশেষত প্রহসন) মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণে ও মূল্যবোধে বহুবিবাহের গ্রহণযোগ্যতা এতোটাই কমিয়ে দেয়া হয় যে এই অসুস্থ প্রক্রিয়াটি আইনী সাহায্য ছাড়াই সমাজ থেকে উচ্ছেদ হতে শুরু করে। এছাড়া, কৌলিন্য কিংবা বর্ণ বা জাতিভেদের মতো কুসংস্কারকে পুনঃপুনঃ আঘাতে নির্মূল করে দিয়ে মানবতার জয়গান গাইতে প্রস্তুত হয়েছিলেন তখনকার কয়েকজন প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারক। বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম।

এক-ই সঙ্গে পাশাপাশি একটু একটু করে দানা বাঁধছিল নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প, তার সংগ্রামী পথযাত্রা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের প্রতি অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর জগতে নিজেকে কর্মক্ষম করে তুলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার দুর্দান্ত বাসনা দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল নারীর। তার আত্মপ্রত্যয়-ও এক ভিন্ন স্তরে - নবদিগন্তে গিয়ে পৌঁছেছিল। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ঊনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে যে নারীবাদী আন্দোলন এই ভূখন্ডে হয়েছিল, তা মুলত প্রগতিশীল, মুক্তমনা পুরুষের হাত ধরেই এগিয়েছিল।

আমরা সকলেই অবগত যে ১৮১৮ সালে রামমোহন কলকাতায় সহমরণ এবং সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য জনমত তৈরি করেন, এবং ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই প্রথা বিলোপ করে আইন পাস করেন।

কালোত্তীর্ণ, মহান এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫০-৫৫ সালে বিধবা বিবাহের সপক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে ভারতবর্ষে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়। বিধবা বিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ১৮৬৭ সাল নাগাদ ৬০টি বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন। বাল্যবৈধব্যের অন্যতম প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ প্রধানত তাঁর-ই চেষ্টায় রোধ হয় ১৮৭১ সালে। হুমায়ূন আজাদ ঠিক-ই বলেছিলেন, রামমোহন বাংলার মেয়েদের জীবন দান করেছিলেন, কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সমাজ থেকে আরো দু'টি কুপ্রথা বিদায় করতে সচেষ্ট ছিলেন বিদ্যাসাগর যা দূর করতে বেশ কিছু সময় নিয়েছিল। তার একটি বহুবিবাহ যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল আরেকটি কুপ্রথা – আর সেটি হলো বৈবাহিক ব্যাপারে কুলীনপ্রথা পালন।

সতীদাহ প্রথা নিবারণের ফলে বহু অল্পবয়স্কা নারী বিধবা হয়। তাদের অসহায়ত্ব, নিরাপত্তাহীনতা এবং উঠতি বয়সের স্বাভাবিক শারীরিক চাহিদার কারণে পরবর্তি কালে কেউ কেউ পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে, অনেকে সংসারে বা বাড়ির বাইরে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়। গুপ্ত ভ্রূণ হত্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়ের মতোই টের পেলেন অকাট্য যুক্তির জোরে নয়, শাস্ত্রীয় কুসংস্কার দিয়েই এদেশের মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও কর্মধারা পরিচালিত হয়। ফলে সতীদাহ নিবারনের জন্যে রামমোহন যেমন শাস্ত্র থেকেই মালমশলা যোগাড় করে শাস্ত্রকেই ঘায়েল করেছিলেন, বিদ্যাসাগর-ও এক-ই পথ বেছে নিলেন। শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রের সংস্কারকে প্রতিহত করেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মনোসংযোগ করেন বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে। সহমরণের বদলে ব্রম্মাচার্য্য পালনের মধ্য দিয়ে বিধবা নারী যে জীবন ধারণ করে, বিদ্যাসাগর তাকে বলেন মৃতবৎ। এই জীবন যে প্রকৃত বেঁচে থাকা নয়, নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে শুধু প্রাণটা টিকিয়ে রাখা, চিতার আগুনের মতোই প্রতিদিন জ্বলন্ত আগুনে একটু একটু করে পুড়ে মরা, তা তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ তিনি নারীকে দিতে চেয়েছিলেন একটি পরিপূর্ণ জীবন, উপভোগ্য জীবন, নারীর শরীরকে তিনি নারীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত রাখার অধিকার নারীকেই দিতে চেয়েছিলেন বিধবা বিবাহের মাধ্যমে। সেই হিসেবে বিদ্যাসাগর প্রকৃত-ই প্রগতিশীল ও আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন একজন নারীবান্ধব মানুষ বলে নিজেকে প্রমাণ করেন। বিদ্যাসাগর যখন শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করেন, "তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না......দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়" তখন বড় হয়ে ওঠে নারীর শরীর। সেই শরীরের ওপর যার অধিকার নেই তার আর কোন অধিকার-ই স্বীকৃত নয়।

বিধবাদের, বিশেষ করে বাল্য বিধবাদের, সমস্যার সমাধান এনেছিলেন বিদ্যাসাগর বহু শাস্ত্র ঘেঁটে। অবশেষে বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেছিলেন পরাশরের বিধান। এই বিধানে স্বামী মারা গেলে বিধবাদের সামনে তিনটি পথ খোলা থাকেঃ পুনঃবিবাহ, ব্রহ্মচারিত্ব, স্বামী সহগমন বা সতীদাহ। সতীদাহ যেহেতু তখন আইন বহির্ভূত হয়ে গেছে রামমোহনের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে, তিনি বিধবাদের ওপর রামমোহনের মতো ব্রম্মচারীর জীবন চাপিয়ে দেন না। তিনি রামমোহনের মতো কেবল প্রাণ নয়, রক্তমাংসে গড়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মাবুষের মতো জীবন দিতে চেয়েছেন বিধবাদের। ফলে বহু কষ্টে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করিয়ে এইসব বিধবা মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ খুলে দেন তিনি। আর সেটা করলেন তিনি যুক্তি বা আইনের ভয় দেখিয়ে নয়। ধর্মীয় শাস্ত্র ঘেঁটেই প্রমাণ করলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। সেই সময়ে অল্প বয়সে যারা বিধবা হত, তাদের ওপর শ্বশুর বাড়ির, এমন কি নিজের মা-বাবার বাড়ির সদস্যরাও নানা রকম অত্যাচার করত। সেই সঙ্গে আরো বহুভাবে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবশেষে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ হয় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই।

কেবল সমাজ সংস্কারে নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও মানবদরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) অবদান অপরিসীম। তিনিই প্রথম বাংলাকে আধুনিক ও ব্যবহারযোগ্য ভাষা হিসেবে গড়ে তোলেন। তার আগে বাংলা ভাষার ব্যবহার ছিল মধ্যযুগীয়। বাংলাকে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল , শ্রুতিমধুর এবং সংহত করে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার পান্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল ও বহুমুখী কর্মক্ষমতার উৎস ও চালিকাশক্তি ছিল তার মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সকল প্রাণীর কল্যাণকামিতা। তাঁর এই অগাধ মাববিক কর্মকান্ডকে তিনটি ধারায় ভাগ করা চলেঃ ১) সমাজ সংস্কার বিশেষ করে নারীর জীবনের মান উন্নয়ন, ২) শিক্ষার অগ্রগতি ও ৩) ভাষার সংস্কার ও আধুনিকায়ন।

মধ্যযুগীয় রীতি থেকে বের করে নিয়ে এসে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। বিদ্যাসাগর ভাষার ভেতর শৃঙ্খলাবোধ আনেন। পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটাবার জন্য তিনি লেখেন-বর্ণ পরিচয়, বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), আখ্যানমঞ্জরী, বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) ইত্যাদি। গদ্যে শৃঙ্খলা ও বিন্যাস এনে গদ্যকে সাহিত্যের বাহন করে তোলার জন্য লেখেন শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) প্রভৃতি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যে ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও প্রাঞ্জল। তিনি জানতেন সাধারণ মানুষকে কোন বক্তব্য বোঝাবার জন্য সহজ ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন; আর বিদ্যাসাগর সেই দুরূহ কাজটি, অর্থাৎ সহজ ভাষায় গদ্য রচনার মতো প্রয়োজনীয় কাজটি সার্থকভাবে করেছিলেন।

মানবতাধর্মী ও সমাজসংস্কারমূলক কাজ করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, তার কৃত ও পরিকল্পিত কাজের সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সেই সব লেখার মধ্যে রয়েছে- বাল্য বিবাহের দোষ (১৮৫০), বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৫৫), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), রত্ন পরীক্ষা (১৮৮৬)। বাল্য বিবাহের কুফল, বহু বিবাহের কুফল, বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। গল্পের ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রকৃত সত্যকে চমৎকারভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন, 'বিধবা জীবন কেবল দুঃখের ভার এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায় এবং পতিবিয়োগ দুঃখসহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়।' 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষক প্রস্তাব' প্রবন্ধে এক জায়গায় হতাশ ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন, 'যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান ধর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।'

১৮৯৫ সালের ২৯ জুলাই। বিদ্যাসাগরের জন্যে আয়োজিত এক স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে এই মহান ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান যা পরে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ বিদ্যাসাগরের পরোপকার ও পান্ডিত্য নিয়েই কেবল দু'চার কথা বলতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ও কর্মের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন 'আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি। দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ। তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।'

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের অবদান স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

১. 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তিনিই সর্ব প্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটি আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারের কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়া দিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে,

যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।'

২. বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক আড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলোর মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবল সর্বপ্রকার ব্যবহার যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।'

৩. 'বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।'

মানবিক গুণাবলিতে অতুলনীয় বিদ্যাসাগর মানুষে-মানুষে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই বাংলা ভাষার সংস্কার করেন। তাঁর রচনার ভেতর কোন বংশ বা গোত্র বড় হয় না। মানুষ বড় হয় নিজ ব্যক্তিত্বে, নিজ কর্মে, নিজের মূল্যবোধ ও জীবনযাপনে। বহু সংগ্রাম করে, বহু নির্যাতন সহ্য করে, মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে তিনি মানবতার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ তাঁর দুই শত বছর জন্মতিথিতে একথা অনায়াসে বলতে পারি, কালান্তরে স্থায়ীভাবে টিকে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি, 'পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর চেয়ে জোরালো অবস্থান অন্য কোন ভারতীয় পুরুষ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।'

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

প্রবীর বিকাশ সরকার

জাপানে রবীন্দ্রভক্ত কোওরা তোমি (ওয়াদা তোমিকো)

জাপানের নাগানো প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর জায়গা কারুইজাওয়া। সবুজ-নীল পাহাড়ঘেরা শহরটি অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে বিগত ১৫০ বছর ধরেই এদেশের গর্ব। মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২) মার্কিনী ও পশ্চিমা সাহেবরা পাশ্চাত্য শৈলীতে একে গড়ে তোলেন। শতবর্ষ প্রাচীন ভবন, সড়ক, স্কুল, কলেজ, গীর্জা, খেলার মাঠ, বাগান এখনো ছবির মতন আকৃষ্ট করছে দেশ-বিদেশি বহু পর্যটককে সারা বছর ধরে। বৈচিত্র্যময় উপহার সামগ্রী বিক্রয়ের বাজারও দেখার মতন এখানে। জাপানি ধনী ব্যক্তিদের অনেক গ্রীষ্মাবাস এখানে গড়ে উঠেছে গত কয়েক দশকে। জাপান একটি দ্বীপ হলেও কারুইজাওয়ার পাশে কোনো সাগর নেই। তবে রয়েছে গর্ভধারী আগ্নেয়গিরি আসামা মাউন্টেন। মাঝে মাঝে ভূকম্পন হলে পরে জ্বালামুখ থেকে লাল-কমলামিশ্রিত আগুনের ফুলকি সশব্দে বেরিয়ে আসে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ১৯১৬ সালে প্রথম জাপান ভ্রমণ করেন তখন এখানে প্রায় ১০ দিন অবস্থান করেছিলেন। এদেশে প্রথম 'মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ নারুসে জিনজোও তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কারুইজাওয়া শহরে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি আবাসিক প্রকল্পে বক্তৃতা দেবার জন্য। নারুসে ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এবং আমেরিকায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রাচ্যাদর্শ ছিল তাঁর কাছে গভীর আরাধ্যের বিষয়। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কবিগুরু তাঁর আহবানে সানন্দে সাড়া দিয়েছিলেন।

নোবেলবিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জাপানে আগমন করেছেন এই সংবাদ তো ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে গণমাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে জড়ো হয়েছিলেন ছাত্রীরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। ছাত্রী ওয়াদা তোমিকোও তাদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এখানে দুজনের পরিচয় হয়নি। একজন বক্তা, অন্যজন শ্রোতাই থেকেছেন। ওয়াদা তোমিকো তথা কোওরা তোমির ভাষ্য থেকে জানা যায় কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে নাগানো-প্রদেশের কারুইজাওয়া উপশহরে। এই প্রসঙ্গ তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় একাধিকবার লিখেছেন। যেমন, 'হিছেন অ ইকিরু : কোওরা তোমি জিদেন' বা 'যুদ্ধবিহীন বাঁচা : কোওরা তোমি জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ' উপঅধ্যায়ে 'জীবৎকালের শিক্ষক' শিরোনামযুক্ত স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

"টেগোর মহাশয় নারুসে স্যারের আমন্ত্রণে জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা প্রদান করতে আসেন। মিলনায়তনভর্তি আমাদের ছাত্রীদের উদ্দেশে স্বরচিতা কবিতা আবৃত্তি করেছেন খুব চমৎকার কণ্ঠে; নিখাদ থেকে উচ্চখাদ পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠ যেন ঘণ্টাধ্বনির মতোই বারংবার মনে হয়েছে। আমাদের ছাত্রীদের হাতে তৈরি খাবার গ্রহণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এখনো স্মরণে আছে।

প্রতিবছর, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন আত্মোন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হত নাগানো-প্রদেশের কারুইজাওয়া সানছেনরিয়োও ছাত্রীনিবাসে। সেখানেই নারুসে স্যারের আমন্ত্রণে টেগোর মহাশয় আসছেন জানতে পেরে আমি সানন্দে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। এই সময় আমি ঋষিকবি টোগোরের সঙ্গে সকাল ও সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গে অবস্থান করে গভীরভাবে প্রভাবিত হই। সি এফ অ্যান্ড্রুজ এবং পিয়ারসনের সঙ্গে তিনি সানছেনরিয়োওর অন্য একটি গৃহে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে পশ্চিমদিকে অবস্থিত আসামা পর্বতের বিশালাকৃতি পটভূমির মধ্যবর্তী উঁচুস্থানে অশ্বত্থসদৃশ মেদবহুল বৃক্ষের শাখাছড়ানো বিশাল আকৃতি অবলোকন করা যেত। যাতে এই দৃশ্য আরও সুস্পষ্টভাবে অবলোকন করা যায় তার জন্য উঁচুস্থানে কাঠ দিয়ে একটি মঞ্চবেদি নির্মাণ করা হয়েছিল। তাতে বসে সকাল ও সন্ধ্যেবেলা তিনি ধ্যানে মগ্ন হতেন। আমরা টেগোর মহাশয়ের ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলাম বলে প্রতিদিন দেখা তাঁর ধ্যানমগ্ন মূর্তি সত্যিই মনে গভীর ছাপ ফেলত। সূর্যাস্ত আসামা পর্বতের ধুম্রজালকে লাল রঙে রাঙিয়ে কবির দীর্ঘ চুল আর পদ্মাসনকে গোলাপি রঙে রাঙালে পরে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতেন। আমরা সেই মহিমাময় প্রতিমূর্তি নিঃশ্বাস ভুলে গিয়ে দেখতাম।

তিনি এই আসামার পার্বত্য প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। পাহাড়ের উঁচু-উঁচু চূড়ায় সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়েছেন এবং সেই ধ্যানের ভেতর থেকে অসংখ্য সুন্দর কবিতার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর কোলের ওপর রাখা খাতায় কলম দিয়ে 'উদভ্রান্ত পাখি', 'জোনাকি' প্রভৃতি কবিতা একটার পর একটা লিখেছেন। প্রতিদিন সকালবেলা কুয়াশায় ঝিলমিলানো বুনোফুল দিয়ে সজ্জিত আমাদের ছাত্রীনিবাসের টেবিলে এসে প্রাতভোজ গ্রহণকালে তিনি সদ্যজন্মলব্ধ মণিমুক্তোসম বাংলা ভাষার কবিতাগুলো নিশ্চিতভাবে আমাদের ছাত্রীদেরকে সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাতেন।[৭]"

সেই যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিষ্কাম প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন মাত্র ১৮ বছরের তরুণী ওয়াদা তোমিকো, বিবাহোত্তর মাদাম কোওরা তোমি, তিরোধান অবধি ক্রমাগত গভীর-গাঢ়ই হয়েছে সেই অনুরাগ, ভালোবাসা ও ভক্তি। তোমিকো হয়ে উঠলেন গুরুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। এরকম নারী ভক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুণমুগ্ধ বিদেশি নারী ভক্তদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন বলে বাস্তবিকই জানা নেই। কানাগাওয়া প্রদেশে নিজের বাড়ির নাম পর্যন্ত রেখেছিলেন 'শান্তিনিকেতন'। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবনের কিউরেটর ক্ষীতিশ রায় কর্তৃক কোওরা

তোমিকোকে লিখিত একটি অ্যারোগ্রাম থেকে। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে তিনি ১৯১৭ সালে আমেরিকায় যান উচ্চশিক্ষার্থে। ১৯১৮ সালে ২২ বছর বয়সে বিখ্যাত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১৯ সালে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯২০ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নাড কলেজ থেকে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর মেরিল্যান্ড প্রদেশের বাল্টিমোর শহরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগে ক্ষুধা বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। তখন তিনি ২৪। এই সালেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হয় আমেরিকার নিউইয়র্কে। এই প্রসঙ্গে কোওরা তোমির ঘনিষ্ঠজন ও সহকর্মী রবীন্দ্রগবেষক কাজুও আজুমা লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোওরার সাক্ষাৎ ঘটেছিল মোট ছ'বার। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকা যান, কোওরা তখন সেখানকার পিএইচডি-র ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন খবর পেয়েই তিনি ছুটে যান তাঁর কাছে। গুরুদেব অতিব্যস্ততার মধ্যেও কোওরাকে অনেক সময় দেন। তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোওরার ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও অনেক বেড়ে যায়। এটা ছিল দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার।"[৮]

১৯২২ সালে কোওরা তোমি জন্স হপকিন্স থেকে Experimental Study of Hunger in its Relation to Activities বিষয়ে ডক্টর অব ফিলোসফি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং স্বদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে কিউশুউ ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অনুষদের মনোচিকিৎসা গবেষণাকেন্দ্রে গবেষণা সহযোগী হিসেবে যোগ দেন। এই বছরের গ্রীষ্মকালে আমেরিকার বিখ্যাত বন্দোবস্ত-বিশেষজ্ঞ, সমাজ সংস্কারক, সমাজকর্মী, সমাজতত্ত্ববিদ, জনপ্রশাসক, গ্রন্থকার এবং নারীনেত্রী নোবেলবিজয়ী জেইন অ্যাডামস জাপানে এলে পরে তাঁর দোভাষী হন। এবং তাঁরই প্রভাব গ্রহণ করে পরবর্তীকালে সমাজসেবা ও নারী অধিকার আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। লিখতে শুরু করেন নারীমুক্তি বিষয়ে, নারীমুক্তি আন্দোলনেও সক্রিয় হতে শুরু করেন। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও রচনাবলি পাঠ করে শান্তি ও সাম্যবাদী চিন্তার দিকে ঝুঁকে পড়েন। অবশ্য ১৯১৬ সালেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার পর তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৬১ সালে ইংরেজিতে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যান্ড জাপান' নামক প্রবন্ধে তাঁর স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য, তিনি লিখেছেন, "তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) চিন্তার দ্বারা অভূতপূর্ব প্রভাবিত আমি নিজের জীবনকে সর্বজনীন শান্তির জন্য উৎসর্গ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৯২০ সালে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ জার্মানি থেকে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক সংবাদ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, আমি উপশহরের এক হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাদের কারুইজাওয়ার স্মৃতি নিয়ে আরেকবার কথাবার্তা বলি। সে কথা রবীন্দ্রনাথও অবশ্য পরবর্তীকালে বলেছেন। ১৯২৪ সালে তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন নির্ধারিত ছিল। প্রত্যাশা অনুযায়ী জাপান তাঁকে আহ্বান করবে কি করবে না সেটা

বিবেচনা না করেই আমি আসাহিশিম্বুন (সংবাদপত্র) প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে দুঃসাহসের সঙ্গে তারবার্তা মাধ্যমে তাঁকে জাপানে আমন্ত্রণ জানাই।”[৯]

সেই বছরই ওসাকা মহানগরে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রথম দোভাষী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মঞ্চে। এরপর আরও একাধিক সভার দোভাষী হিসেবে গুরুদেবের পাশেই ছিলেন। এতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আত্মিক টান কতখানি প্রবল ও গভীর ছিল। দোভাষী এবং ভ্রমণ পরিকল্পনাকারী হিসেবে কবির সেবাযত্ন সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। এমন-ই এক সময় তিনি গুরুদেবকে জাপানে আমন্ত্রণ জানান যখন তিনি আমেরিকার শিক্ষাজীবন শেষ করে ফিরেছেন মাত্র। কবির প্রত্যাশা মেটানোর মতো আত্মবিশ্বাসে তিনি তখন টুইটুম্বুর। মাত্র ২৮ বছর বয়সী তখন। কবির সঙ্গী ছিলেন ড.কালিদাস নাগ, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু এবং মার্কিন নাগরিক লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট। এছাড়া আরও দুজন চীনা ইতিহাসবিদ। মে মাসের ৫ তারিখ চীনের রাজধানী পিকিং-এ জন্মদিন উদযাপন এবং ৪টি বক্তৃতা দিয়ে ২০ তারিখ যাত্রা করে ৩১ শে মে তারিখে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে পৌঁছান। কবির দলকে বন্দরে অভ্যর্থনা জানান ওয়াদা তোমিকোসহ অন্যান্য ঘনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ। নাগাসাকির উনজেন নামক পাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্রের এক হোটেলে অবস্থান করেন অতিথিদের নিয়ে। এখানে পরবর্তীকালে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে। এই তৃতীয়বার ভ্রমণের সময় ফুকুওকা, শিমোসেকি, কোবে, ওসাকা, নারা, কিয়োতো নগরসমূহ ভ্রমণ শেষে টোকিওতে আসেন ৭ জুন তারিখে। টোকিও রেল স্টেশনে কবিগুরুকে এক মহাঅভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক জায়গায় বক্তৃতা প্রদান, জাপানের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে মুগ্ধতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির অনুকরণ ও অনুসরণেরও তীব্র সমালোচনা করেন কবিগুরু। ফলে জাপানি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বেশ উষ্মা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই ভ্রমণের সময় তিনি জাপানে আশ্রিত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হন। জুন মাসের ১১ তারিখ কোবে সমুদ্র বন্দর থেকে ভারতের দিকে ফিরতিযাত্রা করেন। তাঁকে বিদায় জানান ওয়াদা তোমিকোসহ ভক্তবৃন্দ। এই ১২টি দিন ওয়াদা তোমিকে কবির দল নিয়ে বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরও তিনি একই প্রবন্ধে লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনকে কতখানি শক্তিশালী করেছেন, তাঁর জাপান ভ্রমণ এবং বক্তৃতাদ্বারা জাপানিরা কতখানি প্রভাবিত হয়েছেন, আবার তিনি হৃদয় খুলে জাপানিদের চিন্তা, অনুভব, কারিগরি এবং রীতিনীতি কতখানি গ্রহণ করেছেন-আমি এইসব বিষয় স্পর্শ করে যেতে চাই।”[১০]

গুরুদেব চলে যাওয়ার পর একটা অব্যক্ত শূন্যতা যে তিনি অনুভব করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। স্মৃতিকাতরতা থেকেই জুলাই মাসের ১১ এবং ১৮ তারিখে পরপর দুটি নিবন্ধ লেখেন কবিগুরুর সঙ্গে কারুইজাওয়াতে কাটানো সময়ের স্মৃতি নিয়ে জনপ্রিয় ‘কাতেইশুউহোও’ ম্যাগাজিনে। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বৃহদাকার উপন্যাস ‘গোরা’র জাপানি অনুবাদ নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ মতামত লেখেন একই ম্যাগাজিনে মার্চ

মাসের ২২ তারিখে। তাতে অনুবাদক একদা শান্তিনিকেতনে জুডো ও ক্রীড়া শিক্ষাদানকারী ক্রীড়াবিদ সানো জিননোসুকের প্রশংসা করেন।

শিক্ষাপ্রাঙ্গনের বটজাতীয় বিশাল বৃক্ষরাজির তলে সকাল-বিকাল যেমন বক্তৃতা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি ধ্যানও করেছেন। জায়গাটি তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেছিলেন। প্রশান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতি তাঁকে পশমি আঁচল দিয়ে যেভাবে জড়িয়ে নিয়েছিল তা তিনি ভুলতে পারেননি। মৃত্যুর বছর ছয় পূর্বে আরেকবার এখানে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর পরম ভক্ত মাদাম কোওরা তোমির কাছে ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে। তোমি শান্তিনিকেতনে দুবার গিয়েছিলেন যথাক্রমে গুরুদেবের জীবদ্দশায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার সময় ১৯৪৯ সালে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করেন। এছাড়া, ১৯৬১ সালেও ভারতে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তিনি অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্শকী জাপানে খুব-ই জাঁকজমকরে সঙ্গে সকল বড়বড় শহরে পালিত হয়। অনুষ্ঠান পরকিল্পনা ও আয়োজনের জন্যে জাতীয় কমিটি গঠিত হয় ১৯৫৭ সালেই। এই কর্মযজ্ঞে অতি উৎসাহী অংশগ্রহণকারী ও অন্যতম সংগঠক ছিলেন মাদাম কোওরা তোমি।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তিনি কখনোই বিস্মৃত হতে পারেননি। কারুইজাওয়াতে কবিগুরু প্রতিদিন নিভৃতে বসে কবিতা, গান লিখে ছাত্রীদেরকে শুনিয়েছেন। ছাত্রীরা ঋষি-কবিকে দেবতাজ্ঞানে সেবাযত্ন করেছে। মেয়েদের সুবিনীত ব্যবহার আর সুচারু সৌন্দর্যের মায়ায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন, ফলে বিদায়ের দিন তারা যেমন অশ্রুসিক্ত হয়েছেন, তেমনি কবিগুরুও। মাদাম কোওরা তোমির লিখিত জীবনবৃত্তান্তে এইসব স্মৃতিময় ঘটনার কথা জানা যায়।

এই কারুইজাওয়াতে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালীন কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম দৃষ্টিবিনিময় তারপর ঘনিষ্ঠতা এবং আমৃত্যু আরাধনা। গুরুদেবের ১২০তম জন্মবর্ষ স্মরণে বার্ধক্যে এসে আসামা মাউন্টেনের সবুজ পাদদেশে রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জের স্মারক ভাস্কর্য স্থাপন করেন ১৯৮১ সালে, তখন তাঁর বয়স ৮৫। ভাস্কর্যটির নাম 'জিনরুই ফুছেন' বা 'যুদ্ধহীন মানবজাতি'। এরকম ঘটনা বিশ্বের আর কোনো দেশে রবীন্দ্রনাথের কোনো নারীভক্ত ঘটিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই ভাস্কর্য স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীরা মিলে চাঁদা তুলে সেই চাঁদার অর্থে আমি ভারত-জাপান টেগোর সংস্থার সভানেত্রী হিসেবে এই ভাস্কর্যটি স্থাপন করেছি। এই ভাস্কর্যের বুকে 'জিনরুই ফুছেন' বর্ণমালা খোদিত আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনভর অহিংস পৃথিবীর জন্য আবেদন করে গেছেন। এখন আমাদের উচিত তাঁর কথাকে আঁকড়ে ধরা। মানুষ হত্যা করে অর্থলাভ করা, ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টায় অগণিত লোককে রোধ করা সহজ নয়। অর্থলিপ্সা, ক্ষমতার লোভ মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে গভীর শেকড় ছড়ানো এক অশুভশক্তি। এই শক্তি কে বা কারা সেটা বলার চেয়ে সমস্ত মানবজাতি মিলে এই অশুভশক্তিকে রোধ না করলে নয়।

অহিংসার লড়াই রাজনীতির ক্ষেত্র, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন জীবন বাজি ধরেই লড়াই করতে হয়। এই লড়াই সমস্ত মানবজাতির লড়াই।"[১১]

জীবনভর মাদাম কোওরা তোমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রচুর রচনা, স্মৃতিকথা লিখে রেখে গেছেন, রবীন্দ্রকবিতা ও প্রবন্ধের অনুবাদ করে গেছেন। এমনটি কবিগুরুর বাঙালি কোনো নারী ভক্তও করেননি। তাঁর রচিত অতিক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ 'শিসেই তাগো-রু তো কারুইজাওয়া' তথা 'ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ এবং কারুইজাওয়া', তাতে কবিগুরুর প্রতি তাঁর প্রথম দেখার মধুরতম অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্র অনুবাদের মধ্যে, 'শিনৎসুকি গিতানজোরি' বা 'নতুন চাঁদ গীতাঞ্জলি' (১৯৬২), 'শি তো জিনসে তাগো-রু' বা 'কবিতা ও জীবন : রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৭) ও 'ইউকান তেৎসুগাকু' বা 'ফিলোসফি অব লেইজার' (১৯২৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৯১৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার এবং স্মৃতিকথার সংখ্যা অনেক। আবার, একাধিকবার তাঁর বক্তৃতাসমূহেও রবীন্দ্রনাথের নাম ও বাণী উচ্চারিত হয়েছে গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে। ১৯৯৩ সালে ৯৬ বছর বয়সে এই মহীয়সী জাপানি রবীন্দ্রনারীভক্তের জীবনাবসান ঘটে।

১৯২৭ সালে ওয়াদা তোমিকো ৩১ বছর বয়সে তাঁর মাতৃশিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। নারীমুক্তি আন্দোলন, শিশুশিক্ষাসহ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে পত্রত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ, নিবন্ধ, মতামত লিখতে থাকেন। দু'বছর পর ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াদা তোমিকো চিকিৎসক কোওরা তাকেহিসার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কোওরা তোমি নামে পরিচিত হন। ঠিক সেই বছরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটি তারবার্তা পান। যদিও তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্ররে যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাদাম কোওরা তোমির গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে গুরুদবে রচিত দুটি ইংরেজি ছত্র কী অসামান্য কাব্যিকরূপে ধরা পড়েছে তা ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য।

১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে জাপানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে লিখে উপহার দিয়েছিলেন যে চিরঞ্জীব দুটি ছত্র তা নিম্নরূপ:

> It is not a bower made white with the bunches of Jasmine
> It is waves swiging with the turbulent foam.
>
> অর্থাৎ,
>
> এ যে শুভ্র রঙে রঞ্জিত জুঁইফুলের কোনো নিকুঞ্জ নয়
> এ যে দুরন্ত সফেন দোদুল্যমান তরঙ্গ।

তথ্যসূত্র:

১ ইনদো নো শিজিন / কোকুগি শিরোও, ২০০৬, ভূমিকা
২ রবীন্দ্ররচনাবলী, উনবিংশ খÐ, ৩৪২ পৃষ্ঠা
৩ টেগোর মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন বুলেটিন 'সাচিয়া' ২য় সংখ্যা, ১লা আগস্ট, ১৯৫৯
৪ রবীন্দ্রনাথের টুকরো লেখা / কাজুও আজুমা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৯-২০

৫ জাপান ও রবীন্দ্রনাথ :শতবর্ষের বিনিময়, কাজুও আজুমা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫৮
৬ গেইজুৎসু নো পাতোরোন /ইয়াশিরো য়ুকিও, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১০৬-৭
৭ হিছেন অ ইকিরু :কোওরা তোমি জিদেন / ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪
৮ জাপান ও রবীন্দ্রনাথ :শতবর্ষের বিনিময় / কাজুও আজুমা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫৪
৯ কোওরা তোমি নো সেই তো চোওসাকু, দাই নানা কান, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৪৬
১০ ঐ পৃষ্ঠা ১৪৭
১১ হিছেন অ ইকিরু :কোওরা তোমি জিদেন / ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৮১

জাপান

ফারহানা আহমেদ

গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের কাছে

হঠাৎ করে ছুটি পেয়ে গেলাম এক সাথে আমি আর বাচ্চারা। ১০ দিন। অনেক সময় ব্যস্ত জীবনে। ঠিক হোল চলে যাব কোরাল রিফ দেখতে। স্যান ডিয়াগো থেক ১০ ঘন্টা প্লেন জার্নি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি পর্যন্ত। ২৪ ঘন্টা ডিউটি করেও প্লেনে উঠে দেখেছি ঘুম আসেনা। যাক উদাস নয়নে মুভি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম সিডনি। নেমেই দেখি ঝকঝকে রোদ চারিদিকে। খালাত ভাই রিসিভ করতে এসেছিল, বলে দিল ‘ আপু সানস্ক্রিন এনেছো তো? নয়তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে রোদে ’ রেন্ট এ কার থেকে গাড়ী নিয়ে ছাই হয়ে যাওয়া এড়াতে প্রথমেই কিনে ফেল্লাম সান স্ক্রিন। কয়েকটা দিন সিডনিতে স্বপ্নের মত কেটে গেল। সে স্মৃতি অন্য আরেকদিনের জন্য তোলা থাক।

সিডনি থেকে প্লেনে করে নামলাম কেন্জ সিটিতে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু ভিজিয়ে দিচ্ছে না। কাজিনের বাসায় গেলাম আমরা। বিকালে বাসার কাছেই ওয়ালাবি (ছোট ক্যাঙ্গারুর মত) ফার্ম দেখতে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম। ছোট ছোট দলে ঘুরছে, মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে দেখছে চলমান গাড়ীর লাইট। আড্ডা শেষে ঘুমিয়ে উঠে সকালে পৌঁছে গেলাম লেগুনে। টিকেট কাটা ছিল আগেই। উঠে গেলাম জাহাজে। একটু একটু ভয় ছিল মোশান সিকনেস আছে কিন্তু প্রকৃতির তৈরি সপ্ত আশ্চর্যের একটি দেখার উত্তেজনায় কোন কিছুই টের পাইনি যেন। দোতলা জাহাজের উপরের তলাটা চাইনিজ ভাষা ভাষীদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তাল গানের শব্দে একটু উঁকি দিয়ে এলাম। বেশির ভাগই রংচং এ কাপড় পরা বুড়োবুড়ি। গানের তালে তালে নাচছে।

এরমধ্যে লান্চ সেরে নিলাম বারিটো দিয়ে। ছিমছাম খাবার, তারপর চা আর কুলহীন সাগরে তাকিয়ে গন্তব্যের অপেক্ষা।

ঘন্টা চার পরে পৌঁছালাম গ্রের্ট ব্যারিয়ার রিফে। নীচে উঁকি দিয়ে পানিতে রকমারি মাছের সমারোহ দেখলাম। বাচ্চাদের নিয়ে গ্লাস বোট (নৌকার তলাটা কাঁচের) এ উঠলাম একটু পরে। নীচে নীল সাদা সবুজ কোরাল আর তার মাঝে মাছ দের নানা রং এর সমারোহ। জাহাজে ফিরে স্কুবা ডাইভিং করব চিন্তা করেও বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে বাদ দিলাম। স্নরকেলিং করব আমরা। সাগরের একটু গভীরে গেলেই অনেক বেশি সুন্দর সবকিছু শুনেছি। ড্রেস চেন্জ করে মা কন্যা আর পুত্র রেডি হলাম। আমাদের গাইড টিউব টেনে নিয়ে যাবেন, বার জন মোট, স্নরকেলিং করব। শুরু হোল

সে স্বপ্নের যাত্রা, একটু পর পর কাছিম , স্টার ফিস , হলুদ কমলা লাল সব মাছের দেখা আর মনকাড়া বর্ননা , তারপর সবুজ নীল সাদা কোরাল। মনে হচ্ছিল একটু নামলেই ছুঁতে পারব। কি অপূর্ব, কি অপূর্ব। গান বেজে চলেছে মনে মনে ‘ ভাবি শুধু এখানেই থাকব, দূরে যেতে মন নাহি চাইছে’ আমিতো স্বপ্নে এতদিন এই অজানাতেই আসতে চেয়েছি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল আমাদের। আবহাওয়া খারাপ থাকলে অনেক সময় নাকি জাহাজ আসেনা।

বোটে ফিরে শাওয়ার নিয়ে ফেরার অপেক্ষা। চা খুঁজে নিলাম , ঘন্টা খানেক পরে আবার তীর মুখি যাত্রা জাহাজের। যেতে যেতে রাত নামল, আকাশে পূর্নিমার চাঁদ। পানিতে খেলা করছে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য। বাসায় ফিরে আড্ডা আর ডিনার খেয়ে ঘুমাতে গেলাম। পরদিন একবেলা দেখব এ্যাবোরিজিন পল্লী আর একবেলা ছোট্ট জু। কোয়ালার দেশে এসে কোয়ালা না দেখে কি আর ফিরে যাওয়া যায়?

সকালে গেলাম এ্যবোরিজিন পল্লী জ্যাবেগাই এ। ঢুকে দেখলাম মাটির নীচে বিশাল চুলায় ক্যাঙ্গারু বারবিকিউ হচ্ছে। সেই সাথে আদিবাসিদের সাজ পোশাকে বহু বছর আগে কিভাবে বারবিকিউ হোত তার বর্ননা । বাচ্চারা একটু খেয়ে দেখল কেমন টেস্ট। ভিতরে গিয়ে দেখি আদিবাসী মহিলার সাজে হার্বাল ফল মুল লতা পাতা সাজিয়ে কোনটার কি গুন বর্ননা করছেন একজন। মাঝে মাঝে একটু চেখে দেখতে দিচ্ছেন। এরপর গেলাম বল্লম ছুঁড়ে শিকার করার ট্রেনিং সেশনে, শেষে বুমেরাং ছোঁড়া শিখতে। এত রকম বুমেরাং যে আছে সেটাতো জানতাম না। কোন কোন টা পাখীকে আহত করে নামানোর জন্য আবার কোনটা শিকারী পাখিকে মেরে ফেলার জন্য। আমার ছোঁড়া বুমেরাং কোন পাখীর নাগাল পায়নি ভাগ্যিস। তারপর কিনলাম পাখীকে আহত করার বুমেরাং, যেন বাসায় এসে একটা স্মৃতি চিহ্ন হওয়া ছাড়া এটার আরও কোন কাজ আছে।

বিকালে ছোট জু তে গেলাম কোয়ালা দেখতে। ওরা বল্ল সাপ ও ধরে দেখা যাবে । শুনেই চিৎকার করলাম বাংলায়’ আমার মাথায় কি সিট আছে সাপ ধরব?’ ছেলে মেয়ে বুঝিয়ে বল্ল তাদের মা সাপ ধরবে না, ওরা ধরবে। নিয়ে এলো কোয়ালা ওরা। এত শান্ত লক্ষী কোয়ালা, কোলে নিয়ে অনেকক্ষন বসে রইলাম। পরদিন বিকালে ফ্লাইট। দুপুরে ফিস এন্ড চিপস খেয়ে গেলাম পাহাড়ের উপরে বাঁধ দেখতে। চিকন আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আঘাঘন্টা ড্রাইভ করে খালাতো ভাই নিয়ে গেলেন উপরে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। এটা নাকি সব সময়ের আবহাওয়া এখানে। মানুষের তৈরি বাঁধের সাথে বন আর প্রকৃতি মিলে ভাষার অতীত সৌন্দর্য্য তার।

ফিরতি পথে ভাবি দিলেন এ্যবরেজিনদের আর্ট। শত কাজের মাঝেও ভাই ভাবির তুলনাহীন আতিথেয়তার আনন্দ নিয়ে রওনা দিলাম সিডনির পথে

স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

ফাহমিদা ফেরদৌসী
রুবাইয়া শরমিন
রেজওয়ানা সিলভি

সবার জন্য লাইব্রেরি

ছোটবেলার কথা মনে করলেই মনে পড়ে যায় অলস দুপুরে একলা সোফায় বসে বই পড়া। আমার নিজস্ব ছোট্ট বইয়ের জগত, বাস্তবতার বেড়া এড়িয়ে অন্য কোথাও। রবি ঠাকুর, শরতচন্দ্র, সত্যজিৎ আর নতুন প্রবীণ অনেক লেখকের লেখার সাথে অভিযান।

আমাদের বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত পরিবারে। টাকার প্রাচুর্য ছিল না কোন কালেই। তারপরও মা কিভাবে জানি প্রতি মাসে নতুন বই কেনার জন্য টাকা জমিয়ে ফেলতেন। আর ছিল বন্ধুদের সাথে আর পাড়ার বড় ভাই বোনদের সাথে বইয়ের অদল বদল। কখনো প্রিয় বইটি পড়তে দেবার জন্য অনেক দেন দরবার, পায়ে ধরা।

লাইব্রেরির ধারণাটা লেখনীতে থাকলেও বাস্তবে এর দেখা মেলা কঠিন ছিল। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে মফস্বল শহরগুলোতে। একুশের বইমেলা আর নীলক্ষেত ছাড়া হরেক রকম বই নেড়ে চেড়ে দেখার সুযোগ নাই বললেই চলে। এর উপর ছিল পড়ার বাইরের বই নিয়ে অভিভাবকদের আপত্তি।

অনেক দশক পার হয়ে গেছে। প্রযুক্তির সাথে সাথে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এসেছে আমাদের প্রতিদিনের সময়ে ভাগ বসাতে। শুধু লাইব্রেরির অভাবটাই চিরন্তন রয়ে গেছে। অনেক অনেক বইয়ের মাঝে হারিয়ে যাবার যে অপার আনন্দ তা থেকে আমাদের পাঠকরা আজো বঞ্চিত। লাইব্রেরির আরেকটি বিশাল সুবিধা যে সে অর্থনৈতিক সামর্থ্য নির্বিশেষে মানুষের হাতে বই তুলে দেয়। লাইব্রেরির বৈচিত্র্যমূলক বইয়ের তালিকায় পাঠক নিজের চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে অন্য ধরনের লেখার সংস্পর্শে আসেন, তার চিন্তার পরিধি বাড়ে। বিশেষ করে শিশু কিশোরদের মানসিক বিকাশে লাইব্রেরির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে আর দেশের বাইরে আমাদের মধ্যে যারা পাঠক আর সাহিত্যানুরাগী আছেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে যার যার জায়গায় থেকে যতখানি সম্ভব লাইব্রেরির আনন্দটা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া। আমাদের বাসার বইগুলো বিল্ডিং এর অন্যদের সাথে অদল বদল করা যায়। বাসার ছাদে একটা অদল বদল বাক্স করা যায় যেখান থেকে যে কেউ একটা বই দিয়ে আরেকটা বই নিতে পারবে। বাচ্চাদের নিয়ে বই পড়ার ক্লাব করা যায় যেখানে সবাই বই অদল বদল করবে। প্রতিটা স্কুলে অনলাইন

লাইব্রেরি করা যায়। পড়ার আনন্দ ছড়িয়ে যাক সবার মাঝে। সবার জন্য মুক্ত হোক লাইব্রেরি।

বাচ্চাদের স্কুলগুলোতে লাইব্রেরি গড়ে তোলা ভীষণ জরুরি। এর জন্য খুব বেশি টাকার দরকার নেই কিন্তু। স্কুলের প্রতিটি বাচ্চা যদি প্রতি বছর একটি করে গল্পের বই স্কুল লাইব্রেরিতে দেয় তাহলেই কিন্তু অনেক বই হয়ে যায়। এতে করে বাচ্চারা লাইব্রেরির সাথে একাত্ম হবে, আরো আগ্রহ দেখাবে।

একই ভাবে বলা যায় ইবই আর অডিও বইয়ের লাইব্রেরির কথা। আমরা অনেকেই বাচ্চাদেরকে ফোনে গেম খেলতে দেই, ভিডিও দেখতে দেই। এর পাশাপাশি যদি ইবই পড়া শেখাই আর অডিও বই শুনতে দেই সেটাও কিন্তু বাচ্চাদের পড়ার অভ্যাস তৈরিতে সাহায্য করে। যেসব স্কুলে কাগজের বইয়ের লাইব্রেরি করার জায়গা নেই সেখানে একটা ট্যাবলেট বা কম্পিউটার রাখা যায় ডিজিটাল লাইব্রেরি হিসেবে। বয়স উপযোগী বিভিন্ন বই বাচ্চারা সেখান থেকে পড়তে পারে অথবা লাইব্রেরি পিরিয়ডে পুরো ক্লাস একসাথে অডিও বই শুনতে পারে। তারপর বইটা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

অডিও বই এর আরো কিছু দারুণ উপকারী দিক আছে। বয়স্ক মানুষ, যাদের বই পড়তে কষ্ট হয়, তারা অনেক সহজেই অডিও বই শুনে পড়ার বাধা দূর করতে পারেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা আছে এমন যে কারো জন্য তো অডিও বই অনেক অজানা জগতের দুয়ার খুলে দেয়।

আমরা যারা সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, বই নিয়ে বসার সময় করে উঠতে পারি না, তাদের জন্যও অডিও বই একটা ভাল মাধ্যম। কাজ করতে করতে বা রাস্তায় কোথাও যাবার সময় আমরা সহজেই অডিও বই শুনে নিতে পারি। কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে বই পড়ার যে মজা সেটা বই শুনে পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য বলব বই শোনাটাও কম আনন্দদায়ক নয়। লেখকের লেখনীর যাদুর সাথে গল্পকথকের কণ্ঠের কারুকার্য একটি বইকে অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

তাই আসুন লাইব্রেরি গড়ি। সেটা কাগজের বইয়ের হোক, ইবইয়ের হোক, বা অডিও বইয়ের। নতুন পাঠক তৈরিতে লাইব্রেরির কোন বিকল্প নেই। বই যত বেশি সহজলভ্য হবে মানুষ তত বেশি বই পড়তে আগ্রহী হবে। পাঠক যত বাড়বে, লেখকের সংখ্যা আর লেখার মান দুটোই ভাল হতে থাকবে। আমাদের ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। সমাজকে, দেশকে ভালবাসার আর ভাল রাখার প্রত্যয় দৃঢ় হবে।

বিজন সাহা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

গতকাল বাসায় ফিরে দেখি দীপেন দা'র মেসেজ।

বিজন একটা অনলাইন সাহিত্য সম্মেলন হবে অক্টোবরে তাতে একটা অনলাইন পত্রিকা বের হবে। তুমি কি একটা বিজ্ঞান প্রবন্ধ দিতে পারবে এক দুদিনের মধ্যে? দুই হাজার শব্দ। তোমার বইয়ের একটা অংশ বা ওখান থেকে এডিট করে পাঠালেই হবে।

অনেকটা অপ্রস্তুত হয়েই উত্তর দিলাম, দেখি।

কিন্তু কী লেখা, কাদের জন্য লেখা? আমার বই আকাশ ভরা সূর্য তারা কসমোলজির সেকাল একাল মূলত স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের জন্য, তাদের মধ্যে সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রতি আর বিশেষভাবে কসমোলজির প্রতি আগ্রহ গড়ে তুলতে। ওখান থেকে একটা অংশও তুলে দেওয়া যায়। তবে আমি সব সময় চেষ্টা করি নতুন কিছু লিখতে অথবা পুরনো কথাগুলো নতুনভাবে বলতে। তাই এ লেখাটি হবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান গবেষণার কিছু ব্যাপার নিয়ে কথা বলা।

ফিজিক্সের প্রতি আগ্রহ যতদিন নিজেকে জানি ততদিন থেকেই, তবে কসমোলজির প্রতি আগ্রহ আগে তেমন ছিল না। স্কুলে পড়ার সময় সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে ব্ল্যাক হোলের কথা পড়ে শিহরিত হতাম, কিন্তু এ নিয়ে কাজ করার কথা কখনো ভাবিনি। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন এ কারণেই যে এ লেখার শুরু দীপেন ভট্টাচার্যের ডাক থেকেই। আমাদের দুজনের পড়াশুনা মস্কোয়। উনি পড়তেন মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে, আমি গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে আমি যখন শুরু করি, উনি মস্কোর পাট চুকিয়ে চলে যাওয়ার পথে। ছাত্রজীবনে আমরা বিভিন্ন পাঠ চক্রের আয়োজন করতাম। ওই সময় উনি ক্রিমিয়া থেকে ফিরেছেন প্র্যাক্টিক্যাল শেষে। মিখলুকো মাখালায়া আমাদের হোস্টেলের ১ নম্বর ব্লকের ২০১ নম্বর ঘরে অ্যাস্ট্রোনমির উপর একটা সেমিনার দিতে এলেন। বিভিন্ন স্লাইড দেখাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে কথা ওঠে ১০ সূচক ৪২, অর্থাৎ ১-এর পরে ৪২টা শূন্য ও দশ সূচক ৪০, অর্থাৎ ১-এর পরে ৪০টা শূন্যের মধ্যে পার্থক্যের। উনি বললেন দ্বিতীয় সংখ্যাটা প্রথমটার তুলনায় এতই ছোট যে সেটা হিসাবে না ধরলেও চলে। কথাটা সত্য, কিন্তু ওই মুহূর্তে ছিল শকিং। বলা যায় সেটাই ছিল মহাকাশ নিয়ে আমার শোনা প্রথম কোন সিরিয়াস আলোচনা। দীপেন'দা নিজেও হয়তো ভুলে গেছেন, কিন্তু বিষয়টা আমার মধ্যে গভীর দাগ কেটেছিল সেদিনই।

আমার কাজ অবশ্য শুরু হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা সমস্যা নিয়ে যা মূলত আইনস্টাইন-ডে ব্রগলির ধারণার উপর ভিত্তি করে। পিএইচডি করার সময় বুঝতে পারি

সমস্যাটা সহজে সমাধানযোগ্য নয়। তাই নতুন কিছু নিয়ে গবেষণা করার দরকার ছিল। ইচ্ছে ছিল সুপারসিমেট্রির উপর কাজ করার। নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে সেটা বেশ আলোড়ন তৈরি করেছিল স্ট্রিং থিওরির পাশাপাশি। তবে আমার সুপারভাইজার প্রফেসর রিবাকভ একটা অপশন হিসেবে তাঁর বন্ধু প্রফেসর শিকিনের কথা বলেন। আলাপের পর তিনি আমাকে তাঁর কিছু পুরনো কাজ দেন সমস্যাটা বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য। একটা জায়গায় এসে আটকে যাই। আমরা প্রতি সোমবার দেখা করতাম। ওনাকে এ নিয়ে বললে বলেন, "ভাব, ভাব।" এভাবে কেটে যায় এক মাস। শেষ পর্যন্ত আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কেন উনি এই সহজ ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন না জানতে চাইলে বললেন, "গবেষণা, কাঠ কাটা নয়, এখানে ভাবনার দরকার, ধৈর্যের দরকার। আমি যদি তোমাকে বললাম, তুমি হয়তো সেটা বুঝতে, কিন্তু ধৈর্য ধরে সমস্যা সমাধান করার শিক্ষাটা পেতে না।" স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই পড়ান, কিন্তু সবাই শিক্ষক হতে পারেন না। একজন প্রকৃত শিক্ষক শুধু সিলেবাসের রুটিন মাফিক বিষয়গুলো পড়ান না, ছাত্রদের ভাবতে শেখান, হাতে-কলমে কাজ করতে শেখান। আসলে রুটিন মাফিক কাজ করে পেশাদার হওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের ডাক্তার, শিক্ষক, গবেষক, মানুষ হতে হলে এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। এটাই সবচেয়ে কঠিন।

অনেককেই প্রায়ই বলতে শুনি অমুক বিজ্ঞানী ধর্মে বিশ্বাস করেন, ধার্মিক ইত্যাদি। কথাটা কী সত্য? ঈশ্বরে বিশ্বাস করা না করা দুটোই বিশ্বাস, কেননা যেকোনো জিনিস প্রমাণ করা যায় একটা ফ্রেমের মধ্যে থেকে। ফুটবল খেলায় ক্রিকেটের নিয়ম চলে না। তাই কোন একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমে থেকে ঈশ্বর আছেন কী নেই- এ প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারব না, কেননা একই সঙ্গে দুটো স্টেটসমেন্টকে এক ফ্রেমে ফেলা যায় না। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের মূল পার্থক্য ঈশ্বর আছে কী নেই, সেটা নয়। মূল কথা হচ্ছে ধার্মিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন প্রশ্নাতীতভাবে। বিজ্ঞানী প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। ধার্মিকের কাছে সব না হলেও কিছু কিছু বিষয়, যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ধর্মগ্রন্থের বাণী অপরিবর্তনীয়, বিজ্ঞানীর কাছে সবই পরিবর্তনশীল, এমনকি যে তত্ত্ব আজ তিনি প্রচার করছেন, সেটাও কেউ না কেউ ভুল প্রমাণ করবেন, নতুন আবিষ্কার ও অবজারভেশনের ভিত্তিতে আজকের তত্ত্বকে উৎকর্ষ রূপ দেবেন, এটা তিনি শুধু বিশ্বাসই করেন না, আশাও করেন। তাই বিজ্ঞানী হওয়া অনেক কঠিন।

একটা সময় ছিল, যখন বিশ্বাস করা হত যে মহাবিশ্ব ছিল ভূকেন্দ্রিক। এটা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসই নয়, সাধারণ বিশ্বাসও ছিল। কেন না অনেক আগেই সে নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমন কী ঈশ্বর নিজে ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছেন প্রথম মানব আদমের সামনে মাথা নত করতে। এ হেন মানুষ, সেরা জীব সৃষ্টির কেন্দ্রে থাকবে সেটাই তো স্বাভাবিক। তাই যখন মধ্যযুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও বললেন মহাবিশ্বের কেন্দ্র সূর্যে অবস্থিত আর পৃথিবী নিজেই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে সেটা মানা সহজ ছিল না। সময়ের সাথে পরিস্থিতি বদলালো। নিউটন

মাধ্যাকর্ষণ বলের সূত্র দিয়ে বিভিন্ন স্বর্গীয় বস্তুর গতিবিধির বর্ণনা দিলেন। সেখানে স্পেস আর টাইম ছিল পরম বা আবসালিউট। বিভিন্ন বস্তু সেখানে চলাফেরা করত এদের কোন পরিবর্তন না করেই। এরপর এলো বিদ্যুতের যুগ। মাক্সয়েল সমীকরণ। নিউটনের সূত্রের সাথে এর অসামঞ্জস্যতা দূর করতে এগিয়ে এলেন আইনস্টাইন। এলো আপেক্ষিকতার বিশেষ সূত্র। এখন আর স্পেস ও টাইম পরম রইল না, শুধু তাই নয় এরা আলাদা না থেকে এক হয়ে তৈরি করল স্পেস-টাইম বা দেশ-কাল। যোগ হল সমসত্ত্বতা ও আইসোট্রপির (সব দিক সমান) ধারণা। এটা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কেননা পৃথিবী থেকে সরে গেলেও এতদিন সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্তমান ধারণায় দেখা গেল মহাবিশ্বের সমস্ত বিন্দুই সমান, যেমন সমান সব দিক। বিশেষ বিন্দু বা দিক বলে কিছু নেই। নেই কেন্দ্র। মানুষের সমাজে সব সময়ই কেউ না কেউ বিশেষ অবস্থানে থাকে, তা সে পরিবার প্রধান হোক, মন্ত্রী হোক, রাজা হোক, নেতা হোক অথবা ঈশ্বর হোক। তার সারা জীবনই এসব কিছুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আর এখন দেখা যাচ্ছে কোন কেন্দ্র নেই, বিশেষ কিছু নেই। এটা মেনে নেওয়া মানে নিজের সমস্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা।

কিন্তু যিনি এই তত্ত্বের জন্ম দিলেন, তিনিই কী সেটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পেরেছেন? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের অসামঞ্জস্যতা দূর করতে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব প্রকাশ করলেন ১৯১৭ সালে। ১৯২২ সালে ফ্রিদম্যান যখন দেখালেন এই তত্ত্ব যে মহাবিশ্বের জন্ম দেয় সেটা সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল, আইনস্টাইন সেটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, মহাবিশ্ব পরিবর্তনশীল নয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কসমোলজিক্যাল টার্ম সংযোজন করেন নিজের সমীকরণে। ১৯২৯ সালে হাবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পরই আইনস্টাইন সেটা মেনে নেন। এটাই প্রমাণ করে বিজ্ঞান শুধু বাহ্যিক জগতেই পরিবর্তন আনে না, পরিবর্তন আনে মনোজগতেও। সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারে না, তাদের সেটা বুঝতে হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানী সেটা বুঝতে পারেন, ফলে প্রতিনিয়ত তাঁকে নিজের বিশ্বাসের সাথে লড়াই করতে হয়, প্রচলিত বিশ্বাস ভেঙ্গে নতুন বিশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। সেটা কোন মানুষের পক্ষেই সহজ কাজ নয়।

তাই বলে কী বিজ্ঞানীরা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না? করেন, অবশ্যই করেন। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন পরিবর্তনে। তিনি প্রচলিত বিশ্বাসকে অনবরত প্রশ্ন করেন, উত্তর খোঁজেন। কিন্তু প্রচলিত ধারণার প্রতি তাঁর এই অবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নয়। অর্থাৎ অবিশ্বাস করতে হবে বলেই অবিশ্বাস করা নয়, এটা প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্য অথবা ভুল প্রমাণ করা, আর ভুল হলে সেটার পরিবর্তে আরও উন্নত বিশ্বাস বা তত্ত্ব দেওয়া, গাণিতিক লজিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু তাঁর আগেও তো বিজ্ঞানীকে কিছু একটা বিশ্বাস করতেই হবে। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। নিজের জীবনের কিছু ঘটনা এক্ষেত্রে বলতে পারি। আমি যখন কসমোলজির উপর কাজ শুরু করি প্রায়ই একটি তত্ত্বের রেফারেন্স দিতাম, যেটা পেয়েছি একটা

বিখ্যাত বইয়ে। এভাবে বেশ কিছু পেপার বের হয় ফিজিক্যাল রিভিউ সহ বিভিন্ন জার্নালে। এরপরে এক রিভিউয়ার বললেন যে এই রেফারেন্সটা ঠিক নয়। তখনও অন লাইনে প্রায় কিছুই পাওয়া যেত না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে মূল পেপারটা পাওয়া গেল। যদিও এতে আমার পেপারের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি, তবে সব কিছু সঠিক ভাবে রেফার করা গবেষকের নৈতিক দায়িত্ব। বিজ্ঞানীর কাজ কী? অফিস যাওয়া, বছরে কতগুলো রিসার্চ পেপার পাবলিশ করা এসব তাঁর পেশা, তাঁর জীবিকা । কিন্তু সত্যিকারের বিজ্ঞানীর মূল কাজ সত্য সন্ধান, বিশেষ করে যারা পদার্থবিদ্যায় কাজ করেন। প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করাই তাঁর মূল কাজ। এখানে মিথ্যার বা গোঁজামিল দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে সমস্যা হল, অনেকেই এক সময় গবেষণাকে রুটিন মনে করতে শুরু করেন আর বই বা নামকরা জার্নালে প্রকাশিত সব কিছুকেই বাইবেলের লেখন বলে মনে করেন।

একবার এক প্রফেসর আসেন বাইরে থেকে আমার সাথে কাজ করতে। আমার চেয়ে বয়সে বড়, অভিজ্ঞ। আমরা একসাথে কিছু কাজের পরিকল্পনা করছিলাম। একদিন উনি আমাকে একটা সমস্যার কথা বললেন আর কিছু প্রাথমিক গণনা দেখালেন। যেহেতু এই লাইনে অনেকদিন কাজ করছি দেখেই বুঝলাম কিছু একটা মিস হয়ে গেছে। নিজে অংক করে বললাম, এখানে আরও একটা সমীকরণ আছে, যেটা তুমি উল্লেখ করতে ভুলে গেছ। ওনার কথা এ বিষয়ে প্রচুর পেপার আছে, ওনার নিজেরও আছে। তাই ভুলের প্রশ্নই আসে না। আমি তাঁকে আমার গণনা দিয়ে আবার দেখতে বললাম। মনে খটকা, এত লোক তো ভুল করতে পারে না। ঘটনাটা কী? পরের দিন উনি এসে বললেন, সেই মিসিং সমীকরণটা আসলে অন্য দুই সমীকরণের রৈখিক কম্বিনেশন। তাহলে? কিছুক্ষণ চিন্তা করে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শুধু কসমোলজিতেই নয়, বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম দিকের উদাহরণগুলো প্রিমিটিভ এই অর্থে যে সেটাকে বিভিন্ন ভাবে সরলীকরণ করা হয়। কসমোলজির সমস্যা সমাধানে প্রায়ই আদর্শ তরল ব্যবহার করার কারণে আইনস্টাইন সমীকরণের ডানদিকটি বেশ সহজ রূপ ধারণ করে। আর এজন্যেই একটা সমীকরণ অটোম্যাটিক্যালি বাদ পড়ে যায় অন্য দুটোর রৈখিক কম্বিনেশন বলে। কিন্তু যখনই আমরা আদর্শ তরলের পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করি সেই স্বাধীনতা নাও থাকতে পারে। এক সময় দেখা যায় অনেকেই আদর্শ তরলের কথা ভুলে যান, আর ধরেই নেন এই সরলীকৃত সিস্টেম সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আইনস্টাইন সমীকরণে বাঁ দিকে থাকে আইনস্টাইন টেনজর, যা দেশ-কালের জ্যামিতির বর্ণনা দেয় আর ডান দিকে থাকে শক্তি-ভরবেগের টেনজর যা মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের উৎস ও বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। তাই যদি প্রতিটি সমীকরণের দুটো দিকই একই সাথে বদলানো না হয়, সেখানে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়। এই অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য সবগুলো সমীকরণই বিবেচনায় নিতে হবে, ফলে এক্ষেত্রে শক্তি-ভরবেগ টেনজরের কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে এক ধরণের রেস্ট্রিকশন আরোপিত হয়। যাহোক, আমার সাথে একমত হয়েও ওই পেপার তিনি প্রকাশ করেন। আমি ওই পেপারে যৌথ অথার হতে

অস্বীকার করি। পরবর্তীতে আমি নিজে একটি পেপার লিখি যেখানে এই ধরণের স্পেস-টাইমে এনার্জি-মোমেন্টামের সীমাবদ্ধতাগুলো গাণিতিকভাবে প্রমাণ করে দেখাই। এ ধরণের ঘটনা ঘটে যখন আমরা বিজ্ঞানীরা আসল কাজ- প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকি, অন্যদের পেপারে লেখা সবকিছু অন্ধভাবে সঠিক বলে মনে করি। তবে এটা করা মোটেই সহজ নয়। কারণ এতে নিজের অনেক কাজও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। বিজ্ঞানীই হই আর যাই হই, আমরা সবাই মানুষ। কে চায় নিজেকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে? এই ঘটনা আমার জন্য ছিল খুবই শিক্ষণীয়। আমার নিজের কাজ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ছিল। এ ব্যাপারে প্রোফেসর শিকিনকে অনেকবার বলেছি। উনি সব সময়ই বলতেন যে সব ঠিক আছে। তবে ডিএসসি ডিফেন্ড করার পর আমার আর অতটা পিছুটান ছিল না। তাই নিশ্চিন্ত মনে নতুন করে অংক করে দেখি কিছু অ্যাডিশনাল কন্সট্রেইন পাচ্ছি। এতে করে আগের সব রেজাল্ট ঠিক থাকলেও সেসবের ইন্টারপ্রিটেশন বদলে যাচ্ছে। আমি এর উপর নতুন কিছু পেপার লিখি, শিকিনকে বলি।

তার মানে আমি এতদিন যা কিছু করলাম, সব ভুল? না, ভুল নয়। আমারা ভেবেছিলাম যেটা জেনারেল কেস, দেখা গেল সেটা আংশিক সমাধান। কিন্তু? কোন কিন্তু নয়। ভালো যে আমাদের ভুলটা আমরা নিজেরাই ধরতে পেরেছি।

আসলে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি রেজাল্ট সন্তানের মত। সন্তান যেমন ভুল পথে গেলে কোন বাবা-মাই সেটা সহজে মেনে নিতে পারেন না, কোন রেজাল্ট ভুল প্রমাণিত হলে যেকোনো বিজ্ঞানীই সেটাকে সহজে মেনে নিতে পারেন না, যদিও জানেন তাঁর সমস্ত গবেষণার ফলই চরম, পরম সত্যকে জানার পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র।

মাত্র বছর কুড়ি আগেও ধারণা করা হত আমাদের মহাবিশ্ব মন্দনের সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছে। যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ বল পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই মহাবিস্ফোরণের পর একে অন্যের থেকে দূরে চলে গেলেও এই বলের ফলে সম্প্রসারণের বেগ কমবে সেটাই স্বাভাবিক। তাই ১৯৯৮ সালে সুপারনোভা পর্যবেক্ষণে যখন দেখা গেল মহাবিশ্ব ত্বরণের সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছে সেটা কসমোলজিস্টদের নতুন পরীক্ষার সামনে ফেলল। প্রয়োজন হল এই ফেনমেনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। প্রথমেই মাথায় এলো আইনস্টাইনের কসমোলজিক্যাল টার্মের কথা। একটা জিনিস পরিষ্কার, মাহাবিশ্ব এমন কিছু দ্বারা পরিপূর্ণ যা বিকর্ষণ বলের কাজ করে। তাছাড়া এটা পরিচিত বস্তুর সাথে কোন মিথস্ক্রিয়া করে না। আর যেহেতু সম্প্রসারণ সব দিকে একইভাবে হচ্ছে, এটা সমস্ত মহাবিশ্বে সমান ভাবে বিরাজ করছে। একে একে বিভিন্ন মডেলের প্রস্তাব করলেন বিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ আইনস্টাইনের তত্ত্বকেই ঢেলে সাজানোর কথা বললেন। সে কাজ এখনও এগিয়ে চলছে। আলেক্সেই স্তারবিনস্কি কসমোলজিতে এক সুপরিচিত নাম, স্ফীতি তত্ত্ব বা ইনফ্ল্যাশন থিওরির আবিষ্কারকদের একজন। আমি নিজে এ ঘটনার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি স্পিনর মডেল ব্যবহার করে। যেহেতু স্পিনর প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বে, ক্যাসিকাল তত্ত্বে এর ব্যবহার মেনে নিতে অনেকেই দ্বিধা করেন। ২০০৭ সালে প্রথম পরিচয়ের সময় প্রফেসর স্তারবিনস্কিও সেটাই করতেন, এর পরেও অনেকদিন খুব

সন্দিহান ছিলেন। ২০১৮ সালে ব্যক্তিগত আলাপের সময় বললেন, “এখন ত্বরমাণ সম্প্রসারণের ব্যাখ্যার জন্য অনেক ভালো ভালো থিওরি রয়েছে। তবে শুধু একটা থিওরিই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। “এটা ছিল আমার কাজের প্রতিও এক ধরণের শুভ ইঙ্গিত। আমি বললাম, “চয়েজ থাকাটা সব সময়ই ভালো। যদি মহাবিশ্ব কোন এক দিন ধ্বংস হয়ে যায় আর নতুন করে পথচলা শুরু করতে চায়, সে জানবে, কোন পথে যেতে নেই। আর সেই সাথে তার হাতে বেশ কিছু অল্টারনেটিভ পথও থাকবে। “পদার্থবিদ্যায় নেগেটিভ ফলাফলও একটা ফলাফল, কারণ এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কোন পথে যেতে নেই।

অনেকেই প্রশ্ন করেন সৃষ্টিকর্তা নিয়ে। আমি বলি, “আপনার হাতের যন্ত্রটা কে তৈরি করল সেটা না জানলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেটা কীভাবে কাজ করে সেটা না জানলে ওই যন্ত্রটার কোনই মুল্য নেই। একজন কসমোলজিস্ট হিসেবে আমি চাইছি মহাবিশ্বের উৎপত্তি, এর বিবর্তন, এর গঠন আর পরিণাম জানতে। মহাবিশ্ব এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। সৃষ্টিকর্তার থাকা না থাকা এতে কোন প্রভাব ফেলে না। তাই জানার আগ্রহ অনুভব করি না।”

আমাকে নিজের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন জার্নালে পাঠানো পেপার রিভিউ করতে হয়। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, খুব কম লোকই এসব পেপারের খুঁটিনাটি পড়ে দেখেন। অনেকেই নিজদের কাজের রেফারেন্স থাকলেই সেটাকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন, অনেকে আবার পেপারটা ঠিকমত বোঝার চেষ্টা না করেই এটাকে বর্জন করার পরামর্শ দেন। খুব কম লোকই মূল ধারার বাইরের পেপার গ্রহণের পক্ষে কথা বলেন। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজ এক ধরণের ফ্যাশান। তাই কী বইয়ে, কী জার্নালে কিছু লেখা থাকলেই অথবা নামকরা বিজ্ঞানী লিখলেই যে সেটা বেদবাক্য হবে তা নয়। প্রতিটি সমস্যাই নতুন। পদার্থবিদ্যায় সূত্রগুলো এসব সমস্যা সমাধানের সাধারণ রূপরেখা দেয়। প্রতিটি রুগিকে যেমন অবস্থা বুঝে আলাদা আলাদা চিকিৎসা দেওয়া হয়, এক্ষেত্রেও তাই। প্রতিটি নতুন সমস্যা একেবারে শুরু থেকে বিবেচনায় নিন, সেটাকে সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করুন। অভিজ্ঞতা বলে অনেক ভালো ভালো জার্নালে ভুল লেখাও প্রকাশিত হয়। যদি পেপার প্রকাশ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তো আপনি সফল। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চাকে যদি সত্যসন্ধান ভাবেন – ভুল লেখা প্রকাশ আপনার ব্যর্থতা। আমি ছাত্রদের বলি রবীন্দ্রনাথ, পুশকিন, শেক্সপীয়ার যদি ভুল ব্যাকরণে লিখতেন, শুধু ছন্দ দিয়েই কী আমাদের মন জয় করতে পারতেন? পারতেন না। গণিত পদার্থবিদ্যার ভাষা। তাই পদার্থবিদ্যার উপর আপনার যেকোনো কাজ হতে হবে গাণিতিক ভাবে নির্ভুল।

প্রশ্ন করুন। শুধু প্রশ্ন করেই আমরা পরম সত্যকে জানতে পারব। এ এক অন্তহীন পথচলা।

দুবনা, রাশিয়া

ড. বেগম জাহান আরা

প্রমিত বাঙলায় ‘স’-এর জন্য কোনো বর্ণ নেই

বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের পরিচিতির ভাষা। জীবন বিকাশের ভাষা। রাষ্ট্রীয় ভাষা। পৃথিবীর আধুনিকতম ভাষার একটি হল বাঙলা। বলা হয় পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম ভাষা বাঙলা। আমরা গর্বিত বাঙলা ভাষার উত্তরাধিকার হয়ে। কিন্তু এই অহংবোধের সাথে সাথে আমাদের দায়িত্বও আছে বাঙলা ভাষাকে আধুনিক বিশ্বে কার্যকর ভাষা হিসেবে উপস্থাপন করার। সে অনেক কাজ। যেমন বাঙলা বানান সংস্কার একটা।

বাঙলা বানানের সমস্যার চেয়ে মতান্তরের ঝড় বেশি। পোকা বাছার মতো একটা একটা করে সমস্যার সমাধানে সবাই মিলে কাজ করার চেয়ে মাথা ঘামানো বেশি হয় মতান্তরের বিষয় নিয়ে। ফলে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা ঘুরপাক খাই। সমাধানের দিকেই যেতে পারি না। উপমহাদেশের প্রখ্যাত বৈয়াকরণেরা বলেছেন, বাঙলায় দীর্ঘস্বর নেই। বাঙলা একাডেমিও নিমরাজি কথাটায়। তবে একাডেমি একটা ‘কিন্তু’ রেখে দিয়েছে কয়েকটা বানানের বেলায়। অনেকেই এখন বলেন, বাঙলা একাডেমির বিধান আমরা মানি না। বিশেষ করে ওপার বাঙলার কিছু আলোকিত মানুষ বলেন যে, ‘রেফ-এর পর দিত্ব ব্যঞ্জন হবে না, এই সিদ্ধান্তও ভুল’। মানে, কলকাতা বানান সংস্কার সমিতির সিদ্ধান্তও ভুল। এই ভাবে পায়ে পায়ে ল্যাং মারলে মানুষ এগোতে পারে?

বাঙলা বানানে তিন ‘স, শ, ষ’ নিয়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি শত শত বছর যাবত। কারণ আমাদের উচ্চারণে তিন স-ই প্রায় একরকম ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন; সকাল, সন্ধ্যে, সময়, সামনে, শহর, শকুন, শাড়ি, শেকল, ষাঁড়, ষোলো, ষড়, ষন্ডা, এই বারোটা শব্দেরই প্রথমে আছে স/শ/ষ। কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে একটা ‘শ’। শব্দের মাঝে বা অন্তেও একই অবস্থা। যেমন বাসা, আসা, আসল, বসা, আবাস, সাবাস, সাহস, এসেছিস; শশা, মশা, আশা, দশা, তামাশা, হতাশা, দুরাশা, প্রত্যাশা; আষাঢ়, কসাই, নিকষ, বিষ, ভাষা, মহিষ, ইত্যাদি শব্দের মধ্য ও অন্তের স/ শ/ ষ-এর উচ্চারণেও একই ‘শ’ পাওয়া যায়। কলকাতার বানান সংস্কার পুস্তিকায় বলা হয়েছে, তিন শ-এর মধ্যে একটি বা দুটি বর্জন করলে বাঙলা উচ্চারণে কোনো বাধা হয় না। এই কথাটা মতান্তরের আর একটা উৎস।

সমস্যা হল কোন বিশেষ একটি বা কোন বিশেষ দুটি ‘শ’ বর্জন করা যেতে পারে, তার কোনো দিক নির্দেশনা দেয়া হয় নি। গিট্টু একটা দিয়ে ছেড়ে দিলে সেটা খুলবে কে? এই কথাটার মধ্যে একটু দায়হীনতার ব্যাপারও আছে। কারণ স-দিয়ে লেখা কোনো কোনো যুক্তাক্ষরে ‘স’-এর ‘S’ উচ্চারণ পাওয়া যায়, যেমন; স্তর, স্তব, স্থান, স্নেহ, শ্রাবণ, শ্লাঘা, শ্লীল, শ্রবণ, ইত্যাদি শব্দে স্পষ্ট ‘দন্ত্য স’-এর উচ্চারণ পাই আমরা।

কিন্তু 'ষ' দিয়ে যে কয়টা যুক্তাক্ষর আছে তার কোনোটাতেই দন্ত্য-স-এর উচ্চারণ আসে না। অন্যদিকে 'ষ' দিয়ে শুরু হয় এমন বাঙলা শব্দও অভিধানে মাত্র কয়টা। বাকিগুলো বুৎপত্তিজাত শব্দ। আর 'ষ' মধ্যে বা অন্তে থাকে তার উচ্চারণ শ-এর মতোই হয়। 'ষ'-এর উচ্চারণ কখনও 'স'বা 'S'-এর মতো হয় না। এক্ষেত্রে যদি ধরে নেয়া যায়, 'ষ'-কেই বাদ দেয়া যায় সহজে, তাহলে কেমন হয়? এই রকম একটা সিদ্ধান্ত পেলে আমাদের জন্যে ভাল হত। তা যখন পাওয়া যায়নি, তখন আমাদের সমস্যা আমাদেরই দূর করতে হবে।

বাঙলা একাডেমির ব্যাবহারিক অভিধানে মূর্ধন্য- 'ষ'-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য তালব্য-শ-ই ব্যবহার করা হয়। মানেটা কি এই দাঁড়ায় না যে, 'ষ'-এর উচ্চারণ আর আমাদের মুখে নেই। বৈয়াকরণদের মতে, 'ণ, ষ' ধ্বনি প্রাচীন বাঙলাতেই লুপ্ত হয়েছে। এটাকেই স্বীকৃত সত্য বলে মেনে যায় নাকি? এই দুইটি ধ্বনি আমাদের উচ্চারণে ছিলও না কোনোকালে।

অন্যদিকে বাঙলা একাডেমির প্রমিত বাঙলা বানানের নিয়মে বলা হয়েছে, তৎসম শব্দের বানান তথৈবচ রাখতে হবে। তার মানে 'ষ' বাঙলা বানানে থাকবে। মুখে থাক বা না থাক, বানানে তাকে চাই। এই বিপরীতমুখী চিন্তা এবং বানানে তা শেখানোর অভিধানলগ্ন বিধিই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সাহস কেউ দেখাচ্ছি না। মানে সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কোন দিকে যাবো, সে কথাটাও কেউ মুখে আনলেন না। তাই কলকাতার বিধি বা পরামর্শ অনুযায়ী (যদিও নির্দিষ্ট করে বলা নেই, তবে শব্দের উদাহরন দেখে মনে হয়), 'ষ'-কে বাদ দেয়াই যায়। এই একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে বিচার করে এবং বাঙলা ভাষার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় 'ষ'-কে বাঙলা বর্ণমালা থেকে বিদায় দিতে হবে। আর কত? হল তো অনেক। আমরা তো বানান মুখস্ত করেছি, করতে হবে তাই। এখনকার প্রজন্ম গরমিল বা গোঁজামিল দেখলে প্রশ্ন করে। পছন্দ না হলে বর্ণ বাদ দিতে বলে। স্পষ্টই বলে, তিনটে 'শ'-এর দরকার নেই। এই সহজ সাবলীল দাবি তুলতে পারেন না সচেতন ভাষীরা।

তবু বাকি থাকে কাজ। সেটা হল, 'দন্ত্য স'-কে 'S'-এর মতো করে উচ্চারণের একটা সিদ্ধান্ত নেয়া, এবং 'শ' দিয়ে 'শ'-এর উচ্চারণ করা। তাহলে 'সকাল সন্ধ্যে' বানান 'শকাল শন্ধ্যে' লেখতে হয়। এমন বানান তো অনেক দিন থেকেই বেশ কিছু শিক্ষিত সচেতনভাষী লিখছেনও। তাহলে সেটাই স্বীকার করে নিই আমরা? তাতেও সন্তুষ্ট হচ্ছি না। এটা তো ঠিক, উচ্চারণানুগ বানানের জন্যই একদা বানান সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সেই স্পিরিট কেন নেই আমাদের? একটা পথ বা মত তো বেছে নিতেই হবে। 'হযবরল' আর কতদিন?

এই হযবরলজনিত সিদ্ধান্তহীনতা আমাদেরকে অন্য ভ্রমের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আজকাল 'শ্রাবণ, শ্রেষ্ঠ, শ্রীলঙ্কা, শ্লীল, অশ্লীল, শ্লাঘা' , ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে গায়ের জোরে 'শ' কে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন। ফলে আমাদের মুখে এতকাল যে

শব্দগুলোর উচ্চারণ ছিল 'স্রাবন স্রেষ্ঠ, স্রিলঙ্কা, স্লিল, অস্লিল, স্লাঘা (srabon, sreshtho, srilonka, slil, oslil, slagha), তা হয়ে যাচ্ছে shrabon, shreshtho, shrilongka, shill, oshlil, shlagha। তাতে কিন্তু উচ্চারণ অস্পস্ট হয়ে যাচ্ছে। হচ্ছে, না ঘরকা, না ঘাটকা। তাঁদের ধারণা, যেহেতু বানানটা লেখা আছে 'শ'-দিয়ে, তাই 'শ'-এর উচ্চারণই করতে হবে। এটাও তো মেনে নিচ্ছি না আমরা। তাহলে উপায় কী? এভাবেই চলবে বাঙলা উচ্চারণের 'হযবরল'?

এখানে হল উল্টো ব্যাপার। লিপি দেখে উচ্চারণ করা হচ্ছে। সেই কাজটা আরো কঠিন। যে কারণে চর্যাপদ-এর পাঠ নিয়ে সমস্যা কাটে না। কারণ তার উচ্চারণ পাওয়া আর সম্ভব নয়। তাই লিপি দেখেই উচ্চারণের পাঠ নির্ধারণ করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে গরমিল লেগেই থাকার কথা এবং আছে। নরওয়ের পন্ডিত পারকাভার্নের বইতে রোমান হরফে চর্যাপদের যে পাঠ পাওয়া যায়, তার সাথে বাঙলা বইয়ে লেখা উচ্চারণের কিছু গরমিল দেখা যায়। এবং সেটাই স্বাভাবিক।

অনেক শিক্ষিত মানুষকেও দেখেছি, কেউ কেউ 'ছ' দিয়ে 'S'-এর উচ্চারণ বোঝাতে চান। যেমন; ইছলাম, ছালাম, নাছির, ইত্যাদি বানান। আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণে যেহেতু 'ছ'-এর উচ্চারণ 'দন্ত্য -স'-এর মতো, তাই তাঁদের ধারণা 'ছ' লিখে 'S'-এর কাজ সারা যায়। কিন্তু এই বানান প্রমিত বাঙলায় চলে না। 'ছ' হল ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি। আর দন্ত্য-স হল শিস ধ্বনি। শাস্ত্রমতে দুটো ধনির উচ্চারণের স্থান এবং উচ্চারণ রীতি একেবারে আলাদা। এই বিষয়গুলো বাঙলা ব্যাকরণে থাকার কথা। বর্নের পাঠে প্রতিটি বর্ণের শাস্ত্রীয় উচ্চারণ প্রাথমিক শিক্ষা পর্বেই বিশ্লেষণ করে শেখানো আবশ্যিক।

আবার কিছু কিছু বানানে পাশাপাশি দুই 'স, শ' থাকলেও তার উচ্চারণে পাই একটা 'শ'। যেমন 'প্রশাসন, অশেষ, বিশেষ, শস্য' এই শব্দগুলোর সব 'শ'-ই আমাদের উচ্চারণে 'শ' হিসেবে উচ্চারিত হয়। এখানেও প্রজন্মের প্রশ্ন, তাহলে আর দুটি 'শ'-এর প্রয়োজন কি? তাদের কথার উত্তর কেউ দেয় না। কিন্তু গা বাঁচিয়ে কোথায় পালাব আমরা? তিন 'স' নিয়ে আমাদের কালে আমরা হাবুডুবু খেয়েছি। আমাদের প্রথম প্রজন্মও খেয়েছে। তৃতীয় প্রজন্মের এরা একুশ শতকের মানুষ। চোখ বুঁজে কিছু মুখস্ত করার পক্ষে না। জেনে বুঝে যাচাই করে শিখতে চায়। তাই তারা প্রশ্ন তুলেছে তিন 'স/শ/ষ' নিয়ে। মুখস্থ বিদ্যা নিয়ে জীবন কাটানো বয়সী এই আমাদের প্রজন্ম, এখন ওদের প্রতিপক্ষ হয়েছি। সংকোচে থাকি। ওদের কথার উত্তর দিতে পারি না।

সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দ 'শ্মশান, স্মরণ, স্মৃতি' (smoshan, smoron, smriti) ইত্যাদি শব্দে আমাদের উচারণ কখনও 'শ' কখনও 'স'-এর মতো। মানে, আমরা বলি, 'শশান, শরন, স্রিতি'। শব্দের আদিতে 'শ+ম' যুক্ত হলেও তার উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে শুধু তালব্য 'শ'। একই ভাবে, আদিতে 'স+ম' যুক্ত হয়েও উচ্চারণ হচ্ছে শুধু তালব্য 'শ'। আবার কখনও 'স+ম+ঋ-কার' যুক্ত হলে 'স-এর' উচ্চারণ থেকে যাচ্ছে 'স'। এই সব ঝামেলার সমাধান মহাপন্ডিত পানিনিও মিটিয়ে ফেলতে পারেন নি। আমরা তো কোন ছার? কিন্তু প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান এখন যুক্তির আলোকে পানিনির চেয়ে বেশি

ত্রুটিহীন কাজ করতে পারে। একুশ শতকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দুরন্ত দাপটে অনেক কিছুই এখন ব্যাখ্যা করা যায়, যা আগে যেত না। তাহলে বিজ্ঞানের সেই বিদ্যাটা আমরা কাজে লাগাব না কেন?

আমরা যে কিছু পরিবর্তন করিনি তা তো নয়। সংস্কৃতে যা 'smoshan, smoron', বাঙলায় তা' shoshan, shoron'। তার মানে আমরা বাঙলা উচ্চারণ করি। আমাদের বাঙলা জিবে এটাই আছে সেই কোন কাল থেকে। কিন্তু তবু বানানে লেখা যাবে না। অনেকের ধারণা, বানানে পরিবর্তন আনলে শব্দের অর্থ বদলে যাবে। অন্যদিকে শব্দের আসল অর্থ তো পাওয়া যায় বাক্যে প্রয়োগের ওপর। নইলে সমধ্বনিজ শব্দের ব্যবহার সম্ভব হত না। এই এলোমেলো বিষয়গুলো ঠিক করা যায় অবশ্যই। সেটাই করতে চাই আমরা সবার সহযোগিতা এবং আলোচনার মাধ্যমে।

আরও কিছু শব্দের উচ্চারণ নিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যাক। যাঁরা জন্ম থেকে 'শ্রাবণ'-কে 'shrabon' উচ্চারণ করে এসেছেন, এবং অভ্যেস করেছেন তাঁরা পেরে যাচ্ছেন। আর যাঁরা 'শ্রাবণ'-কে 'srabon' শুনে এবং বলে এসেছেন (যেমন আমরা), তাঁদের আয়ত্বে আসছে না সেই উচ্চারণ। আমরা তো ছোটো বেলায় ঐ শব্দগুলোর উচ্চারণ করেছি, 'স্রেষ্ঠ, স্রিলংকা, স্লিল, অস্লিল, স্লাঘা'। এবং এখনও তাই করি। হঠাৎ নতুন এই প্রবণতার এবং তা চর্চার কোনোই প্রয়োজন নেই বাঙলা ভাষায়। ভাষা তো বহতা নদীর মতো। সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তার মুখ পেছনে ফেরাতে গেলে বিভ্রাট বাড়বেই।

একটা নিয়ম আছে, সেটা এখানে বলা যেতে পারে। যেমন; 'শ/স'-এর সাথে 'র, ল, ন' যুক্ত হলে তার উচ্চারণ 'স' হয়ে যায়। 'দৃষ্টান্ত, শ্রেষ্ঠ, শ্রান্ত, শ্লেষ, শ্লীল, প্রশ্ন, স্নেহ' ইত্যাদি শব্দের 'স/শ'-এর উচ্চারণ 'স' হয়ে গেছে আমাদের উচ্চারণে। এমন উচ্চারণের কারণ ব্যাখ্যা করাও যায়। বাক প্রত্যঙ্গের মধ্যে জিভ সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং উত্তম মডুলেটর। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'র, ল, ন' আশ্রিত ধ্বনি হিসেবে আশ্রয়ী ধ্বনি 'স/শ'-কে কাছে টেনে আনে। সেটাই সহজ হয় জিভের কাছে। কতকটা সহজাতও বটে জিভের জন্য। বাঙলা একাডেমির ব্যাকরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হিন্দি, মারাঠি, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষাতে 'ভাষা পরিকল্পনা' করে তারা এই নিয়ম করে নিয়েছে যে, দন্ত- 'স'-এর উচ্চারণ 'শ' হবে না। আর 'শ'-এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স'-এর মতো হবে না। আমরা সেটা করতে পারিনি। গায়ের জোরে অশুদ্ধ উচ্চারণকে শুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য নিজেরাই একটা আপোস রফা করেছি নিজেদের সাথে। নিয়মও তৈরি করা হয়েছে। সেটা হল 'শ'-এর সাথে 'র/ল/ন' যুক্ত হলে 'শ'-এর উচ্চারণও হবে দন্ত্য 'স' বা 'S'-এর মতো (শ্রাবণ, শশ্রু, সুশ্রি)। আর ত-বর্গীয় বর্ণের (ত, থ) সাথে যুক্ত থাকলে (যেমন, স্তম্ভ, স্থান, স্নান) এবং 'স্ক স্ফ' যদি শব্দের আদিতে থাকে তাহলে সেখানে দন্ত্য 'স'-এর উচ্চারন হবে 'S'-এর মতো। কিন্তু শব্দের মধ্যে 'স্ক, স্ফ' থাকলে (আস্কারা, আস্ফালন) সেটার উচ্চারণ হয়ে যাবে 'শ'-এর মতো। এখন এই সব নিয়মকে মনে হয় দারুণ গোঁজামিল। কিন্তু এক সময় আমিও সায় দিয়েছি। ভাবতেই নিজেকে অপরাধী লাগে।

এখন বুঝতে পারছি সেটা কত বড় সর্বনাশা ভুল। আমাদের প্রয়োজন একটা জাতীয় সিদ্ধান্ত। মানে, দুই 'স, শ'-কে দুই ভাবে উচ্চারন করতে হবে। তাহলে উচ্চারণানুগ হবে বানানও। মূর্ধন্য-ষ-এর কথা আর বলছি না। আমি বর্জন করেছি অনেক আগেই। দায় নিয়েই করেছি। ভাষা বিজ্ঞানের যুক্তিতেই করেছি। আর তাতে সমর্থন আছে এই উপমহাদেশের পন্ডিত বৈয়াকরন ড. সুনীতি বাবু এবং ড. শহীদুল্লাহ সাহেবের। তাঁরা বলেছেন, মূর্ধন্য-ণ আর মূর্ধন্য-ষ প্রাচীন বাঙলাতেই লুপ্ত হয়েছে। আধুনিক বাঙলায় তারা অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁদের লেখায় বর্ণ দুটি কেউ বাদ দেন নি। সমস্যা হয়েছে সেখানেই। তবুও সমাধান একসময় তো করতেই হবে।

স্বীকার্য যে, এই সংশোধনের সিদ্ধান্তে অনেক কাজ এসে পড়বে। অভিধানে শুধু দন্ত্য 'স'-এর পৃষ্ঠাগুলোতেই আমূল সংস্কার প্রয়োজন হবে। তবে তার আগে জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়ন অনিবার্য। বহুবার বহু ফোরামে ভাষানীতির কথা বলা হচ্ছে। এই কাজটা না হলে আমাদের বানান এবং উচ্চারণের সমস্যা কাটবে না। তাই আমাদেরকে বলেই যেতে হবে।

আগেও বলেছি, গোঁজামিল আর দিতে চাই না। আমরা যদি প্রমিত বাঙলা উচ্চারণের মত বাঙলা বানান লেখতে চাই, তাতেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আসলে আমরা তো প্রমিত বাঙলা বানান লেখার কোনো চেষ্টাই করিনি কোনোদিন। সেই ভুলের জের আর টানতে চাই না। বাঙলা বানান হোক বাঙলার মতো। এটাও মনে রাখতে হবে, এই কাজ একদিনের নয়। প্রায় সোয়া দুইশো বছরের ভুল তো সহজে মুছে ফেলা যাবে না। প্রথমে দরকার বিষয়টা বোঝা। হিসেবের মধ্যে আনা। আলোচনার জন্য বসা। বলতে চাই, বাঙলায় দুই 'স, শ'-এর ব্যবহার বিধি ঠিক করে নিতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, শুধু দন্ত্য 'স দিয়ে বাঙলা কোনো শব্দ শুরু হয় না। মানে বাঙলা শব্দের আদিতে 'স'-দিয়ে কোনো শব্দই নেই। বিদেশি শব্দ লেখার সময় লাগে দন্ত্য-স। যেমন, সফর মাস, সালাম, সাহরি, স্টাডি, স্টেডিয়াম, স্টার, ইত্যাদি। বাঙলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে যুক্ত অক্ষর দিয়ে শুরু আছে কিছু শব্দ, যেমন স্তুপ, স্থান, স্খলন, স্পন্দন, স্তর, স্তিমিত, ইত্যাদি, আবার, আস্ত, মস্ত, সাস্থ্য, পস্তানো, ইত্যাদি শব্দে দন্ত্য 'স '-এর উচ্চারন 'S'-এর মতো। এই সব কারণে রবীন্দ্রনাথ একদা বাঙলায় নতুন বর্ণ আমদানির কথা বলেছিলেন। ড. সুনীতিবাবুকেই বলেছিলেন কাজটা করতে। তিনি সাহস করেননি মনে হয়। যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতি 'অ্যা' বর্ণ আমদানি করে পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

একুশ শতকে আমাদের কি আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা সাজে?

হামবুর্গ, জার্মানি

মতলুব আলী

রবীন্দ্র-নজরুল সুরবাণী যখন আমাদের প্রেরণার উৎস

রবীন্দ্র বিষয়ক অনুভূতিজাত একটি পরম উপলব্ধির কথা শুরুতেই বলে নিতে চাই। কথাটি হচ্ছে- রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ আগে ঠিকই নিজের সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছিলেন যে, তাঁর সৃষ্টির, তাঁর সৃজনশীল কর্ম-ভাণ্ডারের, প্রসাদধন্য হবে সবাই তিনি চলে যাওয়ার দীর্ঘকাল পরেও। আর নিখাদ-অপ্রতিরোদ্ধ আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছিলো:

"আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে-
হৃদস্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পলবমর্মরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে ।।"
[২ ফাল্গুন, ১৩০২]

তিনি বুঝেছিলেন, তাঁকে পাঠ করবে আগামী দিনের পাঠক, তাঁর গানেই তাঁকে স্মরণ করবে ভবিষ্যতের গায়ক। তাঁর কর্মের আনন্দসুখ উপভোগ করবে ভাবিকালের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মীময় উৎসাহী সমাজসেবক ও করিৎকর্মা গবেষক, এ কথা কবিগুরু জানতেন। সবচেয়ে আশাবাদী ছিলেন তিনি তাঁর গান বিষয়ে। অকপটে বলেছেন : 'আমার গান বাঙালি জাতিকে নিতেই হবে, আমার গান গাইতেই হবে সকলকে, বাংলার ঘরে ঘরে, প্রান্তরে, নদীতীরে।' [প্রবাসী/আষাঢ়, ১৩৪৮]

আজ যখন আমরা আমাদের প্রকৃতি-পরিবেশের দিকে তাকাই, যখন গাছের শাখায় সবুজপাতায় বাতাসের ঢেউ খেলে যায়, বৃষ্টিধারাজলে নেয়ে চারদিক অনায়াসে আর্দ্রশীতল রূপ ধারণ করে, আর মেঘমুক্ত আকাশ থেকে আস্তে আস্তে উঁকি দেয় মেঘভাঙ্গারোদ, তখন রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ান আমাদের সামনে। তাঁর কথাকবিতাগান আমাদের, তাঁরই উচ্চারণ অনুসারে বলি 'সর্বাঙ্গমনে', দোলা দিয়ে যায় তার মধ্য দিয়েই আমাদের চেতনার দরোজা আরও অনেকখানি উন্মুক্ত হয়ে যায়; আর আমরা ভালোবাসি স্বদেশ কিংবা প্রকৃতিকে, ভালোবাসি মাটি-মাকে, সর্বোপরি নিজেকে।

উপরে বর্ণিত বিষয়াদির বাইরে আমার মনে হয় বিষয়টি এ-রকমও : আমাদের একান্ত নিজস্ব পরিবেশে, আমাদের পাশাপাশি বসবাসকারী এমন মানুষ নিশ্চয়ই আছে যারা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসুধার স্বাদ-উপভোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত কিংবা ওই বিষয়ে

খুব বেশিরকম নির্লিপ্ত। একজন বাংলা ভাষাভাষী তথা বাঙালিই যদি সে হয়, তা হোলে তার মধ্যে রবি ঠাকুরের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ সত্তার প্রভাব ঘটলে বলতে হবে সে এক বঞ্চিতজন, আর তা আক্ষরিক অর্থেই যেমনটি বলা যেতে পারে কোনো একজন জন্মসূত্রে এবং বিদেশে বেড়ে ওঠা বাঙালি মা-বাবার সন্তান সম্পর্কে, যে কিনা বাংলার রূপরসগন্ধবর্ণ কিছুই কখনো উপভোগ করতে পারেনি; এই মাটি ও মানুষের প্রতি যার কোনো আকর্ষণ কখনো নেই বা ছিলো না। তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুভবে এই রবীন্দ্রোপলব্ধির বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। সে এটা মানবে না বা বুঝবে না শুধু এজন্যই যে তা নয়, আসলে এই ভাবনার রাজ্যে প্রবেশের তার দিক থেকে তো কোনও প্রয়োজন নেই! কেননা, ওই মানসিক তাগিদ তার মোটেও থাকবে না যে এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রানুরাগ হচ্ছে এক ধারাবাহিক মূল্যবোধসম সুস্থ মানবিক-চেতনার পরিচর্যা। ওই বোধের সৌরভ থেকে রবীন্দ্রবিরোধীর দূরত্ব যে দুর্লঙ্ঘ্য বহুদূর।

তো যে-কথা বলতে চেয়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে, আমাদের কাছে, অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। আমাদের মানবচেতনা ও বাঙালি চেতনা কিংবা কর্মীসত্তার দিকটিকেও যদি চিহ্নিত করি সর্ববিধ ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা আমাদের আদর্শ মাপকাঠির প্রেক্ষিত ধরেই পেয়েছিলাম; আর আজ তাঁর চিরপ্রস্থানের অর্ধশতাধিক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর স্পষ্টতই তিনি আমাদের কাছে প্রয়োজন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। সভ্যতার সংকট সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বা সংকট উত্তরণের পথ নিয়ে তার ভাবনার বিষয়াবলী অনেক বড়ো ব্যাপার আমরা আপাতত আমাদের বাঙালি মনমানস আর বাঙালিত্বের কিংবা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা-সংকটের মোকাবেলাও যদি করতে চাই, আমার ধারণা সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হলে বা তাঁকে সঙ্গী করলে ক্ষতির তো কিছু নেই- বরং প্রাপ্তির দিকই অনেক বেশি। তাই মনে হয় বাংলার ঘরে ঘরে রবীন্দ্র-পাঠাভ্যাস নতুন করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়াটা এখনও বরাবরের মতোই জরুরি।

রবীন্দ্রনাথ শুধুই শিল্পসঙ্গীতের মানুষ তো ছিলেন না, সমাজমনস্কতা কিংবা বিজ্ঞানমনস্কতাও তাঁর চরিত্রের এক-একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো- ফলে বিশ্বমানবতা থেকে নিয়ে মানবসমাজের একেবারে প্রাথমিক ইউনিট ছোট্ট ঘর-সংসারের খুঁটিনাটিসহ অনেক কিছুই তাঁর সৃষ্টিশীল বিষয়াকর্মাদির আওতার মধ্যে ছিলো; সে-সবের নিকটবর্তী হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে বাঙালি হিসেবে অন্যদিকে মানুষ হিসেবে শাণিত হওয়ার সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে যুদ্ধ-গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, প্রতিবাদী ও মানববাদী তথা সমাজপ্রগতিতে বিশ্বাসীও ছিলেন বটে, কিন্তু মার্ক্সিস্ট কিংবা কমিউনিস্ট ছিলেন না, এ আমরা নিশ্চিত জানি; আর এ-ও জানি তিনি সারাজীবন সাধারণ অর্থে হিন্দুত্ব পালনকারী ধর্মপরায়ণও ছিলেন না- সেসব দিক থেকে সরাসরি নাস্তিক যেমন তিনি নন, একক কোনো ধর্মে প্রাণমন সঁপে দেয়া আস্তিকও নন। এ-কথা সুবিদিত যে, 'পিরালি' ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত তাদের পরিবারিক ধ্যানধারণা ছিলো সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রচলিত প্রথাবিরোধী

একেবারেই ভিন্ন ধাঁচের। পতিত হয়েছিলেন তাঁরা- হিন্দু ব্রাহ্মণশ্রেণির সঙ্গে সংশ্রব রাখাতো দূরের কথা, কোনোরকম সামাজিকতার সম্পর্কটাও রাখা ছিলো দুষ্কর। আর তাই সীমাবদ্ধ নিজস্ব গন্ডিতে থেকেই তাঁদের যা করবার তাঁরা করতেন। বলাবাহুল্য, ওই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই তাঁরা পরিচর্যা করে গেছেন বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সাথে সম্পর্কিত সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের। শিক্ষার আলোয় আলোকিত মর্যাদায় অভিষিক্ত আধুনিক বাঙালি সুশীল সমাজ ও বাঙালির পরিশীলিত সাংস্কৃতিক জীবনের দীক্ষা প্রদানের কাজটা ওই পরিবার কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো। আর অনিবার্যভাবে একদিন তাঁর মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ওই রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন আমাদের চিরচেনা-রবীন্দ্রনাথ।

সুতরাং তাঁর কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে। তো আমাদের কোনো প্রয়োজন এখন আর নেই তাঁকে কোনোভাবে খণ্ডিত করে দেখার, বা সে-রকম সঙ্কীর্ণ প্রেক্ষিত-প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার, কারণ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির গড়া এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ মানবসন্তান। তাঁকে সমালোচনা করার নানা দিক নিশ্চয় নিন্দুকের নোটবুকে আছে। সমালোচনার বিষয়টি আপেক্ষিক, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তা করা যেতেই পারে কিন্তু সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য করার দিকটি হচ্ছে, একজন শক্তিমান মানবসত্তার অধিকারী বিচিত্র কর্মের কাণ্ডারী ও ভাণ্ডারী এই শ্রেষ্ঠ মানুষটি তাঁর নিজের সীমায়িত অবস্থানকেন্দ্রের পরিধি থেকে আক্ষরিক অর্থেই নিজেকে মুক্ত করে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল বৃহত্তের ঐক্যচেতনাঙ্গণে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। আপাতত তাঁর সেই প্রগাঢ় উদারনৈতিক মানবিক মাহাত্ম্য-গুণের দিকটিই আমাদের কাছে লক্ষণীয় আদর্শ হতে পারে।

বাঙালি কোনোদিন পারবে না কবিগুরুর অস্তিত্ব মন থেকে মুছে ফেলতে এই তাঁকে মুছে ফেলা কিংবা নিশ্চিহ্ন করার দুরাশা যেনো কস্মিনকালেও কারও মনে উদিত না হয়, কারণ তা হবে আত্মঘাতসম। নিশ্চয় সচেতনভাবেই এই ইতিবাচকতার অভ্যাসের পরিচর্যা আমরা সচেতন বাঙালিরা করেই যাবো। তবু একটা কথা এ মুহূর্তে লিপিবদ্ধ করার তাগিদ অনুভব করি অন্তর থেকে যে, একসময় যে-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালির আধুনিক সংস্কৃতির অন্যতম অলংকার স্বরূপ, আজ তিনিই আমাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২৬৮ বঙ্গাব্দে বৈশাখের ২৫ তারিখ (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ), আর কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)। দূরত্বটা আটত্রিশ বছরের। রবীন্দ্রনাথ যখন কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবনের মধ্যগগনে উদ্ভাসিত. আর রবীন্দ্রপ্রতিভার কিরণোচ্ছটা যখন বঙ্গভূমি তথা সারা ভারতের আকাশে রীতিমতো এক সঞ্জিবনী শক্তির পরিচয়ে উৎকর্ষের চরম শিখর স্পর্শের দিকে অপ্রতিরোদ্ধ গতিতে ছুটে চলেছে সে-রকম একটা সমৃদ্ধ সময়ে রবীন্দ্রপ্রসাদধন্য নবীন কবি নজরুল কিভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবের আওতা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়ে এগিয়ে

গেলেন পরিপূর্ণতার দিকে অনেকটা যেনো তাঁরই সমান্তরাল যাত্রাপথে, এটা ভেবে আশ্চর্য হতেই হয় বৈকি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্মমুখর-জীবনের দুর্বার-গতিছন্দে তাবৎ বাধা ও প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে চলা নজল যখন বের করলেন নিজের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন:

"কাজী নজরুল ইসলাম
আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা,
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন!
১৪ শ্রাবণ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩২৯"

বাঙালি বড়োই ভাগ্যবান জাতি। বিশ্বকবি আর বিদ্রোহীকবি রবীন্দ্র-নজরুল দুজনকেই সঙ্গী করে, উত্তরাধিকার অর্জনের গৌরব নিয়ে, ঠাঁয় বসে আছে নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য কেন্দ্রিক বিজয়স্তম্ভে। রবীন্দ্র-নজরুলকে বাদ দিয়ে বাঙালির কি চলে? রবীন্দ্রসঙ্গীত-নজরুলগীতি ছাড়া অনুষ্ঠান-উৎসবপ্রিয় আধুনিক বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন প্রায় অচল! আর সবচেয়ে মূল্যবান যে-কথাটি দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি কিংবা আঙ্গিকের দিকেও যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহোলে একথা দ্বিধা-সংকোচের বালাই না রেখেই বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের 'মত' ও 'পথ' এক ছিলো না। তাই জীবনদর্শন-সাহিত্যদর্শনেও তাঁদের নৈকট্য দুয়েক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেলেও সমধিক মাত্রায় লক্ষণীয় নয়। তাঁদের বিচিত্র ব্যক্তিজীবনের আলোকে দুজনের সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অবস্থানের দিকে যদি যাই তাহোলে সেক্ষেত্রেও আপেক্ষিকভাবে সুস্পষ্ট একটা অসামঞ্জস্যের চিত্র তুলে ধরাই যাবে; কিন্তু ওই যেখানে বাংলা সাহিত্য কিংবা বাংলা কবিতা ও গানের দরবারী মজলিস বসেছে সেখানে এই দুজনকে আমরা সততই এক করে পাচ্ছি, একজন সেখানে মাননীয় সভাপতির আসন অলংকৃত করে আছেন। আর আরেকজন বিশেষ সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় অভিষিক্ত।

চাই আমরা দুজনকেই। তাঁদের মধ্যে কে কতো বড়ো কে কতোটা ছোটো, কার কতোখানি অবদান কার মর্যাদার স্তর কোন্ আসনে এ-সমস্ত প্রশ্নের তুলনামূলক পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণের আজ আর কোনো অবকাশ বাঙালির হাতে নেই। দুজনেই আমাদের অস্তিত্ব-সত্তায় মিশে আছেন সার্বক্ষণিক সঙ্গী তাঁরা আমাদের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই বিরাজ করেন; সন্তানের উপর মা-বাবার সত্তা যেমন সারা জীবন ছায়ার মতোন ভূমিকা রেখে যায়, তাঁরা সামনে থাকুন আর না-ই থাকুন আসলে তাঁদের স্মৃতিটাওতো একটা কার্যকর অদৃশ্য-রূপ বটে! সেদিক থেকে সমকালীন বাঙালির

দেহমনোপ্রাণ বস্তুতপক্ষে এই দুই মহাকবি ও মহান সঙ্গীতস্রষ্টার কাছে পিতা-মাতার মতোই ঋণী। পিতা ও মাতা যদি আমাদের জন্মদান করে থাকেন, এ-কথাটা যেমন মিথ্যা নয় তাহোলে এ-সত্যেও অবশ্যই খাদ নেই যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আর বিদ্রোহী নজরুল আমাদের দৃষ্টিদান করেছেন বাঙালির অন্তর্দৃষ্টি। বিষয়টি অনেকের কাছেই হয়তো আপেক্ষিক মনে হতে পারে তাই আমার স্বীকার করতে আজ আর দ্বিধা নেই, যারা 'বাঙালি' শব্দটিকেই আপেক্ষিকতার নাগপাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের পক্ষে এরকম মনে করাই স্বাভাবিক।

বসন্ত-বর্ষার গানসহ ঋতু-সঙ্গীত, স্বদেশপ্রেমের গান, প্রেম-বিরহ বা জীবনসত্তা ও মানুষের গান যখনই যা দরকার, তো রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুল আছেন। আছেনই। রবীন্দ্র-নজরুল সুরবাণী আমাদের অস্তিত্ব-সত্তার অংশীদার। সামগ্রিকতার বৈশিষ্ট্যে ধারাবাহিক প্রেরণার উৎসও বটে।

সুরস্রষ্টা নজরুলের কাছে আরও বাড়তি পাওয়া গেছে ইসলামী গজল, ভজন-কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি- আবার সমধিক মাত্রার বিদ্রোহ-বিপ্লবের গানও নজরুল রেখে গেছেন। উদ্দীপনা, প্রতিবাদী চেতনা আর আত্মত্যাগী ব্রত নিয়ে প্রেরণার উৎসানুকূল্যে নজরুল ইসলাম তাঁর গদ্যে-কবিতায়-গানে চমৎকার সৃজন-স্বাক্ষর রেখেছেন।

বাঙালি-মুসলিম প্রাণে ইসলামী জোশ্ উজ্জীবনের মাল-মশলাও তিনি বিস্তর জুগিয়েছেন একজন নিষ্ঠাবান সেবকের মতোই। অথচ পাশাপাশি তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণাভরে বিতারণের চেষ্টা করেছেন 'মোলা-পুরুতদের' শ্রাদ্ধ করেছেন যখনই মনে হয়েছে তাঁর। যে 'ধূমকেতু' পত্রিকার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বাণী পাঠিয়েছিলেন, তার প্রথম সংখ্যায় বিদ্রোহী কবি 'আমার পথ' রচনায় লিখেছিলেন : "ধূমকেতু" কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।" ['রুদ্র-মঙ্গল' গ্রন্থভূক্ত/তথ্যসূত্র : নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাঙলা-উনড়বয়ন-বোর্ড, ঢাকা/১১ জৈষ্ঠ্য, ১৩৭৩]

বাঙালি সংক্রান্ত বিষয়েও নজরুল ছিলেন বড়ো বেশি স্পর্শকাতর। 'যুগবাণী' গ্রন্থের 'জাগরণী' শীর্ষক রচনায় তার প্রকাশ এভাবে : "জাগো বকুল জাগো! তুমি যেখানে ফোট, সেই পল্লীতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাঙলা বাঙালির আসল প্রাণ। আমাদের এই শাশ্বত বাঙালীর সুষুপ্ত, ঘুমে-ভরা অলস-প্রাণ জাগিয়ে তোল তোমার জাগরণের সোনার কাঠি দিয়ে!" [১৩২৭ আষাঢ়ের 'বকুল'-এ 'উদ্বোধন' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত]

প্রসঙ্গত বলা দরকার, বাঙালি গীতিকারদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক গানের রচয়িতা বোধ করি কাজী নজরুল ইসলামই, আর তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য মৌলিক অবদান স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলা রাগপ্রধান গানের সৃষ্টি তিনি এর উদ্ভাবক হিসেবেও স্বীকৃত।

হ্যাঁ, একথা ঠিক যে বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে একজনকে, অর্থাৎ যার কিনা মাতৃভাষা বাংলা তাকে, বাঙালি বলা যেতে পারে; আর বাঙালি বলতে তো কোনো ধর্মকেন্দ্রিক

'শ্রেণি' বা 'গোষ্ঠী-সম্প্রদায়' কিছুই বোঝায় না- সুতরাং একজন ধর্মপরায়ণ মানুষের (আস্তিক মানুষের), সামাজিক-জীবনের নানাদিক বিবেচনায় রেখে যেহেতু যে-কোনো একটি ধর্মের প্রতি আনুগত্য রাখাটা তার ব্যক্তিসত্তার প্রেক্ষিতে অনিবার্য- সেদিক থেকে অত্র অঞ্চলের একজন বাঙালিকে 'মুসলমান' কিংবা 'হিন্দু' বা 'বৌদ্ধ-খৃষ্টান' কিছু একটা তো হতে হবেই। আর বলাবাহল্য, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব অর্জনের ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার সীমাবদ্ধতা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো রকমের বাধা। শুনতে যদিও খুব একটা শোভন হবে না কথাটা তবুও উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, কোনো ধর্মীয় উপসনালয় বা প্রার্থনাকেন্দ্রে বিধর্মী বলে চিহ্নিত কারুর প্রবেশাধিকার না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ ধর্মবেত্তা শ্রেণি তথা ধর্মাচারী গোষ্ঠীর কাছে যার যার ধর্ম অন্যের ধর্মের চেয়ে পবিত্র, একইভাবে তার ধর্মপালন হেতু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানাদিও পবিত্রতম সুতরাং বিধর্মী-গোত্রভূক্ত কেউ সেখানে প্রবেশ করলে তার মর্যাদা হানি হবে, এটাই প্রচলিত ধারণা।

তাই এমন বাধা-প্রতিবন্ধক নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িকতাবোধের অনুকূল এক বাস্তব উপাদান। কিন্তু তবুও বলা যাবে ওই বাধা যিনি মানসিকভাবে অতিক্রম করতে পারেন তিনি প্রকৃত অর্থে অন্তরে ধারণ করেন এমন এক মানবিক সত্তা, যা অনায়াসে মহাপ্রাণসত্তার প্রতিভূ এবং নিঃসন্দেহে তাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত মহামানবের গুণাবলি। আবার ধর্মাচরণের বাইরে থেকেও এই গুণের পরিচর্যা করা অসম্ভব নয়। আমাদের নিজস্ব পরিবেশেই তার প্রমাণ মিলতে পারে। এসব বিবেচনায় এনে আমারতো মনে হয় একজন খাঁটি বাঙালির জন্য খাঁটি হিন্দু অথবা খাঁটি মুসলমান প্রভৃতি হওয়াটা ততোখানি জরুরি নয়, যতোটা জরুরি হচ্ছে খাঁটি মানুষ হওয়া। এই প্রেক্ষিতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যদি এভাবে মূল্যায়ন করা যায় যে সর্বতোভাবে তিনি সেই মহৎ পথের পথিক ছিলেন, তাহোলে পরিণতিতে একথাও উল্লেখ করাটা যুক্তিযুক্ত হবে যে, তাঁর মধ্যে সেই প্রবণতা একশোভাগই ছিলো। কারণ তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন, আর জাত-ধর্মের নামে নেতিবাচক তাবৎ 'বজ্জাতি' কিংবা জালিয়াতির তিনি মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টা করে গেছেন। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছ জুয়া' গানটি ছাড়াও এর আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে।

এসব ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন তীব্র সমালোচনামুখর, আর সেই কারণে কারুর প্রতি তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নজিরও তেমন প্রত্যক্ষিভূত নয়। তাই আমার মনে হয় এককভাবে 'ধর্মীয়-বাঙালি' পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইসলামকে মূল্যায়ণ-পর্যালোচনার চেষ্টা করাটা তাঁকে অনেকটাই সংকুচিত করে দেখার হীনম্মন্য পদক্ষেপ বৈ নয়। আর সেজন্যই মনে করি ওই নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে তাঁকে উদ্ধার করা প্রয়োজন তাহোলে মানবপ্রেমিক। আর একই সঙ্গে জীবনবাদী ও শান্তিবাদী। রোমান্টিক এবং বাংলার প্রকৃতিপ্রেমিক কবি-গীতিকার ও সুরস্রষ্টা নজরুলের পরিচয় সুস্পষ্ট হবে। ভবিষ্যতের ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বৃহত্তর বাঙালি সমাজ গড়ে তোলার মতো একটা বাস্তবানুগ পথানুসন্ধানের সম্ভাবনার সৃষ্টিও তা থেকে হতে পারে। আর এই প্রেক্ষিতে

রবীন্দ্রানুশীলনের সুপ্রশস্ত পথখানিতো বরাবরের মতো সহায়তা প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়েই আছে। যে-রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' শীর্ষক মহৎ কাব্যের ঔদার্যমন্ডিত চমৎকার মূল্যায়ন নজরুলের সৃজনশীল লেখনিতেই সম্ভব হয়েছিলো। কবিগুরুর প্রতি পরম শ্রদ্ধায় নিবেদন করেছিলেন তিনি তাঁর সেই দীর্ঘ কবিতা একই শিরোনামে, যার শুরুতেই কবিতাটির উৎস-প্রেরণা সম্পর্কে বন্ধনীতে উল্লেখ করেছিলেন 'কবি-সম্রাট' রবীন্দ্রনাথের "আজি হতে শতবর্ষ পরে" পড়িয়া'। ওই প্রসিদ্ধ রচনার কয়েকটি পংক্তির উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই আজকের এই আলোচনার ইতি টানা যুক্তিযুক্ত মনে করি :

"তোমা হ'তে শত বর্ষ পরে
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি,
হে কবীন্দ্র, অনুরাগ-ভরে!
আজি এই মদালসা ফাগুন-নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে!
চতুরালি, ধরিয়াছি তোমার চাতুরী!
করি' চুরি
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে,
কাব্য হ'য়ে, গান হ'য়ে, সিক্তকণ্ঠে রঙ্গীলা স্বপনে।
আজিকার যত ফুল বিহঙ্গের যত রক্ত-রাগ
তব অনুরাগ হ'তে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ!
আজি নব-বসন্তের প্রভাত-বেলায়
গান হ'য়ে মাতিয়াছ আমাদের যৌবন-মেলায়!"

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

মনজুরুল হক

জাপান ও ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার

জাতিসত্তার দিক থেকে জাপান হচ্ছে একক জাতিগোষ্ঠীর দেশ, অর্থাৎ সবাই এখানে জাপানি। একই এদের ভাষা, একই চেহারা, এমন কি চালচলনও। যদিও অতীতে দেশের উত্তরে আইনু নামের ভিন্ন একটি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। তবে কয়েক'শ বছরের আগ্রাসন আর নিপীড়নের মুখে আইনু এখন বিলুপ্ত-প্রায় প্রজাতি। জাপানের আধুনিকতার সূচনা লগ্ন মেইজি যুগে, যেটা শুরু হয়েছিল ১৮৬৮ সাল থেকে, আইনুদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্মাচার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। ফলে অনেকেই এরা পরবর্তী কালে রূপান্তরিত জাপানিতে পরিণত হয়। ফলে জাপানে এখন কার্যত সকলেই জাপানি এবং দেশটি হচ্ছে ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় হোমোজিনিয়াস। কেবল যে চেহারা আর ভাষা তাই শুধু নয়। পোশাকের দিক থেকেও সবাই প্রায় একইরকম এবং কেউ কেউ মনে করেন চিন্তাভাবনাও এরা করেন একই সমান্তরালে। সেরকম এক দেশে ব্ল্যাক লাইফ বা ব্ল্যাক পাওয়ার বলতে কি বুঝায় তা অনুধাবন করা খুব কষ্টকর। বিশেষ করে জাপানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কালো মানুষের কাছাকাছি আসার সূচনা যখন হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের দখলাধীনে দেশটি চলে আসার সময় থেকে। কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন সৈন্যদের জাপানে অনেকেই তখন দেখেছিলেন স্রষ্টার অদ্ভুত সৃষ্টি হিসেবে।

সেরকম এক সময়ে কিংবা তারও অল্প আগে জাপানের দূরবর্তী এক পল্লীর মানুষদের কালো মানুষের সংস্পর্শে আসার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী জাপানি লেখক কেনজাবুরো ওয়ে'র লেখা এক ছোট গল্পে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সেই গল্পের শিরোনাম হচ্ছে "প্রাইজড স্টক" বা খামারের দামি পশু। গল্পের নামকরণের দিকে পাঠক খেয়াল রাখলে বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না কোন চোখে সেই দূর পাড়াগাঁয়ের মানুষ দেখেছিলেন ভাগ্যহত এক কৃষ্ণাঙ্গকে, জাপানি সেনাদের গোলার আঘাতে হামলা করতে আসা বিমান বিধ্বস্ত হলে যে বৈমানিক প্রাণে বেঁচে গেলেও ধরা পড়েছিল গ্রামবাসীদের হাতে। বৈমানিককে গ্রামবাসীরা আটক করলে তাকে নিয়ে কি করবে তা তারা ভেবে পাচ্ছিল না। ফলে শহর থেকে নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত গ্রামেই তাকে আটক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গ সেই মার্কিন বৈমানিকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানের এক দূরবর্তী গ্রামে আটক থাকা এবং তার সাথে গ্রামবাসীদের আচরণের উপর কেন্দ্রীভূত সেই কাহিনীতে ভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষদের নিয়ে জাপানের সাধারণ জনগণের মনোভাবের পরিচয় মেলে। মার্কিন বিমানচালক সেই কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ায় আসলেই সে ছিল মূল্যবান এক সম্পদ। গ্রামের ছোট ছোট বালক-

বালিকার কাছে সে হয়ে উঠে মূল্যবান কোন মানুষ নয়, বরং পশু। সেই যুদ্ধবন্দীর সাথে আচরণের মধ্যে দিয়ে ওয়ে বালক জীবনের মনস্তত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে গেলেও সেটা আসলেই ছিল জাপানি মনস্তত্ত্বেরই একটি অংশ। এটা আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে মূল বালক চরিত্র যখন সেই যুদ্ধবন্দীকে নিগার হিসেবে সম্বোধন করার মধ্যে দিয়ে নিজের বয়ঃপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়।

জাপান এখন আর আগের সেই জাপান নেই। তবে তারপরও বলতে হয় অনেক কিছুই জাপানে যেন গভীর কোন নদীর নিচ দিয়ে বহমান স্রোতের মত রয়ে গেছে, উপর থেকে যা সহজে নজরে আসে না, তবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে এর আঁচ অনুধাবন করা যায়। বর্ণ পরিচয়ের দিক থেকে জাপানিরা পীত গোষ্ঠীর হলেও এদের অবস্থান শ্বেতাঙ্গদের অনেকটা কাছাকাছি এবং জাপানিরা নিজেরাও এটা নিয়ে তৃপ্ত আর সন্তুষ্ট। ১৯৭০এর দশকে এপারথেইড দক্ষিণ আফ্রিকা যখন ব্যবসায়িক স্বার্থ বিবেচনা করে জাপানিদের 'সম্মানিত সাদা মানুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, জাপানে অনেকেই তখন খুশী হয়েছিলেন। ফলে জাপানে "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার" আন্দোলনের প্রভাবকে মনে হয় সেরকম হিসাব-নিকাশের আলোকে বিবেচনা করে দেখা দরকার। শহুরে তরুণদের মধ্যে এটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেও কৃষ্ণাঙ্গ জীবনধারা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে পদে পদে নিগৃহীত হওয়ার যে জীবন কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর অনেককে যাপন করতে হচ্ছে, সেটা প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করা জাপানীদের পক্ষে মনে হয় তেমন সহজ নয়। ফলে এই আন্দোলনের ভ্রান্ত উপস্থাপনা কিংবা ব্যাখ্যাও সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে জাপানের নাগরিক সম্প্রচার কেন্দ্র এন এইচ কে'র ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার্ নিয়ে তৈরি একটি বিজ্ঞাপনী ভিডিও ক্লিপিং তুলে নেয়া হচ্ছে এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সংবাদ বিষয়ক একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার প্রতিবাদ বিক্ষোভের পটভূমি তুলে ধরতে সংক্ষিপ্ত সেই এনিমেশন ভিডিও তৈরি করা হয়, এন এইচ কে যেটা টুইটারে আপলোড করেছিল। এতে একজন বলিষ্ঠ পেশির কালো মানুষকে দেখানো হয়েছে, কালো রঙের ট্র্যাঙ্ক আর সাদা গেঞ্জি পরা যে ব্যক্তি সাহেবি পোশাকের একজন শ্বেতাঙ্গের দিকে খালি মানিব্যাগ ধরে রেখে চিৎকার করে অভিযোগ করে যাচ্ছিলেন। সেই ভিডিও ক্লিপিং প্রচারিত হওয়ার পর অভিযোগ উঠেছিল যে এন এইচ কে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারকে এর সার্বিক ব্যাপ্তির আলোকে বিচার না করে শুধুমাত্র এর অর্থনৈতিক দিকটির উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে এন এইচ কে দ্রুতই সেই ক্লিপিং প্রত্যাহার করে নেয়।

তবে এর অল্প কিছুদিন পর দেড় মিনিটের আরেকটি ভিডিও সম্প্রচার কেন্দ্র আপলোড করে, যেখানে দেখা যায় আগের দৈত্যাকার সেই কালো মানুষ ওয়ালেট খুলে ধরে চিৎকার করে কিছু বলতে থাকা অবস্থায় আশপাশের অন্য কৃষ্ণাঙ্গরা গান-বাজনা, এমনকি লুটপাটেও মগ্ন। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে দৈত্যাকার সেই কৃষ্ণাঙ্গের হাতে ধরে রাখা ওয়ালেটটি হচ্ছে সাধারণত মহিলাদের ব্যবহার করা ওয়ালেট। ফলে ঠিক কোন

বার্তা ভিডিও দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ার সুযোগ অনেকে রয়ে গেছে। প্রতিবাদের মুখে এটাও অবশ্য এন এইচ কে'কে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তুলে নেয়।

তবে জাপানের তরুণ প্রজন্ম এখন আগের চাইতে অনেক বেশি কৃষ্ণাঙ্গদের সংস্পর্শে আসায় এবং জাপানি তরুণদের সাথে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকায় হাওয়া মনে হয় এখন এখন কিছুটা হলেও পাল্টাতে শুরু করেছে। তবে সেটাও অনেকাংশে সীমিত আছে জাপানি-কৃষ্ণাঙ্গের পরিবারের নতুন প্রজন্মের সদস্যদের দেখিয়ে যাওয়া সাফল্যের মধ্যে। যে কয়েকটি নাম জাপানে আজকাল আলোচিত, সেই তালিকায় শুরুতেই আছে টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা। নাওমির বাবা হাইতি থেকে আসা এবং মা জাপানি। টেনিসে রীতিমত সাড়া জাগিয়ে ফেলায় জাপানি তরুণদের অনেকেই কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠছে এবং দেশের প্রধান শহরগুলোতে "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার্র" মিছিলে এরাই ছিল সংখ্যাধিক্য। অন্যদিকে আবার "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার" আন্দোলনের সমর্থনে নাওমি ওসাকার দেয়া টুইট বার্তায় বিরূপ মন্তব্যের সংখ্যাও কম নয়। ফলে বিভ্রান্তি যে একেবারে দূর হয়েছে তা বলা যায় না।

এর বিপরীতে শ্রেণী বৈষম্য কাটিয়ে উঠার আরেকটি তরঙ্গ জাপানে বহমান, যার অনুসারীরা বলছেন জাপানের বেলায় ব্ল্যাক লাইফ নয় বরং অল লাইফ ম্যাটার্স হবে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। শ্রেণী বৈষম্য ধরে রাখার জন্য জাপানের শাসক শ্রেণিকে দায়ী করে এরা বলছেন জাপানের ভুলে যাওয়া উচিৎ হবেনা ১৯৩০ ও ১৯৪০এর দশকের প্রথমার্ধে চীনা ও কোরীয়দের প্রতি রাজকীয় সামরিক বাহিনীর আচরণ, দেশের দক্ষিণ পন্থীরা এখনও যা স্বীকার করে নিতে নারাজ। ইতিহাসের এই তিক্ত অধ্যায়টি নিয়ে জাপান ও দুই কোরিয়ার মধ্যে চলা বিবাদের স্থায়ী কোন নিষ্পত্তি এখনও হয় নি। নিষ্পত্তি হয় নি যুদ্ধকালীন কোরিয়া উপদ্বীপ ও চীনে সেখানকার তরুণীদের যৌন সেবা দানে বাধ্য করার বিষয়টিরও। ফলে এই দলের সমর্থকদের যুক্তি হচ্ছে জাপানের মত কৃষ্ণাঙ্গ জীবনের সাথে সেভাবে পরিচয় না থাকা একটি দেশের জন্য মানব জীবন মূল্যবান ধ্বনি তোলা হবে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত।

এই বিতর্ক অবশ্য জাপানে নতুন কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই এটা কার্যত চলমান। এর একদিকে আছে মূলত দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ধারক ও বাহকরা, অন্যদিকে আছে অগ্রসর চিন্তার মানুষজন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার গুরুত্ব যারা কেবল অনুধাবনই করেন নি, একই সাথে জাপানিদের সেই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে অবদান রেখে গেছেন।

নাগিসা ওশিমা জাপানের নেতৃস্থানীয় চলচ্চিত্র পরিচালকদের একজন, বিদেশী যুদ্ধবন্দীদের প্রতি জাপানিদের আচরণ নিয়ে অসাধারণ একটি ছবি যিনি তৈরি করেছিলেন ১৯৮০র দশকে। যুদ্ধবন্দী শিবিরের অধিনায়ক বন্দীদের বাধ্যতামূলক শ্রমেই কেবল নিয়োগ করেন নি, সেই সাথে নানারকমভাবে এদেরকে নিগৃহীত, অপমানিত করেছে। যুদ্ধের হাওয়া ঘুরে গেলে সেই শিবির অধিনায়ককে দেখা যায় পাল্টা

ভূমিকায় এবং আগের একজন বন্দি মিঃ লরেন্স তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তাকে এভাবে অর্থাৎ "মেরি খ্রিস্টমাস মিস্টার লরেন্স" বলে সম্ভাষণ করেছিলেন তিনি। যে বার্তা ওশিমা এর মধ্যে দিয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তা হল, মানবতা সমুন্নত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব এবং এর বিচ্যুতি ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে, সেটাও সকলের জন্য।

(লেখক টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজের অধ্যাপক এবং প্রথম আলোর জাপান প্রতিনিধি)

ইয়কোসুকা সিটি, কানাগাওয়া, জাপান

মল্লিকা ধর

এই আশ্চর্য মহাবিশ্ব

এই যে আমাদের মহাবিশ্ব, এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। মহাবিশ্ব কী? আমরা যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করি, সেই পৃথিবী হল ছোট্টো একটা গ্রহ। এই গ্রহ ঘুরছে সূর্যের চারপাশে, সূর্য হল নক্ষত্র। পৃথিবীর মতন আর পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় বড় আরও কতগুলো গ্রহ ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। উপবৃত্তাকার নানা কক্ষপথে এরা ঘুরে চলেছে সূর্যকে ঘিরে (কোনো কোনো গ্রহকে ঘিরে আবার ঘুরছে এক বা একাধিক উপগ্রহ)। এরা সূর্যের গ্রহমন্ডলী। সূর্য আর তার গ্রহমন্ডলীকে একসঙ্গে বলা হয় সৌরজগৎ।

এই বিশাল সৌরজগৎও ঘুরছে। ঘুরছে কার চারপাশে? মিল্কিওয়ে বা ছায়াপথ নামের বিরাট এক গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে। এই গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছে সূর্যের মতন আর সূর্যের চেয়ে আরো অনেক বড় বড় নক্ষত্র ও সেই নক্ষত্রদের গ্রহমন্ডলী নিয়ে। কত নক্ষত্র? কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র। ভাবলেও মাথা ঘুরে ওঠে। এছাড়াও আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম অন্যান্য মৌলিক পদার্থের গ্যাস দিয়ে তৈরি নেবুলা, আছে নিউট্রন দিয়ে তৈরি পালসার, আছে আরও অনেক কিছু। সব নিয়ে এই বিশাল গ্যালাক্সি।

মহাবিশ্বে এইরকম গ্যালাক্সি আছে অনেক। কত? বহু হাজার কোটি গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সিরা দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অন্ধকার মহাশূন্যের বুকে। এই বহু হাজার কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে যে বিরাট মহাশূন্য, সেই সবটাকেই একসঙ্গে বলা হয় দৃশ্যমান মহাবিশ্ব (Universe)।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার আছে। এ মহাবিশ্ব ক্রমাগতঃই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সিরা ক্রমেই পরস্পরের থেকে দূরে আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

তাই প্রশ্ন ওঠে, এই বিরাট ব্যাপারটা সম্ভব হল কী করে? এ কি চিরকালই এমন ছিল? নাকি একসময় এর সূচনা হয়েছিল? এ কি কেবল প্রসারিতই হতে থাকবে?

এই মহাবিশ্ব কী করে সৃষ্টি হল। কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিবর্তন ঘটল। ভবিষ্যতে এর পরিণতি কী হবে। এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা ও চর্চা হয় যে ফিল্ডে। সেই ফিল্ডের নাম কসমোলজি। মহাবিশ্ব বিদ্যা।

পল স্টাইনহার্ট আর নিল টুরোক দিয়েছেন মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পরিবর্তন, লয় ও আবার নবজন্ম– এইরকম চক্রাকার এক ধারণা। একে বলে সাইক্লিক কসমোলজি বা চক্রাকার বিশ্বতত্ত্ব।

আচ্ছা, সেই যে বলছিলাম মহাবিশ্ব প্রসারণশীল, সেটা জানা গেল কী করে? এডউইন হাবলের গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছিল এটা। তিনি গ্যালাক্সিদের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন গ্যালাক্সিরা সবাই দূরে সরে যাচ্ছে যে, গ্যালাক্সি যত দূরে তার সরে যাবার গতিবেগ তত বেশি।

গ্যালাক্সিদের এই দূরে চলে যাবার পর্যবেক্ষণ থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণশীলতার ধারণা এসেছিল। এ এমন এক মহাবিশ্ব, যার স্থানকাল কেবল প্রসারিত হয়, ছড়িয়ে যায়। গ্যালাক্সিরা একে অপরের থেকে দূরে চলে যায় যা গ্যালাক্সিদের বর্ণালি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। গ্যালাক্সিদের বর্ণালিতে লোহিত অপসরণ (Red Shift) দেখা যায়।

লোহিত অপসরণ মানে হলো এইসব গ্যালাক্সিদের থেকে আসা আলোকে প্রিজম বা কোনো আলোক বিশ্লিষ্ট করার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে দিয়ে দেখা যায় এদের বর্ণালি লালের দিকে (বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে) সরে গেছে। এরকম হবার কারণ? বিজ্ঞানী ডপলারের আবিষ্কার থেকে আমরা জানি যে, কোনো তরঙ্গ উৎস যদি আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তবে আপাত তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায় ।

অতীতে গ্যালাক্সিরা সবাই অনেক কাছাকাছি ছিল, একেবারে সৃষ্টিমুহূর্তে একেবারে একসাথে মিলে ছিল সব। সেই সৃষ্টিমুহূর্ত হল মহাবিস্ফোরণ (Big Bang)। তারপর থেকেই সবকিছু ছুটে পালাচ্ছে দূরে আরো দূরে। কিন্তু তার আগে কী ছিল? মহাবিস্ফোরণের আগে?

তাত্ত্বিকেরা বলতেন স্থানকালের সৃষ্টিও মহাবিস্ফোরণে, তাই তার আগে কী ছিল এই প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ তখন তো কালেরই অস্তিত্ব ছিল না! কালই যদি না থাকে তবে আগেই বা কী পরেই বা কী? কেউ কেউ তখন তর্ক জুড়তেন স্থানকাল কীসের থেকে সৃষ্টি হল? কোনোকিছুর থেকে যদি স্থানকাল সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই জিনিস মহাবিস্ফোরণের আগেও ছিল। কী সেই জিনিস? এইসব নানা বাদানুবাদ তর্কবিতর্ক প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্ন লেগেই ছিল। সাম্প্রতিক কালে স্ট্রিং তত্ত্ব বিতর্ক আরো উসকে দিল। পুরানো প্রশ্ন গুলোর সঙ্গে আরো নানা নতুন নতুন প্রশ্ন যোগ হল।

স্ট্রিং-তত্ত্বে নতুন মাত্রার (ডাইমেনশন) এর প্রয়োজন হয়ে পড়লো, আমাদের চেনা তিনটি স্থানিক মাত্রা- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর একটি কাল মাত্রার যে জগৎ- তাতে আর কুলালো না স্ট্রিং তত্ত্বে। বহু অতিরিক্ত মাত্রার প্রয়োজন হয়ে পড়লো গণিত মেলাতে। স্টাইনহার্ট আর টুরোক নতুন বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে অগ্রসর হলেন নতুন জ্ঞানের আলোয়। তাঁরা বললেন, আমাদের চেনা তিনটি স্থানমাত্রা আর একটি কালমাত্রার জগৎ আসলে আছে উচ্চতর মাত্রার জগতের ভিতর। এই জগৎ হলো ডি-ব্রেনের (D-brane) জগৎ। এই ব্রেন কথাটা এসেছে মেমব্রেন থেকে।

আমাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতাময় জগৎ হলো 3D-ব্রেনের জগৎ, তা ছুটে চলেছে চারমাত্রা বা পাঁচমাত্রার জগতের ভিতর দিয়ে। যেমন ধরা যাক খাতার একখানা পাতা খাতা থেকে ছিঁড়ে গিয়ে হাওয়ায় উড়ে চলেছে। খাতার পাতার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছাড়াও সামান্য

পুরুত্ব আছে, এখন গণিতের খাতিরে পুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা হলো। যা রইলো তা হলো একটা দ্বিমাত্রিক জিনিস উড়ে চলেছে ত্রিমাত্রিক স্থানের মধ্য দিয়ে। এই তুলনা থেকে কল্পনা করে নিতে হবে আমাদের চেনা ত্রিমাত্রিক মহাবিশ্ব (কাল মাত্রাটি হিসাবে ধরলে চতুর্মাত্রিক) উচ্চতর মাত্রার জগতের ভিতর দিয়ে চলছে। আমরা নিজেরা ত্রিমাত্রিক জগতের জীব, আমাদের পক্ষে উচ্চতর মাত্রা কল্পনা করা সোজা না, কারণ আমাদের মগজ বিবর্তিত হয়েছে ত্রিমাত্রিক দেশকালের উপযোগী হয়ে।

যাইহোক, গণিতের সহায়তায় বিজ্ঞানীরা অনায়াসে উচ্চতর মাত্রা নিয়ে হিসাব কষতে পারেন তবে কিনা দৃশ্যমান হিসাবে সে জগত কল্পনা করা শক্ত। আমরা যদি দ্বিমাত্রিক তলের উপরে ছায়ামানুষ হিসাবে জীবন কাটাতাম তাহলে যেমন "উপর" বা "নিচ" আসলে কী, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না। আমাদের জগতের মতন আরো অনেক জগৎ- 3D ব্রেন, ভেসে চলেছে উচ্চতর মাত্রার জগতের ভিতর দিয়ে। স্ট্রিং-তত্ত্বের সমীকরণ গুলি ইঙ্গিত দেয় এইসব 3D ব্রেনেরা কাছাকাছি অন্য ত্রিমাত্রিক ব্রেনের উপরে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। ব্রেনে ব্রেনে ঘষা খেলেই এই শক্তি ছাড়া পায়, এই শক্তির প্রকাশ দেখা দিতে পারে মহাবিস্ফোরণ হিসাবে। শক্তি জন্ম দেয় পদার্থের, আইনস্টাইনের শক্তিবস্তু নিত্যতা সূত্র অনুসারে। ক্রমে তৈরি হয় গ্যালাক্সিরা, জ্বলে ওঠে তারারা, তৈরি হয় গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি।

ত্রিমাত্রিক ব্রেনের স্থানকাল প্রসারিত হয় যেমন, আমাদের মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। আর উচ্চতর মাত্রায় গোটা গোটা ত্রিমাত্রিক ব্রেনও পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। একসময় ত্রিমাত্রিক ব্রেনের ভিতরে এই প্রসারিত দেশকাল এত পাতলা হয়ে যায় যে প্রায় শূন্যই তখন তাকে বলা যায়, সব বস্তুরা পরস্পর থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যায়। এইরকম ফুলেফেঁপে বিশাল আর ভিতরপাতলা হয়ে উঠলে তখন ত্রিমাত্রিক ব্রেনেরা আবার পরস্পরকে আকর্ষণ করতে শুরু করে। কাছে এলেই আবার ঘটে সংঘর্ষ, আবার বিস্ফোরণ, শক্তি মুক্ত হওয়া, পদার্থের সৃষ্টি, আবার গ্যালাক্সি নক্ষত্র গ্রহ। নতুন করে সৃষ্টিচক্র শুরু হয়।

এইরকম "নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ" মডেলে এক মহাবিস্ফোরণ থেকে আরেক মহাবিস্ফোরণের মধ্যের সময়কাল এক ট্রিলিয়ন (হাজার বিলিয়ন) বছর। আমাদের মহাবিশ্ব মাত্র ১৩.৭ বিলিয়ন বছর পার করেছে। এখনও একে শিশুই বলা যায়। হাজার বছর যার আয়ু তার কাছে ১৩ বা ১৪ বছর আর তেমন কী?

বারে বারে নতুন হওয়া মহাবিশ্বের মডেল সৃষ্টির আগে কী ছিলো সেই প্রশ্নের মীমাংসা করে দেয়। "আগে" ছিলো আরো আরো পুরাতন মহাবিশ্ব, মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাং) মাত্র একবার ঘটেনি, ঘটেছে আরো আরো বহুবার। মহাবিস্ফোরণে স্থানকালের সৃষ্টি না, তার আগে অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতিও লয় ঘটেছে। নতুন রকম ধারণা, নতুন গণিত। বহু লোকে চমৎকৃত, কেউ কেউ বিরক্ত। এই চক্রাকার মহাবিশ্ব মডেল নিয়ে বিরক্ত লোকেদের মধ্যে একজন হলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ শন ক্যারল। তাঁর নিজের ধারণার মহাবিশ্ব মডেল আরো রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়কর ।

মাল্টিভার্স বা বহুজগৎ তত্ত্ব। কিভাবে এলো এই তত্ত্ব? কারাই বা দিলেন এই তত্ত্ব?

শন ক্যারোল চিন্তিত ছিলেন সময়ের গতিমুখ নিয়ে। কেন সময় একমুখী? কেন সর্বদাই গতকাল থেকে আজ হয়ে আগামীকালের দিকে বয়ে চলে সময়?

সময়ের ধারা কি উল্টোদিকে বইতে পারে কোথাও? কোথাও কি আগামীকাল→আজ→গতকাল হতে পারে? যদি না হয়, তবে তার কারণ কী? "পরে" কেন পরে? "আগে" কেন আগে? প্রতিসাম্যের (সিমেট্রি) ধারণা সময়ের ব্যাপারে চলে না কেন? মহাবিশ্ব এই মুহূর্ত থেকে কয়েক বিলিয়ন বছর পরে যা হবে কয়েক বিলিয়ন বছর আগে তা ছিলো না, অন্যরকম ছিলো। সময়সাম্য নেই আমাদের মহাবিশ্বে, তার কারণ কী?

উচ্চতর মাত্রার ব্যাপারেও শন ক্যারোল খুব উদার। শুধু অতিরিক্ত মাত্রা জুড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতে চান না, তিনি অসংখ্য মহাবিশ্ব জুড়তে চান তাঁর তত্ত্বে। তিনি দেখাতে চান সময়ের গতি কোথাও অতীতমুখী, কোথাও ভবিষ্যৎমুখী। কোনো সমীকরণ যদি কোনো একটি কণার গতি বর্ণনা করে, সেখানে সময় অতীতমুখী না ভবিষ্যৎমুখী বোঝার উপায় নেই, +t সময়কে -t দিয়ে বদলে দিলেও সমীকরণ একই থাকে, সময় একেবারে প্রতিসম। ধরা যাক, একটি রেণু জলের মধ্যে ব্রাউনীয় গতিতে এলেমেলো ঘুরছে। অণুবীক্ষণে লাগানো সিসিডি ক্যামেরায় এর গতির ভিডিওচিত্র তুলে নিয়ে পরে চালিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভিডিও সোজা বা উল্টো চালালে একইরকম দেখাচ্ছে। কোনটা আগে কোনটা পরে বোঝার উপায় নেই, একইরকম এলেমেলো গতি। কোনো কণা বৃত্তাকারে ঘুরছে, এর গতির ভিডিও তুললেও একই, সোজা বা উল্টা চালালে তফাৎ ধরা পড়ে না।

কিন্তু বহু কোটি কণার সমাহারে তৈরি কোনো বড় বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যাপার গুরুতর। বহু কণার সম্মিলিত আচরণ সময়কে একটা একমুখিনতা দেয়। তখন পার্থক্য করা যায় কোনটা আগে কোনটা পরে। চীনা মাটির কাপ হাত থেকে শক্ত মেঝেয় ফেলে দিন। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, টুকরোগুলো লাফিয়ে জড়ো হয়ে জুড়ে গিয়ে কাপ আর হবে না (চীনেমাটির কাপপ্লেটের ব্যবসা যারা করে তারা শান্তিতে করেকম্মে খাবে)। অর্থাৎ পরিষ্কার "আগে" আর "পরে" আলাদা করা যাচ্ছে এই বড় বস্তুদের ক্ষেত্রে।

প্রতিটা তন্ত্র (সিস্টেম) চলতে চায় সুস্থিতির (ইকুইলিব্রিয়াম) দিকে, এনট্রপি বলে একটা মাপ ব্যবহার করা হয় পূর্ণ সুস্থিতি থেকে তন্ত্রটি কত দূরে তা বোঝানোর জন্য। যে কোনো সিস্টেমে এনট্রপি কেবল বাড়ে, বেড়েই চলে, কখনো কমে না। আমাদের চেতনায় সময়ও চলে কম এনট্রপির থেকে বেশী এনট্রপির দিকে। তাই সময়ের গতিমুখ অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণ ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছে গেলে তখন এনট্রপি সর্বোচ্চ, সময়ের আর তখন কোনো অর্থ নেই কারণ কোনো পরিবর্তন আর হচ্ছে না ।

আমাদের মহাবিশ্ব ১৩.৭ বিলিয়ন বছরের পুরানো। এ যখন প্রসারিত হতে শুরু করেছিল তখন এর এনট্রপি ছিল খুব কম। যত সময় যেতে থাকল তত এনট্রপি বাড়তে লাগল। কেন প্রথমে এনট্রপি কম ছিল? আরো বহু বেশী সম্ভাবনা ছিল এমন কোনো অবস্থায় শুরু হওয়া যে ক্ষেত্রে এনট্রপি শুরুতেই থাকতো খুব বেশী। কিন্তু সেরকম

অবস্থায় তো শুরু হয় নি! এটা এমন অবস্থাতেই শুরু হয়েছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হতে পারে গ্যালাক্সিরা, তারারা, গ্রহেরা। সৃষ্টি হতে পারে জীবন, বিবর্তনের ধারা বেয়ে আসতে পারে আমাদের মতন জীব যারা প্রশ্ন করতে পারে এই যে বিপুল জগৎ- এর শুরু কোথায়, শেষ কোথায়?

কেন এমন হল? শুধুই এক আশ্চর্য সমাপতন? মিরাকল? শন ক্যারোল এই ধরনের ব্যাখায় সন্তুষ্ট না মোটেই, তিনি এর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখা খুঁজে পেয়েছেন অতিস্ফীতি (ইনফ্লেশন) তত্ত্বের মধ্যে। আশির দশকে বিজ্ঞানী অ্যালান গুথ দিয়েছিলেন মহাবিশ্বের অতিস্ফীতি তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে, আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথমে একটা অতি দ্রুত বিপুল প্রসারণের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল যে প্রসারণে এই মহাবিশ্ব অতি অল্প সময়ে অতি ক্ষুদ্র আকারের অবস্থা থেকে বহু বহু কোটি গুণ বড় আকার ধারণ করে। এই মারাত্মক দ্রুত প্রসারণকেই বলে ইনফ্লেশন ।

পরে গুথ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে ওরকম স্ফীতি একবারেই শেষ হয়ে যায় না, আমাদের এখানে শেষ হলেও সে হয়তো ঘটে চলেছে অন্যখানে। অর্থাৎ শুধু আমাদের মহাবিশ্বই না, এরকম দ্রুত ফুলে ওঠা জগৎ তৈরি হয়েছে আরো অসংখ্য । আসলে ইউনিভার্স না, আছে মালটিভার্স। অসংখ্য প্রসারণশীল জগৎ।

শন ক্যারোলসহ অনেক বিজ্ঞানী বলেন (এবং অঙ্ক কষে দেখান) যে অসংখ্য মহাবিশ্ব বেরিয়ে আসতে পরে শূন্য থেকে। কারণ শূন্য শুধু শূন্য নয়, আমরা যাকে শূন্য বলে ভাবি তা আসলে অবিরাম কোয়ান্টাম আলোড়নে আলোড়িত। সেখানে অনবরত চলতে থাকে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশান, ক্রমাগত চলতে থাকে ভার্চুয়াল বা অলিক কণাদের সৃষ্টি ও ধ্বংস। এই অলিক কণারা শূন্য থেকে শক্তি ধার করে মুহূর্তখানেকের জন্য মূর্ত হয়। তারপর তাদেরকে ডিটেক্ট করার আগেই আবার শূন্যতে বিলীন হয়ে যায়।

এই কোয়ান্টাম আলোড়ন থেকে একেবারে "কিছু না "থেকে সৃষ্টি হতে পারে দেশ-কাল (space-time)। বেশীরভাগ দেশ-কালই আবার অলীক কণার মত "কিছু না" তে বিলীন হয়ে যায়। আর কিছু অতিস্ফীতির ফলে বিলীন হয় না, পরে অতিস্ফীতি থেমে গেলেও সে প্রসারিত হতেই থাকে। আবার তার ভিতরেও স্থানকাল একসময় খুব বস্তুবিরল হয়ে যায়। সেখানে আবার নতুন মহাবিশ্ব ফুটে উঠতে পারে যেভাবে আদি মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। অসীম জগৎ, অনন্ত গতিময় সৃষ্টিস্থিতিলয়। এই সব বহু জগতে কোথাও সময় ভবিষ্যৎমুখী, কোথাও অতীতমুখী, কোথাও এনট্রপি খুব কম থেকে শুরু হয়, কোথাও শুরুতেই বেশী থাকে।

আমাদের মতন মহাবিশ্বগুলিতে যেখানে শুরুতে এনট্রপি কম ছিল আর সময়ের গতি অতীত থেকে ভবিষ্যৎমুখী সেখানেই জটিল গঠনের গ্যালাক্সিরা তৈরি হয়, তারারা জ্বলে ওঠে, গ্রহেরা তৈরি হয়। আমাদের মতন জটিল জীবেরা তৈরি হয়। আমাদের মহাবিশ্বের যে জীবন তৈরি হওয়ার অনুকূল অবস্থা, তা সমাপতন নয়। অনেক মহাবিশ্বের মধ্যে সে একটামাত্র, এখানে জীব-অনূকূল পরিবেশ আছে বলেই আমরা এসেছি, আমরা আসবো বলে এত মেপেজুপে হিসেব করে মহাবিশ্ব তৈরি হয়নি। মাল্টিভার্স তত্ত্বে মাল্টিভার্স

চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এর অবস্থাও চিরকাল একই, মহাবিশ্বসমূহ সৃষ্টি হচ্ছে আবার লয় পাচ্ছে। এই তত্ত্বে সব মিলিয়ে দেখতে গেলে চিরকাল একই আছে- চিরকালীন আলোড়ন ও পরিবর্তনের মধ্যে অচঞ্চল, অপরিবর্তনীয়।

জনসন সিটি, টেনেসি, যুক্তরাষ্ট্র

মাহ্‌তাব আহ্‌মেদ

অপচয়

কিছু দিন আগের কথা। আমার পরিবারকে বিছানায় রেখেই সাত সকালে উঠে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বসে গেলাম টেবিলটা খুলে ফেলার জন্য, যেন সে টের না পায়। কারনণ সে জানে আমি কোন কিছুই ফেলে দেয়ার পাত্র নই, তা যত অপ্রয়োজনীয়ই হোক না কেন। টেবিলটা আঠার বছর আগে কিনেছিলাম এক ইয়ার্ড সেল থেকে বড় ছেলের পড়ার টেবিল হিসেবে যখন সে প্রাথমিক স্কুলে পড়ত। পরে সে হাই স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই নিজের রোজগারের পয়সায় পছন্দের একটা টেবিল কিনে আমাকে বলেছিল এটা ফেলে দিতে। ফেলে দিতে? কিছুতেই না। তাই সে টেবিলটা আমি গ্যারেজে রেখে কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছি। এখন আর একটা গাড়ি কিনব বলে আবার পরিবার থেকে তাগাদা এলো টেবিলটা ফেলে দিতে। আর তাগাদা আসবে নাই বা কেন? ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানো আর তা বজায় রাখার দায়িত্ব যে তাঁরই।

সুতরাং সেদিন পরিবার আশেপাশে নাই দেখে নেমে গেলাম কাজে। মৃদু বাতাসে বসন্তের ঠাণ্ডা সকাল হলেও কাজ করতে গিয়ে ঘাম বেরোবার অবস্থা। একই সাথে চলছিলো মাথায় প্রাসঙ্গিক দুনিয়ার চিন্তা। আম্মার কাছে শুনেছিলাম "তৃণ হতেও কাজ হয় রাখিলে যতনে"। ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি "অপচয়কারী শয়তানের ভাই।" এমনকি একটা ভাত অবহেলায় মাটিতে ফেললে সে ভাতকে নাকি আখেরাতে এক মুগুর সমান করে মুখ দিয়ে ঢোকানো হবে শাস্তি স্বরূপ। এসব শিক্ষাই ছিল প্রধানত আমার মায়ের কাছ থেকে, যার বাবা ছিলেন অখণ্ড ভারতের ডি এস পি সাহেব। আর সরকারি চালক নিয়ে গাড়ি দৌড়ানো বাবার জীবন নিয়ে আমার মা ছিলেন গর্বিত। তবে অপচয়ের শৌখিনতার কোন ক্ষমতাই ছিল না। না ছিল আমার আর আমাদের, না ছিল চার পাশের দশ জনের মধ্যে নয় জনের। ফলে, ছোটবেলার সে শিক্ষা আর অভ্যাস শেকড় গেড়ে বসে আছে মাথার প্রতিটি নিউরনে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সবকিছুর মত অপচয়য়ের অর্থ ও যে ভিন্ন হতে পারে তা যেন কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকতে চাইছে না। পঁয়ত্রিশ বছর আগে জাপানে বিদেশী ছাত্রদের দেখেছি টেলিভিশন পর্যন্ত কুড়িয়ে আনতে। বলাই বাহুল্য সে সবই ছিল জাপানিদের ফেলে দেয়া জিনিস।

মনে পড়ে এক মজার কাহিনী। কাহিনীটি ঢাকা মেডিকেলের আমার এক ডাক্তার বন্ধু কাশেমের কাছে শোনা যে নাকি তখন আমাদের একই কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে পি এইচ ডি'র ছাত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাম দুনিয়া থেকে আসা

মুসলিম ছাত্রদের একটি গ্রুপ ছিল যারা একটা ভাড়া বাসায় প্রতি সপ্তাহে জুম্মার নামাজ পড়তাম। সে সুবাদে আমাদের কিছু নূতন বন্ধু জুটে যায়। ডাক্তার কাশেমের ছিল তেমনি এক মিসরীয় বন্ধু। আমাদের ছাত্রাবাসের অদূরেই ছিল একটি এপার্টমেন্ট কমিউনিটি। এক শনিবার বিকালে ডাক্তার কাশেমের সেই মিসরীয় বন্ধুটি কমিউনিটির সুপারমার্কেটে বাজার করতে যায়। বরাবরের মত অভ্যাস মাফিক বাজারে পৌঁছার আগে বন্ধুটি কমিউনিটির ময়লাস্তুপের এলাকাটি একটু জরিপ করে নেয়। সেদিন সে দেখে এক সুন্দর কার্পেট। মানিকে মানিক চেনে, মিসরীয় বন্ধুটি ভাবে এটাতো মিসরীয় কার্পেট না হয়ে যায়না। আর এর এত অবমাননা? এর একটা বিহিত হতেই হবে। মিসরীয় বন্ধুটির জাতীয় সম্মানে আঘাতের মাত্রা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি। ইরানী কার্পেটের মত মিসরীয় কার্পেটও বিশ্ব বিখ্যাত। দুই বছর আগেই মিসর গিয়েছিলাম পরিবার নিয়ে বেড়াতে। যাবার আগেই বাজারের লিস্টের প্রথমেই ছিল কার্পেটটি। আর বাস্তবিকই খোদ কায়রোতেই একটা ভালো কার্পেটের দোকান পেতে আমাদের এক স্থানীয় টুরিস্ট গাইডের সাহায্য নিতে হয়েছিল। হেন কার্পেটের বিদেশের মাটিতে এত অবহেলা? সুতরাং যে কথা সে কাজ। ঘরে ফিরে সে লেগে যায় এক সাহায্যকারী এবং একটি গাড়ির খোঁজে। তার প্রথমেই মনে পরে ডাক্তার কাশেমের কথা, কারণ কাশেম ছিল তার একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু যার নিজেরই একটা বড় গাড়িও ছিল। বন্ধু বলে কথা, এক কথায় কাশেম তার দোস্তের কথায় রাজী। ঠিক হলো কাজটি তারা আজ পারবেনা তাই কার্পেটটা আনতে হবে কাল রবিবার। ফেলে দেয়া আবর্জনাটি কুড়িয়ে নিয়ে আসা সম্পূর্ণ জায়েয। বরং সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনা সরানোর কর্মচারীর কাজ কমে যাওয়ায় তাদের উপকারই হবে। এমনকি কার্পেটের মালিক জানতে পারলে সে নিজেই তার গাড়ি অথবা ঘাড়ে করে মিসরির ঘরে কার্পেটটি পৌঁছে দিত খুশী হয়েই। কিন্তু আত্মসম্মান বলে কথা আছে না? আমরা হচ্ছি জাপান সরকারের বিদেশি মেহমান, বিখ্যাত কিয়োতো ইউনিভার্সিটির মেডিসিন বিভাগের পি এইচ ডি'র ছাত্র। সুতরাং সে রাস্তা না। এমনকি দুই বন্ধু ঠিক করল কাজটি তারা করবে রবিবার রাতের অন্ধকারে যেন কেউ দেখতে না পারে।

পরদিন যথারীতি রাতে বের হবার সময়েই শুরু হলো বৃষ্টি। এতে দুই বন্ধু বরং একটু খুশীই হলো। কারণ বৃষ্টির ফলে এখন দেখে ফেলার সম্ভাব্য লোকের সংখ্যা আরও যাবে কমে। যথা সময় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেখে ঈপ্সিত বস্তুটি তাদের অপেক্ষায় তখনো আছে। এখন শুধু কার্পেটটি গাড়িতে তুলে ফেলা। কিন্তু তোলার জন্য কার্পেটটিতে হাত দিতেই দুজনেরই টনক নড়ল। যে বৃষ্টিকে তাদের অপারেশনের সহায়ক ভেবেছিল, সেই বৃষ্টি কিনা তাদের কাজকে এত দুরূহ করে দিল শেষ পর্যন্ত! মরুভূমির তৃষ্ণার্ত মিসরীয় কার্পেট বৃষ্টির পানি পেয়ে আকণ্ঠ তা পান করে নেয়। ফলে যা হবার তাই, কার্পেটের ওজন বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কিন্তু তাই বলে তো দুই দিনের প্রস্তুতির মহান প্রকল্প পরিত্যাগ করা যায়না। তাড়াতাড়ি ছাত্রাবাসে ফিরে এসে আরেক বন্ধুর সাহায্যে তারা কার্পেটটি নিয়ে আসতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত।

অথচ শুনেছি এই জাপানি বাচ্চারাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকান সৈন্যের ব্যারাকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত উচ্ছিষ্ট বাধাকপির আশায়। ঘরে নিয়ে মায়ের হাতের সেদ্ধ করা সে বাঁধাকপি খেয়েই কাটিয়ে দিত দিনটা। অন্যদিকে বয়স্করা বাইরে সারাদিন ব্যাস্ত কাজে। সে সময়ের পটভূমিতে তৈরি টোকিও ট্রায়াল মুভিটিতে তখনকার সর্বব্যাপী ভয়াবহতার চিত্র পরিষ্কার। অর্থনৈতিক এ দুরবস্থার মাঝেও জাপানিরা চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের গবেষণার কাজ। আমার গবেষণায় প্রচুর খরগোস ব্যাবহার করতাম। শুনেছি সে সময় গবেষণার কাজে ব্যবহৃত খরগোসকে গবেষণার কাজ শেষে তাকে জবাই করে পরম তৃপ্তির সাথে গবেষকরা খেয়ে নিত আমিষের অভাব পূরণ করতে।

জাপানিদের সে ইতিহাস জানার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, নিজের চোখে তাদের জিনিসপত্র ফেলে দেয়ার অভ্যাস দেখেও তো জাতটাকে কোনদিন অপব্যায়ি মনে হয়নি। তাই বলে দরকার নাই অজুহাতে আমি ফেলব জিনিস? বিশেষ করে যা কিনা আমিই এক সময় গাঁটের পয়সা দিয়ে কিনেছি। আমার রক্তে যে তা নেই! সব দেশের মতই আমেরিকাতেও অনেক সংস্থা আছে পুরনো জিনিস সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। তবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মোটামুটিভাবে সব পর্যায়ের পুরনো বস্তুর গ্রহিতা থাকলেও আমেরিকার গ্রহিতারা সাধারণত একটা ন্যুনতম মানের নীচের জিনিস নিতে আগ্রহী নয়, তা বিনে পয়সায় হলেও। তাই উপায় হচ্ছে ফেলে দেয়া। ক্ষেত্র বিশেষে গাঁটের পয়সা খরচ করে হলেও। তা করতে যে আমার মন সায় দেয় না।

সুতরাং অভ্যাসের দাসত্ব বজায় রেখে কাজ করতে করতে একসময় খেয়াল করলাম টেবিলের বেশ কয়েকটি তক্তা ইতিমধ্যে আলাদা করে ফেলেছি। তক্তা গুলা না হয় গুদাম ঘরে রেখে দেব, যদিও তা দিয়ে কখন কি করব জানিনা। কিন্তু তা করতে গিয়ে শ্রম-মূল্যের যে অপচয় হচ্ছে তার কি হিসাব করেছি? মনে পরে বিশ বছর আগের কথা, আমার তখন রেসিডেন্সির শুরু। আর তখনকার রেসিডেন্সির বেতন নিন্দুকের ভাষায় ঘণ্টায় হয়ত দশ ডলারের বেশি ছিল না। নির্ধারিত মাসিক বেতনের বিনিময়ে প্রকৃত কাজ ছিল গড়ে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টার স্থলে ষাট থেকে সত্তুর ঘণ্টা। অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে এ অনাচার বন্ধ করতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। অন্যদিকে আমি কাউকে কাজে ডাকলে তাদের মিটার চলে ভিন্ন রেটে তীব্র বেগে। যেমন একদিন আমার বাথ রুমের আটকে যাওয়া এক পাইপের মেরামতের জন্য একজন মিস্ত্রিকে ডাকি। যে কাজে ডাকা, বাংলায় আমরা তাকে মেথরের কাজ বলেই জানি। কাজ করা আর না করা মিলিয়ে মোট পনের মিনিট পর সে একটা আশি ডলারের বিল ধরিয়ে দেয়। পনের মিনিটে আশি ডলার মানে ঘণ্টায় তার পারিশ্রমিক দাঁড়ায় তিন শত বিশ ডলার। অন্যদিকে রেসিডেন্সির বার্ষিক তিরিশ হাজার ডলার ঘণ্টায় পনের ডলারও হয়না। বাধ্য হয়ে মিস্ত্রিকে তার পারিশ্রমিক ঘণ্টায় তিন শত বত্রিশ টাকাই কিনা জিজ্ঞেস করি। সে বলল না। আশি টাকার মধ্যে ষাট ডলার হচ্ছে ডায়াগনোসিস অর্থাৎ রোগ নির্ণয়ের জন্য, বাকি বিশ ডলার হচ্ছে আসল কাজ অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য। এক মিনিট পর আমার হারানো বাক ফিরে এলে

বললাম ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবে? তুমি এখন থেকে কাজে গেলে আমাকে তোমার সহকারী হিসেবে নিয়ে যাবে? সে সম্মতি জানিয়ে জানতে চাইল আমি কি করি। উত্তর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল "কোনো অসুবিধা নাই, তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে না। আমার অসুখ হলে তোমার কাছে আসব চিকিৎসার জন্য, আর তোমার পায়খানা ঠিক করাতে হলে আমাকে ডাকবে। আমরা কেউ কারো থেকে পয়সা নেব না। বরং আমরা বার্টার, মানে কাজের বিনিময়ে কাজ করে দেব"। ভাইসব, শুনেছেন তার কথা, মনে মনে কল্পনা করলাম আজ আমার শালার বাপ এই ব্যাটার প্রস্তাবটা শুনলে কি ভাবতেন আর কি করতেন? এটা দেখার জন্যই তোমার কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম? আর একই সাথে যদি আমার বাপও বেঁচে থাকতেন? দুই বাপের মাঝে আজ কত বড় হাতাহাতি আর কুরুক্ষেত্রটাই না হয়ে যেত। তাছাড়া ও আমার কপালটা ভালো ছিল কারণ আমার বউ ঘরে ছিল বলে এত সুন্দর বিনা পয়সায় নর্দমার কাজটা করানোর প্রস্তাবটা সে শুনতে পায়নি। তাই প্রস্তাবটা শোনা মাত্র আর কথা এগোতে না দিয়ে তার বিলটা চুকিয়ে দিতে আমি আর এক মিনিট ও দেরি করিনি।

যার কাজ তারেই সাজে, অপরকে সাজে লাঠি। স্মৃতি রোমন্থনের ওই পর্যায়ে ঠিক তখনি কিভাবে যেন লোহার খোঁচায় হাত কেটে রক্ত বের হতে লাগলো। এখন কি করি? যে কাজে এখন হাত দিয়ে বসেছি তার মূল্য কত? একেই কি বলে কয়লা ধুলে ও ময়লা যায় না? দুঃখিত, কিন্তু সে মুহূর্তে এর চেয়ে জুতসই অন্য কিছুই আমার মাথায় আসেনি। এদিকে নৌকা যে মাঝ দরিয়ায়, কাজ তো থামাতে পারিনা! সুতরাং আবার (অ)কাজে ডুবে গেলাম। অল্পক্ষনেই হাতের ব্যথা ভুলে চিন্তা সূত্রে এগোতে থাকি আবার। ঠিক আছে কয়লার ময়লা না হয় নাই বা গেল। কিন্তু এ কাঠ দিয়ে কি করব? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

মনে পড়ে বছর দশেক আগে এক মেয়ে তার মাকে নিয়ে আসে আমার ক্লিনিকে। রোগীর বর্ণিত প্রায় সব উপসর্গ এবং তার উপযুক্ত চিকিৎসাই আমার পরিচিত। কিন্তু একটা উপসর্গ আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। "She is a hoarder". রোগী নাকি ঘরের কিছুই ফেলতে দেয় না, ফলে "Our home is a mess". বাসায় এসে ডিকশনারি খুলে আবার হোর্ডিং এর মানে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম। এর মানে হচ্ছে ঘরে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মজুত। কালো বাজারির মজুতদারি নয়। কিন্তু এটা যে মানসিক রোগের উপসর্গ হতে পারে সেটা সেদিনই জানলাম। এ যে উভয় সঙ্কট! একদিকে হোর্ডিং, এর মানসিক রোগী হবার ভয় অন্যদিকে তৃণ হতেও কাজ হয় রাখিলে যতনের মত অমোঘ বাণী মাথার ভেতরে। নিজকে রোগির সম্ভাব্য তালিকা থেকে সরানোর চিন্তায় আমার মানসিক চাপ তখন তুঙ্গে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার পেলাম চির কুমার এনাটমির প্রফেসার প্রয়াত শ্রদ্ধেয় মল্লিক স্যারের বাণীতে। স্যার সম্ভবত মেদিনীপুরের ছিলেন, কথা বলতেন খুব মিষ্টি করে। আর সব ছাত্রছাত্রীর চেষ্টা ছিল সুযোগ পেলেই সারের কথাকে যথাসাধ্য কপি করার চেষ্টা করা। যেমন একদিন শীতের সকালে সিরিয়াস ক্লাসের সময় হলের ভেতর এক জোড়া চড়ুই পাখি বেশ দরাজ গলায়

গান জুড়ে দিল। ফলে স্যারকে বক্তৃতার মাঝে মাঝেই থামতে হচ্ছিল। কে জানে এতে হয়তো পাখি যুগল আস্কারা পেয়ে গলা দেয় আরও বাড়িয়ে। অগত্যা স্যার কিছুক্ষণ চুপ থেকে সুন্দর করে একটা হাসি দিয়ে বললেন, দেখ দেখি, সারা রাত কাটিয়ে এখনি তাদের সময় হলো প্রেম করার। সে স্যার ছাত্রদের স্নেহের সুরে বলতেন Failure is the pillar of success, কিন্তু বাপু do not add useless pillars, তা হলে যে ঘরে থাকার জায়গাই থাকবে না। স্যারের কথাটি মনে পরতেই বুঝলাম যা শিখেছি এবং শিখছি, সে সব কিছুই ঠিক। তবে তাদের আছে সীমাবদ্ধতা, যা অতিক্রম করলেই সেটা হয়ে যায় বেঠিক। যেমন বাঁচার জন্য খেতেই হবে, কিন্তু বেশি খেলে বদ হজম। অথবা মেদ বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন রোগ। এছাড়া সব শিক্ষা এবং সত্যই অন্যান্য সব কিছুর মতই আপেক্ষিক ও বটে। আমেরিকাতে জানুয়ারি মানে শীতকাল হলেও অস্ট্রেলিয়ায় তখন হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। এভাবে আমার গবেষণা চলতেই থাকতো, যদি না আমার পরিবার ডেকে নাস্তার তাগাদা দিত।

বসন্ত শেষে এখন চলছে গ্রীষ্মকাল। কমিন কোভিড সবাইকে করে রেখেছে নিজ গৃহে জিম্মি। আমার পেশাটি "অত্যাবশ্যকীয়" বিধায় নিয়মিত কাজে যেতে হলেও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ঠায় ঘরে বাঁধা। আজ তেমনি এক শনিবার, করার তেমন কিছুই নাই। বাগানের কাজ আর কত করা যায়? তাছাড়া গত কয়েক সপ্তাহ যাবত প্রচণ্ড গরম যাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হলো দিদি পূরবী বসুকে কথা দিয়েছি একটা লেখা দেব। ভাবলাম এ সুযোগে কিছু একটা লিখে ফেলি। আর টেবিল প্রকল্পের ব্যাপারটা ভুলে যাবার আগে আগে এইতো লেখার উত্তম সময়। সুতরাং যেই চিন্তা সেই কাজ। লেখার মাধ্যমে ডুবে গেলাম অদূর অতীতে। এদিকে কখন যে আমার পরিবার পাশে বসে লেখাটা পড়তে শুরু করেছে খেয়াল করিনি। "তাই তো বলি, গ্যারেজটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন? শুনে বর্তমানে ফিরে আসি। এত বড় টেবিলটা কখন যে গ্যারেজ থেকে উধাও হয়ে গেছে এতদিনে তার চোখে ও পড়েনি, হয়ত অপ্রয়োজনীয় বলেই । তবে সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি তক্তাগুলো গুদাম ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে জেনে।

ফ্রেডরিকসবার্গ, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

রাকিব হাসান

ক্রিস্টিনা: নিভৃতে হারিয়ে যাওয়া অসম অর্ধসমাপ্ত এক ভালোলাগার গল্প!

ছোটবেলায় একটি গান শুনেছিলাম:-

"তারে ধরি ধরি মনে করি
ধরতে গেলেম, আর পেলেম না
দেখেছি, দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা"

সত্যি প্রেম-ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটি অনুভূতি যা কোন কিছু দিয়েই বিধিবিদ্ধ করা সম্ভব হয় না। মনের অজান্তেই যেনো বুঝি সে দোলা দিয়ে উঠে, কখনো আবার শূণ্যে মিলিয়ে যায়।

ঠিক তেমনি এক ভালো লাগা কিংবা ভালোবাসার গল্প শুনাবো আজ।

২০১৪ সালের কোন এক সময়। তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। যৌবন কেবল দুয়ারে কড়া নাড়ছে, হঠাৎ করে কেন জানি মোটর স্পোর্টসের ওপর আলাদা একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। বাংলাদেশে সে অর্থে মোটর স্পোর্টসের সে রকম প্রচলন নেই বললেই চলে। আমার বর্তমান ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি ২০১০ সালে খোলা হলেও ঐ বছর থেকেই আমি মূলত ফেসবুক ব্যবহার করা শুরু করি আজকের দিনের মতো করে। একটা অভ্যাস সে সময় গড়ে উঠেছিলো আচমকা। মোটর স্পোর্টসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফেসবুক পেইজে গিয়ে সে সময় বিভিন্ন স্পোর্টস বাইকারদের ছবি খুঁজে বের করে তাঁদেরকে মেসেজ করাটা কেন জানি আমার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে হঠাৎ করে একদিন কোন এক ফেসবুক পেইজে যেতে না যেতেই ক্রিস্টিনার ছবি আমার চোখে ভেসে আসে এবং ছবির নীচে ট্যাগসম্বলিত তার নাম লিখা ছিলো। আমি তখন ফেসবুকে তার নাম লিখে সার্চ করলাম এবং তার ফেসবুক আইডি খুঁজে পেলাম। এরপর আমি তাঁকে একটি মেসেজ করলাম আমার পরিচয় দিয়ে এবং আমি বললাম যে, আমি তার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ক্রিস্টিনা আমাকে মেসেজ করলো এবং আমাকে বললো তাঁকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠানোর জন্য। এরপর আমি তাঁকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালাম এবং সে আমাকে তার ফেসবুক ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণও করলো। এরপর আমাকে সে প্রশ্ন করলো, “Are you happy to be my friend?” আমি তাঁকে উত্তর দিলাম, "Why

not? It's one my pleasures that I have been able to become a friend of yours". তারপর তাঁকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলাম বিশেষ করে মোটর স্পোর্টস এবং এখানে কীভাবে সে এলো কিংবা তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। এভাবেই ক্রিস্টিনার সাথে আমার পরিচয়।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ইউনিভার্সিটির ভর্তি কোচিং। বাহিরে যাওয়ার প্রস্তুতি সব মিলিয়ে আসলে এতোটা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এবং সেই সাথে আসলে বেশ কিছু পারিপার্শ্বিকতার কারণে কেন জানি এ আগ্রহটি আবার আমার মধ্য থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো এবং একটা দীর্ঘ সময় প্রায় আড়াই বছর। এরপর আর ক্রিস্টিনার সাথে কখনো যোগাযোগ হয়নি সেভাবে। বলা হয়ে থাকে এ পৃথিবীতে একটা জিনিস ততো তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় যতো তাড়াতাড়ি সে জিনিসটি গরম হয়। আচমকা মোটর স্পোর্টসের প্রতি সৃষ্টি হওয়া আগ্রহ আচমকা হারিয়েও যায়।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। নিজের পরিবার পরিজন সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে এক গহীনে নিজের জীবনকে ঠেলে দিতে বাধ্য হলাম। শুরু হলও আমার প্রবাস জীবনের দিনলিপি। ইউরোপে পা রাখার পর প্রথম কয়েক মাস আসলে তেমন কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয়নি। একবার আলবেনিয়া গিয়েছিলাম ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। আইজেক নামের একটি অর্গানাইজেশন রয়েছে যারা মূলত ইয়ুথ লিডারশীপ ডেভেলপমেন্টে কাজ করে বলে দাবি করে থাকে। এ আইজেকের মাধ্যমে আলবেনিয়াতে একটি ইয়ুথ লিডারশিপ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ আসে ভলান্টিয়ার হিসেবে।

তবে আক্ষরিক অর্থে প্রথমবার নিজের থেকে ইউরোপের কোন দেশ ঘুরার সুযোগ আসে ২০১৮ সালের মার্চের শেষ এবং এপ্রিল মাসের শুরু এমন সময়। শীতের বুক চিরে নতুন এক অনন্ত যৌবনা রূপে ইউরোপে বসন্তের আবির্ভাব ঘটে। কয়েক দিন আগে চারপাশের প্রকৃতিকে যেখানে নির্জীব আর প্রাণহীন মনে হতো এমন সময় যেন প্রকৃতি নতুন প্রাণ ফিরে পেতে আরম্ভ করে। ক্যাথলিক চার্চগুলোতে বিশ্বাসী মানুষেরা ইস্টার উৎসবে মেতে উঠে এবং বলা হয়ে থাকে যে বড় দিন বা খ্রিস্টমাসের পর ক্যাথলিক চার্চে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে "ইস্টার"। ইস্টারের ছুটিতে বেড়িয়ে পড়লাম বুলগেরিয়া এবং রোমানিয়া ঘুরতে। এ দুইটি দেশের প্রতি আমার কেন জানি আলাদা এক বিশেষ ধরণের আগ্রহ কাজ করতো। জীবনে অনেক বসন্ত এসেছে কিন্তু কেন জানি এ "রোমানিয়া" এবং "ক্রিস্টিনা" এ দুইটি শব্দের কথা স্মৃতিপটে ভেসে আসলে মনে হয় যে জীবনের শ্রেষ্ঠ বসন্তটি ঐ সময়ই বুঝি ফেলে চলে এসেছি। ঐ দিন্ আমি সত্যিকার অর্থে আমি হেসেছিলাম, আবার এ দিনটি আমাকে কাঁদিয়েছিলো শেষ বিকেলে সব কিছু শূণ্য করে।

মার্চের একত্রিশ তারিখ। উইজ এয়ারের ফ্লাইটে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট থেকে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে যাওয়ার টিকেট কনফার্ম করি। স্থির করি যে চার দিন বুলগেরিয়া ঘুরে এরপর রোমানিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবো। অবিশ্বাস্য মূল্যে মাত্র এক

ইউরোতে ফ্লিক্স বাসে করে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া থেকে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে যাওয়ার টিকেটও পেয়ে যাই।

বুলগেরিয়াতে পৌঁছানোর পরই চেষ্টা করি ক্রিস্টিনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য, যেহেতু প্রায় চার বছরের মতো তার সাথে কোন যোগাযোগ ছিলো না এক ধরণের অজানা শঙ্কার মধ্যে ছিলাম আদৌতে ক্রিস্টিনা আমাকে চিনতে পারবে কি না কিংবা আমার সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করবে কিনা। এক ধরণের দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যেই সাহস করে তাঁকে মেসেজ দিয়ে ফেললাম।

০৫ এপ্রিল, ২০১৮। কাঙ্ক্ষিত সে মুহূর্ত জানালায় উঁকি দিয়ে ধরাও দিলো। বেশ কয়েকবার অনুরোধের পর ক্রিস্টিনার মন গললো। ক্রিস্টিনার বাসা ছিলো আলেকজান্দ্রু আইওয়ান কুজা পার্কের কাছে। বুখারেস্টের সিটি সেন্টার থেকে বেশ খানিকটা দূরে এবং সম্পূর্ণ কোলাহল ও নির্জঞ্ঝাটমুক্ত একটি জায়গা। ট্রাফিক জ্যাম বুখারেস্টে বসবাস করা সাধারণ মানুষদের কাছে নিত্যদিনের প্রধান সমস্যা। আসলে বুখারেস্টের স্থানীয় প্রশাসন যানবাহনের ওপর অনেক ভর্তুকি প্রদান করে এবং এ কারণে শহরের বেশির ভাগ জায়গাতেই সে অর্থে গাড়ি পার্কিং করতে তেমন খরচ হয় না আর এ কারণে সবাই যে যার মতো পারে যেখানে সেখানে গাড়ি পার্ক করে রাখে যা শহরটিতে যানজট সৃষ্টির প্রধান একটি কারণ। সেই সাথে গাড়ির হর্ণ শব্দ তো আছেই। কিন্তু এ জায়গাটি পুরোপুরি নীরব এবং শান্তিতে মনের আনন্দে নিঃশ্বাস নেওয়ার একটি আদর্শ জায়গা বলা চলে। ক্রিস্টিনা আমাকে আলেকজান্দ্রু আইওয়ান কুজা পার্কে আসার জন্য বললো। আমাকে দেখার সাথে সাথে ক্রিস্টিনা আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং আমার গালে একটা চুমু আঁকলো। সে এক অনাবিল প্রশান্তি! পৃথিবীতে এর থেকে প্রশান্তির খুব কম জিনিসই আছে। আমরা বেশ কিছুক্ষণ একসাথে পার্কের ভেতর হাঁটাহাঁটি করলাম।

ক্রিস্টিনা আসলে সম্পূর্ণ বিপরীত জগতের একজন মানুষ। তবে তার মধ্যে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসত্ত্বা রয়েছে যা সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে। ক্রিস্টিনা প্রকৃতির বিভিন্ন ছবি তুলতে ভীষণ ভালোবাসে। কখনো গাছ কিংবা গাছের পাতা, ঘাস, পাখি, কাঠবিড়ালি এ সবের ছবি তোলে। কিছুক্ষণ পার্কে বসে গল্প করার পর আমরা চলে গেলাম পার্কের ঠিক বিপরীতে থাকা একটি শপিং মলে। শপিং মলের ছাদে চিলেকোঠায় একটা রেস্টুরেন্ট ও কফিবার রয়েছে। সেখান থেকে পুরো পার্কের অসাধরণ একটি ভিউ পাওয়া যায়। আমি সারাদিন ঘুরাঘুরি কারণে বেশ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম। এজন্য আমি কোকাকোলা অর্ডার করলাম আর ক্রিস্টিনা কফি অর্ডার করলো। এরপর অনেকক্ষণ একসাথে গল্প হলো। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো।

ক্রিস্টিনার বর্তমান বয়স প্রায় বত্রিশ যেখানে আমার বয়স মাত্র বাইশ। আমার থেকেও দশ বছরের বড় কিন্তু তারপরেও কেন জানি যখন ক্রিস্টিনার কথা মনে পড়ে তখন আমার মনের থেকে অন্য রকম কিছু একটা উপলব্ধি হয়। কোন এক অজানা কারণে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। তার প্রতি আমি ভালোলাগা অনুভব করতে থাকি। রূপ লাবণ্যের দিক থেকে ক্রিস্টিনা এখনও প্রদীপ্ত বলতে হবে। ২০১৮ সালে আমার আবিষ্কার করা সবচেয়ে সুন্দর

অভিজ্ঞতা ছিলো এ ক্রিস্টিনা। ২০১৪ সালে যার সাথে আমার ফেসবুকে পরিচয় হয়েছিলও। কখনও ভাবিনি যে সামনাসামনি এভাবে দেখা করতে পারবো কিংবা ফেসবুকে ভার্চুয়ালি পরিচয় হওয়া কোন একজন মানুষও বাস্তবিক জগতে সত্যি অসাধারণ হতে পারে সেটা কখনও কল্পনায় ছিলো না। জীবনের অন্যতম সেরা একটা অভিজ্ঞতা পেয়েছি আমি ক্রিস্টিনার থেকে। একসাথে সে কফিবারে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর আমরা আবার কিছুক্ষণ একসাথে আবারও পার্কে গিয়ে হাঁটাহাঁটি করি।

ক্রিস্টিনা আমাদের সবার থেকে আলাদা। সে চায় জীবনটাকে উপভোগ করতে। নিজের ইচ্ছাশক্তির ওপর বেঁচে থাকতে। সমাজের সকল প্রথাকে সে ভাঙতে চায়। আমরা আজকে অনেকেই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ডুকরে কেঁদে পরে আর সেই ইউনিভার্সিটিকে সে প্রত্যাখ্যান করে চলে আসে এই বলে যে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের থেকে বাস্তবিকভাবে কোন জ্ঞান অর্জন এবং সেই সাথে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সমাজের মানুষের কল্যাণে ব্যয় করাটাই প্রকৃত স্বার্থকতা। কর্পোরেটক্রেসিকে সে পুরোপুরি ভেঙ্গে দিতে চায়। আমাদের সকলের চিন্তার বাহিরে গিয়েও সে নিজেকে মেলে ধরতে চায়।

এক সাথে কিছু ছবি তুলি। ততোক্ষণে বিকেল হয়ে গিয়েছে আর আমার ফেরার সময়ও হয়ে গিয়েছে। ফিরতি বাস ছেড়ে যাওয়ার সময়ও হয়ে এসে গিয়েছে। ক্রিস্টিনা আমাকে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সেখানে দায়িত্বেতে থাকা এক পুলিশ সদস্যকে আমরা অনুরোধ করি আমাদের আরও কিছু ছবি তুলে দেওয়ার জন্য। তিনি দায়িত্ব অবস্থায়ও আমাদের অনুরোধ রাখেন আন্তরিকতার সাথে। এরপর আমি ক্রিস্টিনাকে বিদায় জানিয়ে মেট্রোতে উঠে পড়ি সে মিলিটারি অটোগারার উদ্দেশ্যে যেখান থেকে আমার বুদাপেস্ট ফিরে যাওয়ার বাস ছাড়ার কথা ছিলো। বিদায় লগ্নে ক্রিস্টিনা আমাকে আরও দুইবার জড়িয়ে ধরেছিলো এবং আমার গালে চুমু এঁকেছিলো। সে এমন এক স্বাদ যে স্বাদ পৃথিবীর সমস্ত ঝালকে কিংবা তেতোকে এক নিমেষে পৃথিবীর সবচেয়ে সুমিষ্ট কোন বস্তুতে পরিণত করতে পারে।

এরপর? এরপর আবার সেই আগের জীবন। সেই ভার্সিটি, পড়াশুনা, ব্যক্তিগত বিভিন্ন চাপ তবে ক্রিস্টিনার সাথে সেইদিনের সে মুহূর্তগুলো সব সময়ই আমার হৃদয়ে চির ভাস্কর। জানি না সে ভালোলাগা আদৌতে কোন ভালোবাসায় পরিণত হলো কিনা। তবে জানি যদি সেটা ভালোবাসায় পরিণত হয়ও কোনদিন সেটাকে বাস্তবায়িত করাও সম্ভব নয় কেননা আমাদের সমাজে এ ধরণের অসম প্রেমকাহিনীগুলো কখনও সার্থকতা লাভ করে না। আমি জানিনা কেন তবে ছোটো বেলা থেকেই আমি দেখেছি আমাদের দাদা-দাদী কিংবা নানা-নানী এমনকি আমাদের বাবা-মার সময়ের মানুষেরাও যখন বাড়িতে কোন ছেলের জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে বের হতো সব সময় চেষ্টা করে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে যার বয়স কিনা পাত্রের বয়সের তুলনায় অন্ততঃ পাঁচ বছরের নীচে। আমাদের সমাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরণের অসম ভালো লাগার কাহিনীগুলো

অপূর্ণ থেকে যায়, অন্তত আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে কোন বাবা-মা মেনে নিবে না যে তার ছেলে এমন কাউকে বিয়ে করুক যিনি কিনা। তার ছেলের তুলনায় বয়সে বড়।

এখনও মাঝে মধ্যে ফেসবুকে যোগাযোগ হয় ক্রিস্টিনার সাথে। আসলে ক্রিস্টিনার বর্তমান সময়টা খুব বেশি একটা ভালো যাচ্ছে না। বছর দুইয়েক আগে তার বাবাও মারা যায় এবং তার মা এখন বয়সে অনেকটা বৃদ্ধ। এক ধরণের আর্থিক টানা-পোড়নের মধ্য দিয়ে সে যাচ্ছে। মোটর স্পোর্টস নিঃসন্দেহে অনেক ব্যয়বহুল, তাই নিয়মিতভাবে মোটর স্পোর্টসে সে অংশ নিতে পারছেও না। এদিকে তার বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও যদিও সে যথেষ্ট ফিট কিন্তু তবুও কেন জানি সে স্পন্সর পাচ্ছে না যার মাধ্যমে সে আসলে আবার কাঙ্ক্ষিতভাবে রেসিং ট্র্যাকে ফিরে আসবে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ওপর সে খুবই ক্ষুব্ধ কেননা তার বক্তব্য হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক সিস্টেমের জন্ম দেয় যেখানে মানুষের কোন স্বপ্ন থেকে আরম্ভ করে নিত্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার এমনকি চিকিৎসা সেবার মতো মানবিক বিষয়গুলোও বাণিজ্যের একটি বিষয় হিসেবে পরিণত হয়। নতুন করে মোটর বাইক কেনা এমনকি তার এখন যে বাইকটি রয়েছে বেশ পুরনো বাইক সেটাতে চাকার মেরামত করতে যে খরচটুকু প্রয়োজন সেটিও তার হাতে নেই। আবার রোমানিয়া যদিও বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু তারপরেও এখনও দেশটির সাধারণ মানুষের আয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যান্য দেশ থেকে অনেক নীচে।

মানুষ বাঁচে আশায়, ক্রিস্টিনা এখনও স্বপ্ন দেখে যে তার এ দুরাবস্থা কোন একদিন দূর হবে এবং সে আবারও মোটর স্পোর্টসে তার হারানো অর্জনকে ফিরিয়ে আনবে।

অপুর জীবনে কোনদিন আর হৈমন্তী ফিরে এসেছি কি না এটা জানা না গেলেও আমার এরপর আর কোনদিন ক্রিস্টিনার সাথে দেখা হয়নি। তবে ক্রিস্টিনা আমার অবচেতন মনে হয় তো বা ক্ষণিকের এক হৈমন্তি যার হাসিটুকু আমি সব সময় খুঁজে বেড়াই। জানি না আর কোনদিন দেখাও হবে কি না ক্রিস্টিনার সাথে। যদি কোনদিন একটা টাইম মেশিন বানাতে পারি আমি চেষ্টা করবো বসন্তের সেদিনের সে বিকেলে আবার হারিয়ে যেতে। ক্রিস্টিনার সাথে করে আমি পুরো পৃথিবী দেখতে চাই। তাকে জড়িয়ে ধরে আবারও তার গালে চুমু আঁকতে চাই।

বেশ কয়েক বছর আগে একটি সিনেমা দেখেছিলাম। এটি ছিলো একটি ইতালিয়ান সিনেমা। এ সিনেমার কাহিনী এতোটাই অসাধারণ ছিলো যে পরবর্তীতে সেরা বিদেশি ভাষার সিনেমা হিসেবে এটি অস্কার পুরস্কারের সম্মাননা অর্জন করেছিলো। সিনেমার নাম "মালেনা"। মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালির সিসিলিতে বারো বছরের এক কিশোর রেনাতোর সাথে তার এক শিক্ষিকা যার নাম ছিলো মালেনা (যিনি মূলত এ সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র); মালেনার প্রতি তার দুর্বলতা এবং ভালো লাগার কাহিনী নিয়ে। নিঃসন্দেহে এটি ছিলো একটি অসম প্রেম কাহিনী কেননা রেনাতোর সাথে মালেনার বয়সের পার্থক্য ছিলো অনেক বেশি এবং মালেনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার স্বামীকেও হারিয়েছিলো।

কাছে আসার সব গল্পই পূর্ণতা পায় না। সিনেমার শেষ অংশে এসে দেখা যায় যে রেনাতো এখন প্রায় বৃদ্ধ এবং শেষ বয়সে এসেও তার উপলব্ধি যে তিনি তার জীবনে অনেক নারীকে ভালোবেসেছেন কিন্তু মালেনা একমাত্র নারী যাঁকে তিনি কোন দিনই ভুলতে পারবেন না। ক্রিস্টিনাকে ভালোবেসে ফেলেছি কি না সেটা জানি না তবে সেটা যে নিঃসন্দেহে একটি অসম ভালোলাগার গল্প এবং হয়তোবা এক সময় জীবনের শেষ বয়সে এসেও রেনাতোর মতো আমাকে বলতে হবে যে জীবনে অনেক নারীর সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু ক্রিস্টিনার মতো কাউকে ভালো লাগেনি কোন দিনই। সমাজের প্রথাকে ভেঙে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহসও নেই আমার মধ্যে।

জীবনে আসলে যা হারিয়ে যায় তা যেন সারাজীবনের জন্যই হারিয়ে যায়, শুধু হারিয়ে যাওয়া সে জিনিসগুলো মস্তিষ্কের দৃশ্যপটে থেকে যায় স্মৃতি হিসেবে।

ভালো থেকো ক্রিস্টিনা! তোমার সর্বোচ্চ সফলতা কামনা করছি। তুমি হলে ইউরোপে আসার পর প্রবাস জীবনের আমার প্রথম ভালো লাগার মানুষ। জানি না আর কোনদিন দেখা হবে কি না তবে সারাজীবন আমি বুখারেস্টের সেই রঙিন মুহূর্তগুলোকে ফিরে পাওয়ার জন্য কেঁদে যাবো, হয় তো বা "শেষের কবিতা" উপন্যাসে উল্লেখিত লাবণ্যের মতো তুমিও আমার কাছে এক দীঘির জল যার প্রতি আমার ভালোলাগা বা ভালোবাসা কোন দিনও ফুরোবে না।

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিশ্বকে এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে ঠেলে দিয়েছে। কোন ধরণের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় কিংবা নয় কোন ধরণের সামরিক যুদ্ধ। সামান্য কয়েক ন্যানোমিটারের অতি ক্ষুদ্র এক আলোক আণুবীক্ষণিক বস্তু আমাদের সকলের স্বাভাবিক জীবনকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে দিয়েছে। এমনকি আমাদের স্বাভাবিকভাবে চলাচলের সুযোগও আজ বিপন্ন হয়ে গিয়েছে তবে যেদিন এ পৃথিবী এ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবে সবার প্রথম আমি ছুটে যাবো রোমানিয়ার রাজধানী বুদাপেস্টে। ক্রিস্টিনাকে এবার সত্যি জড়িয়ে ধরে তার কপালে আর দুই গালে চুমু এঁকে তার চোখে চোখ রেখে এবার সত্যি তাঁকে বলবো আমি তোমায় ভালোবাসি। সমাজের প্রথাগত সে বাঁধনকে বিদীর্ণ করে সত্যি নতুন অভিযাত্রার এক সাফল্যের দিকে কোনদিন পদার্পণ করতে পারবো কিনা সেটা হয়তো বা অজানা সেই এক অনাগত দিনেই প্রকাশিত হবে।

স্লোভেনিয়া

রিটন খান

গল্পনির্মাতা ওয়ালীউল্লাহ্

বাংলা ছোটগল্প সেই আশ্চর্য রত্নভান্ডার, উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে যার সন্ধান আমাদের দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকে প্রতিনিয়ত এই আবিষ্কার প্রক্রিয়া চলছেই। বাংলা কথাসাহিত্যের রত্নখচিত এই অঙ্গনে কতজনের কত সৃজন-সাধনায়, ধারাবাহিক চর্চায় সৃজিত বাংলা গল্পভূমি আজ যে পাঠমনস্কতা দাবি করে সে অবদান সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপরবর্তী ছোট গল্পকার কথাকার সকলেরই। তাই যে কোন একজন লেখকের ছোটগল্প আলোচনার ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলা গল্পজগতের প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। বাংলা ছোটগল্প নদীর স্রোতের মতো। সেই চলমান ধারায় বিকশিত হয়েই এক একজন স্রষ্টা স্রোতপথকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ভাষা নির্মাণশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কখনো বা বাঁক নিয়েছেন, কিন্তু আসল ধারাস্রোতে ভাটা পড়েনি কখনো। শুধু পরিমাণে পরিসরে নয়, বৈচিত্র্যে গভীরতায় সর্বদা ব্যাপ্ত যে-সৃষ্টি, মাঝেমধ্যেই স্বকীয়তায় অনন্য হয়ে উঠেছেন তার স্রষ্টা লেখকজন। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া নির্মাণশৈলী আঙ্গিকে যিনি কখনোবা হয়ে ওঠেন নির্মাণশিল্পী। গঠণবিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে মিলেমিশে যায় নির্মাণ বা সৃষ্টি।" কী গাঁথলেন সেটি যেমন দর্শনীয় হয়ে ওঠে, কেমন করে গাঁথছেন সেই অভাবিত সৌন্দর্যেও মগ্ন হতে হয়। "বাংলা ছোটগল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ হলেন এমনই স্থপতি, যাঁর স্থাপত্যকর্ম যেমন দৃষ্টিনন্দন তেমনই স্থাপন প্রক্রিয়াটিও উপভোগ্য, দাবি করে মনোযোগ। কোন একটিকে বাদ দিলে ঠিক আস্বাদ মেলে না। তাই ওয়ালীউল্লাহর গল্পের পুনঃকথন সম্ভব হয় না। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় না, প্রতিটি শব্দ পড়তে হয়। গল্পের ভেতরের মূল অংশকে তেমন করে আলাদা করা যায় না। আবার নির্মাণভঙ্গিমাটিকে আলাদাভাবে দেখতে চাইলেও গল্পের প্রাণটি নষ্ট হয়। ওয়ালীউল্লাহর গল্প মানে তাই আগাগোড়া পাঠ এবং সচেতন পাঠ।

মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবন (১৯২২-১৯৭১)। প্রায় তিন দশকের (চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট) লেখালেখি। গল্প দিয়ে শুরু করলেও পরে লিখেছেন উপন্যাস, নাটক। সাহিত্যজীবনের প্রথম দেড় দশকই মূলত তাঁর গল্প লেখার কাল। পরে ক্রমে মগ্ন হয়েছেন উপন্যাসে। শেষ আবিষ্কৃত গল্পের হিসেবে সব মিলিয়ে ৫৩টি গল্প লিখেছেন। জীবনের প্রথম গ্রন্থটিই গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা'। প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে, ৪৪শেও হতে পারে, পূর্বাশা প্রকাশনী থেকে। আর লেখকের দ্বিতীয় ও শেষ গল্পগ্রন্থ "দুই তীর ও অন্যান্য গল্প" প্রকাশিত হয় দু'দশক পরে ১৯৬৫ সালে। দুটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পের সংখ্যা ৮ ও ৯ মিলিয়ে মোট ১৭। বাদবাকি সব গল্পই অগ্রন্থিত থেকে যায় দীর্ঘকাল। ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌গ্রন্থাবলী। পূর্ববর্তী ১৭টি গল্প ছাড়াও এ

গ্রন্থাবলীতে আরও ৩২টি গল্প সংকলিত হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আরও ৪টি গল্প পরে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে 'গল্পসমগ্র আপাতত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র গল্পের এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা যায়।' ওয়ালীউল্লাহর প্রথম গল্প 'নয়নচারা' প্রকাশিত হয় পূর্বাশা পত্রিকায়। সে-সময় (১৯৪৩-৪৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো ছায়া সারা বাংলা জুড়ে। যুদ্ধ অনাহার ও মৃত্যুর পটভূমিকায় 'নয়নচারা' ছাড়াও তিনি পরপর লিখেছেন 'মৃত্যু-যাত্রা', 'রক্ত'। সমকালীন পটভূমিতে তরুণ ওয়ালীউল্লাহর অন্তর্গত রক্তক্ষরণই অনুভবে দরদে প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধ-মন্বন্তর শুধু যে খিদে বাড়িয়ে দেয় তা নয়, লুটেপুটে নেয় আবাল্য স্নেহের কৈশোর ভূমিটুকুও। ভিটেছাড়া ঘরছাড়া মানুষের বুকের ভেতরের সবটুকু 'জমিন' কেড়ে নিয়ে তাকে ছিবড়ে হাভাতে ভিখিরি করে তোলে। আর কিছু নয়, চেয়েচিন্তে যে কোনভাবে উদরপূর্তিই যার একমাত্র চাহিদা বলে সাধারণের বিশ্বাস, সেখানে ওয়ালীউল্লাহ্শুরু করেন এভাবে; "ঘূর্ণায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ুরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। "খিদে নয়, খিদের তাড়নে হা-অন্ন মানুষটির অন্তর্দেশ জুড়ে হারানো মাটি হারানো জীবনের হাহাকার। এও এক খিদে, যার তৃপ্তি নেই দু'মুঠো ভাতে। ফ্যানভাতের সন্ধানী মানুষটির সতৃষ্ণ আকাঙক্ষা আসলে সেই মাটি এবং মা-টি। ময়ূরাক্ষী নদীকে ছুঁয়ে যে গ্রাম 'নয়নচারা', মাটিলগ্ন যে জীবন, পায়ে পায়ে তারই নিরন্তর অনুসন্ধান। খিদে নয়, তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্মৃতি।" সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তীক্ষ তীব্র আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগল আপাদমস্তক। "অবশেষে" কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বলল নাও। "ভাত পেল সে।" ত্রস্ত ভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিস্পলক চাখে চেয়ে রইলো মেয়েটির পানে। "চেনা যেন বহুকালের চেনা এই মুখ। নয়নচারা গ্রামে ভাতের থালা সাজিয়ে অপেক্ষা করে যে জন, এ তো সেই মুখ। চকিতে কি ভেসে ওঠে মা'র ভাত বেড়ে দেওয়ার চিরকালীন অমৃত বৈভবাদৃশ্য? রান্নাঘর আসনপিঁড়ি আস্ত সেই উঠোন? আচলে ভাতটুকু নিয়ে মাটি-সন্ধানী সে সন্তান কাঙ্গালের আকুতিতে বলে ওঠে : "নয়নচারা গায়ে কী মায়ের বাড়ি? "খিদের মুখে দাঁড়িয়ে শুধু ভাত নয়, মনের ভেতর জুড়ে অন্য এক অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া নিয়ত ক্রিয়াশীল। 'নয়নচারা'য় যে সূচনা পরবর্তী তিন দশকের লেখালেখিতে সেই অনর্গল খোঁড়াখুড়ি। বহির্বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতি সময়ের সঙ্গে পা ফেলে ওয়ালীউল্লাহ্ আসলে খনন করে চলেন মানবমন মানবভূমি। বহির্বাস্তবকে ছাপিয়ে যায় মনোবাস্তব। ওয়ালীউল্লাহ্তাই অন্য রকমের লেখক।

ওয়ালীউল্লাহ্ যখন কলম ধরেন, বলা ভালো-বাধ্য হন, তখন বাংলা গল্প অতিক্রম করেছে প্রায় পাঁচ দশকের পথ। ভাব-ভাষা ও নির্মাণশৈলীতে ক্রমশ ফুটে উঠছে তার বৈচিত্র্য। ততদিনে কল্লোল যুগের লেখকজনেরা তাঁদের কথা-বৈচিত্র্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কলম ধরেছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত বদল ঘটে চলেছে গল্পের চেহারায় আঙ্গিকে অন্তর্লীন

বয়নকৌশলে, এবং অবশ্যই বিষয়ে ও ভাবে-ভাষায়। গল্প-বৈচিত্র্য সম্পর্কে জগদীশ গুপ্ত ভারি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন " :...উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয়, বা সে বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।" [কালি-কলম"-এর সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লেখা চিঠি ১৬.৯.১৯২৭। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী ১ম খণ্ড, ২৭ সংখ্যক চিঠি।] সমাজচেতনা ও অন্তশ্চেতনার মিশেলে বাংলা গল্পভুবনের রূপমাধুর্য প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে থাকে। জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিকের কলমে ক্রমাগত এই বৈচিত্র্য প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা ছোটগল্পে উঠে আসতে থাকে সাধারণ প্রান্তিক মানুষ ও তার মানসভূমি। এই অনুসন্ধানেই একে একে নিয়োজিত হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ এবং আরও অনেকের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। 'নয়নচারা' গল্পবয়নে যে-সূচনা, তাতে জগদীশ ও মানিকের ধারা-প্রভাব কিছুটা স্পষ্ট হলেও অল্প কয়েকটি রচনাতেই নিজস্ব স্বতন্ত্রতার প্রমাণ রাখলেন ওয়ালীউল্লাহ্। "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সর্বসময়ের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখক -গল্পকার ঔপন্যাসিক ও নাট্যরচয়িতা। এর মধ্যে তাঁর গল্পকার ও ঔপন্যাসিক পরিচয় বিশেষ মহত্ত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত..। "ওয়ালীউল্লাহ তো গল্প-লেখক নন, গল্পনির্মাতা। স্থাপত্য নির্মাণের পরও যেমন ধারাবাহিক ঘষামাজ চলতেই থাকে, তেমনই আপন সৃষ্টির প্রতি দরদ লক্ষ করি এই লেখকের মধ্যেও। গল্প তো নয়, যেন আত্মজ। প্রকাশের পরও চলতে থাকে অদলবদল পুনর্লিখন। একটি লেখা নিয়ে কত অতৃপ্তি। লেখার প্রতি কতখানি ভালোবাসা, নিয়ত পূর্ণাঙ্গভাবে ধরবার চেষ্টা। লেখার প্রতি এই দরদ ও নিষ্ঠাই লেখক ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রাণবস্তু। লেখক নিজেই তাঁর গল্পের পাঠক, নির্মম বিচারক।

'নয়নচারা' প্রকাশের কয়েক বছর পর মোটামুটি ১৯৪৯ সাল থেকেই গল্প রচনায় লেখকের মনোযোগ কমে আসে। লেখক মন দাবি করে আরও পরিসর ও ব্যাপ্তি। মনোযোগী হয়ে ওঠেন উপন্যাসে ও নাটকে। ফলত প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশের প্রায় দু-দশক পরে সংকলিত হয় দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ "দুই তীর ও অন্যান্য গল্প" (১৯৬৫)। এ গ্রন্থের ভূমিকাতেই প্রকাশিত হয় নিজস্ব গল্প নিয়ে লেখকের অতৃপ্তি ও পরিচর্যার দৃষ্টিভঙ্গি : "পূর্ব-প্রকাশিত গল্পগুলি এ সঙ্কলনের জন্য ঘষামাজা করেছি, নাম বদলেছি, স্থানে স্থানে লেখকের অধিকার সূত্রে বেশ অদল-বদলও করেছি।» দু-দশক আগে প্রকাশিত গল্প সংকলিত করবার আগে আগাগোড়া পরিমার্জন, নাম বদল (যেমন দুই তীর গল্পের পূর্বনাম ছিল 'কালো বোরখা') করার মতো ধৈর্য শ্রম তো খুব একটা চোখে পড়ে না। ওয়ালীউল্লাহর মতো গল্প-নির্মাতারাই পারেন। ওয়ালীউল্লাহর অধিকাংশে গল্পেই লেখকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কারণ গল্পের চরিত্র গল্পের কাহিনির চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে গল্পের নির্মাণশৈলী। শব্দবন্ধে কীভাবে বুনে চলেছেন গল্পের অবয়ব, তা অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। গল্পকথক থেকে গল্প-নির্মাতা হয়ে ওঠা

ওয়ালীউল্লাহর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মতো এই লেখককেও ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল সমকাল ও বাস্তব অভিঘাত। এই বহির্বাস্তবকে ওয়ালীউল্লাহ্ধরতে চেয়েছেন মনোবাস্তবের প্রেক্ষিতে। তাই তাঁর গল্প-শরীরে বাত্মায় হয়ে উঠেছে অন্য মাত্রার ব্যঞ্জনা। 'নয়নচারা'য় মাটি সন্ধানী আমুর শেষ উচ্চারণ : "নয়নচারা গাঁয়ে কি মা'র বাড়ি? "খিদের সমস্ত চাহিদা আকাঙক্ষা গ্লানিকে ছাপিয়ে এ অনুসন্ধান স্পষ্ট করে তোলে এক গ্রাম উঠোনের মনোভূমি। 'জাহাজি' গল্পে তো সমুদ্রযাত্রা জাহাজ পরিবার ছেড়ে বাড়ি চলে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যায় ছাত্তার। করিম সারেঙও ভাবে" এবার শেষ হবে তার সামুদ্রিক জীবন, এবার এ-অশান্ত জীবন থেকে সে মুক্তি পাবে। "জাহাজ বন্দরে পৌছবার পর করিম সারেঙ ছাত্তারের হাতে ধরিয়ে দেয় ঘরে ফেরার অসম্ভব আকুতিভরা ছাড়পত্র 'তুই বারিৎ যা গই, আর ন আইছ্', আর বদলে নেয় নিজের সিদ্ধান্ত 'আবার সে জাহাজে চুক্তি নেবে, এবং যদি পারে আমৃত্যু সমুদ্রের বুকেই বাস করবে।' ছাত্তারদের ঘর আছে আত্মীয়পরিজন আছে সবাই আছে। কিন্তু করিম সারেংদের জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার মত কোন 'ঘর' নেই। জাহাজ-ই তাদের ঘরবাড়ি, তারা যে জাহাজি'। ওয়ালীউল্লাহকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শওকত ওসমান বলেছিলেন," ওয়ালীউল্লাহর নিসর্গবন্দনা কিন্তু উপন্যাসের পটভূমি রচনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয়। বরং তা উপন্যাসের অলংকারবিশেষ। কথকতার বিবৃতি না দিয়ে যেন পাঠকের দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু-উপন্যাসে নয়, গল্পে নিসর্গ কথকতার মেটিভ বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধৃত। "]সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ :শওকত ওসমান। দেশ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ [শুধু উপন্যাসে নয়, ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পে নিসর্গ এসেছে চরিত্র হিসেবেই। 'পরাজয়' গল্পে নিসর্গ যেন সহযোগী পার্শ্বচরিত্র। গল্প-নির্মাতা হিসেবে লেখকের এও এক নির্মাণকৌশল। 'পরাজয়' -পাঠে বিভূতিভূষণকে কি মনে পড়ে পাঠকের? অনেকটা একই আঙ্গিকে ভিন্নতর বোধে মাত্রায় রচিত হয় 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পটি। একক কোন নায়ক নয়, পঞ্চাশের মন্বন্তরই এ গল্পের নায়ক। আরও নির্দিষ্টি করে বলতে হয়, মন্বন্তরের পীড়নে পিষ্ট একটি মৃতদেহকে ঘিরে আবর্তিত এ গল্প। একটি শবদেহ, তা যেন নিস্প্রাণ অমানবীয় বস্তু নয়, হয়ে উঠেছে। মানবিক চরিত্র।" ওপারে বড় গাঁ, চাল পাওয়া যাবি নেশ্চয়।" এই আশায় মেয়ে পুরুষের দল সঙ্গী বৃদ্ধের মৃতদেহের বাধা অতিক্রম করে চলে যায়। "এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে তার গুড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইল অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মত।" আশ্চর্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হতে হয় পাঠককে। এভাবেই একের পর এক তুলনাহীন স্বতন্ত্র নির্মাণ। একটি তুলসীগাছের কাহিনী, খুনি, দুই তীর, নিস্ফল জীবন, নিস্ফল যাত্রা, মালেকা, খণ্ড চাঁদের বক্রতায়, সেই পৃথিবী, পাগড়ি, কেরায়া, সতীন প্রতিটি গল্পকেই ওয়ালীউল্লাহ্স্থিতধী স্থপতির মতো ভারি মমতায়, কিন্তু কখনো কখনো নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠুরতায় গড়ে তুলেছেন। আর এই নির্মাণক্রিয়ায় বড় রকমের প্রাধান্য পেয়েছে মননচর্চা। 'অবসর কাব্য' এমনই এক গল্প যেখানে মধ্যবিত্ত চরিত্রের ভাবনা-বেদনার নাটকীয় উপস্থাপনা। মনের গহিনে যে জটিল

আবর্ত, চোরাগলি তার সন্ধানে মগ্ন লেখক। পড়তে পড়তে মনে হতে পারে সাধারণ মধ্যবিত্ত মননে এত জটিলতা থাকে? থাকতে পারে? জটিলতা খোঁজার এক ধরনের বিলাসিতা নয় তো? কিন্তু মনের গভীরতর অন্বেষণে এমন আরও জটিল জটিলতর ভাঁজখাঁজের খোঁজ পাওয়া স্বাভাবিক। বরং মনে হয় সময়ের নিরিখে ওয়ালীউল্লাহ্ অনেক বেশি নিবিষ্ট মনের জটিলতা বিশ্লেষণে। এও তাঁর আর এক বৈশিষ্ট্য। যেমন 'স্তন' গল্পটি। এ তো পুরোপুরি মনোবিকলনধর্ম গল্প। একটি শিশুর জন্ম দিয়ে এক মা'র মৃত্যু। অন্য এক মা মাজেদার ষষ্ঠ সন্তান জন্মের পরই চলে গিয়েছে কোল খালি করে। মা মরা সন্তানটিকে দুধ দেবার জন্য মাজেদা কে নিয়োগ করা হয়েছে। সন্তানহারা মাজেদা প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে মাতৃহীন দুধের শিশুকে কোলে তুলে নেয়, স্তন গুজে দেয় শিশুর মুখে। কিন্তু দুধ নেই যে বুকে। মাজেদার মনে হয়" স্ফীত স্তনে দুধ জমে গেছে বলেই কিছু নিঃসৃত হচ্ছে না। "মাজেদা ভাবতে থাকে" এ কি সম্ভব যে, যে-দুধ তার সন্তানের জন্য এসেছিল, তার সন্তানটি আর নেই বলে সে দুধ এমনভাবে জমে গেছে? "এই মানসিক খোঁড়াখুড়ি চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়" কুচাগ্রে কী যেন আটকে আছে বলে দুধটা সরছে না। "আর সে দেরি করে না। সরু দীর্ঘ একটি মাথার কাঁটা নিয়ে পরপর দুটি স্তনের বোঁটায় তীক্ষভাবে বসিয়ে দেয়। তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে-দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল।"

এমনই আরও অনেক গল্প, যার নির্মাণকৌশল গল্পশরীর সচকিত করে, বিস্মিত করে। 'না কান্দে বুবু'র প্রতি অনুচ্ছেদের নির্মাণপর্বে আশ্চর্য কারুকাজ। মনে হয়, এও সম্ভব !কখনো অনামা চরিত্রের সংলাপ, কখনো বর্ণনা। মাঝেমধ্যে একই কথার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু একঘেয়েমির প্রশ্নই আসে না। বরং এমত বর্ণনায় মেলে রূপকথা-স্বাদ। ওয়ালীউল্লাহর নির্মাণকলার অন্যতম উপাদান তাঁর ভাষাবিলয়। জাদুকলমের অসাধারণ চারুতাগুণে ভাষা পায় অলঙ্কারের সৌকর্য। 'নয়নচারা' গল্পে" আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নাবল। "কিংবা 'কেরায়া' গল্পে" কানা বেড়ালের মতো নিঃশব্দে সতর্ক পদক্ষেপে অবশেষে ভোর আসে। "অবসর কাব্য'-এ" পৃথিবীময় মখমলের মতো রাত্রি এসেছে নিঃশব্দে। "স্বপ্নের অধ্যায়'-এ" মাস্টারনিটির সঙ্গে তার ভাব হল, পাখির পালকের মত উষ্ণ নরম ভাব। "তেমনই 'নানির বাড়ির কেল্লা'-য়" খানিকটা উজানে নদীটি হঠাৎ কেচ্ছার মতো রহস্যময় হয়ে গেছে। "জীবনানন্দ বলতেন" উপমাই কবিতা"। ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পশরীরের স্থানে স্থানে আশ্চর্য সব উপমায় মনের মধ্যে চারিয়ে যেতে থাকে কবিতা-অনুভব। উপমার পাশাপাশি ওয়ালীউল্লাহর গল্পের আর এক সম্পদ পূর্ববঙ্গের বৈচিত্র্যময় উপভাষা। অধিকাংশ গল্পেই তো প্রান্তিক জীবনের জীবনচিত্রণ, যে জীবন পল্পবিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, যশোর, খুলনার গ্রামমাটিতে। এইসব এলাকার স্থানিক উপভাষা উচ্চারিত হয় গল্প-চরিত্রের ঠোঁটে ঠোঁটে। গল্পের পৃষ্ঠা থেকে চরিত্রগুলি যেন উঠে দাঁড়ায়। ভারি সবল, মুখোমুখি তাদের অবস্থান। এই বাস্তবতা যতটা না বাইরের, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্দরের অন্তরের। চরিত্রের অন্তর্গত যে মানুষ তারই উন্মোচনে ওয়ালীউল্লাহর স্বকীয়তা। এতটাই আন্তরিক

গভীর উপস্থাপনা যাতে গল্পভূমির মানসজনে আবিষ্ট হয়ে ওঠেন পাঠক। গল্প-ভুবনের মানুষের সঙ্গে এভাবে একাত্ম হয়ে নিজেকে দেখার সুযোগ তো মেলে না সহজে। বাংলা ছোটগল্পের বহতা স্রোতের যে অভিমুখটির সন্ধান পেতে কিছুটা অসুবিধে হত, উপস্থিতি অনুভূত হত জগদীশ-মানিক-জ্যোতিরিন্দ্রের সৃজনে, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে ছোঁয়া যেত না তাকে, ওয়ালীউল্লাহর 'গল্পসমগ্র' একালের পাঠককে এনে দিল সেই আস্বাদঅহঙ্কার।

আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

লিয়াকত হোসেন

রবীন্দ্রনাথ ও সুইডেন

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুইডেনের সম্পর্ক খুব জোরালোভাবে গড়ে ওঠেনি। জাপান, চীন, ইরান, রাশিয়া বা ব্রিটেনের সঙ্গে কবির ঘন ঘন যাতায়াতে যেভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো সুইডেনের সঙ্গে ততটা হয়নি। ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেও কবি সুইডেন এসেছেন মাত্র দু'বার, ১৯২১ ও ১৯২৬ সালে। অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার লাভের ৮ বছর পর। কলকাতা তথা ভারতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে বাড়িটি যাদুঘর হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে ও ঠাকুর পরিবারের অনেক দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন বাড়িটি ঘিরে। এই বাড়িতেই কবির জন্ম ও মৃত্যু। বাড়ির দোতলার একটি ঘরে কবির জাপান, ইরান ও রাশিয়া ভ্রমণের ওপর প্রর্দশনী কক্ষ। কিন্তু কোথায়ও সুইডেন ভ্রমণের উপর তথ্য নেই। তবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ছোট্ট পেপার কাটিং আছে। সুইডেনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরালো হয়ে উঠেনি বলেই হয়তো এদিকটা প্রাধান্য পায়নি।

কিন্তু ইতিহাস ঘেটে যতটুকু পাওয়া যায়, কবির নোবেল পুরস্কার লাভের ঠিক এক বছর আগে, ১৯১২ সালে সুইডেনের যুবরাজ উইলহেম কলকাতা ভ্রমণ করেন। সে সময় তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সুইডিশ সোসাইটির হালকা যোগাযোগও ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সুইডিশ লেখিকা সেলমা লগারলভের পত্রালাপ ছিল। তবে এই যোগাযোগ রবিঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তিতে কোন প্রভাব ফেলেনি। রবিঠাকুর নোবেল লাভ করেছিলেন স্বীয় প্রতিভাবলে।

গীতাঞ্জলির অনুবাদ

গীতাঞ্জলির কবিতাগুলো যে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল সে এক বিস্ময়। ১৯১২ সালের মার্চে কবির বিলেতে যাবার কথা। কিন্তু এই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে বিশ্রামের জন্য শিলাইদহ চলে যান ও নিজেকে হালকা কাজে ব্যস্ত রাখতে গিয়ে বেছে নিলেন কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। গীতাঞ্জলি থেকে গৃহীত ৫৩টি কবিতার পাশাপাশি ১৬টি কবিতা নিলেন গীতিমালা থেকে, ১৫টি নৈবদ্য থেকে, ১১টি খেয়া থেকে, ৩টি শিশু থেকে এবং কল্পনা, স্মরণ, চৈতালি, উৎসর্গ থেকে আরো কয়েকটি কবিতা এভাবেই গ্রথিত হল গীতাঞ্জলির ইংরেজি কবিতার অনুবাদ।

কয়েকমাস বিশ্রামের পর কবি বিলেতের উদ্দেশে জাহাজ যাত্রা করলেন। জুন মাসের ২ তারিখে বিলেতে পৌঁছে পূর্ব পরিচিত স্যার উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের হাতে অনুবাদগুলো তুলে দিলেন। অনুবাদকর্মের গুরুত্ব অনুধাবন করতে এতটুকুও ভুল

করেননি রোটেনস্টাইন। তিনি তৎকালীন সাহিত্যজগতের কয়েকজনকে নিয়ে কবির সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন এবং ঐ বৈঠকে আইরিশ কবি ইয়েট্সও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন একজন তাঁর অনুবাদগুলো দেখে দিক যার মাতৃভাষা ইংরেজি। অনুবাদ কবিতাগুলো পড়ার পর কবি ইয়েট্স অকুণ্ঠ রায় দিয়ে বললেন, গত ১০ বছরে তিনি ইংরেজি ভাষায় এমন রচনা পড়েননি। এরপর ইয়েট্স যেখানেই গেছেন সঙ্গে থেকেছে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের খাতা।

এরপর সীমিতসংখ্যক কবিতা নিয়ে কবি ইয়েট্সের ভূমিকাসহ ১৯১৩ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশ করে গীতাঞ্জলি। রবিঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই গীতাঞ্জলির ১০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

নোবেল প্রাপ্তির পূর্বে

নোবেল প্রাপ্তির পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সম্মানে রোটেনস্টাইন যে কাজটি করেছিলেন সেটিও ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েট্সের নেতৃত্বে ১৯১২ সালের জুলাইয়ে লন্ডন ট্রোকাডেরো রেসেরাঁরায় নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সাহিত্য জগতের ৭০ জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। উদ্দেশ্য ছিল সুধীমহলে রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন কবি ইয়েট্স এবং ঐ নৈশভোজে রবীন্দ্রনাথকে বিলেতের সুধিমহলে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি নোবেল পুরস্কারের জন্য কবির নাম প্রস্তাব করা হয়। সে কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন রোটেনস্টাইন ও ইয়েট্স। সুধীমহলে পরিচয় পর্বের পর ১৯১৩ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। তিনিই ছিলেন প্রাচ্যের প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিরল সম্মানে ভূষিত হন।

রবীন্দ্রনাথ ও সুইডিশ সোসাইটি

এই সত্যটি সহজভাবে ধরে নেয়া যায় যে, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময় পাশ্চাত্যে কবি রবিঠাকুর ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই তাঁর নোবেল প্রাপ্তিতে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। সে জন্য মিডিয়াতে কিছু অগ্রহণযোগ্য শব্দ এসেছিল যা গ্রহণযোগ্য নয়।

এটি বিস্ময়কর হলেও সত্য যে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় কবি রবীন্দ্রনাথ অপরিচিত থাকলেও সুইডিশ সোসাইটিতে তিনি অপরিচিত ছিলেন না। কিছু তথ্যে জানা যায় ১৯১৩ সালে কবি রবিঠাকুর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বছর দুই পূর্বে ১৯১১ সালের শুরু থেকেই সুইডিশ সোসাইটি কবি রবিঠাকুরের সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। একই বছর সুইডেনের রাজা পঞ্চম গুস্তাভের দ্বিতীয় পুত্র সোদারমানল্যান্ডের ডিউক প্রিন্স কার্ল উইলহেম লুদভিগ কলকাতা ভ্রমণ করেন। প্রিন্স উইলহেম ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, কম্বোডিয়া, রেঙ্গুন হয়ে কলকাতা পৌঁছে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ঠাকুর পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। প্রিন্স উইলহেমের কলকাতা ভাল লাগেনি। কলকাতাকে

এক বিরক্তিকর শহর বলে উলেস্নখ করেছেন। সামাজিক বর্ণবাদ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-শুদ্র বর্ণবিভেদ, কালিঘাটে পশুবলী তাঁকে কষ্ট দিলেও ঠাকুর বাড়ির সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ঠাকুর বাড়ির প্রশস্ত লাইব্রেরি হলে প্রিন্স উলহেমকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রিন্স উলহেম লিখেছেন, 'দিনের শেষে আঁধারে গাড়িতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি চালক একটি ইংরেজি শব্দও জানেনা, অবশেষে আমরা প্রশস্ত দরজার সম্মুখে এলাম। দরজা খোলার পরই রোমীয় সম্রাট সিজারের মত রাজকীয় পোষাক ও পাদুকা পরিহিত তিনজন বিশিষ্ট আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন। তাঁরা কলিকাতার বিশিষ্ট ঠাকুর পরিবারের চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই, এঁদের দুইজন শিল্পী, একজন আইনজ্ঞ, সবার ছোট চতুর্থজন সাহিত্যিক, তিনি সাময়িক সময়ের জন্য বাইরে ছিলেন। বিশাল ঘরটি মূল্যবান তৈলচিত্রে সজ্জিত। পূর্ণ গালিচায় ঢাকা মেঝে, কয়েকটি ছোট ও বড় কুষণ পাতা। লাইব্রেরী হলটি পরিপূর্ণ ও সাজানো ছিল ২০,০০০ পুস্তকে। ঠাকুরেরা সাহিত্য ও বিভিন্ন পুসস্তক বিষয়ক উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। রাজনৈতিক আলোচনাও হচ্ছিল তবে তাঁরা ইংরেজ শাসনে ছিলেন অসন্তুষ্ট। শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতে ঠাকুর পরিবার কলিকাতায় বহুল পরিচিত।'

রবিঠাকুরের সুইডেন আগমন

১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেও কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর স্টকহোম গ্রেন্ডহোটেলে নোবেল নৈশভোজে কবি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, কবির পরে টেলিগ্রাম পাঠ করেছিলেন বৃটিশ চার্জ দ্য এফের্য়াস মিস্টার ক্লাইভ, 'I beg to convey to the Swedish Academy my grateful appreciation of the breadth of understanding which has brought the distant near and has made a stranger a brother.' কবির পক্ষে নোবেল পদক গ্রহণ করেছিলেন বৃটিশ কূটনীতিক। তবে কবি সুইডেন এসেছেন মাত্র দু'বার, ১৯২১ ও ১৯২৬ সালে। অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার লাভের আট বছর পর। রবিঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তির পর পরই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ে ইউরোপ। যুদ্ধের ডামাডোলে কবির সুইডেন আসা সম্ভব হয়নি। এসময় ধীরে ধীরে শুরু হয় শান্তিনিকেতনের কাজ। ১৯২১ সালের দিকে কবি বের হলেন ইউরোপ ভ্রমণে, উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ। ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশে সভা সমাবেশ ও বক্তৃতা রাখার পর কবি এসে উপস্থিত হলেন জার্মানিতে। সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধু। জার্মানিতে কবিকে দেয়া হল অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা। জার্মানি থেকে কবি এলেন ডেনমার্ক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পৌঁছে দেখেন, নোবেল পুরস্কার প্রাপক ভারতীয় কবিকে দেখার জন্য সে কী বিরাট জনতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর ছাত্রেরা মশাল জ্বেলে শোভাযাত্রা করে কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল; এবং তারপর অনেক রাত পর্যন্ত প্রাঙ্গণে উৎসব ও হৈ-হুল্লোড় করল। কবি সহাস্যমুখে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।' ডেনমার্ক ভ্রমণ সম্পর্কে সুইডিশ দৈনিক

স্ভেন্স্কা ডাগব্লাডেটের সাংবাদিক মার্টা লিন্ডকভিস্ট লিখেছেন, 'Rabindranath's second day in Copenhagen was blessed with brilliant high summer weather from early in the morning, when Tagore and his Danish friends went for a drive towards North Zealand, to the evening when the students of Copenhagen paid tribute to him with a splendid torchlight procession after his recitation at the student union.'

ডেনমার্ক থেকে কবি মে মাসের বাইশ তারিখ বিকেলে মালমো শহরে এসে পদার্পণ করেন। মালমোয় অভাবনীয় সম্বর্ধনা লাভের পর কবিকে রেলপথে স্টকহোমে নিয়ে আসা হয়। মালমো হতে ট্রেন সকাল দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে স্টকহোমের পথে রওয়ানা হয়। সঙ্গে উৎফুল্ল জনতা। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে এসে দেখেন স্টেশনে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্যগণ তাঁকে স্বাগত করবার জন্য উপস্থিত। কবিকে স্বাগত জানাতে স্টকহোম রেলস্টেশানে উপস্থিত ছিলেন সুইডশ একাডেমির সেক্রেটারি ড. কার্লফেল্ড, কাউন্টপত্নী ইউলামোজ মোলেনদ্রফ, লেখক ফিয়া ওহম্যান ও অনান্য সুধীবর্গ। স্টেশনের বাইরে বিরাট উৎসুক জনতা অপেক্ষা করছিল। কবি শান্ত মনে মাথা নুইয়ে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করেন। ড. কার্লফেল্ড শোভাযাত্রাসহ কবি ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আসেন গ্র্যান্ডহোটেলে। এই হোটেলেই কবি ও তাঁর সঙ্গীদের অবস্থান ঠিক করা হয়েছিল। বিকেলে এক সম্বর্ধনা সভায় কবি তাঁর ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে জানান, এই দেশটি উড়োজাহাজে করে তাঁর দেখার ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে পূরণ হয়নি, কবির সুইডিশ বন্ধুরা তাঁকে নিবৃত করেন। কবির সফরসঙ্গী কবি পুত্র ও পুত্রবধু যদি রাজি হতেন তবে কোন কিছু বাধা হয়ে উঠত না। ২৪ মে কবি আরেকটি সম্বর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখেন। ২৭ মে উপসলার কাগজগুলো রিপোর্টে লিখে, 'The stage had almost been transformed into an orangery with a colossal decoration of flags at the back of the stage, the rostrum completely concealed in flowers.' লেখিকা অ্যানি আকারহেইল্ম কবিকে 'The mysterious property of the East' বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, কবির ভেতর দুটি শক্তি বিদ্যমান, সৃষ্টি ও ধ্বংস, জীব হতে জীবে, ব্যক্তি হতে ব্যক্তিতে এবং তাঁর ভেতর বুদ্ধ ও যিশু উভয়েই সমন্বিত|

১৯২১ সালের মধ্যেই জার্মানিতে কবির আট লক্ষ কপি বই বিক্রয় হয়ে গিয়েছিল, যা ছিল যে কোন লেখকের চেয়ে বিশাল বিক্রয় সংখ্যা। বিক্রয়লব্ধ বইয়ের রয়্যালিটি সংগ্রহ ও সুইডেন ভ্রমণ দুটিই সমন্বয় সাধন হয়েছিলো। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জার্মানি যখন এসেই পড়েছেন, বাবা সুইডেন যাবেন না-তা কি হয়? নোবেল কমিটির আমন্ত্রণের ব্যাপারটাতো ছিলোই। স্টকহোম ইউরোপের সুন্দর নগরীগুলোর অন্যতম। সেখানে আমাদের অবস্থান খুব মধুর ছিল। নোবেল কমিটি আনুষ্ঠানিক ভোজসভার আয়োজন করেছিলো। বাবা অনুবাদ পড়েছেন এমন লেখকদের অনেকের সঙ্গে এ অনুষ্ঠানে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় সুইডেনের রাজা সভাপতিত্ব করলেন আর আতিথেয়তা করলেন সেলমা লাগেরলফ। বাবা বসলেন এ দুজনের মাঝখানে। উপস্থিত ছিলেন নুট হামসুন, বিওর্নসন, সোয়েন হেডিন, বোয়ের এবং

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার খ্যাতিমান লেখকবৃন্দ। আমি বসেছিলাম নোবেল কমিটির সচিবের পাশে।' অনুষ্ঠানে ছিলেন ১৯০৯ সালে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পাওয়া নারী লেখিকা সেলমা লগারলফ, ১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত নরওয়ের সাহিত্যিক নুট হামসুন, ১৯০৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত নরওয়ের সাহিত্যিক বিয়র্নস্টার্ন, সুইডিশ পর্যটক ও ভূগোলবিদ নোবেল পুরস্কার কমিটির আজীবন সদস্য স্ভেন হেডিন ও আরো অনেকে। সুইডেনের রাজা সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে কবি তাঁর ভাষণে স্মরণ করেন পঁচিশ বছর বয়সে পদ্মার উপর বোটে ঘুরে বেড়ানোর কথা, গ্রাম বাংলার সৌন্দর্যের কথা ও গীতাঞ্জলির কবিতাগুলো লেখার অনুপ্রেরণার কথা। কবির ভাষণের পর উপসলা চার্চের আর্চবিশপ বললেন, 'ঋষি ও কবির সমন্বয় হয়েছে কবির ভেতর, নোবেল সাহিত্য পুরস্কার যোগ্য পাত্রে অর্পিত হয়েছে।' আর্চবিশপের অনুরোধে কবি উপসলা ভ্রমণ করেন ও অগনিত ভক্তের সম্মুখে উপসলা চার্চে বক্তৃতা করেন। বিশপ উপস্থিত থাকলে ইতিপূর্বে অন্য ধর্মাবলম্বী কাউকে চার্চে বক্তৃতা দিতে দেয়া হয়না কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকে সে সম্মান দেয়া হল।

স্টকহোম আসার পর পরই কবির সঙ্গে সুইডিশ পর্যটক স্ভেন হেডিনের পরিচয় হৃদ্যতা হয়। স্ভেন হেডিনকে কবি তাঁর একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। কবির সঙ্গে মিলিত হয়েই হেডিন মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'It was a splendid sight to see the fine looking Indian poet.' হেডিন সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিনি ছিলেন একজন পর্যটক। যেখানে সেখানে চট করে চলে যেতেন। সবখানে এমনভাবে থাকতেন যেন সেটাই তাঁর বাড়ি। গোটা বিশ্বটাকেই তাঁর নিজের আলয় বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনি পড়তে বাবা পছন্দ করতেন। দেখা হবার পর ব্যক্তি হেডিনকেও পছন্দ করে ফেললেন। তাঁর সঙ্গে সহজেই সবার বন্ধুত্ব হয়ে যেত। তিনি তখন ইংরেজদের উপর ভীষণ ক্ষেপে আছেন। বৃটিশরা একসময়ে তাঁকে যে সম্মানে ভূষিত করেছিল, তা ফিরিয়ে নিয়েছে। বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক তাজা দেখাত। তিনি আমাদের জানালেন যে আবার মধ্য এশিয়ায় ঘুরতে বেরাবেন। একদিন সুইডেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন যে বাবার সম্মানে সুইডিশ সরকার সেনাবাহিনীর সি প্লেনে আমাদের বার্লিন ফেরার ব্যবস্থা করতে চায়। কবি এতে রাজি হলে সুইডিশ সরকার আনন্দিত হবে। আইডিয়াটা বাবার খুব পছন্দ হল। যথারীতি একটি বিমান প্রস্তুত করা হল। এরপর হেডিন বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে এলেন। যথাকার কথা বলছি তখন বিমান চলাচলের যুগ শুরু হয়েছে। হেডিন বিমান ভ্রমণের কথা শুনেই আঁতকে উঠলেন। আমাকে বললেন যে বাবাকে যেন আমি মানা করি। তিনি তাঁর দেশ সুইডেনকে ভালোবাসেন তবু কিছুতেই চান না যে আমরা সুইডিশ বিমানে উঠি। বিমানটা কোন জার্মান পাইলট চালালে না হয় দেখা যেত! হেডিন তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণালয়ে ফোন করলেন এবং উদ্বেগের কথা জানালেন। এরপর ট্রেনে চেপে বসা এবং নৌপথ জাহাজে পাড়ি দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না।' সুইডেন ভ্রমণশেষে কবি সদলবলে জার্মানি যাত্রা করেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার সুইডেনে পদার্পণ করেন ১৯২৬ সালে।

দ্বিতীয়বারের ভ্রমণও প্রথমবারের মত না হলেও প্রাধান্য পেয়েছে। যথারীতি এবারও তিনি গ্র্যান্ড হোটেলে এসে উঠেন। দৈনিক স্ভেন্স্কা মরগনব্লাডেট এক সাক্ষাতকারে জানায়, আগেরবারের চেয়ে কবিকে দশ বছরের যুবক লাগছে। এই সময় কবি পাশ্চাত্যে খৃষ্টধর্মের প্রতি গভীর আগ্রহ ও উদারতা প্রকাশ করেন এবং বলেন খৃষ্টধর্মের উদারতার ভেতর দিয়েই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি রক্ষা ও বৈষম্য দূর হবে।

রবিঠাকুরের সুইডিশ অনুবাদ

প্রিন্স কার্ল উইলহেম কলকাতা থেকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে প্রাচ্য ভ্রমণ ও কলিকাতা অভিজ্ঞতার উপর এক সারগর্ভ পুসস্তক Där Solen lyser বা 'ওখানেও সূর্য উজ্জ্বল' রচনা করেন। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে এবং ঐ বছর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রিন্স উইলহেম ক্রমে রবীন্দ্র সাহিত্যের গুণগ্রাহীতে পরিণত হন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি রবিঠাকুরের 'স্ফুলিঙ্গ' বইটি Eldflugor নামে সুইডিশে অনুবাদ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চীন ও জাপান ভ্রমণকালীন সময়ে লিখিত ছোট ছোট হাইকু জাতীয় কবিতা সমষ্টির অনুবাদ সংকলন Eldflugor বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। প্রিন্স উইলহেম কবি রবিঠাকুরের অনুমতিসাপেক্ষে ছোট ছোট কবিতাগুলি অনুবাদ করেন এবং ৬০ পৃষ্ঠার বইটিতে স্থান পেয়েছে ২৪০টি কবিতা। বইটি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুইডিশ পর্যটক, লেখক ও সুইডিশ একাডেমি সদস্য স্ভেন হেডিনকে বইটি উৎসর্গ করেন

গীতাঞ্জলির মর্মস্পর্শী কবিতাগুলোর জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেও গীতাঞ্জলির সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে, গীতাঞ্জলির সুইডিশ অনুবাদ আন্দ্রিয়া বুটেনশোন। কিন্তু এর আগেই কবিগুরুর দুটি কাব্য সংকলন সুইডিশ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে 'The Gardener' অনুবাদক ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডেরবার্গ (১৯১৪) ও 'The Crescent Moon' কবিতা সংকলনের বেশ কয়েকটি কবিতার হরাল্ড হাইমেনের অনুবাদ নিয়ে Nymånen, ১৯১৪ সালে।

এরপর কবি গুরুর আরও বেশ কয়েকটি বই সুইডিশে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই বইগুলো:

১ Postkontoret (ডাকঘর), অনুবাদক হরাল্ড হাইমেন ১৯১৬
২ Kungen av det mörk rummet (রাজা), অনুবাদক ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডেরবার্গ ১৯১৭
৩ Farande fåglar (ছোট ছোট কবিতা সংকলন), অনুবাদক হুগো হুলতেনবার্গ ১৯১৭
৪ De Rovlystna Stenarna (ক্ষুধিত পাষান ও অনান্য গল্প), অনুবাদক হরাল্ড হাইমেন ১৯১৮
৫ Mina Minnen (আত্মস্মৃতি), অনুবাদক আগষ্ট কর ১৯১৯
৬ Offret (বির্সজন), অনুবাদক হুগো হুলতেনবেরী ১৯১৯
৭ Sadhana (সাধনা), অনুবাদক আগস্ট কর ১৯২০

৮ Mashi (gvwm), অনুবাদক হুগো হুলতেনবার্গ ১৯২০
৯ Chitra (চিত্রা), অনুবাদক ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডেরবার্গ ১৯২১
১০ Skeppsbrottet (নৌকাডুবি), অনুবাদক আগস্ট কর ১৯২১
১১ Fruktplockning (চিত্রা, বলাকা, গীতালি, গীতাঞ্জলি, উৎর্সগ, খেয়া, কথা কাব্যগ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতার অনুবাদ সংকলন) অনুবাদক হুগো হুলতেনবার্গ ১৯২১
১২ Glimtar från Bengalen (ছিন্নপত্র), অনুবাদক হুগো হুলতেনবার্গ ১৯২১
১৩ Vårspelet (ফালগুনি), অনুবাদক হরাল্ড হাইমেন ১৯২২
১৪ Flykten (কচ-দেবযানী ও বিখ্যাত কয়েকটি কবিতা সংকলন), অনুবাদক হরাল্ড হাইমেন ১৯২৩
১৫ Den skapande Enheten (হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধ্যাত্মিক আলোচনা) ১৯২৩
১৬ Min Barndom (আমার ছেলে বেলা), অনুবাদক ইলা মিরিন-হিলবুম ১৯৫৬
১৭ För fyra röster (চতুরঙ্গ), ফরাসী থেকে সুইডিশে অনুবাদ করেন ইলা মিরিন-হিলবুম ১৯৬৪

কবি গুরু রবিঠাকুরের বিভিন্ন কবিতা ও নাটকের পাশাপাশি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র আলোচনায় সমৃদ্ধ পুস্তক Rabindranath Tagore och hans författarskop (রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকর্ম) এবং ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় Santiniketan. ১৯৬৪ সালের পর থেকে রবিঠাকুরের কোন অনুবাদকর্ম সুইডিশে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত না হলেও মাঝে মধ্যে দু-একটি হচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় রবিঠাকুরের বিভিন্ন কবিতার অনুবাদ সংকলন Mitt Hjärta Dansar (হৃদয় আমার নাচেরে) অনুবাদ Kristian Carlsson। এখনো রবিঠাকুরের পাঠক চাহিদা প্রবল।

(লেখকের ইমেল যোগাযোগ Liakat.stockholm@yahoo.com)

তথ্যসূত্র:

Tagore in Sweden 1921 & 1926
আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রজীবন কথা : শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সুইডিশ পত্র পত্রিকা : Svenska dagbladet, Swedish Arkive
Dar Solen lyser : Prince Karl Wilhem

সুইডেন

শামীম আজাদ

শতবর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আমি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০ বছরে পা রাখল আর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পড়ার হল ৫০ বছর! ভাবা যায়? কোন কোন মানুষ ঐ পঞ্চাশ বছর আয়ুই পায় না। এখন আমি যখন আমাদের স্যারদের কথা, রোকেয়া হলের কথা কিংবা টি.এস.সির খাবারের গল্প করি- আমার চারপাশে লোক জমে যায়। গোল হয়ে বসে। ওদের কাছে গল্প মনে হয়। সব কিছু বাদ দিয়েও যখন বলি ১২ থেকে ১৪ টাকায় ঢাকাই শাড়ি কিনতাম। আমি ও বাবলী টি.এস.সি তে এক টাকা পঁচিশ পয়সায় কুপন কিনে ভাত, সালাদ বা ডাল ও মাংস-আলুর তরকারি দিয়ে খেলে পেট ভরে যেত। কিংবা পুরো কলাভবনের মেয়েদের মাথায় হিজাব পাওয়া দুষ্কর ছিল। শাড়িই ছিল আমাদের প্রধান পোশাক! সবাই বিস্ময়ে তাকায় যেন বাড়িয়ে-চুরিয়ে বলছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বর্ষে পা ফেলা উপলক্ষ্যে আমরা ৬৯-এর সতীর্থরা স্মৃতিচারণ করার জন্য ফেসবুকে জুলাইর ১ তারিখ থেকে আমাদের সাদাকালো ছবি দিচ্ছি। আর আমাদের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির পিকনিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সোনারগাঁয়ে সত্যাগ্রহ, মাস জুড়ে নাটক, স্পোর্টস, বিতর্ক, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরী, ৭১ এর ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলন, এসময় ট্রাকের উপর বসে গান আর কবিতা করে শহর ঘোরা, ৬৯-এর গন-আন্দোলন, বটতলায় বক্তৃতা ইত্যাদির ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠছে আমাদের গৌরবের ইতিহাস। তরুণ বন্ধুরা বলছে আমরা নাকি এখনকার সময় থেকেও এগিয়ে ছিলাম। এখন নাকি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজলেও আমাদের মত একটি মেয়েও পাওয়া যাবে না। হয়তো ওরা একটু বেশিই বলছে। হয়তো না। যাক এ সব নিয়ে আরেকদিন বলা যাবে। আজ বলি সে সময়ের গল্প।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল বিজ্ঞান, আইন ও কলা অনুষদ নিয়ে। তখন শুধু বাংলা বলে কোন বিভাগ ছিল না। ছিল 'সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ'। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহই বাংলা অনার্স শ্রেণীর পাঠক্রম করেন। ১৯৩৭ সালে সংস্কৃত বিভাগ ও বাংলা বিভাগ আলাদা হয়ে গেলে ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সে সময় যেসব মনীষী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও গবেষকগণ বাংলা বিভাগ আলো করেছিলেন তাঁরা হলেন মোহিতলাল মজুমদার, ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ড: মনোমোহন ঘোষ, কবি জসীমউদ্‌দীন, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে এবং তার পরে নানা সাংস্কৃতিক ও গণআন্দোলনে আমাদের বাংলা বিভাগ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

আমরা তার গল্প শুনেছি শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড: আহমদ শরীফ, ড: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ড: নীলিমা ইব্রাহীম, শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এঁদের কাছ থেকে। শুনেছি আমাদের সময়ের কলা ভবনের আমাদের এই বিদ্যাদেবগণের কাছ থেকে, একেবারে সামনা-সামনি বসে। কখনো বিশাল ২০১৭ নম্বর কক্ষে, কখনো শীতের রোদে হেলান দিয়ে বাংলা বিভাগের করিডোরে, কখনো আসন্ন উৎসবের জন্য ডি এল রায়, রবীন্দ্রনাথ কিংবা কাজী নজরুল ইসলামের গানের মহড়া দিতে দিতে অধ্যাপক আব্দুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষের মেঝেতে বসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁরাই প্রাচ্যের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় করে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই অসামান্য শিক্ষাগুরুদের জ্ঞান কলস আমাদের হতভাগ্য মাথায় উপুড় হবার আগেই তাঁদের ক'জনকে নির্মম ভাবে হত্যা করে পাকিস্তানী হন্তারা। হত্যা করে একদম বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে।

১৯৬৯ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হই তখন শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। ভর্তি হয়েই রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রী হবার জন্য আবেদন করে বাসে প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে ক্লাশ করে আবার ফিরে যেতাম। আমার বাবা তখন নারায়ণগঞ্জের খাদ্য বিভাগে নগর রেশনিং বিভাগের প্রধান। আমি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা যিনি আর পি সাহা নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এসেছি। হলের এম এ শেষ বর্ষের ছাত্রীদের সেশন যে কোন কারণে শেষ হয়নি বিধায় তারা হল ছাড়েননি। এদিকে প্রথম বর্ষের ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে। কী করা? ঐ শেষ বর্ষের কোন একজনের সঙ্গে ডাবলিং করার শর্তে আমার সিট হল চামেলি হাউসে। আমি ভেবেছিলাম প্রভোস্ট আপা আমাকে ছোটবেলায় চিনতেন বলে একটা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। পরে বুঝলাম এটা একটা চালু সিস্টেম। কেবল মাত্র ভীষণ মেধাবীরাই শুরু থেকে একক সিট পায়।

রোকেয়া হলের সেই প্রাচীন দালানে এক সময় নাকি গান আর পান হত। নূপুরের রিন রিন শব্দ নীলক্ষেতের ধানী জমির হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেত। আর রাতের বেলা এ রহস্যময় বাড়িটির কাঠের সিঁড়িতে শোনা যেত ঔপনিবেশিক আমলের সাহেবদের ভারি জুতোর শব্দ। কিন্তু সেই চামেলি হাউস নামের এমন ভূতুড়ে স্থাপনাতেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়িটির গায়ের ফাটল দিয়ে উঠে গেছে পরগাছা, বিশাল স্নানঘরের ছাদ চুঁইয়ে নেমে আসছে জলধারা। বাইরে চামেলি গাছ না থাকলেও গাড়ি বারান্দার ওপরে ছিল আর্শ্চয মিষ্টি এক ম্যাজেন্টা রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ মাধবীফুল আর তার লতার লাস্য। ১৯৫৭ সালে রোকেয়া হল নির্মাণের আগ পর্যন্ত এটিই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী নিবাস।

রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রী থাকা কালে তিনজন প্রভোস্ট পাই। প্রথম জন ছিলেন সাময়িক। এবং এ শুধু সাক্ষাৎকারের সময়। তিনি ছিলেন ভাষা-আন্দোলন সৈনিক ডঃ সাফিয়া খাতুন- একটু লক্ষ্মীট্যাড়া, সৌম্যকান্তি, সাদা শাড়ি সরু পাড় ও চোখে

আয়তাকার কালো ফ্রেমের চশমা। তাঁর হাতে থাকতো বিশাল এক হ্যান্ডব্যাগ । নারায়নগঞ্জে মর্গান স্কুলে ক্লাশ ফাইভে পড়ার সময় তাঁকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। সেখানে মেয়েদের শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য তিনি পুরো স্কুলকে ১০টি হাউসে ভাগ করে দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম রানী ভবানী হাউসে।

রোকেয়া হলে ঢোকা বলে কথা! সে ডাব্লিং কিংবা ট্রিপলিং হোক। আমি শামীম তরফদার (১৯৭২ সাল থেকে আজাদ), আবু আহমদ মাহমুদ তরফদার ও আনোয়ারা তরফদারের কন্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়বো সেই সুলতানার স্বপ্নের রোকেয়া হলের আদি দালানে থাকবো! পুলকে প্রায় গাগল হয়ে গেলাম।

আমার চুলে তখনও কলেজের মফস্বলী পবিত্রতা। দুই বেনি, গায়ে অড্রে হেপবার্ন স্টাইলের একটা আঁটোসাঁটো পাকা পিচরঙা প্রিন্ট কামিজ পরে, ফেরিওলার ঝুড়ি থেকে পাঁচ টাকায় কেনা দুই স্ট্রাপ স্যান্ডেল পরে নিউ মার্কেট থেকে ছবি তুল্লাম। ছবিটা ফাইলে ঢুকল আর আমি রোকেয়া হলে রেসিডেন্ট স্টুডেন্ট হিসেবে বিশাল এক টিনের গেটের ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখনও শামছুন্নাহার হল নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি বিধায় চামেলি হল থেকে নিজস্ব সিট হল স্টাফ কোয়ার্টারের তিন তলায়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বেল শুনে ডাইনিং রুম থেকে মাখন লাগানো পুরু পাউরুটি এনে খেয়েই দিতাম দৌড় ক্লাশে। কলা ভবনেই মেয়েদের কমন রুমের একদিকের ছোট্ট ক্যান্টিনে, গরম গরম সিঙ্গারা চা থাকতো সব সময়। কাজেই এলোমেলো অবস্থায় দৌড় দিলেও ভেতরের যে ড্রেসিং টেবিল ছিল তা দেখে চোখের আই লাইনার ঠিক করা বা শাড়ি ঠিক করে প্রার পর চা খাবার সময়টুকু শুধু থাকতো।

ততদিনে স্থায়ী প্রভোস্ট আপা এসে গেছেন। হল কম্পাউন্ডের ভেতর তাঁর কোয়ার্টার। দারুন কড়া প্রভোস্ট আখতার ইমাম। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আবহ, নিত্য নতুন বন্ধু, কিংবদন্তী শিক্ষক, বিদেশী পীঠস্হানের মত অপূর্ব সুন্দর ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, চারিদিকে লেগে গেল নবীন বরণের ধুম। এত আনন্দ এত আশা! তাতে একবার রোকেয়া হলের বিশাল গেটের ফোকর গলে বাইরে বেরুলে আর হলে ফিরতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু তাঁর ভয়ে পড়ি মরি করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার আগে হলের গেটের ভেতর ফিরে আসতে হয়। মেইন বিল্ডিং এর নিজে হাজিরা দিতে হয়। আর তারপরই সন্ধ্যার পর শুরু হয় আরেক বায়োস্কোপ জীবন! হলের বিভিন্ন স্থাপনার একটি থেকে অন্যটিতে কেবল যাওয়া আর আসা, প্যারডি বানানো, আড্ডা-গান, রান্নাঘরের দাদীদের পটিয়ে ফুলকো ডিম ভাজা মছর করা, দৌড়াদৌড়ি-পুকুর পাড়ে বসে কার কোথায় প্রেম হচ্ছে বা হচ্ছে না তার গল্প- অকারণে খিলখিল- বাতাসে বাতাসে শাড়ির পতাকা তোলা । মনে হত পুরাই সিনেমা। কিন্তু আপার গাড়ির হর্ণ আর নমিদা'র গেট টানা ঘর ঘর শোনা মাত্র যে যেখানে আছি সেখানেই ধাতব ভাস্কর্য হয়ে যেতে হতো।

সব সময়ই সেই বিশাল গেটে পালাক্রমে থাকতেন মহাপরাক্রমশালী দু'জন দারোয়ান।আমরা সামনের রাস্তায় রোডের হার্ড শোল্ডারে সারি সারি বেগুনি জারুল গাছের নিচে বসে শেষ আড্ডা- সময় পার করে সাড়ে সাতটার দু'এক মিনিট দেরি

করলেই রুদ্ধ সে গেটের গায়ে মৃদু টংকার তুলে তার দরোজা খোলার জন্য কত যে অনুনয় করতে হত! কখনো বাইরের আড্ডা শেষে হলে পৌঁছে দিতে এসে হাসান, রেজা, বাহার মজা করে পুরানো প্যারডিটাই বার বার করতো- 'রোকেয়া হলের গেট দেখেছ দেখ নাই তার প্রাণ/ ভেতরে তার শত শত নারী/ বাহিরেতে দারোয়ান!'

একুশে ফেব্রুয়ারি আসার আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত। সবগুলো হলের নিজস্ব অনুষ্ঠানের মহড়া শুরু হত। অনুষ্ঠান গুলোয় গান গাইতেন কাদেরী কিবরিয়া, শাহীন মাহমুদ, মিলিয়া গনি, নাসরিন আহমেদ, রোকেয়া মীনাক্ষী হক, সাধন দাস, রথীন্দ্র নাথ রায়, অজিত রায়, জাহেদুর রহিম, ইকবাল আহমেদ এবং নৃত্যে শারমিন হাসান, লায়লা হাসান, লুবনা মরিয়ম এরা। এরা কেউ সতীর্থ, কেউ অগ্রজ। কিন্তু গোলাম মোস্তফা, কামাল আতাউর রহমান, বাবলী, আমি আমরা আবৃত্তি করতাম। আবৃত্তি শেষে আমরা শ্রাবণী, শেলী, নাজলীর মত কোরাসে কণ্ঠ দিতাম। গান শেখাতে আসতেন দিব্য কান্তি জাহেদুর রহিম, ঋজু আব্দুল লতিফ। নিজস্ব রিক্সা দিয়ে আসতেন শেখ লুৎফর রহমান।

টিএসসিতে চলতো লাগাতার মহড়া। ওখানে হত ডাকসু সাংস্কৃতিক পরিষদের অনুষ্ঠান, সম্মিলিত জোটগুলোর অনুষ্ঠান হত বাংলা একাডেমিতে। তখন শিল্পকলা একাডেমি ছিল না। একুশের আগের সন্ধ্যায় আমরা ওদিকটায় একটা ঘুল্লা মেরে দেখি আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েরা শহীদ মিনারের পাদদেশে ও রাস্তায় আলপনা করার যোগসাজশ করছে। জগন্নাথ হল ও মহসীন হলের ছেলেরা মধ্যরাত পর্যন্ত সজাগ থাকবে আর চা খাওয়া-খাওয়ি করবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু প্রভোস্ট আখতার ইমাম আপার জন্যে আমাদের তার উপায় নেই। তাঁর ভয়ে বেগুনি জারুলের নিচে ফুটপাথে বসে ছেলেগুলোর সঙ্গে ভাল করে আড্ডাই দিতে পারি না।

আমাদের হলে তখন দেখতাম মালিভাইরা লন পরিষ্কার করেছেন। লাল মেইন বিল্ডিং এর সামনে অতি ছোট্ট একটা কংক্রিট ভাস্কর্য। ওখানেই ছাত্র ইউনিয়নের একুশের অনুষ্ঠান হত। লিটল ম্যাগাজিন ও হবে। চারিদিকের এ ব্যস্ততায় দেখতাম সতীর্থ কামাল, হাবীব, ঝোরা ওরাও ছুটছে। কামালের ভাবে বুঝাই যায় না সে বঙ্গবন্ধুর পুত্র। সে ৬৯ থেকে ৭৫ অবধি কয়েক বছর একটানা আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। কারা কোথায় যাবে, রিহার্সেলে কী খাওয়ানো হবে, ডাকসু অফিসে কে আছে কে নেই এইসব নিয়েই তার ব্যস্ততা! হলে তখন মহা ব্যস্ত আয়শা খানম আপা, মালেকা বেগম আপা, সঙ্গে ছোট্ট লাল টুকটুকে আভাদি ও আমাদের বন্ধু রোকেয়া।

মনে পড়ে কলা ভবনে বাংলা বিভাগের 'অন্য একুশ'। এর জন্য আব্দুল হামিদুল ইসলামের ব্যকড্রপ। মহসিন রেজার ভারি স্বরে কবিতার লাইন মুখস্ত করা, আলী ইমাম আর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা। আমাদের উত্তেজনার সাথে সাথে কলা ভবনে বটতলার সামনের সড়ক দ্বীপের শিশু ইউক্যালিপ্টাস দোল বেড়ে যেত।

একুশের ভোরে রোকেয়া হলের হলের সেই তিমি মাছের পিঠের মত লোহার দরজার চৌকো পেট দিয়ে বেরিয়েই দেখতাম ছেলেরা সাদা পাঞ্জাবি কালো ফিতার ব্যাজ পরে

ব্যানার হাতে অপেক্ষায়। সবাই খালি পায়ে। আমাদের মনে ভাষা শহীদদের স্মৃতি কণ্ঠে গাফফার চৌধুরির আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি... আমি কি ভুলিতে পারি...। গেয়ে গেয়ে ও হামিং করতে করতে নম্র পদক্ষেপে আমরা ঢাকা শহরের ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে জারুল তমাল পেরিয়ে শহীদ মিনারের দিকে এগোতাম। আশেপাশের দোতলা থেকে লোকজন দাঁতের ব্রাশ হাতে, তোয়ালে কাঁধে আমাদের দেখতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতো। আজ এতদিন পর ভেবে অবাক হয়ে যাই কী করে রোকেয়া হল থেকে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে শহীদ মিনার গিয়েছি ও ফিরেছি। হাঁটতে হাঁটতে উষ্টা খেয়ে কড়ে আঙ্গুল কেটে গেলেও কিভাবে ব্যানার ধরে থেকেছি। মিনার পদতলে অবনত হয়েছি।

একুশ ভিন্নও সারা বছর ধরে লেগে থাকতো সাহিত্য সভা, বিতর্ক, নাটক। টি.এস.সির সাহিত্য সভায় সাহিত্যের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন অধ্যাপক এনামুল হক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল। আমরা ঋদ্ধ হয়েছি। বিতর্ক সভায় যুক্তির ঝড় তুলেছে মাহফুজ আনাম, সেলিম জাহান, আতিউর রহমান। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছি আর বিতর্কের শেষে ভোট দিতে যেয়ে হাত তুলেছি নিজস্ব পছন্দের তার্কিকের পক্ষে। নাটকের মহড়া চলেছে ম হামিদ ভাইর দেখাশোনায়। যে দিন খুকী মানে বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু খেলাধূলার সোনার মেয়ে সুলতানা কামাল আর আমাদের ক্লাশের সালমার খেলা থাকতো আমরা সবাই হল থেকে দল বেঁধে চলে যেতাম জিমনেসিয়ামের মাঠে-আমরা এক ঝাঁক চিয়ারর্গালস।

রোকেয়া হলের গেটের ভেতর দু'পাশে ছিল বারান্দা ও চৌকো পিলারওয়ালা ভিজিটর্স রুম। বাঁদিকে তার পেছনেই দীঘ শিরীষের সবুজ ছায়া ও শীতল পুকুর। চামেলী হাউসের নিচেরতলায় হল অফিস, প্রভোস্ট ও হাউস টিউটারদের কক্ষ। ১৯২১ সালে অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের কনসেপ্টে এই হাউস টিউটার পদগুলো করা হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের হাউস নয় ছিলো হল এবং তাঁরা আমাদের পড়াতেন না। দাপ্তরিক কাজ, আমাদের হাজিরা নেওয়া ও ধমকাধমকিই ছিল তাঁদের কাজ। স্টাফ কোয়ার্টারতো স্টাফদের জন্য তাই নিচের তলায় থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অসামান্য রূপবতী রোকেয়া হলের হাউস টিউটর মেহেরুন্নেসা চৌধুরী আপা। বরিশালের মেয়ে, হাতভরা সোনার চুড়ি, নাকে হিরের নাকফুল। আর ঐ সুন্দর সরু নাকেই ছিল দুনিয়ার ঘ্রাণ শক্তি, চাঁপাকলি পায়ের চপ্পলে বিড়ালের গতি। লুকিয়ে রুমে রান্না চড়ালে বা গান ছাড়লে কী করে যে তিনি উঠে আসতেন টের পেতাম না!

স্টাফ কোয়ার্টার, জালিদেয়া দেয়ালের ডাইনিং হল, মেইন বিল্ডিং সবকিছুর মধ্যস্থানে ছিল অসাধারন এক কমনরুম। তার ডিজাইন করেছিলেন কোন এক বিদেশী রোমান্টিক আর্কিটেক্ট। রুমের মধ্যখানটা ফুঁড়ে ছিল এক বিশাল বনস্পতি বৃক্ষ। বৃষ্টি এলে সে গাছের গা জড়িয়ে থাকা চিরহরিৎ অর্থ-লতিকার গা চিকচিক করত। ভেতরে টেলিভিশন ছিল। যেদিন আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের অনুষ্ঠান বা গেট স্মার্ট সিরিজ থাকতো আমরা রাতের আহার শেষ করে কার্পেটে ঠাসাঠাসি করে বসে তা দেখতাম। দিনে সুযোগ পেলে

পড়তাম ফ্রি সংবাদপত্র, চিত্রালী, দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক। কোনায় রাখা ছিল একটি হারমনিয়াম ও জোড়া তবলা-বায়া। যেদিন গাছের বাকল এর ফাটল বেয়ে যে রূপালী জলধারা ঝরতো কাচের এপারে আমার রুমমেট শ্রাবণী হারমনিয়াম টেনে গাইতে বসতো বর্ষার গান।

ততদিনে নীলিমা ইব্রাহীম আপা হলের প্রভোস্ট। সে হবে সত্তর সাল। একদিন গান শুনতে শুনতেই হঠাৎ আকাশ ফুটো করে, আমগাছ হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এলো। আমি ও শ্রাবনী পারুলকে টানতে টানতে নিচে মেইন বিল্ডিং এর সামনে গিয়ে দেখি এক্টেনশন বিল্ডিং থেকে নেমে এসেছে বাসন্তী, জানু, ডলিও। এমনকি উপরের ক্লাশের আপারাও। তারপর ওয়ান টু থ্রি বলে সবাই সেই অপরূপ রূপালী তরল ধারায় ভিজতে লাগলাম। ভিজতে ভিজতে ও জল ছোঁড়াছুড়ি করে করে কখন যে চামেলী হাউসের সামনে মেইন বিল্ডিং এর নিচে মূল পয়েন্টে এসে গেছি জানি না। এক সময় দেখি সারামাঠ ভরে গেছে বৃষ্টিভেজা তরুণীতে। খালি পায়ে চুল খুলে হাত ছড়িয়ে সবাই ভিজছে। হঠাৎ মেঘের গর্জন ছাপিয়ে উঠল প্রভোস্ট আপা নীলিমা ইব্রাহীমের গলা! সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই হতভম্ব স্থির ধাতব হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু ভাল করে শুনে বুঝি তিনি আমাদের না-বকছেন সব পুরুষ স্টাফদের। যাও তোমরা সব ভেতরে যাও! তারপর তাদের সবক'টাকে দৃষ্টির বাইরে পাঠিয়ে মুখে মৃদু হাসি চেপে বল্লেন, 'শোনো মেয়েরা জ্বর বাঁধালে কিন্তু সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আর আমি যাচ্ছি, কিন্তু পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে যেন মাঠ খালি পাই।' সেকি মধুর মুরতি! আমরা এবার আনন্দে বিহব্বল বৃষ্টিভেজা ঘাসের গোড়ায় গড়াগড়ি করলাম! আপা কিন্তু পঁচিশ মিনিটেও এলেন না।

হলের ফিস্ট এর সময় ডাইনিং হলের দরোজার বাইরে প্লেট আর চামুচ বাজিয়ে গান গাইতাম। বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকার বারান্দায় বেরিয়ে এদিকে মহসিন হল আর ওদিকে জগন্নাথ হলের ছেলেদের কুকুর বিড়ালের ডাক শুরু হয়ে যেতো। আর আমরা সমান তার জবাব দিতাম। হাউস টিউটর আপারা অন্ধকারে টর্চ নিয়ে ছুটে এসেও আমাদের ধরতে পারেন না।

এলো অসহযোগ আন্দোলনের কাল। আমরা মুখর হলাম প্রতিবাদ, প্যারেড, বক্তৃতায়, ট্রাকে উঠে প্রতিবাদী গান ও কবিতা বলে শহর প্রদক্ষিণ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের মেয়েরা কাঠের বন্দুক কাঁধে নিয়ে লাগলো প্রস্তুতিতে। এমন সময় উঠলো একাত্তরের ঝড়। অসহযোগ আন্দোলনের মূল শক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের চাকে পড়লো শাসকদের ঢিল। চারিদিকে তারা শুরু করলো পুলিশী অভিযান আর ধরপাকড়। যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় চড়াও। শেষ অবধি এসে গেল কারফিউ আর রোকেয়া হল বন্ধের পালা। আব্বা ততদিনে ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছেন। ওরা থাকেন সোবানবাগে। এদিকের এই অস্থির অবস্থার মধ্যেই আমাকে সামলানো নিয়ে বিপদে পড়ে তারা আমার বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছেন।

মার্চের একদিন রাতারাতি হল ছেড়ে বাড়ি গেলাম। যাদের বাড়ি দূরে তারা বাক্স পেটরা নিয়ে বাড়ি রওয়ানা হবার সুযোগই পেল না। আর সেই মহাদুর্যোগের রাত পঁচিশে

মার্চে আমাদের অপাপবিদ্ধ যৌবনের রঙীন রোকেয়া হলে ঢুকে বাংলাদেশের নারীর নোঙর ছত্রখান করে দিয়ে গেল পাকিস্তানী পশুরা।

যুদ্ধ শেষে আমরা কেউ কেউ ফিরে এলাম। কেউ কেউ এল না। যারা এল তারা সবাই হত বিহ্বল, মূহ্যমান, ভিন্ন মানুষ। শহীদ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সহপাঠী নজরুল, শাহরিয়ার। শহীদ হয়েছেন আমার সরাসরি শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, রাশিদুল হাসান। যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক গিয়াসউদ্দীন, জিসি দেব, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, এ. এন.এম. মুনীরুজ্জামানসহ আরো অনেকে। সে সময় একদিকে চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দ আর অন্যদিকে নিদারুণ বেদনা। আর এর থেকে সামনে এগুনোর জন্য মরিয়া এক জাতি। অনিশ্চয়তা চারিদিকে, মানুষ আছে কাজের লোক নেই, যারা জীবিত তারাও ফিরে আসেননি স্ব স্ব স্থানে। এমতাবস্থায় আমি আর বাবলি তখন রেডিও বাংলাদেশ আর হলিক্রস হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবাদানে ঢুকে পড়লাম। আর নতুন বছরের গোড়ায় দেশের ঐ অস্থির সময়ের কারণেই আমিও প্রতিজ্ঞা ভেঙে বিয়ে করলাম। কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। পড়াশোনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লেখালেখি, টিভিশো, ঘর সংসার নিয়ে শুরু হল আমার নতুন জীবন।

আজ যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ বছরের এ দীর্ঘ পথযাত্রায় আমিও তো এক ধূলিকণা। মনে পড়ে যুদ্ধের কারণে ১৯৬৯ এ প্রবেশ করা আমাদের ব্যাচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে গিয়েছিলো সব চাইতে বেশি সময়। আমরা কাগজেপত্রে ৭৩ এর অনার্স ও ৭৪ এর এম এ হলেও, সব কিছু শেষ করে আসলে বের হয়েছিলাম ১৯৭৬এ। তাই আমাদের স্মৃতি সম্ভার অনেক দীর্ঘ। কিন্তু শুধু সময়ের দীর্ঘতাই তো নয়, আমরা একসঙ্গে হাতে হাত ধরে পথ পাড়ি দিয়েছি- দেশের বড় এক দুর্যোগের সময়, চূড়ান্ত বেদনা ও অর্জনের সময়ও। দু:খের সঙ্গীরাইতো সবচেড়ে নিবিড় বন্ধু হয়। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের জন্যে আমার তাই বড় মায়া।

লন্ডন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাজ্য

সঞ্জয় দে

সেইন্ট জুলিয়ানের আইরিশ পাব

মাল্টা সেইন্ট জুলিয়ান পোতাশ্রয়ের পার্শ্বস্থিত বাঁধানো পথটিতে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াবার সময়ে দেখি শে এদিকে হেঁটে আসছে। ও আমাকে দেখতে পায়নি। রাস্তার দিকে মুখ করে হাঁটছে। সেজন্যে হয়তো। খানিকটা দুলে দুলে হাঁটার সময়ে পিঠে ছড়িয়ে থাকা কোঁকড়া চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে কাঁধের দু'পাশে। ওর হাতে খাবারের একটি প্যাকেট। সেটি থেকে বার করে এক টুকরো মুখে দিয়ে আবার গুটিয়ে রাখছে প্যাকেটে। কিছুক্ষণ আগে ওকে আমি রাস্তার ওপারের এক ইতালিয়ান ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকতে দেখেছি। সেখান থেকেই কিনে ফিরছে হয়তো। আরেকটু কাছে এলে দেখি ও হঠাৎ থেমে পার্ক করা দুটো গাড়ির মাঝে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা একটি বেড়ালকে হাতের প্যাকেটে থাকা সেই খাবার সাধছে। পথের যাযাবর বেড়াল। খাবারের সন্ধানে এরা সাধারণত সবখানেই একটু ছোঁকছোঁক করে। কিন্তু কী আশ্চর্য। এই বেড়ালটি কিন্তু শে-র খাদ্য প্রদানের আহ্বান অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে। শে বার বার সাধে। বেড়ালটি বারবারই মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি পাশ থেকে এ-দৃশ্য দেখে বেশ আমোদ পাই। 'বেড়ালটার মনে হয় একেবারেই খিদে নেই'– পেছন থেকে আচমকা এই কথাখানি বলে শে-কে চমকে দিই।

শে-র সাথে পরিচয় আজ সকালে হোটেলের প্রাতরাশ টেবিলে। ও কিন্তু ঠিক আমার টেবিলে বসেনি। বসেছিল পাশের টেবিলে। সকাল দশটার দিকে যখন উপস্থিত হলাম, প্রাতরাশের ট্রে-গুলো প্রায় ফাঁকা। কেবল রয়ে গিয়েছিল কয়েক টুকরো পাউরুটি আর অল্প ক'টি দইয়ের কৌটো। অগত্যা সেগুলো নিয়েই খেতে বসে দেখি। পাশের টেবিলে উপবিষ্ট এই মেয়েটির দশাও আমার মতই। প্লেটে উঁকি মারছে দু'পিস রুটি। খানিকটা মাখন আর তার পাশে রাখা কফির পেয়ালা। প্রাতরাশ ঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটি সেই মুহূর্তে একটি বালতি আর ঘর মোছার লাঠি এনে মেঝে ধুচ্ছে। মেয়েটির টেবিলের পাশে এসে লোকটি ঘর মোছা থামিয়ে কিছুটা ব্যথিত ভঙ্গিতে বলে, 'আরেকটু আগে এলে পারতে। এ সময়টায় সব কিছুই শেষ হয়ে যায়।' মেয়েটি হেসে বলে, 'আরে ধুর, এ কোনো ব্যাপার-ই না। আমি এমনিতেও সকালে এটুকুই খাই।'

মেয়েটির মাথায় অপরা উইনফ্রে-র মত কোঁকড়া চুল। ঠিক কৃষ্ণাঙ্গ নয় ও। আবার ঠিক আমাদের মত তামাটেও নয়। বরং যেন শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গের মিশ্রণে উদ্ভূত এক মানবী। তো এই মানবীর স্থায়ী নিবাস কোথায়? সেটি জানার জন্যে আমি আলাপ শুরু করে এভাবে, 'তুমিও কি আমার মতই মাল্টায় ক'দিনের জন্যে ঘুরতে এসেছ?' মেয়েটি

তখন সবে টোস্ট করা পাউরুটিতে কামড় বসিয়েছে। আমার কথার জবাব দেবার জন্যে তাই কয়েক মুহূর্ত সময় নেয় ও। ঠোঁটের কাছে আটকে থাকা পাউরুটির গুড়োগুলোকে আলতো করে মুছে বলে, 'আমি এখানে আছি মাস দুয়েক হল।'- ওর মুখশ্রীতে খেলে যায় আনন্দের অভিব্যাক্তি। তবে ওর উত্তর বুঝতে আমাকে কিছুটা বেগ পেতে হয়। 'এখানে মানে? দু'মাস ধরে এই হোটেলেই আছো?' কফির কাপটি হাতে নিয়ে সেটিতে ব্রাউন সুগারের ছোট প্যাকেটটি ঢালবার সময়ে ও বলে, 'মাল্টা ইজ ড্যাম এক্সপেন্সিভ। এখানে বাড়ি ভাড়া করবো কীভাবে? আর তাছাড়া এখানে এসে যে শেষ পর্যন্ত এভাবে দু'মাস একটানা থেকে যাব, সেটাও আগে থেকে ভেবে আসিনি।'

আমি এখানে একটা চমকপ্রদ গল্পের আভাস পাই। ততক্ষণে আমার রুটি ভক্ষণ শেষ। উঠে গিয়ে পাশের লম্বাটে টেবিলে রাখা কেটলি থেকে গরম জল কাপে ঢেলে সেখানে ডুবাই আরল গ্রে-র একটি প্যাকেট। তারপর শে-র টেবিলের কাছে এসে বলি, 'উড ইউ মাইন্ড?' 'নট এট অল'- বলে সামনের চেয়ারে বসার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে। ওর কফি পান আর আমার এই চা পানের মাঝ দিয়ে ওর যে কাহিনীটি আমি ছেঁকে তুলে আনতে পারি সেটি অনেকটা এমন – শে নামক এই মেয়েটি বেড়ে উঠেছে মাহতিনিক নামক এক ফ্রেঞ্চ ভূখণ্ডে। ফ্রেঞ্চ ভূখণ্ড, তবে এর অবস্থান কিন্তু ফ্রান্সে নয়। বরং সেই সুদূর ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাকি সব দ্বীপমালার মাঝে লুকিয়ে আছে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ। আশেপাশের অন্যান্য দ্বীপ স্বাধীন হয়ে গেলেও এটি আজ অবধি ফরাসি উপনিবেশ হিসেবেই নিজের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। তো এই দ্বীপের অধিবাসিনী এক মহিলা হলেন শে-র মা। অন্যদিকে শে-র বাবা মূল ফরাসি ভূখণ্ডে বসবাসকারী এক শ্বেতাঙ্গ ব্যাক্তি। শে-র জন্মের কিছুকাল পরই ওর বাবা-মার দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। বাবা ফিরে আসেন ফ্রান্সে। আর মা ওকে নিয়ে রয়ে যায় মাহতিনিকে। বয়স আঠারো পেরুবার পর শে-র বাবা ওকে নিয়ে আসেন ফ্রান্সে। নিজ শহর নিসে। কিন্তু মুক্ত দ্বীপবাসিনী শে-র ওই নিস শহরের নাগরিক জীবন আর এই হটাৎ পাওয়া বাবার সান্নিধ্য ভালো লাগেনি। কয়েকটা বছর কলেজে এটা-ওটা নিয়ে পড়ে বাবাকে একপর্যায়ে ও জানিয়ে দেয় ফ্রান্সে আর নয়। কিছুকাল ভবঘুরের মত ঘুরবে। জীবনটাকে পরখ করে দেখবে। দেখবে জীবন নামক এই তরী আসলেই কি কোনো বন্দরে বেড়ার জন্যে উন্মুখ? নাকি এ কেবলই ভেসে বেড়াবার জন্যে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় অনিশ্চিত নিয়তির পদতলে?

সেই ভাসমান জীবনের অংশ হিসেবেই শে একসময়ে এসে পৌঁছায় মাল্টায়। এই হোটেলে এসে ওঠে। দোতলার কোণের দিকে বেশ কম ভাড়ায় একটি ঘর পায়। এখানে সাগর পাড়ে কয়েকটা দিন ঘুরে বেড়াতে গিয়ে বেশ ভালো লেগে যায়। হয়তো এর পেছনে কারণও আছে। মাল্টাও তো আসলে জন্মভূমি মাহতিনিকের মতই চারদিকে সাগর দিয়ে ঘেরা এক ক্ষুদ্র দ্বীপদেশ। তবে থাকতে ভালো লাগলেও হোটেল ভাড়া মেটাবার জন্যে তো পয়সা চাই। তাই এ-এলাকার এক দোকানে ও খণ্ডকালীন কাজ নেয়।

‘কী অহংকারী বেড়াল রে বাবা! কতবার খাবার সাধলাম, ফিরেই তাকাল না।’– শে-র মুখে কৌতুকমাখা হাসি। সূর্যের গায়ে তখন বিদায়ী রক্তরাগ। সেই রশ্মিতে ঝিকমিকিয়ে উঠছে দিগন্তের কাছে ভেসে থাকা কয়েকটি নৌকোর মাস্তুল। শে-র ক্যারিবিয়ান-ফ্রেঞ্চ মুখায়বও যেন সেই কমলা আভা শুষে নেবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। ‘তোমার আজ ঘোরাঘুরি কেমন হল?’– পথপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝারি আকারের একটি গারবেজ বিনে খাবারের প্যাকেটটি ছুঁড়ে দিয়ে শে-র প্রশ্ন। ও আসলে জানতে চাইছে আজ গোজো দ্বীপে আমার ভ্রমণ কেমন হল। সকালে খাবারের টেবিলেই ওখানে যাবার কথা শে-কে বলেছিলাম। আমি এর সরাসরি জবাব না দিয়ে বলি, ‘তোমার যদি তাড়া না থাকে বা ভিন্ন কোনো প্ল্যান না থাকে, তাহলে আমরা হয়তো ওই বারটায় গিয়ে বসতে পারি’– বলে আমি এই রাস্তাটা যেখানে গিয়ে কমলালেবুর পৃষ্ঠের ন্যায় বাঁক নিয়েছে, ওখানে চুপ মেরে লুকিয়ে থাকা এক আইরিশ পাবের দিকে নির্দেশ করি। পাবের নাম দ্যা ডাবলিনার। সাগর থেকে ছুটে আসা এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুটা হিমের অনুভূতি এনে দেয়ায় নিজের সাদা লেদার জ্যাকেটটির জিপার ওপরে উঠাতে-উঠাতে শে ওর ফয়সালা জানিয়ে দেয়– ‘আই উড লাভ দ্যাট।’

ডাবলিনার ক্যাফের অন্দরভাগ কিছুটা লম্বাটে ধরণের। বাঁ ধারে কাউনটার আর কিছু বার টুল পাতা। দরজা ঠেলে ঢুকতেই ছোট দু তিনটে টেবিল। দেয়ালে টানানো টিভিতে বাজছে রক কনসার্টের ভিডিও। আমরা একেবারে প্রথম টেবিলেখানায় বসেই বুঝতে পারি, এখানে বসে কথা বলা সম্ভব নয়। এই স্বল্পায়তনে একসাথে বহু লোক জড়ো হওয়ায় কথা বলতে হচ্ছে রীতিমত চেঁচিয়ে। ‘বাইরে গিয়ে বসতে চাও?’- ভেতরের পরিস্থিতি দেখে খানিকটা বিরক্ত হয়ে শে জিজ্ঞেস করে। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। বাইরে পাতা একটু উঁচু গোলাকার টেবিল, সাথে দুটি করে হাই চেয়ার। সামনে পিচ ঢালা পথ। পথের পাশটায় ঝিমিয়ে থাকা মৃতবৎ সাগরের লোনা জল। এখন বিকেলের দিক বলে আলো ধীরে ধীরে মরে আসছে। জ্বলে উঠেছে সড়কবাতি। আমাদের ঠিক উল্টোদিকে, সাগরের ওপারটায় ডলচে ভিটা নামক এক রেস্তোরাঁর বারান্দায় জ্বলছে সান্ধ্য মরচেবাতি। ওয়েটার এনে রেখে যায় আমার অর্ডার করা দু গ্লাস হোয়াইট ওয়াইন আর এক প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ওয়াইনের গ্লাসে ভাসতে থাকে রূপালি বুদবুদ।

আজ সকালে গোজো আর কমিনো দ্বীপে ভ্রমণের খুঁটিনাটি নিয়ে অবশ্য শে-র সাথে আলোচনা হয় না। ও এখানে আসার শুরুর দিকেই এসব এলাকা চষে ফেলেছে। আমি শুধু সংক্ষিপ্ত আকারে আমার দ্বীপ দর্শনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উচ্ছ্বাস ওর কাছে নিবেদন করি। তারপর আমাদের আলাপ এগোয় ওর ফ্রান্স-এ কাটানো সময় আর এখানকার এই অনির্দিষ্টভাবে যাপিত জীবন নিয়ে।

‘তুমি ভাগ্য কিংবা দৈবে বিশ্বাস কর?’– ঠিক কী কারণে নিস শহরের জীবনকে সাময়িকভাবে বিদায় জানায় শে এই ভবঘুরে জীবন বেছে নেয়, সে প্রশ্ন করলে জবাব না দিয়ে ও উল্টে আমাকেই এ প্রশ্ন করে বসে।

আমি কি দৈবে বিশ্বাস করি? এই প্রশ্নের জবাব দেয়াটা আমার কাছে খুব কঠিন কর্ম বলে মনে হয়। তবে হ্যাঁ, দৈব বলে কিছু একটার অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে। অন্তত গতকাল এখানকার মোস্তা শহরে এমন এক নিদর্শন দেখে এলাম। তারপর একে অস্বীকার করতেও কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে। সেটির গল্প বলা যাক।

মোস্তা-র প্রধান চার্চ চত্বরের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে অভ্যন্তরে ঢোকামাত্র ডোমের মধ্যমণি হয়ে থাকা স্কাইলাইটের মাঝ দিয়ে ঠিকরে আসা আলো আমাকে ঝলসে দেয়। ইউরোপের অধিকাংশ চার্চের ভেতরটা গুমোট অন্ধকারময় হলেও, এ চার্চটি ওই স্কাইলাইটের কারণেই যেন স্বতন্ত্র। তবে এই যে স্কাইলাইট, এই এটিই আবার এক অলৌকিক ঘটনার সাথে জুড়ে আছে। ১৯৪২ সালের কথা সেটি। তার আগের দু বছর থেকেই মাল্টার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল জার্মানি আর ইটালির বোমা-ঝড়। জেনারেল রোমেলের নেতৃত্বে জার্মানি বাহিনী তখন উত্তর আফ্রিকায় বেশ শক্ত অবস্থানে। রোমেল খুব দ্রুত বুঝে গেলেন, ব্রিটেনের অধীনে থাকা আফ্রিকা আর ইউরোপর মধ্যবর্তী এই ক্ষুদ্র দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ যতদিন না তিনি পাচ্ছেন, ততদিন আফ্রিকায় তার বাহিনীর জন্যে বিরাট একটা ঝুঁকি রয়েই যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে জার্মান বিমান বাহিনী লুফৎভাফা মাল্টাকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে ৪২ সালের এপ্রিল মাসে লুফৎভাফার একটি বোমারু বিমান উড়ে আসে মোস্তার দিকে। বিমানটির প্রকৃত লক্ষ্য কী ছিল কে জানে, তবে ওটি মোট চারটি বোমা নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। দুর্ভাগ্যবশত সেই চারটি বোমাই এসে আছড়ে পড়ে এই চার্চে। তবে তো এই চার্চ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা, তাই না? কিন্তু হল না। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ওই চারটি বোমার মাঝে তিনটি এসে পড়ল চার্চের প্রাঙ্গণে। একটিও বিস্ফোরিত হল না। আর চতুর্থটি ওই স্কাই লাইটের কাচ ভেদ করে এসে বিঁধল মোজাইকের মেঝের বুকে। একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ যাকে বলে। কিন্তু এই এটিও নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইলো সেখানে। সেদিন চার্চে মেলা লোক উপস্থিত ছিলেন। বোমাগুলো বিস্ফোরিত হলে তাঁদের অনেকেই হয়তো মারা পড়তেন। কিন্তু অদৃষ্টের অদ্ভুত কারসাজিতে বেঁচে গেলেন তারা, বেঁচে গেল এই অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শনটি। ছাদ ফুটো করে ঢুকে পড়া তেজ নিঃশেষিত সেই বোমাটি আজও লোহার খোলে বন্দি হয়ে ঝিমুচ্ছে প্রার্থনা ঘরের কোণের দিকে।

শে-কে এই চার্চ আর বোমাটির কথা বলে বললাম, ‘ঠিক এমন কোনো ঘটনার মুখোমুখি যখন হই, তখন কিছুটা হলেও দৈবকে মেনে নিতে বাধ্য হই। কিন্তু তুমি হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?’- শ্যামপেনের গ্লাসে চুমুক থামিয়ে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করি।

‘নিসে আসার পর থেকে ভালো ছিলাম না আমি’- গালের পাশে হুড়মুরিয়ে নেমে আসা কোঁকড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে শে বলে, ‘মনে হত যেন এক অজানা পৃথিবীতে হুট করেই এসে পড়েছি। কারুর সাথে গিয়ে যে পরিচিত হব, কিংবা কেও আমার কাছে এসে যেচে পরিচিত হবে, তেমনটিও ঘটেনি। বড় শহরগুলোতে হয়তো এমনটাই ঘটে। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। ওদিকে আমি হয়ে পড়লাম খুব একা। নিঃসঙ্গ। বন্ধুহীন।

নিসে কয়েকটা জায়গা আছে, যেখানে খুব উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়ালে নিচে সমুদ্র দেখা যায়। বেশ কয়েকবার সেখানে দাঁড়িয়ে ভেবেছি ঝাঁপ দেবো। যে জীবনে কোনো আনন্দ নেই, উদ্দেশ্য নেই, হিল্লোল নেই, সেই জীবন বয়ে বেড়িয়েই বা কী লাভ? ঠিক এমন একটা সময়ে একদিন এক বাসস্ট্যান্ডে টনি রবিন্স-এর শো-এর বিজ্ঞাপন দেখলাম। নিসের পাশের দেশ মোনাকো-তে হবে।'

'টনি রবিন্স? এই ভদ্রলোক কী উনি না, যিনি মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে বেশ নাম করেছেন?- শে-র কথার মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে জিজ্ঞেস করি।

'মোটিভেশনাল বলতে তুমি কী বোঝাও, এটা নির্ভর করে তার উপর।'- বলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের তিনটে টুকরো শে একসাথে মুখে পোরে। তারপর বলে, 'আমার কাছে মনে হয়েছে টনি রবিন্স আসলে জীবনের নানা দর্শন, নানা ঋণাত্মক দিককে নতুন করে ভাবতে সেখান। তাতে অনেক সময়েই অন্ধকার গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আমরা ভাবি, আরে এই যে বাইরের সূর্যালোকে ভরা পৃথিবী, একে তো জানা হয়নি এতকাল!' আমাদের পাশ দিয়ে হুশ করে কয়েকটি গাড়ি আর একটি বাস চলে যায়। সেজন্যে শে-কে কয়েক মুহূর্ত থামতে হয়। তারপর আবার বলে, 'মোনাকো-র ওই শো থেকে ফিরে এসে ভদ্রলোকের আরও কিছু ভিডিও দেখলাম। সত্যি বলতে কী, আমি তার বিরাট বড় ফ্যান হয়ে গেলাম। তখন থেকেই মনে হল, জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি আর উপভোগ করবার আরও অনেক উপায় আছে। এ জীবন ফুরোবার নয়। প্রতি মুহূর্তে একে মন্থন করে হীরে মানিক তুলে আনার মাঝেই লুকিয়ে আছে সাফল্যের আনন্দ। আর সেই আনন্দ খুঁজবার জন্যেই বাবা আর নিস শহরকে বিদায় জানিয়ে নেমেছি অজানা এই পৃথিবীর মহাসড়কে।'

কমলা রঙের প্রলেপ ছড়িয়ে সূর্য ততক্ষণে একেবারেই ডুবে গেছে দিগন্তের কাছে সমুদ্রের অতল বুকে। হুট করে তাপমাত্রাও বেশ খানিকটা নিম্নমুখী। আমার গায়ে জ্যাকেট নেই। গায়ের শার্টটিই একমাত্র সম্বল। এভাবে বাইরের খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ হয়তো বসা যাবে না। আমি তাই আলাপ সাঙ্গ করার শেষ পর্যায়ে শে-কে বলি, 'যে আনন্দের সন্ধানে পথে নেমেছে, তার কতটুকু পেয়েছ বলে মনে করছ এই দু মাসে? এখনই কি ঘরে ফিরতে চাও? নাকি আরও কিছুটা কাল এভাবেই কাটাবে?'

ওয়াইনের গোলাকার গ্লাসের মুখে আঙুল দিয়ে বৃত্ত এঁকে শে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'এখানে পাওয়া বন্ধুদের কথা তো সকালে তোমাকে বলেছি। এদের প্রায় সবাই-ই আমার মত। আমরা প্রতিদিন একটা ক্লাবে সন্ধ্যের পর একত্রিত হই। একসাথে পান করি, নাচি, গাই। এইতো আগামী সপ্তাহে আমরা দল বেঁধে সিসিলিতে যাচ্ছি রোড ট্রিপে। প্রায় এক সপ্তাহের জন্যে। তারপর...। তারপর কি হবে জানি না...। এই আনন্দবেলা এভাবেই কাটুক না আরও কিছুটা কাল।'

ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে আমি শে-র দিকে অপলক তাকিয়ে থাকি।

সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া, যু

সুমনা চক্রবর্তী

পূর্ণতার ছোঁয়ায় ম্যামথ মাউন্টেন

সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১৯ এর সকাল। তিনদিনের লেবার ডে লং উইকেন্ডে তার সাথে আরেকটা দিন ছুটি নিয়ে কুয়াশামাখা সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়লাম ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত ম্যামথ লেকের উদ্দেশ্যে। আসলে এটিকে বলা হয় ম্যামথ লেকস অর্থাৎ অনেকগুলো লেক কখনো একসাথে আবার কখনো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহাড়ের আড়ালে নিঃশব্দে। শুধু পথ চলতে চলতে তাদেরকে খুঁজে বের করে নিতে হবে। অর্থাৎ পাহাড় আর লেকের অসাধারন যুগলবন্দী। সেটাই তো হওয়ার কথা। আটমাস তুমুল বরফের আচ্ছাদনে ঢেকে থাকে এখানকার পাহাড়। জুন মাস থেকে বরফ গলতে শুরু করে। সেই বরফগলা জলই পরিপূর্ণ করে লেকের জলকে। এই ম্যামথ মাউন্টেন হল পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম স্কি মাউন্টেন। রাজকীয় সৌন্দর্যে অপরূপ এই মাউন্টেনে বাৎসরিক বরফ পরে চারশ ইঞ্চি, তবে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ দিনই থাকে রৌদ্রাকরোজ্জ্বল।

শান্ত নিরিবিলি বাতাস। খাদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করে পাহাড়। চুপিসাড়ে জায়গা করে নেওয়া একচিলতে রাস্তা, পাহাড় ও লেকের মায়াময় যুগলবন্দী এতটাই মানুষকে আকর্ষণ করে যে তার টানেই পৌঁছে গেলাম ম্যামথ মাউন্টেনে। বেলা তখন গড়িয়ে সূর্য তখন পশ্চিমপ্রান্তে যাওয়ার পথে। কিন্তু যেতে গিয়েও যেন ইতস্তত বোধ করছে। বোঝা গেল এই হালকা উষ্ণতা নিয়ে কখনো গাছের পাতার ফাঁকে কখনো বা পাহাড়ের ঢালে লুকোচুরির খেলায় সে ব্যস্ত। চেক ইন করিয়ে লাগেজ নিয়ে ঢুকে পড়লাম দীর্ঘকায় পাইন ও এসপেন এর নিস্তব্ধ প্রহরায় ঘেরা হোটেলে। সেপ্টেম্বরের শেষ গায়ে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হতে শুরু করেছে। গায়ে হালকা জ্যাকেট চড়িয়ে আশপাশটা একটু দেখে নিলাম কাছে ধারের দোকানপাট, খাওয়ারের দোকান ইত্যাদি। পাহাড়ি এলাকায় সন্ধ্যে সাতটায় দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। হোটেলে চেক ইন করার সময় মালিক মশাই বলে দিয়েছেন গাড়িতে কোন খাবার বা মালপত্র রাখা যাবে না। কারন ভাল্লুকেরা খাবারের খোঁজে নেমে আসে। গাড়িতে খাবার থাকলে গাড়ির কাঁচ ভেঙে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না। একে ঠান্ডা তা আবার বন্য প্রাণীর উপদ্রব সবকিছু মিলে দোকানপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ। নিজেকে রক্ষা করার অধিকার তো সবার আছে।

গাড়ি নিয়ে কাছে ধারের দোকানপাট থেকে কিছু খাবার, জল কিনে জায়গাটা খানিকটা পরিদর্শন করে নিলাম। বিছানো পাইন গাছ, পাহাড়ের উপরে ঘরবাড়ি,

সাজানো হোটেল, কাঠের জানলার ফাঁক দিয়ে বেয়ে আসা বিন্দু বিন্দু বাল্বের আলো রাস্তাঘাট সব কিছুর মধ্যেই ছিল এক রাজকীয় সৌন্দর্য এবং এক অজানা ভালোলাগা। হোটেল থেকে বেরিয়েই আছে একটা দুটো মেক্সিকান ও চীনা ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের জায়গা। আছে কয়েকটা দোকান যেখানে স্কি করার জন্য পোশাক, মাউন্টেন বাইক, বরফে চলার জুতো কিনতে পাওয়া যায় আবার রেন্টও নেওয়া যায়। এখানে পর্যটকরা মূলত গরমকালে মাউন্টেন বাইকিং এবং শীতকালে স্কি করতেই আসে। দোকানপাটের খোঁজ নেওয়া শেষ, যাত্রা শুরু করলাম কাছেধারের লেক পরিদর্শনে। ছোট ও বড় অনেক ধরনের লেক আছে। এদের আকার এবং সৌন্দর্য একেকটার থেকে অন্যটা আলাদা। পৌঁছলাম টুইন লেকে। ম্যামথ মাউন্টেনের দক্ষিণপূর্ব ঢাল থেকে দুটি লেকের মিলন হয়েছে বলে এটির নাম টুইন লেক। রাস্তার পাশেই ছোট জায়গা ঘিরে পার্কিং লট। গাড়ি থেকে নামতেই লেকের জলের দমকা হাওয়া শরীরের সব উষ্ণতা এক নিমেষেই উধাও করে দিল। ভারী জ্যাকেট জড়িয়ে লেকের কাছে আসতেই দেখলাম সূর্যের আলো পাহাড়ের এক কোণ থেকে তির্যকভাবে জলের মধ্যে পড়ে হাজারো আলো জ্বেলে দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ম্যাপল গাছগুলোতে হেমন্তের লাল ও হলুদ রং ধরেছে। সেই পাতার প্রতিচ্ছবি জলের ওপরে। জলের শিরশিরানি দোলায় সূর্যের রং ও পাতার রং লেকে তখন বিভিন্ন রঙে ছবি এঁকে চলেছে।

টুইন লেক দেখে এগিয়ে গেলাম হর্স সু লেকের দিকে। লেকের খানিকটা অংশ শুধু বালি। বালি পথ পেরিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে শুরু হয় লেক। লেকের অপর প্রান্তে খাঁড়া উঁচু পাহাড় তবে পাহাড়ের গাছগুলো অধিকাংশই পোড়া। জানা গেল ৫৭,০০০ হাজার বছর আগে আগ্নেয়গিরির উদগিরণ থেকে ম্যামথ লেকের সৃষ্টি। বর্তমানে বড় উদগিরণ না হলেও মাটির তলা থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড অনবরত বেরোনোর ফলে গাছগুলো প্রায় অর্ধমৃত। সন্ধ্যে প্রায় হবে হবে। হর্স শু-লেককে বিদায় জানিয়ে এসে পৌঁছলাম মেরি লেকে। এই লেকগুলো খুব কাছাকাছি তাই ঘন্টা পাঁচ ছয় হাতে সময় থাকলে লেকগুলো দেখে নিতে অসুবিধা হয় না। লেক মেরি হল ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যামথ মাউন্টেনের সব থেকে বড় স্বচ্ছ ও মিষ্টি জলের লেক। উচ্চতা ৮৯৬৬ ফিট। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। রাস্তার একদিকে বহমান লেক অন্য দিকে পাইন গাছে ঘেরা পাহাড়। লেকটা একটা লুপের মতো। সুতরাং গাড়ি সাথে থাকলে আস্তে আস্তে পরিদর্শন করতে ভালোই লাগবে। বিকেলের সূর্য পশ্চিম প্রান্তে চলে যাওয়ার ঠিক আগেই পৌঁছলাম লেকের ধারে। লেকের মধ্যে তখন লাল, হলুদ, সবুজ, নীল ছোট ছোট বোট ভেসে চলেছে। পাইন গাছ আর পাহাড়ের গা বেয়ে সূর্যের আলোর ছটা গলানো সোনার মত বেয়ে পড়ছে। পাইনের বনে তখন একশো পাখির ডাক। ভালোবাসার নীড়ে ফিরেছে যে তারা। হালকা হাওয়ায় জলের শরীরে এক শিরশিরানি ভাব। এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। এই লেকে বোটিং ছাড়াও ফিশিং ও কায়াকিং এর ব্যবস্থা আছে। এখানে পাওয়া যায় প্রচুর ট্রাউট মাছ। সূর্যের দ্রুত গতিতে বিদায় যাওয়ার সাথে সাথে লেকের হিমেল হাওয়া শরীরে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে গাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা। এসব জায়গায়

ছবি না তুলে চলে যাওয়াটা বোকামি। পরে স্মৃতি রোমন্থন করতে এই ছবিগুলো বেশ ভরসা যোগায়। গাড়িতে উঠে চললাম হোটেলের উদ্যেশ্যে, কারণ পরের দিন ম্যামথ এর উচ্চতম পর্বত এ উঠতে হবে বেরোতে হবে সকাল সকাল।

পরেরদিন সকাল। কুয়াশাছন্ন ম্যামথ এর তখন ঘুম ভাঙছে। একটা দুটো করে কফির দোকান খুলছে। ঠাণ্ডা জায়গা বলে দোকানপাট এখানে একটু দেরিতেই খোলে। সকালের গরম কফিতে চুমুক আর বেগলের স্বাদ নেওয়ার জন্য কফির দোকান গুলোতে ভীড় উপচে পড়ছে। তবে হাইকার, বাইকাররা থেমে নেই। সংঘবদ্ধ হয়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। দোকানের দরজা খুলে দেখলাম কর্মকর্তাদের অর্ডার নিতে আর দিতে গিয়ে বেশ হিমশিম অবস্থা। এখান থেকেই প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম ম্যামথ মাউন্টেনের উদ্দেশ্যে। গাড়ি পাকদণ্ডী পথ বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একটি সমতল জায়গা। আছে বেশ বড় পার্কিং লট, ছোটখাটো রেস্তোরাঁ, ছোটপার্ক, বিশাল উলি হাতির ভাস্কর্য আর ভিজিটর সেন্টার। এটিকে এখানে ম্যামথ ভিলেজ বলা হয়। এখান থেকেই গন্ডোলার টিকিট কাটতে হয়। সেই গন্ডোলা মাউন্টেনের শিখরে নামিয়ে দেবে সেখান থেকে দেখে নেওয়া যাবে পাহাড়ের উপরের অজানা পরিবেশ। দাঁড়িয়ে পড়লাম টিকিট কাউন্টারে। পেছন থেকে এক সহৃদয় ব্যক্তি আমার হাতে একটি টিকিট দিয়ে বললেন আমি এটা ব্যবহার করবো না। আপনি নিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করলাম কেন? বললেন পাহাড়ে এত উপরে আমার শ্বাসকষ্ট আরও প্রবল হয়ে উঠবে তাই। পাহাড়ের উপরে এই লাভা ডোমের উচ্চতা ১১,০৫৯ ফিট। শ্বাসকষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের ও শ্বাস এ একটু টান লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিলাম যে বেশ লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে হচ্ছে। ৭৮৮১ ফিটেই এই অবস্থা। হাতে টিকিটটা নিয়ে গন্ডোলার লাইনে দাঁড়ালাম। বন্দোবস্ত আছে দুরকম গন্ডোলার। একটিতে করে পর্যটক আর অন্যটিতে মাউন্টেন বাইক নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ এর উঁচু নিঁচু ঢালে বাইকাররা বাইক চালাতে পছন্দ করে। তবে তা সাধারনতঃ গরমেই করা যায় যখন বরফ গলে যায়। শীতকালের চিত্রটা একদম বদলে যায়, প্রবল তুষারপাতের মধ্যে দলে দলে লোক আসে স্কি করতে।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে দুলতে দুলতে পাহাড়ের শিখরে এসে পৌঁছলাম। এখানে আছে একটি বড় রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর লাগোয়া একটি মিউজিয়াম যেখানে দেখতে পাওয়া যায় ভাল্লুক, কোয়টি, মাউন্টেন লায়ন এর দেহের বিভিন্ন অংশ এবং জীবন যাত্রা। এদের জীবন নিয়ে আছে ভিডিওর প্রদর্শন। এদের বসবাস এই পাহাড়ের উপরেই। সন্ধ্যে ঘনানোর সাথে সাথে এরা বেরিয়ে পড়ে খাবারের উদ্দেশ্যে। তাই বিকেল চারটের মধ্যে এটি বন্ধ হয়ে যায়। কর্মীদের নিয়ে নীচে ফিরে আসে। রেস্তোরাঁর দরজা খুলে অপার মুগ্ধতায় জড়িয়ে পড়লাম। শয়ে শয়ে বাইক আরোহিরা বাইক নিয়ে নেমে পড়েছে। হাইকররা আঁকাবাঁকা ট্রেইল এ হাঁটছে। পাহাড়ের উঁচ নিঁচু টিলার উপরে দুধের মত ছড়িয়ে পরে আছে সাদা বরফ আর সমতলে যেখানে সূর্যের আলো ঠিক মত পোঁছছে না সেখানে আছে স্তূপাকৃত বরফ। আলোর রশ্মিছটা আপন তুলিতে নিয়েছে অন্যরূপ।

কোথাও বা কমলা, কোথাও বা হলুদ, কোথাও বা গোলাপি। পাহাড়ি প্রকৃতিতে এঁকে দিয়েছে রঙিন আলো-ছায়া। সেপ্টেম্বরে এখানে হালকা গরম হলেও পাহাড়ের উপরে মূলতঃ ঠান্ডাই থাকে। এফোঁড় ওফোঁড় করা ঠান্ডা হাওয়া।

পাহাড়ী পাথরের গা ভর্তি করে ফুটেছে হলুদ রঙের বনফুল। এ যেন এক কনে বৌয়ের অঙ্গসজ্জা। ভীষণভাবে বিস্মিত হয়েছিলাম গন্ডোলা করে যেতে যেতে। পাহাড়ের বেশ অনেক জায়গায় যেখানেই অল্প সমতল সেখানেই লেকের সৃষ্টি হয়েছে। উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছিলো কারো বাড়ির উঠোনের সুমিং পুল। সারা পাহাড় জুড়ে আছে সবুজ ও শান্তির সমাবেশ। উপর থেকে গোটা ম্যামথ লেক দেখতে লাগছিল বড় মায়াময়। এখানে দাঁড়িয়ে সাক্ষী হিসাবে ছবি থাকাটা খুব প্রয়োজন। ক্যামেরা সাথেই ছিল। তুলে ফেললাম বেশ কিছু ছবি। সেলফি তুলেও নিজেকে সামিল করলাম পাহাড়ের চূড়ায়। ঘন্টা চারেক যে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না। গন্ডোলা করে ফিরে এলাম ম্যামথ ভিলেজে।

এখান থেকে শাটল বাস ছাড়ে যা নিয়ে যায় ডেভিল পোস্টপাইল ও রেইনবো ফলস এর দিকে। ম্যামথ ভিলেজ থেকে এগুলোর দূরত্ব বেশ অনেকটাই। জঙ্গলের সংকীর্ণ আকাঁবাকাঁ পথ ধরে শাটল আমাদের নামিয়ে দিল ভিজিটর সেন্টারে। এখন থেকে তিনমাইল রাস্তা অতিক্রম করে পৌঁছতে হয় ডেভিল পোস্টপাইল ন্যাশন্যাল মনুমেন্টের পাদদেশে। বড়ই কঠিন, পাথুরে রাস্তা সিঁড়ির মত করে ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। অন্যান্য পর্যটকদের সাথে আমরাও এগোতে থাকলাম। এই ট্রেইলটির নাম জন মুইর ট্রেইল। এই সব পথে চলতে গেলে জল, হালকা খাওয়ার ও লাঠি রাখা খুবই প্রয়োজন। শারীরিক কোন সমস্যা মূলত হাটু বা পায়ের সমস্যা থাকলে না আসাই ভালো। কারণ এ পথ মসৃণ পথ নয়। তিন মাইল পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলাম ডেভিল পোস্টপাইল এর পাদদেশে। এ যেন এক বিস্ময়। প্রকৃতির এই সাদা-কালো সৃষ্টির মাঝে মাথা নত করতেই হয়। আনুমানিক এক লাখ বছর আগে আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণের ফলে বয়ে যায় লাভা। যা উচ্চতায় ছিল ৪০০ থেকে ৬০০ ফিট। ঘনত্ব এত বেশি হওয়ায় লাভা ঠান্ডা হয় খুব আস্তে এবং সমান ভাবে। পরবর্তী কালে এর উপর দিয়ে নুড়ি পাথর সমেত বয়ে যায় হিমবাহ। যা ডেভিল পোস্ট পাইল এর পাথর গুলোকে করে দিয়ে যায় সমান ও মসৃন। এ পাথর মূলতঃ ব্যাসল্ট পাথর (আগ্নেয়গিরি-জাত শিলা) পাথরে হাত দিয়ে ও দেখে মনে হচ্ছিল কোন কারিগর নিপুণহাতে ঘষে এই পাথর সৃষ্টি করেছে। এখানকার স্তম্ভগুলো দীর্ঘতায় ৬০ ফিট আর ব্যাসরেখায় ২ ফিট এবং প্রতিসম। এ সব কিছুর সমন্বয়ে এই অতিকায় পাথরটিকে দেখতে মনে হয় “টল পোস্টস স্ট্যাকেড ইন এ পাইল।” তাই এর নামকরণ হয় ডেভিল পোস্টপাইল। এখন থেকে আরও ২.৫ মাইল পথ অতিক্রম করে পৌঁছতে হয় রেনবো ফলসে। সান হোয়াকিন নদীর উপরে এক অসাধারন সুন্দর ঝর্ণা। ঝর্ণার জলে যখন সূর্য রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটে তখন তা রংধনুর রং নেয়। তাই এটির নাম রেনবো ফলস। দুর্ভাগ্যবশত: সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় সেই দৃশ্য আর দেখা হয়নি। বন্য প্রাণী অর্থাৎ ভাল্লুক, হরিণ, মার্টেন্স, নেকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচতে

দিনের আলোর মধ্যেই ভ্রমন শেষ করাই ভালো। জঙ্গলে সন্ধ্যা নেমে আসে ঝপ করে। বাতাস ও বেশ ঠান্ডা। এক ফালি চাঁদ আকাশের এক প্রান্তে। বলছে যেন বন্ধু আনন্দে ফিরে যাও আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে এখানে।

তিন দিনের ছুটি শেষ, হাতে আরমাত্র একদিন। তাই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। শরীরও তখন ক্লান্তির হাত ধরেছে। বাকি আছে এখনো মনো লেক দেখা। ঠিক করলাম কাল সকালে বাড়ী ফেরার সময় মনো লেক দেখে যাব। পরের দিন সকাল বেলা একরাশ ভালোলাগা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মনোলেকের উদ্দেশ্যে। লম্বা পথ। তবে যেতে যেতে পথের দৃশ্যের রূপান্তর ঘটে। কোথাও বা সবুজ ঢেউ খেলানো পাহাড় আবার কোথও বা মাঠের পর মাঠ আলপাইন শুটিং ষ্টার ফুলের মেলা। গোটা ম্যামথ জুড়েই আছে আসপেন, ব্ল্যাক কটনউড ও উইলো গাছ। গাছে আছে প্রচুর পরিযায়ী পাখীদের মেলা। এসে পৌঁছলাম মনো লেকে। লেকের চারিদিকে হলুদ ফুলের ঢেউ, মাঝখানে লেক। এই লেককে স্যালাইন সোডা লেকও বলা হয়। কারন লেকের মাঝখানে প্রচুর স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায় যা মূলতঃ লাইমস্টোন অর্থাৎ চুনাপাথর। আর এই লাইমস্টোন স্তম্ভগুলি বহন করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। নীল জলের ওপর এই সাদা স্তম্ভ গুলি স্থানীয় ভাষায় বলা হয় “টুফা।” মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে তখন আমাকে মনোলেক। আকাশে ছেঁড়া মেঘ। পাহাড় আর টুফার প্রতিফলন লেকের জলকে দিয়েছে এক অন্যমাত্রা। রোমকূপে ভরে নিলাম এর শীতল স্পর্শ, এবার তো বাড়ী ফিরতেই হবে ছুটি তো শেষ। শুধু চুপি চুপি সারা ম্যামথকে বলে গেলাম ঘাসে রেখো না পা তুমি শুধু গায়ে মাখ তুষারকনা আর সূর্যের উষ্ণতা।

সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

হাসান ফেরদৌস

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১

প্রকৃতি স্থবির নয়, সে সজীব–এ কথা প্রায় সোয়া শ বছর আগে আমাদের জানিয়ে গেছেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। এমনকি প্রতিটি বৃক্ষ অনুভূতিপ্রবণ, আঘাতে সে ন্যুব্জ হয়, ভালোবাসায় উৎফুল্ল হয়। যাকে আমরা আজ প্ল্যান্ট নিউরোবায়োলজি নামে অভিহিত করি। জগদীশ বসু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই সে বিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত জার্মান পরিবেশবিদ পিটার ওলেনবেন তাঁর সাড়া জাগানো দ্য হিডেন লাইফ অব ট্রিজ গ্রন্থে জগদীশ বসুর বলা সে কথাটাই নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন।

সজীব প্রকৃতি মানে শুধু বৃক্ষ বা অরণ্য নয়। আমরা মানুষেরাও এই প্রকৃতির অংশ, অথবা এর সম্প্রসারণ। সবাই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। একে অপরকে বাঁচতে সাহায্য করি। উদাহরণ হিসেবে ওলেনবেন আমেরিকার বিখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের উল্লেখ করেছেন। এটি একসময় বিশুদ্ধ অরণ্য ছিল। যেদিন থেকে মানুষ সে অরণ্যের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা শুরু করল, তখন থেকেই প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাতে শুরু করে। প্রথমে লোপাট হলো নেকড়ে। তাদের অবর্তমানে বহুগুণে বেড়ে গেল এল্ক বা বাঁকানো লম্বা শিংওয়ালা হরিণ। তারা চড়াও হলো সে অরণ্যের এসপেন, উইলো ও অন্যান্য পত্রবহুল উদ্ভিদসমূহের ওপর। তাদের আক্রমণে দ্রুত কমতে থাকল সেসব বৃক্ষরাজি; ফলে খাদ্যের খোঁজে সে অরণ্য থেকে পালাতে শুরু করল অন্য সব পশু ও পাখি। বিরান হয়ে উঠল একসময়ের বিস্তীর্ণ অরণ্য। ১৯২০ সালে ইয়েলোস্টোনকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় উদ্যান ঘোষণার পর পরিকল্পিতভাবে ফিরিয়ে আনা হলো নেকড়েদের। ক্রমেই সজীব হলো বৃক্ষরাজি, ফিরে এল পশু-পাখি। নতুন জীবন ফিরে পেল ইয়েলোস্টোন। ওলেনবেনের কথায়, প্রকৃতির রক্ষক হিসেবে নেকড়ে মানুষের চেয়ে অনেক যোগ্য। সে কথা আবার সত্য প্রমাণিত হলো।

প্রকৃতির রক্ষক হওয়ার বদলে আমরা যখন তার ভক্ষক হয়ে দাঁড়াই, তখন তার ফল কী ভয়াবহ হতে পারে, সে কথার আরেক উদাহরণ করোনাভাইরাস। এই অদৃশ্য ভাইরাসের আক্রমণে সারা বিশ্ব এখন এক অভাবিত বিপর্যয়ের মুখে। এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি, তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা, এই ভাইরাসের উৎস বাদুড় অথবা প্যাঙ্গোলিন নামক একটি ক্ষুদ্র বন্য প্রাণী। মধ্য চীনের উহান শহরের একটি তাজা মাছ-মাংসের বাজারে মুরগি ও অন্যান্য প্রাণীর পাশাপাশি বাদুড় ও প্যাঙ্গোলিন বিক্রি হতো। সারিবদ্ধ খাঁচার ভেতরে তাজা এসব জন্তু রাখা হতো, ক্রেতারা নিজ নিজ পছন্দমতো সেসব কিনে ঘরে ফিরতেন। এক প্রাণীর গা বেয়ে পড়া ঘাম ও লালা এসে মিশত অন্য প্রাণীর সঙ্গে। এদের অনেকগুলোর রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক প্রাণীর ভাইরাস অন্য প্রাণীর ভাইরাসের সঙ্গে মিশে নতুন এক ভাইরাসের

জন্ম হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কেউ কেউ বলছেন, নতুন করোনাভাইরাসের সূত্রপাত এভাবেই হয়েছে।

এশিয়ার অনেক দেশে, বিশেষত চীনে বাদুড় ও প্যাঙ্গোলিন উভয় প্রাণীই মানুষের খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায়। এখানে অনেকের ধারণা, বিভিন্ন কঠিন অসুখের নিরাময় সম্ভব প্যাঙ্গোলিনের মাংস থেকে। অনেক দিন থেকেই বাদুড় বা প্যাঙ্গোলিনের মতো বন্য প্রাণীর বাজারজাত করা বা বিদেশে রপ্তানি নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধ বলেই হয়তো এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে, যেমন চীন, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় প্যাঙ্গোলিনের মাংস ও আঁশ-কাঁটা স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। চীনের নব্য ধনীদের মধ্যে তো বটেই, সে দেশের সরকারি নেতাদের মধ্যেও আদা ও ধনেপাতার চাটনি বানিয়ে প্যাঙ্গোলিনের মাংস পরিবেশনের প্রতিযোগিতা হয়। এক হিসাবে দেখছি, ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে চীনা কর্তৃপক্ষ প্রায় ৯ টন প্যাঙ্গোলিনের কাঁটা ও আঁশ জব্দ করে। বস্তুত, প্যাঙ্গোলিন হচ্ছে বিশ্বের পাচারকৃত বন্য প্রাণীর মধ্যে এক নম্বর।

বাদুড় ও প্যাঙ্গোলিন থেকে করোনাভাইরাসের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে—এই সন্দেহ থেকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে চীনের জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে এই সব প্রাণীর বাণিজ্যিক কেনাবেচা নতুন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চীনের রাষ্ট্রপ্রধান সি চিন পিং পর্যন্ত এই জাতীয় বন্য প্রাণীর কেনাবেচার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, ‘এই ব্যাপারে আমরা আর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না।’

কিন্তু বাদুড় বা প্যাঙ্গোলিন তো হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে। কই, এত দিন তো কোনো করোনাভাইরাসের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অপরাধীর তর্জনী উত্থিত হয়নি। এই প্রশ্নের জবাবে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, অপরাধ বাদুড় বা প্যাঙ্গোলিনের নয়, মানুষের। যাদের প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে বিচরণের কথা, মানুষ সেই সব প্রাণী ধরে এনে গাদাগাদি করে খাঁচাবদ্ধ করে রেখেছে। যে অরণ্যে তাদের বিচরণের কথা, মানুষের আগ্রাসনের ফলে তাদের পরিমাণও কমে আসছে। বন্য প্রাণীর প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ওপর মানুষের হামলার একটা ফল হয়েছে এই যে এই সব প্রাণীর গঠন প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ‘জুনোটিক স্পিলওভার’। সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ বন্য প্রাণী বিশারদ অ্যান্ড্রু কানিংহাম বলেছেন, মানুষের আগ্রাসী ব্যবহার বাদুড়ের মতো প্রাণীর ওপর প্রবল মানসিক (হ্যাঁ, মানসিক) চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে তার রক্তের গঠন ও তাপমাত্রা বদলে যেতে পারে। এই বাদুড়ের দেহ নিঃসৃত ভাইরাস উহানের বাজারে অনায়াসে অন্য প্রাণীর সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে যে নতুন ভাইরাসের জন্ম হয়, তা প্রাণী থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। আর তারপর এক মানুষ থেকে দশ মানুষ, দশ থেকে হাজার, হাজার থেকে লাখ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, উহানে প্রথম যে কয়জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, তার প্রায় সবাই সেই বাজারে কেনাবেচা করতে এসেছিলেন।

এটা কি তাহলে প্রকৃতির প্রতিশোধ? প্রকৃতি যদি সজীব হয়, যদি তার অনুভূতি থাকে, তাহলে তার এমন প্রতিশোধে বিস্মিত হব না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ ক্রমেই প্রকৃতির

ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। বন কেটে বানিয়েছে নগর, ভূগর্ভ থেকে হরণ করেছে গ্যাস, তেল ও কয়লা, নদীপথ পরিবর্তন করে নির্মাণ করেছে অতিকায় বাঁধ। প্রকৃতির ওপর এক কাল্পনিক বিজয় লাভ করে আমরা নিজেদের অজেয় ভেবেছি। কিন্তু এখন সর্বংসহা প্রকৃতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পরিবেশ পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার ভেতর দিয়ে নিজের ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে সে।

প্রকৃতি একসময় প্রতিশোধ নেবে, এমন এক সম্ভাবনার কথা প্রায় দেড়'শ বছর আগে উল্লেখ করে গেছেন ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে পারে, এমন কথা সম্ভবত তিনিই প্রথম বলেছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ ডায়ালেক্টিকস অব নেচার গ্রন্থে। তাতে তিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে ধাবমান মানুষকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন, এতটা বাড়াবাড়ি করো না। মনে রাখবে, তোমাদের প্রতিটি বিজয় প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসেবে তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। মেসোপটেমিয়া, গ্রিস ও রোম সাম্রাজ্য যেভাবে অরণ্য ধ্বংস করে নগর নির্মাণ করেছে, তার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ, এ কথা সুনির্দিষ্টভাবে তখনই উল্লেখ করেছিলেন এঙ্গেলস। বৈশ্বিক উষ্ণতা হয়তো তাঁর অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু তিনিই প্রথম সমাজবিজ্ঞানী, যিনি অবিবেচক মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন প্রকৃতির ওপর বল্গাহীন আক্রমণের ফল হবে বনজ সম্পদের ধ্বংস, সুপেয় জলের প্রবল সংকট ও শস্যভূমির অনুর্বরতা। প্রায় বিদ্রূপ করেই বলেছিলেন, আল্পস পর্বতমালার পাদদেশে হাজার বছর ধরে লালিত পাইন অরণ্য কেটে কৃষিক্ষেত্র বানানোর ফলে যে পাহাড়ি ঝরনা এই ভূমিকে উর্বর করেছে, তা নিঃশেষিত হবে। প্রাকৃতিক উর্বতার স্থান নেবে প্রবল বন্যা। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমরা জানি, কী কঠোর সত্য উচ্চারণ করেছিলেন এঙ্গেলস।

একটি আশার কথাও বলেছিলেন তিনি। মানুষকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমরা যদি নির্দয় বিজেতা না হয়ে, বহিরাগত কোনো আক্রমণকারী না হয়ে প্রকৃতির অনুগত প্রজা হই, তাহলে সে আমাদের কেবল আশ্রয়ই দেবে তাই নয়, আমাদের রক্ষাকর্তাও হবে। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, খুব বেশি কিছু নয়, এর জন্য প্রয়োজন শুধু প্রকৃতির আইন মেনে চলা।

করোনাভাইরাসের মতো বিপর্যয় থেকে আরেকবার প্রমাণিত হলো, সে আইন মেনে না চললে কী নির্মম প্রতিশোধ নিতে পারে প্রকৃতি।

২

করোনাভাইরাসের আগে আমরা পরিচিত হয়েছি ইবোলা, সার্স ও মার্স–এই তিন সংক্রামক ব্যাধির সঙ্গে। তার আগে ছিল স্প্যানিশ ফ্লু, সেটি বিগত শতকের কথা। কিন্তু তারও অনেক অনেক আগে ছিল আরেক সংক্রামক ভাইরাস, যার নাম ভ্যারিওলা, আমাদের কাছে যা গুটিবসন্ত নামে পরিচিত। আমরা এখন জানি, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেও এই ভাইরাস ছিল, মিসরের তিনটি মমিতে তার চিহ্ন রয়েছে। মাত্র ৪০ বছর আগে পৃথিবীর বুক থেকে এই ভাইরাসের নির্মূল সম্ভব হয়।

গুটিবসন্ত নির্মূলের সঙ্গে বাংলাদেশের নাম জড়িত। ভোলার কুরালিয়া গ্রামের তিন বছর বয়সী রহিমা বেগম ছিল এই রোগের শেষ চিহ্নিত রোগী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুটিবসন্তবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ১৯৭৬ সালে কুরালিয়ার রহিমার খোঁজ মেলে। সে খোঁজ এনে দেয় এই গ্রামের আরেক মেয়ে, আট বছর বয়সী বিলকিস। এ জন্য সে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিল, নগদ ২৫০ টাকা। এই ঘটনার চার বছর পর, ৮ মে ১৯৮০ সালে, জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের বার্ষিক সভায় বিশ্বনেতারা ঘোষণা করেন, 'বিশ্বের মানুষ গুটিবসন্ত থেকে মুক্তি পেয়েছে।'

খুব সহজ ছিল না কাজটা। প্রায় পৌনে দুই'শ বছর আগে ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার প্রথমবারের মতো গুটিবসন্তের বিরুদ্ধে কার্যকর এমন একটি টিকা আবিষ্কারে সক্ষম হন। আরও এক'শ বছর পর আরেক ইংরেজ বিজ্ঞানী সিডনি কপারম্যান অধিক নিরাপদ একটি টিকা আবিষ্কার করেন। এই টিকা ব্যবহার করেই পরবর্তী ৫০-৬০ বছরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে গুটিবসন্ত কার্যকরভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয়। কিন্তু পৃথিবীর বাকি অংশ–দরিদ্র, অবহেলিত ও বিদেশি শাসনাধীন–এই ব্যাধি থেকে তখনো মুক্ত হতে পারেনি। তাদের কথা আদৌ বিবেচনায় আনা হয়নি। ষাটের দশকের শেষ নাগাদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুটিবসন্তের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার ফলেই পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এই ব্যাধির নির্মূল সম্ভব হয়।

মনে রাখা ভালো, আমরা এমন এক সময়ের কথা বলছি, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে 'ঠান্ডা লড়াই' তুঙ্গে। তা সত্ত্বেও বিশ্বের দেশগুলো গুটিবসন্তের মতো একটি ভয়াবহ ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাতে হাত মেলাতে সম্মত হয়। অন্য কথায়, গুটিবসন্তের মতো বিশ্বজোড়া মহামারি নির্মূল সম্ভব হয় বিশ্বের দেশগুলোর সম্মিলিত চেষ্টার ফলে। করোনাভাইরাস ঠিক সেই রকম একটি বিশ্বজোড়া মহামারি, একে নির্মূল করতে হলে বিশ্বের দেশগুলোকে আবার হাতে হাত মেলাতে হবে।

৪০ বছর আগে বিশ্বজোড়া উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হলেও আজ তেমন উদ্যোগ গ্রহণ খুব সহজ হবে না। এক-দেড় দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দক্ষিণপন্থী সরকারের উত্থান ঘটেছে, যারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বদলে জাতীয়তাবাদের প্রতি অধিক অনুগত। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'সবার আগে আমেরিকা' নীতি এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটি প্রকাশ। গত বছরে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এসে এক ভাষণে তিনি বিশ্বনেতাদের পরামর্শ দেন, বহুপাক্ষিকতার বদলে জাতীয়তাবাদ আঁকড়ে ধরো, সেটাই প্রকৃত দেশপ্রেমের প্রকাশ হবে। করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রশ্নে বিশ্বের ধনী দেশগুলো মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন।

চীনে করোনাভাইরাস প্রথম ধরা পড়ার পর তা দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে অধিকাংশ দেশের প্রতিক্রিয়া ছিল চাচা, নিজের প্রাণ বাঁচা। ধনী দেশগুলো শুধু যে নিজেদের সীমান্ত বন্ধ করে দেয় তা-ই নয়, যে যেখান থেকে সম্ভব মাস্ক ও গ্লাভস থেকে শুরু করে ভেন্টিলেটর পর্যন্ত কিনে নিজের দেশে জমা করা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র আরও

এক কাঠি এগিয়ে অতিরিক্ত সরবরাহের জন্য বিদেশি কোম্পানিগুলোকে চাপ দেওয়া শুরু করে। যেমন একটি জার্মান বায়োটেক কোম্পানি, যারা করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কারে বেশ কিছুটা এগিয়ে ছিল, তাদের বার্লিন ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসে উৎপাদন শুরুর জন্য গোপন আলাপ-আলোচনা শুরু করে।

আমরা জানি, একটা নিরাপদ ও কার্যকর টিকা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত করোনাভাইরাসকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ সম্পদের বিনিয়োগ, যার কণামাত্র বিশ্বের উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো এই কাজে বেশ এগিয়েছে, আগামী এক বছরের মধ্যেই এই টিকা আবিষ্কৃত হবে বলে ভাবা হচ্ছে। সে টিকা কি বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে মিলবে? আর যদি পাওয়াও যায়, কত দাম হবে সেই টিকার? পৃথিবীর সব দেশই করোনাক্রান্ত, এই ব্যাধি নির্মূল করতে হলে কোটি কোটি টিকার প্রয়োজন পড়বে। ধনী দেশগুলো কি আমাদের প্রয়োজনের কথাটা মাথায় রাখবে?

ধনী দেশগুলো যদি ধরে নেয় নিজেদের প্রয়োজন মেটানো গেলেই সমস্যার সমাধান হবে, তাহলে ভুল করবে। কোনো এক দেশে এই ভাইরাস নির্মূল করতে হলে সব দেশেই তার নির্মূলের উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যথায় পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত দেয়াল ডিঙিয়ে সে এসে হানা দেবে।

করোনাভাইরাসের কারণে আরও একটি মহামারি পৃথিবীর দেশগুলোকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর নাম অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা। ছোট-বড় সব দেশকেই বিপদে পড়তে হয়েছে। দারিদ্র্য বাড়ছে, বাড়ছে বেকারত্ব। ধনী দেশগুলো এই সংকট হয়তো সামলে নেবে, কিন্তু গাড্ডায় পড়বে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো। তারা এমনিতেই বাণিজ্য ও সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে বড় ধরনের বিপদে রয়েছে। এখন করোনার কারণে এই সংকট আরও তীব্র হবে। জাতিসংঘ বলেছে, আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া এসব দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতসহ অর্থনীতির অধিকাংশ ক্ষেত্র ভেঙে পড়বে।

আগেই বলেছি, করোনা থেকে মুক্তি পেতে হলে ধনী-দরিদ্র সব দেশেই টিকা ও অন্যান্য প্রতিষেধকের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশকে বাদ দিয়ে ধনী দেশগুলো একা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে না। নিজেদের সমৃদ্ধির জন্যই তাদের প্রয়োজন পড়বে তৃতীয় বিশ্বের বাজার, তাদের উৎপাদনব্যবস্থা।

আমরা প্রায়ই বলি পৃথিবী একটা বড় গ্রাম। গ্রামের মানুষ যেমন নিজেদের সুরক্ষার জন্য একে অপরের ওপর নির্ভর করে, তেমনই বিশ্বের সুরক্ষা সম্ভব যদি সবাই একে অপরের প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াই। অর্ধশতক আগে পৃথিবী এককাট্টা হয়েছিল বলেই তারা গুটিবসন্তের মতো ব্যাধি নির্মূলে সক্ষম হয়েছিল। করোনাভাইরাসকে নির্মূল করতে হলে আমাদের আবার একজোট হতে হবে।

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র